সূচীপত্র

প্রথম পর্ব

দ্বিতীয় পর্ব

প্রথম পর্ব

প্রথম অধ্যায়

কথারম্ভ

এক.

মানুষের দেশ মানুষের চিত্তের সৃষ্টি—এই জন্যই দেশের মধ্যে মানুষের আত্মার ব্যাপ্তি, আত্মার প্রকাশ।

—রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিতে স্বদেশের সংজ্ঞা এবং স্বদেশচেতনার ফলশ্রুতির সংক্ষিপ্ততম নির্দেশ পাওয়া যেতে পারে। এর অর্থবিস্তার করলে বোঝা যায়, স্বদেশ একটি বিশেষ ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক চেতনাজাত মানসসত্তা, এবং তদনুসারে স্বদেশচিন্তার পরিধিও বহুবিস্তৃত। কোন বিশেষ স্বদেশকেন্দ্রিক মনন ও ভাবকল্পনা যা তদ্দেশের ঐতিহ্য-স্মারক ও সংস্কৃতি-উদ্বোধক তাই স্বদেশচিন্তা।

এদিক দিয়ে 'স্বদেশ' ও 'স্বরাষ্ট্র' শব্দদুটি সমার্থক বলে গ্রহণ করা যায় না। একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, জনসমষ্টি, সরকার এবং সার্বভৌমিকতা—রাষ্ট্রের এই চারটি অঙ্গ রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্বীকৃত। স্বরাষ্ট্র সম্পর্কেও এই স্বীকৃতি প্রযোজ্য। কিন্তু সার্বভৌমিকতা না থাকলেও কোন পরতন্ত্র দেশ তার জনসমষ্টির স্বদেশ বলে গণ্য হতে পারে। কারণ, স্বদেশ পূর্বকথিত চেতনাত্রয়ের সমষ্টি। অর্থাৎ স্বদেশ কেবলমাত্র ভৌগোলিক মানচিত্রে অঙ্কিত ভূখণ্ড নয়, কোন জাতির মন-চিত্রে উদ্‌ভাসিত সত্তা। ঐ নির্দিষ্ট জনসমষ্টিই কোন বিশেষ ইতিহাস-চেতনা ও সাংস্কৃতিক চেতনায় একপ্রাণ ও একতাবদ্ধ হলেই একজাতি হয়ে ওঠে। সে-জাতির কাছে ঐ মৃন্ময় ভূখণ্ড তখনই চিন্ময় স্বদেশ হয়ে ওঠে।

অধুনা 'স্বদেশ' ও 'স্বজাতি' শব্দদুটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে ভারতবর্ষ এবং ভারতীয় জাতির সম্পর্কে স্পষ্ট একটা ধারণা সহজেই জাগে। কিন্তু আলোচনা করলে বোঝা যাবে, 'জাতি' ও 'জাতীয়তা' যা ইংরেজি 'নেশন' ও 'ন্যাশন্যালিজম্' শব্দদ্বয়ের প্রতিশব্দরূপে প্রচলিত হয়েছে—তার প্রত্যয় আধুনিক কালের পাশ্চাত্ত্য শিক্ষালব্ধ। প্রাচীন কিংবা মধ্যযুগে ঠিক এই অর্থে একজাতিত্বের কল্পনা সম্ভবত ছিল না। তবে স্বদেশচিন্তা বা স্বদেশচেতনা ভারতীয় মানসে একেবারে প্রতিফলিত হয় নি—একথা নিশ্চয়ই বলা চলে না। স্মরণাতীত কাল হতেই

একটি বিশিষ্ট ঐক্যচেতনা ভারতীয় জনমানসে ত্রিধারায় প্রবাহিত হয়েছে দৃশ্য বা অদৃশ্যরূপে।

প্রথমত, ভৌগোলিক চেতনাজাত ঐক্যবোধ প্রকাশিত হয়েছে এদেশের নাম-পরিকল্পনায়। ব্রাহ্মণ্যযুগে 'ভারতবর্ষ', বৌদ্ধযুগে 'জম্বুদ্বীপ', মধ্যযুগে 'হিন্দুস্তান'—প্রত্যেকটি নামই ভৌগোলিক দেশবাচক। আবার বিষ্ণুপুরাণের 'ভারতবর্ষ'-বর্ণনায় এই চেতনা প্রতিধ্বনিত—

উত্তরং যৎ সমুদ্রশ্চ হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্
বর্ষং তদ্ ভারতং নাম ভারতী যত্র সন্ততিঃ।

এদিকে মহাকবি কালিদাসের কাব্যে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক পটভূমিকা-রূপে হিমাচল-বর্ণনা আরও উদাত্তসুরে ধ্বনিত—

অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা
হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।

—এই দেবতাত্মা হিমালয় ভারতাত্মারই প্রতীক।[১]

শুধু হিমাচল-বর্ণনাই নয়, কালিদাসের কাব্যে রঘুর দিগ্বিজয়-বর্ণনায়, রামচন্দ্রের লঙ্কা থেকে স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তনকালে যাত্রাপথ-বর্ণনায়, কিম্বা 'মেঘদূত'-এ পূর্বমেঘ অংশের দক্ষিণাপথ হতে উত্তরাপথে পরিক্রমার বর্ণনায়—ভারতভূমির ভৌগোলিক রূপ উদ্ভাসিত। এছাড়া বিশাল সংস্কৃত সাহিত্যের নানা পুরাণে এবং মহাকাব্য 'মহাভারত'-এ আমাদের এই পুণ্যভূমির বর্ণনা আছে, এবং এদেশের নানা তীর্থের পরিক্রমাপথও বিবৃত হয়েছে। স্পষ্টত একরাষ্ট্র গ্রথিত না থাকলেও একই সংস্কৃতিজাত ভৌগোলিক অখণ্ডতা এদেশের নানা পুরাণের নানা স্তোত্রে ধ্বনিত হয়েছে—

অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারবতী চৈব, সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ॥

উক্ত সপ্ততীর্থ-বর্ণনায় ভারতবর্ষের ভৌগোলিক ভূখণ্ড বিধৃত।

আবার—

গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥

এই সপ্তনদীস্তুতি আধুনিক কালেও কবিকণ্ঠে ধ্বনিত—

বক্ষে দুলিছে মুক্তার হার পঞ্চসিন্ধু যমুনা গঙ্গা।

মোটকথা, প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভৌগোলিক অখণ্ডতাজাত ঐক্যবোধ কোন সুষ্ঠু ইতিহাসচেতনার ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত না থাকলেও একটি বিশেষ ধর্ম-সংস্কৃতির ভাবমণ্ডলে ক্ষণে ক্ষণে দীপ্ত হয়েছিল।

অথচ একথা অতীব সত্য যে, ইতিহাসচেতনাই স্বদেশচিন্তার কেন্দ্রভূমি। এটিই ইতিপূর্বে উল্লিখিত দ্বিতীয় ধারা, যার রসসিঞ্চনে পল্লবিত হয় রাষ্ট্রীয় ঐক্যভাবনা, জাতীয় সংহতিবোধ এবং ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক অখণ্ডতাবোধ। রবীন্দ্রনাথ এর মহিমা স্বীকার করেই বলেছিলেন—

> যে সকল দেশ ভাগ্যবান, তাহারা চিরন্তন স্বদেশকে দেশের ইতিহাসের মধ্যেই খুঁজিয়া পায়।

কিন্তু ভারতবর্ষে এই ইতিহাসচেতনার ধারাটিই প্রায়শ লুপ্ত, এ-ব্যাপারটি বিস্তৃত বিশ্লেষণের অপেক্ষায় রইল। আপাতত এইটুকু বলা চলে, আসমুদ্রহিমাচল রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতে কখনও কখনও বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে স্বল্পকালের জন্য। রাষ্ট্রচিন্তার স্তরে এর অস্তিত্ব সূচিত হয়েছিল কৌটিল্য-নির্দিষ্ট হিমালয় ও সমুদ্রসীমায়িত চক্রবর্তিরাজের শাসনক্ষেত্র বর্ণনার সূত্রে এবং তারও পূর্বে বৌদ্ধশাস্ত্র গ্রন্থ 'অঙ্গুত্তর নিকায়'-এ লিখিত ছিল 'জম্বুদ্বীপে' এক চক্রবর্তিরাজশাসিত ধর্মরাজ্য স্থাপনের পরিকল্পনা। বাস্তবক্ষেত্রে মৌর্যচন্দ্রগুপ্ত, অশোক, সমুদ্রগুপ্ত ও হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্য-পরিকল্পনার রূপায়ণ-প্রয়াস এবং কমবেশি সাফল্যের কথা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় উজ্জ্বল হয়ে আছে। তারপর মুসলিম যুগে আলাউদ্দীন খিলজি থেকে ঔরংজীব পর্যন্ত দিল্লির মুসলমান সম্রাটগণের নিরন্তর প্রয়াস ছিল উত্তর ভারতের সঙ্গে দক্ষিণাপথের রাজ্যগুলি গ্রথিত করার। এ-ব্যাপারে ঔরংজীব শেষজীবনে সফলও হয়েছিলেন। কিন্তু ইতিহাসের পরিধিতে ভারতবর্ষে এই জাতীয় প্রয়াস খণ্ড খণ্ড অধ্যায় সৃষ্টি করেছে মাত্র, কোন-একটি নিরবচ্ছিন্ন অখণ্ডতাবোধ জাগ্রত করে নি। অথচ রাষ্ট্রনৈতিক অখণ্ডতা নিরবচ্ছিন্ন না হলেও ভারতের সংস্কৃতির ইতিহাসে ছিল নিরন্তরতা। এ-সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ আমরা যথাস্থানে তুলে ধরব। আপাতত এটুকু উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করেই রবীন্দ্রনাথ "অন্যান্য দেশের মনুষ্যত্বের আংশিক বিকাশের দৃষ্টান্তে ভারতবর্ষের ইতিহাসকে সংকীর্ণ"—না করে দেখার অনুরোধ করেছেন। কারণ, তাঁর মতে বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য, কবীর, দাদূ, নানক ও চৈতন্যদেবের ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বে ভারতীয় সমাজের ইতিহাস আবর্তিত হয়েছে। ইতিহাসের এই লোকবৃত্তকে আমাদের স্বীকার করতে হবে এবং তদনুযায়ী, রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বিশাল সমাজ-ইতিহাস আলোচনা করতে হবে। অবশ্য উনবিংশ শতাব্দীর নব-জাগরণের (রেনেসাঁ) ফলশ্রুতি-স্বরূপ এই বিশিষ্ট ইতিহাসচেতনা আধুনিক কালের দৃষ্টিতেই উদ্‌ভাসিত, প্রাচীন ও মধ্যযুগে এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি সুস্পষ্ট ছিল না।

ভারতবর্ষের স্বদেশচেতনার শেষ উপাদানটি সর্বাধিক জটিল। তা হল, সাংস্কৃতিক চেতনা এবং এটিই পূর্ব-কথিত তৃতীয় ধারা। একথা সর্বজনস্বীকৃত যে, ভৌগোলিক অখণ্ডতাবোধ এবং রাষ্ট্রীয় সমীকরণ-মূলক ঐক্যবোধ যা ইতিহাসভূমিতে প্রতিষ্ঠাপ্রয়াসী —এই দুই বোধকে অতিক্রম করে সাংস্কৃতিক চেতনা সহসা মূর্তিমতী হয়ে ওঠে না। অথচ এই ঐক্যবোধই ভাবরূপী এবং অন্তর্মুখীন হয়ে ভারতীয় সমাজে সর্বদা সঞ্চরমান থেকেছে। বর্ণ, ধর্ম, ভাষা, লোকব্যবহার, সংস্কৃতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য, বিরোধ ও বিচ্ছেদের অস্তিত্ব সত্ত্বেও আমাদের জাতীয় জীবনে একটি মানসিক ঐক্যভূমি আবিষ্কার করার প্রবণতা এই ধারাতে পরিদৃশ্যমান। এবং এর আভাস আছে ভারতীয় কবিকল্পনায় ও সাধকের ধ্যানদৃষ্টিতে। তাই বহুধাবিভক্ত ও বিচিত্র ধর্ম-মতাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও ভারত এক বিচিত্র ভাবগত ঐক্যে সূত্রান্বিত। রবীন্দ্রনাথ এই বিশ্বমিলনাভিমুখী পথকে ভারতপথ আখ্যা দিয়েছেন,—এই পথের পথিকদের বলেছেন 'ভারতপথিক' আর এই ভাবগত ঐক্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে পাশ্চাত্ত্য-পণ্ডিত স্যার জন উড্রফ একে 'ভারতধর্ম' সংজ্ঞা দিয়েছিলেন।

আমাদের দেশের রামায়ণ-মহাভারতের শাশ্বত অমৃতধারাটি উক্ত সাংস্কৃতিক চেতনার উৎস। নানা পুরাণ ও নানা কাব্যের ভাবনিস্যন্দী শ্লোকরাজিতে এবং নানা শাস্ত্র-সংহিতার সূত্রে এই চেতনা অনবচ্ছিন্ন। কালিদাসের ধ্যানদৃষ্টিতে এই চেতনাই উদ্ভাসিত। বুদ্ধ-শঙ্করাচার্য-কবীর-নানক-চৈতন্যের তীর্থপরিক্রমায় ও সাধনালব্ধ বাণীপ্রচারে এই বোধি নব নব রূপে ভারতীয় মানসে পুনঃপুনঃ উজ্জীবিত। কিন্তু এই চেতনা শিল্পিতরূপে প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও কোন যুক্তিনিষ্ঠ প্রত্যয়রূপে সমাজ-ব্যবহার ও রাষ্ট্রচেতনাকে প্রভাবিত করেছে সামান্যই। পরবর্তী কালে ঊনবিংশ শতাব্দীর পুনরুজ্জীবনের আলোকে এই ধারাকে নতুন করে আবিষ্কার করা হয়েছে ভারতবর্ষে।

এ-পর্যন্ত স্বদেশচিন্তার মূলে যে চেতনাত্রয়ী বর্তমান, তার কথাই ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে প্রসঙ্গসূত্রে স্মরণ করা গেল। বোঝা গেল, প্রাচীন ও মধ্যযুগে যা ভাবময়, আধুনিক যুগে তাই-ই প্রমূর্ত চিন্তায় ও শিল্পিতরূপে।

আবার অন্যদিকে দেখা যায়, তথাকথিত 'ন্যাশন্যালিজম্', যার প্রতিশব্দরূপে 'জাতীয়তাবোধ' প্রচলিত, তার সঙ্গে সামগ্রিক স্বদেশচিন্তার পার্থক্য আছে। 'নেশন কী' শীর্ষক প্রবন্ধে ফরাসি-ভাবুক রেনাঁর মত বিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 'নেশন' নামক মানস পদার্থের মূল উপাদান চিহ্নিত করেছিলেন। সেক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য ছিল—

নেশন একটি সজীব সত্তা, একটা মানস পদার্থ।

এ-প্রসঙ্গেই তিনি বলেছিলেন, ইউরোপের রাষ্ট্রতন্ত্রমূলক ন্যাশন্যাল ঐক্য আর ভারতের

'মানুষ-বাঁধার' ঐক্য এক নয়। পরবর্তী কালে তিনি তাঁর 'Nationalism' শীর্ষক বক্তৃতামালায় প্রচলিত 'ন্যাশন্যালিজম্'-এর তীব্র বিরোধিতা করে বলেছিলেন—

> A nation in the sense of the political and economic union of a people is the aspect which a whole population assumes when organised for a mechanical purpose.

আমরাও উক্ত যুক্তি স্বীকার করে বলতে পারি, ঐ-জাতীয় যান্ত্রিক জাতীয়তাবোধ হতে স্বদেশচিন্তার পার্থক্য দুস্তর, অন্তত ভারতীয় স্বদেশচিন্তার ক্ষেত্রে তো নিশ্চয়ই।

মোটকথা, দেশ যেমন কেবলমাত্র মাটি ও মানুষ নয়, তাছাড়া আরও কিছু—স্বদেশচিন্তা তদ্রূপ জাতীয়তাবোধ কিম্বা দেশপ্রেম অতিক্রম করে কোন একটি ব্যাপকতর বোধি। ইউরোপীয় নেশন-তত্ত্বের সঙ্গে এই ব্যাপকতর স্বদেশচেতনার পার্থক্য আছে। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ ইউরোপীয় সভ্যতার ছাঁদে নেশন গড়ার আদর্শ পরিত্যাগ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। রবীন্দ্র-মত গ্রহণ করলে ভারতবর্ষীয় স্বদেশচিন্তাকে সর্বাঙ্গীণ বিকাশের অভিমুখী বলে স্বীকার করতে হয়; এবং তখন দেখা যাবে এই পরিধিতে রাজনীতি, সমাজনীতি ও ধর্মনীতিমূলক চিন্তাগুলি পৃথক ভাবে বা সম্মিলিত ভাবে বর্তমান। আমাদের আলোচনায় এটি স্পষ্ট করে দেখাবার চেষ্টা করব।

দুই.

স্বদেশচিন্তার আলোচনার ক্ষেত্র তিনটি—রাজনীতি, সমাজ ও ধর্ম। এগুলির প্রত্যেকটি আবার দুইভাবে দুটি প্রকাশক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত; সেই ক্ষেত্রদুটি হল চিন্তা-মূলক নিবন্ধ এবং অন্যান্য শিল্পিতরচনা। আবার স্বদেশচিন্তার ক্রমবিকাশের পটভূমিকা সবদেশে প্রায় একই এবং তা হল সংশ্লিষ্ট দেশের পুনরুজ্জীবন যুগ।

ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, প্রাগৈতিহাসিক কালে কৌমমনোবৃত্তি-সম্পন্ন মানুষ তার পূর্বতন ঐতিহ্য সম্পর্কে ছিল নির্বিকার। পরবর্তী কালে সমাজবদ্ধ মানুষ কৃষি-বাণিজ্য-অবলম্বিত এক-একটি বিশেষ সংস্কৃতির অধিকারী হয়ে এক-এক ভূখণ্ডে এক-একটি ঐতিহ্য গড়ে তুলেছে। প্রাচীন মহাকাব্যগুলিতে তার প্রতিফলন আছে। অতঃপর মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্রের যুগে সাধারণ মানুষের অধিকারবোধ জেগেছিল সামান্যই, কাজেই স্বদেশচিন্তার উন্মেষ তখনও আশা করা যায় না। অন্তত ভারতবর্ষে মধ্যযুগীয় অবস্থা ছিল এমনি—

> ভারতবর্ষীয়েরা স্বভাবতই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষারাহিত। স্বদেশীয়, স্বজাতীয় লোকে আমাদিগকে শাসিত করুক, পরজাতীয়দের শাসনাধীন হইব না এরূপ অভিপ্রায় ভারতবর্ষীয়দিগের মনে আইসে না।

বঙ্কিমচন্দ্র 'ভারতকলঙ্ক' প্রবন্ধে উপরোক্ত চিত্রটি অঙ্কন করেছেন। "যে রাজা হয় হউক আমরা কাহারও জন্য অঙ্গুলী ক্ষত করিব না"—এই অনীহা ছিল মধ্যযুগের ভারতীয় সমাজে, অর্থাৎ "কোই নৃপ হোয় হম্‌হি কা হানি" (তুলসীদাস)। অন্যদিকে ইউরোপের ইতিহাসে দেখা যায়, ইটালিতে মধ্যযুগের অবসানে এসেছিল পুনরুজ্জীবন যুগ (La Rinascita বা পুনর্জন্ম, ফরাসি ভাষায় Renaissance)। সেখানে সাহিত্যে, শিল্পে, সমাজে ও ধর্মে এসেছিল নবজাগরণের জোয়ার। এমনিভাবে নবজাগরণের জোয়ারে ইটালির মত এক-একটি জাতির প্রাণশক্তির উদ্বোধন ঘটে এবং তার ফলে সেখানে স্বদেশচেতনার প্রকাশ ও ক্রমবিকাশ ঘটে চিন্তায় ও শিল্পিতরূপে—

> নিজের অতীত সম্বন্ধে···আত্মবিস্মৃতি বা বিকৃতকল্পনা, এটা হচ্ছে সবদেশেরই মধ্যযুগীয়তার লক্ষণ। আর ওই আত্মবিস্মৃতির অবসানে নিজের অতীত ও ঐতিহ্য সম্বন্ধে ঔৎসুক্য ও অনুসন্ধান এবং তার থেকে প্রেরণা লাভ করে বর্তমানের কর্মোদ্যম ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশার সঞ্চার এটাই হচ্ছে আধুনিক যুগের মৌলিক লক্ষণ। ইতিহাসে একেই বলে রেনেসাঁস বা আত্মবোধের পুনরুজ্জীবন।[২]

আচার্য সেন এই প্রসঙ্গে বলেছেন, চতুর্দশ শতকের ইটালির চিত্তমুক্তির বাণীতে সারা ইউরোপ জেগে উঠেছিল সাড়ে চারশত বৎসর ধরে। জার্মানীর ধর্মনৈতিক বিপ্লব, ফরাসির রাষ্ট্রবিপ্লব ও রুশীয় অর্থনৈতিক বিপ্লব—একই নাটকের যথাক্রমিক দৃশ্যাবলী। কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসে ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে উক্ত প্রক্রিয়াগুলি সংঘটিত হয়েছে একযোগে।

মোটকথা, আত্মবোধের পুনরুজ্জীবনই স্বদেশচিন্তার ভূমি প্রস্তুত করেছে ইউরোপের মত আমাদের দেশেও। আসলে আত্মবীক্ষণই তো ইতিহাসচেতনা—যার আলোকে জাতিমানসে সজীব সত্তা জাগরিত হয় এবং ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতিতে পুনর্জাগরণ ও বিপ্লব (reformation & revolution) শুরু হয়। এই জাতীয় মানস-কর্ষণায় যুগমনীষীদের অবদান স্মরণযোগ্য। বস্তুত 'ঐতিহ্যের সমন্বয় ও সাঙ্গীকরণে'-ই স্বাজাত্যবোধ জাগে। স্বদেশচিন্তার উদ্ভব ও বিকাশের মূল প্রেরণা তাই বলা চলে—'আত্মবোধের পুনরুজ্জীবন' এবং 'ঐতিহ্যের সমন্বয় ও সাঙ্গীকরণ'[৩]।

অতএব একথা স্পষ্ট যে, জাতীয়তাবোধ ও স্বদেশপ্রেম—এই দুটি চেতনা স্বদেশ-

চিন্তা-রূপ মহীরুহের সুদৃশ্য পুষ্পস্তবক যা সর্বাগ্রে আমাদের মনোহরণ করে, কিন্তু 'এহোবাহ্য',—এ-মহীরুহের অমৃতফল হল বিশ্বমানবতাবোধ, "যার লাগি নরদেব চির রাত্রি-দিন তপোমগ্ন।"

আজ আর একথা অস্বীকার করা চলে না যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর পুনরুজ্জীবন-প্রেরণা ভারতের ইতিহাসে এসেছে 'বাংলা দেশের হৃদয় হতে',—আর আলোচ্য স্বদেশচিন্তার উদ্ভব ও বিকাশ বাংলা সাহিত্যে ও শিল্পচেতনায় ঘটেছে সর্বপ্রথম। সেজন্য বাঙালি মনীষীদের চিন্তায় এবং প্রায় একইকালে সৃষ্ট শিল্পিতরূপে এই স্বদেশভাবনার বিবর্তন লক্ষ্য করা যাবে। আর এই বিবর্তনধারা-যে ঊনবিংশ শতকের উত্তরাধিকার বহন করে বিংশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত অব্যাহত বেগে প্রবাহিত হয়েছে—আমাদের আলোচনায় সে বিষয়টি ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বঙ্কিম-পূর্ব যুগের স্বদেশচিন্তা

এক. আলোচ্য চিন্তার ক্ষেত্রে বিভিন্ন মনীষী: রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, রামগোপাল, রাজেন্দ্রলাল ও হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

দুই. ঐ-জাতীয় সাহিত্য-সৃষ্টি বা শিল্পিত প্রকাশের ক্ষেত্রে বিভিন্ন শিল্পী: ডিরোজিও, ঈশ্বরগুপ্ত, রঙ্গলাল, মধুসূদন, দীনবন্ধু ও হেমচন্দ্র।

এক.

উনবিংশ শতাব্দীর পুনরুজ্জীবন বাঙালি মনীষীদের চিন্তায় এবং বাংলা সাহিত্যে ও শিল্পচেতনায় স্বদেশ-ভাবনার বীজ বপন করেছে। এই পুনরুজ্জীবনের নতুন আলোয় নবযুগের যাত্রা আরম্ভ হয়েছে ভারতপথিক রামমোহনের আবির্ভাবে। এ-যুগের অব্যবহিত পূর্বে অষ্টাদশ শতাব্দীর চিন্তায় ও সাহিত্যে স্বদেশচিন্তার সুস্পষ্ট কিছু রূপ পাওয়া যায় না। আরও কয়েক শতাব্দী পিছিয়ে গেলে দেখা যাবে, বাংলাদেশে বাঙালির প্রথম মানসমুক্তি ঘটেছিল চৈতন্যযুগে, যখন দেববাদ-অধ্যুষিত সাহিত্যে দেবোপম মানবের বন্দনা ধ্বনিত হয়েছিল। তৎকালীন ভক্তি-আন্দোলনের প্লাবনে বাংলাদেশ এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের পূর্বাঞ্চল হতে উত্তরাপথ পর্যন্ত ভূভাগ প্লাবিত হয়েছিল, এবং তারই প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ আত্মিক ভাবনার উদ্দীপনা প্রকাশ পেয়েছিল বাংলা সাহিত্যে, কিন্তু তাতে স্বদেশ-ভাবনার কোন সুস্পষ্ট প্রকাশ দেখা যায় নি। অতঃপর অষ্টাদশ শতকের সাহিত্যেও স্বদেশচিন্তার প্রতিফলন কোথাও স্পষ্ট নয়; তার কারণ অনুসন্ধান করা যেতে পারে সে-যুগের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের আবর্তে। আমরা জানি, অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলাদেশ ও বাঙালির রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অধঃপতন ইতিহাসের এক মসীলিপ্ত অধ্যায়। সে-যুগের রাজনৈতিক ও সামাজিক ষড়যন্ত্রের পাপ-পিচ্ছিল পথেই ইংরেজ 'বণিকের মানদণ্ড' রাজদণ্ড রূপে দেখা দিয়েছিল। বাঙালির রাষ্ট্রচিন্তা এবং সমাজচিন্তা তখন ছিল সুপ্ত অথবা মৃত। এই প্রসঙ্গে ইংরেজ ঐতিহাসিক Percival Griffiths-এর 'The British

impact on India' গ্রন্থে উদ্ধৃত ক্লাইভের উক্তিটি উল্লেখ করা যায়। পলাশী যুদ্ধের পর মুর্শিদাবাদ প্রবেশের দৃশ্য-বর্ণনার সূত্রে ক্লাইভের মন্তব্য ছিল—

if they had an inclination to have destroyed the Europeans they might have done it with sticks and stones.

ক্লাইভের মন্তব্যে অতিশয়োক্তির সম্ভাবনা স্বীকার করেও এটিকে রাজ্য ও রাজার উত্থান-পতনে বাঙালির নির্বিকার উদাসীনতার প্রতি ইঙ্গিত বলে গ্রহণ করা চলে। এই ঔদাস্য তৎকালীন সমগ্র ভারতীয় জনসমাজের অনীহার কথাই স্মরণ করায়। বাস্তবিকই সেকালে দেশের প্রতি মমত্ববোধ যে হ্রাস পেয়েছিল তার পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় তৎকালীন বাংলা সাহিত্যে। পলাশীর যুদ্ধের মত এতবড় ঐতিহাসিক ঘটনা সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে বিশেষ কিছু উত্তাপ সঞ্চার করে নি, অথচ সাহিত্যে প্রতিফলিত হবার মত আবর্তসঙ্কুল পটভূমিকা ছিল। এবার উক্ত পটভূমিকাটি আমরা এখানে সংক্ষেপে পর্যালোচনা করব।

সেই অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস ইংরেজ বণিকের দয়াহীন দস্যুতার ইতিহাস—যা তৎকালীন দ্বৈতশাসন, মন্বন্তর ও নিষ্ঠুর শোষণের মর্মন্তুদ ঘটনাবলীর সাক্ষ্য। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় হাণ্টার সাহেবের 'Annals of Rural Bengal' গ্রন্থে গভর্নর হেস্টিংসের বিবরণ কিম্বা এডওয়ার্ড টমসন ও জি. টি. গ্যারেট লিখিত 'Rise and fulfillment of British rule in India' গ্রন্থের বর্ণনা। এ-বিবরণে তৎকালীন বাংলাদেশ তথা বৃহত্তর বাংলার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দুর্দশার চিত্র দেখে শিউরে উঠতে হয়। ইতিপূর্বেই বৃটিশ কোম্পানির কুম্ভীপাকে সোনার বাংলা তলিয়ে গিয়েছিল অর্ধশতাব্দীর মধ্যেই : আর শুধু বাংলা নয়, বৃটিশ-শাসিত সমগ্র ভারতবর্ষ হয়ে উঠেছিল শিল্প-বিপ্লবোত্তর ইংলণ্ডের কাঁচামাল জোগানদার এবং পণ্যের বাজার। এদিকে কর্নওয়ালিস প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে আবির্ভূত নতুন ভূস্বামী-সম্প্রদায় ও বণিকগোষ্ঠী এবং ইংরেজ ব্যবসায়ীর সাহায্যকারী বেনিয়ান, মুৎসুদ্দী প্রভৃতির নতুন-এক আর্থিক সম্প্রদায় তৎকালীন বাংলার 'Decadent Society'-র প্রতিনিধিত্ব করছিল। স্পষ্টত ঐতিহাসিক কারণেই সেযুগে বাঙালির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমি ছিল মসীলিপ্ত এবং উচ্চশ্রেণীর জীবনের আদর্শ নিম্নমুখী আর জনসাধারণ আশাভরসা-হীন দিগ্‌ভ্রষ্ট হয়েছিল।

সর্বদিক থেকেই তৎকালীন সমাজমানস ছিল আচ্ছন্ন ও আত্মগ্লানিতে অপহৃত। কুসংস্কার, নিরন্তর পরাভবচেতনা, প্রাকৃতিক শক্তির নিকট সশ্রদ্ধ আত্মসমর্পণ এবং যুগযুগান্তরবিস্তৃত বিধিব্যবস্থার নিকট প্রশ্নহীন আত্মবিক্রয় ব্যক্তিমানসকে

সর্বপ্রকার আত্মচেতনা হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছিল।…সমাজমানস ছিল সর্বপ্রকার গতিশীল-সৃষ্টধর্মী-গুণবর্জিত, কার্যকারণ সম্পর্কের চেতনাহীন, irrational.[১]

সমালোচকের উপরোক্ত বিশ্লেষণ যথার্থ। ঠিক এইকালের বাঙালি ও বাংলাদেশের অবক্ষয়ের বাস্তবচিত্র পাওয়া যায় 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' এবং 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ'-এর বিবরণে। সাংস্কৃতিক জীবনের এমনি কর্মঠবৃত্তির দিনে স্বদেশচিন্তার উন্মেষ আশা করা যায় না।

এইসূত্রে পুনরায় পূর্ববর্তী কয়েক শতাব্দীর মানস-কর্ষণার ইতিহাস অর্থাৎ মধ্যযুগীয় বাঙালি মনীষীদের চিন্তা এবং বাংলা সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে। তৎকালের মনীষীগণ ছিলেন আধ্যাত্মিক উন্নতি ও ভক্তি-মুক্তির পথযাত্রী, হিন্দুসমাজকে মুসলিম অভিঘাত হতে রক্ষা করার প্রয়াসে ব্রতী। আধুনিক অর্থে স্বদেশ বলতে যা বুঝি, তা তখন স্পষ্ট ছিল না, তাই মনীষী ও মহাজনবৃন্দ সমাজ-প্রাঙ্গণ হতে একেবারে দেশ-কালাতীত চিরবৃন্দাবনের অভিযাত্রী হয়ে পড়েছিলেন। তবে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের মঙ্গলকাব্যে সমাজচিত্র যথেষ্ট আছে, রাজনৈতিক বিপর্যয়ের কথাও আছে, কিন্তু স্বদেশের প্রতি মমত্ববোধ সেগুলিতে খুব একটা স্পষ্ট নয়। এ-সম্পর্কে দু-একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'-কাব্যে প্রতাপাদিত্যের ট্রাজিক পরিণতির বর্ণনায় পাই—

পিঞ্জর করিয়া পিঞ্জর ভরিয়া
প্রতাপ আদিত্যে লইল।

এবং তারপরই আরও নির্বিকার অভিব্যক্তি—

প্রতাপ-আদিত্য-রাজ মৈল অনাহারে,
ঘৃতে ভাজি মানসিংহ লইল তাহারে।

উক্ত বর্ণনা নিশ্চয়ই স্বাভাবিক ও প্রাঞ্জল, কিন্তু কাব্যের ঘৃতে তথ্য ভাজা হলেও তাতে জাতিচেতনার গলিত শবের পূতিগন্ধ ঢাকা পড়ে নি। আসলে স্বদেশচিন্তার যা মূল, তা হল স্বজাতি ও স্বদেশের প্রতি এবং দেশের মানুষের প্রতি মমতা। তখনও ঐ মমত্ববোধ সাহিত্যে সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি লাভ করে নি। কারণ, কবি ভারতচন্দ্রের নিরুদ্বিগ্ন মনে মুঘল-পীড়নের জ্বালা ছিল কিনা এ-প্রশ্ন থেকে যায়। অন্তত তাঁর কাব্যে এই প্রতিফলন হয় নি বললেই চলে; একমাত্র অন্নদামঙ্গলের চারটি ছত্রকে ভারতবর্ষের কিঞ্চিৎ প্রশস্তি আছে—

সপ্তদ্বীপ মাঝে ধন্য ধন্য জম্বুদ্বীপ।
তাহাতে ভারতবর্ষ ধর্মের প্রদীপ॥

আবার মধ্যযুগের অবসানে পলাশীর যুদ্ধের জ্বালাও তৎকালীন দু'একটি ছড়া ছাড়া

কুত্রাপি রেখাপাত করে নি। মনে হয় যেন একপ্রকার নিরুদ্যম ঔদাসীন্য সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের স্বাভাবিক প্রত্যাশিত সম্ভাবনা নির্বাপিত করেছে।

অতঃপর ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে ভারতপথিক রামমোহন পুনরুজ্জীবনের মূর্ত প্রতীকরূপে আবির্ভূত হলেন, এবং এই আধুনিক 'প্রমিথ্যুস' সর্ববিধ বন্ধন ও অচেতচিত্ততার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। এ-প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের একটি সশ্রদ্ধ মন্তব্যের কিয়দংশ উদ্ধৃত করছি—

> Rammohon Roy, that other great soul and puissant worker who laid his hand on Bengal and shook her to what mighty issues—out of her long, indolent sleep.
>
> —'On Dayananda.' Vedic Magazine, 1915.

এই মন্তব্য অক্ষরে অক্ষরে যথার্থ। রামমোহন সেদিন বাংলাদেশকে প্রচণ্ড বেগে নাড়া দিয়েছিলেন। বহু শতাব্দীর নিদ্রা ও জড়তা ত্যাগ করে বাঙালি এসে দাঁড়িয়েছিল আগামীকালের পথে। শুধু বাংলাদেশেই নয়, সমগ্র ভারতবর্ষেই বুঝি নবজীবনের বহ্ন্যুৎসব শুরু হয়েছিল সেদিন রামমোহনকে কেন্দ্র করে। যেমন ইউরোপের রেনেসাঁ ও রিফর্মেশনের সুদীর্ঘ অর্ধসহস্র বর্ষের যজ্ঞাগ্নি জ্বালিয়েছিল ইটালি, তেমনি ভারতের শতবর্ষের যজ্ঞশিখা জ্বেলেছে বাংলাদেশ। রামমোহনই ছিলেন সে-যজ্ঞের ঋত্বিক—

> য়ুরোপের নবচেতনা পর্যায়ক্রমে জ্ঞান, ধর্ম, রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতিকে অবলম্বন করে বিপ্লবের সৃষ্টি করেছে, এবং এই চতুর্বিধ বিপ্লব ঘটতে সেদেশে পাঁচশো বছরের বেশি সময় লেগেছে। কিন্তু ভারতবর্ষে এই চতুর্বিধ বিপ্লব দেখা দিয়েছে প্রায় একই সঙ্গে এবং কিঞ্চিদধিক একশো বছরের মধ্যে।...এদেশে সে পর্যায়ক্রম অনুসৃত হতে পারেনি। তবু যে পর্যায়ক্রম কতকটা স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায় সে হচ্ছে ধর্ম, সংস্কৃতি, রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতি।[২]

স্বদেশচিন্তার আলোচনার একটি মূল্যবান সূত্র হিসাবে আচার্য সেনের উপরোক্ত উক্তিটি গ্রহণ করা চলে।

বাস্তবিকই ভারতবর্ষে উক্ত চতুর্বিধ আন্দোলনেরই উদ্গাতা রামমোহন স্বদেশচিন্তার বীজ বপন করেছিলেন জাতির মানসক্ষেত্রে। একই সঙ্গে রেনেসাঁস ও রিফর্মেশন, ধর্ম-সংস্কৃতি-রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে আন্দোলন, ঐতিহ্যবোধ ও নবদৃষ্টিভঙ্গির উন্মেষ, সেদিন ভারতে যে জ্ঞান-কর্ম-ভাবোদ্দীপনার সূত্রপাত করেছিল, তা আজও অব্যাহত। রামমোহনের চতুর্বিধ সাধনা স্বদেশচিন্তার যে-চারটি শিখা

প্রজ্বলিত করেছিল, তার কথা সূত্রাকারে স্মরণ করা যেতে পারে। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থে স্বামী বিবেকানন্দ একস্থানে বলেছেন যে, এই ভারতের প্রাণপাখী ধর্ম এবং—

> তারই প্রেরণায় লক্ষ শতাব্দীর আবর্তনে হিন্দুর জাতীয় চরিত্রের বিকাশ।…
> এ দেশের প্রাণ ধর্ম, ভাষা ধর্ম, ভাব ধর্ম…।

ভাবুক সন্ন্যাসীর এবম্বিধ উক্তিতে কিঞ্চিৎ আতিশয্য থাকলেও এতে ভারতবর্ষের স্বদেশচিন্তার একটি বিশেষ উপাদান পাওয়া যায়। সে-উপাদানটি হল অধ্যাত্মচেতনা। বাস্তবিকই আধ্যাত্মিকতায় জড়িত হয়ে আছে ভারতের সমাজ, সাহিত্য, রাষ্ট্রচিন্তা এবং অর্থনীতি। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সব মনীষীর চিন্তায় এই আধ্যাত্মিকতা ওতঃপ্রোত; কম অথবা বেশি মাত্রায় এই উপাদানটি সর্বত্রই লক্ষ্য করা যাবে।

রামমোহন তাঁর পূর্ববর্তী ভারতপথিক কবীর, দাদূ, নানক, রজ্জবের পথেই যাত্রা করেছিলেন—

> রামমোহন রায় ভারতের এই পথের চৌমাথায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন, ভারতের যা সর্বশ্রেষ্ঠ দান তাই নিয়ে। তাঁর হৃদয় ছিল ভারতের হৃদয়ের প্রতীক— সেখানে হিন্দু, মুসলমান, খৃস্টান সকলে মিলেছিল তাদের শ্রেষ্ঠ সত্তায়, সেই মেলবার আসন ছিল ভারতের মহাঐক্যতত্ত্ব, একমেবাদ্বিতীয়ম্।[৩]

এদিকে 'বুদ্ধির প্রাধান্য এবং মানবহিতবাদের প্রতিষ্ঠা'—উনিশ শতকের ইউরোপের এই দুটি বাণীর সার্থক প্রয়োগ হয়েছিল রামমোহনের ধর্মচেতনায়। রামমোহনই ইসলাম, খ্রীস্টধর্ম এবং উপনিষদের দর্শন সমন্বয় করে ব্রাহ্মধর্মের সূচনা করেছিলেন। "বিকৃত ধর্ম হতে রাষ্ট্রীয় দুর্গতির সূচনা"—এই বিশ্বাসে তিনি স্বদেশের ধর্মকে যুগোপযোগী করে বিশ্বমানবতার পথ উন্মুক্ত করেছিলেন। এইসূত্রে John Digby-কে লেখা রামমোহনের একটি পত্রাংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে—

> I regret to say that the present system of religion adhered to by the Hindus is not well calculated to promote their political interest.…It is, I think, necessary that some change should take place in their religion, at least for the sake of their political advantage and social comfort.…

রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক মঙ্গলের জন্যই যে লোকাচার-সংকীর্ণ হিন্দুধর্মের কিছু সংস্কার প্রয়োজন রামমোহনের চিন্তাধারায় এই আস্থা ক্রমেই দৃঢ় হয়েছিল। তিনি রাষ্ট্র, সমাজ ও ধর্ম—এই ত্রিবিধ সত্তাকে একীভূত করে ঐহিকতার প্রতি বাঙালির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

রামমোহনের দ্বারা প্রজ্বলিত দ্বিতীয় দীপশিখাটি জ্ঞান ও সংস্কৃতির। তাঁর লেখনীচালনা নিছক উপনিষদ ও বেদবেদান্তের অনুবাদের উদ্দেশ্যে নয়; সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণ ও একই সঙ্গে সমাজ-সংস্কারের প্রতিও তাঁর লক্ষ্য ছিল। সতীদাহ-নিবারণ, বহুবিবাহ-নিরোধ-আন্দোলন, ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন—ইত্যাদি উদ্দেশ্যে রচিত তর্কবিতর্ক-মূলক পুস্তিকাগুলি এর প্রমাণ। সর্বত্রই রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক মঙ্গল (Political advantage and Social comfort) তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্য-রূপে বর্তমান ছিল।

ধর্ম ও সংস্কৃতি এই দুটি ক্ষেত্রে যে ইতিহাসপ্রজ্ঞার উন্মোচন, রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতি-মূলক চিন্তায় তারই পূর্ণ বিকাশ। একথা আজ সর্বজনস্বীকৃত যে, রাষ্ট্র-নীতির ক্ষেত্রে রামমোহনই প্রথম পথিক।[৪]

রামমোহনের উক্ত রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির পশ্চাতে অনুপ্রেরণা স্বরূপ বর্তমান ছিল ফরাসি-বিপ্লবের 'সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা'-র বাণী, যা আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রেরণা। অর্থাৎ ইউরোপের মানস-মুক্তির সাধনাই রামমোহনের মনে উদ্দীপনা জাগিয়েছিল। তাই ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দে এদেশে মুদ্রাযন্ত্রের কণ্ঠরোধ করার আইন প্রণীত হলে রামমোহন তীব্র প্রতিবাদ জানালেন এবং এজন্য স-পারিষদ রাজা চতুর্থ জর্জের কাছে একটি আবেদন-পত্রও প্রেরণ করলেন। রামমোহন-জীবনীকার কুমারী কলেট (Collet) রামমোহনের উক্ত লেখনীযুদ্ধকে 'ভারতের ইতিহাসে অ্যারি-অপজিটিকা' আখ্যা দিয়েছেন।

এদিকে বাঙালি তথা ভারতীয় জনচিত্তের প্রতিভূরূপে রামমোহন স্পেনের নিয়মতান্ত্রিক শাসন-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশ করেছেন কলকাতার টাউনহলের জনসভায়, নেপলস্‌বাসীদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ব্যর্থতায় ব্যথিত হয়েছেন, আবার ইংলণ্ডের 'রিফর্ম বিল' (১৮৩২ খ্রীঃ) বিধিবদ্ধ হলে উল্লসিত হয়েছেন। আসলে মনের গঠনে রামমোহন ছিলেন আন্তর্জাতিকতাবাদী।

অর্থনীতির ক্ষেত্রে 'নারীদের সম্পত্তিতে অধিকার দান', 'কৃষক-স্বত্ব' ও 'রাজস্ব-প্রথার পরিবর্তন' ইত্যাদি বিষয়ে রামমোহনের চিন্তামূলক রচনাগুলি উল্লেখযোগ্য। বস্তুত, তিনিই প্রথম আমাদের দেশে রাষ্ট্র, সমাজ, শিক্ষা ও ধর্মবিষয়ে ঐহিক ও বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিকোণ হতে আলোকপাত করতে পেরেছিলেন। ঐ বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিকোণটি হল ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপের, যেখানে বুদ্ধি ও বোধির কার্যকারণাত্মক হেতুবাদ সম্পর্কে নিঃসংশয়তা ছিল; রামমোহনও ঐ একই মনোবৃত্তির অধিকারী হয়েছিলেন। জ্ঞানবাদী এবং মানবতাবাদী রামমোহনকে এইজন্যই দার্শনিক বেন্থাম উল্লেখ করেছিলেন—

Intensely admired and dearly beloved collaborator in the service of Mankind.[৫]

বস্তুত মানবতাবাদী রামমোহন আন্তর্জাতিক চেতনার অধিকারী হয়ে উঠেছিলেন।

মোটকথা, স্বদেশচিন্তার উৎসরূপে যদি পুনরুজ্জীবনকে গ্রহণ করা যায়, আর পুনরুজ্জীবনের ফলশ্রুতি-রূপে যদি চিত্তমুক্তিকে স্বীকার করা হয়, তবে বলতে হবে রামমোহনের চিন্তায় সেই চিত্তমুক্তি ঘটেছে এবং স্বদেশচেতনার উদ্গম হয়েছে। এ-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণ সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য—

আমাদের দেশে একদিন মনের স্বরাজ গিয়েছিল ধ্বংস হয়ে। পঙ্গুমনের ছিল না আত্মকর্তৃত্ব, প্রশ্ন করবার শক্তি ও ভরসা সে হারিয়েছিল।

সেই পিছনের কালকে ক্রমাগত প্রদক্ষিণ-করা-দেশকে রামমোহন ডাক দিয়েছিলেন আগামীকালের পথে। সেই আহ্বানে ছিল চিত্তমুক্তির ভাবগর্ভ বাণী যা বাংলা গদ্যের প্রাথমিক পর্যায়েও স্বদেশচেতনার প্রথম উন্মেষ ঘটিয়েছিল। ফলত ধর্ম ও সমাজসংস্কার, জ্ঞানসাধনা এবং সর্ববিধ স্বাধীনতার ঈপ্সা বাঙালি জনচিত্তে যে অগ্নিশিখা জ্বালিয়েছিল, তারই দহনক্রিয়া চলেছে শতাব্দীব্যাপী। কালের শিলাপটে তারই অগ্নিঅক্ষরে উৎকীর্ণ হয়েছে রামমোহনের প্রচণ্ড বিশ্বাস—

…Enemies to liberty and friends of despotism have never been and never will be, ultimately successful.[৬]

রামমোহন-পর্বের (১৮১৩-৩৩ খ্রীঃ) দুটি দশক বাঙালির 'মানস মুক্তির প্রয়াসে' চিহ্নিত, আর তার পরবর্তী পঁচিশ বৎসর (সিপাহী বিদ্রোহ, ১৮৫৭-৫৮ পর্যন্ত) 'ভাবদ্বন্দ্ব পর্যায়' বলে সাহিত্যের ইতিহাসে স্বীকৃত। স্বদেশচেতনার দিক থেকে বিচার করলেও ঐ-পর্যায়কে একেবারে অস্বীকার করা যায় না।

আমরা লক্ষ্য করছি, পুনরুজ্জীবনের সূচনায় যে অগ্নিশুদ্ধি শুরু হয়েছিল, তার ধূম্রজাল ভেদ করে বাংলা-সাহিত্যে এবং বাঙালি মনীষীদের চিন্তায় সুস্পষ্ট প্রত্যয় ও নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায় নি। আশা ও নৈরাশ্যের দ্বন্দ্বে, প্রাচ্য সংস্কার ও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার সংঘাতে, আস্তিক্যবুদ্ধি ও নাস্তিক্যবাদের বিতণ্ডায় যে-ধূলিঝঞ্ঝা উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল, তাতে তৎকালীন অনেক মনীষীর চিন্তায় স্ববিরোধিতার কথাই প্রমাণিত হয়।

এই ভাবদ্বন্দ্বের পৃষ্ঠভূমিতে স্বয়ং রামমোহনের স্ববিরোধটুকুও লক্ষ্য করা যায়। দেশের স্বাধীনসত্তায় বিশ্বাসী যে-মনীষী বিশ্ব-ইতিহাসের সঙ্গে আত্মিকযোগ স্থাপন করেছিলেন, তিনিও একটি ইংরেজি প্রবন্ধে ভারতে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকদের

বসবাসের সপক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন। আরও চমৎকৃত হতে হয় এই ভেবে যে, তিনি ভাবী ভারতকে খ্রীস্টধর্মাবলম্বী ইংরেজিভাষী জাতির মাতৃভূমিরূপে কল্পনা করেছেন।

এই স্ববিরোধ ও ভাবদ্বন্দ্বের কম-বেশি প্রকাশ লক্ষ্য করা যাবে তৎকালীন ইংরেজি শিক্ষাপ্রাপ্ত 'ইয়ং বেঙ্গল'-দের বিদ্রোহে, রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের অকস্মাৎ সচেতনতায়, এমনকি ব্রাহ্মসমাজের নবধর্ম আন্দোলনের প্রকাশভঙ্গির মধ্যে। সেকালের ডিরোজিয়ানদের সর্বপ্রকার লোকাচার ও সংস্কারের বন্ধন ছেদনের প্রয়াস এবং বিভিন্ন জ্ঞানচর্চামূলক প্রতিষ্ঠানের প্রসারের কথা মনে রেখেও একথা বলা যায়।

ইতিপূর্বে যে-সূত্রটি গ্রহণ করা হয়েছে তা হল এই যে, একই সঙ্গে রেনেসাঁ ও রিফর্মেশন-ধারার অভিঘাতে পর্যায়ক্রমে ধর্ম, সংস্কৃতি (জ্ঞান), রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতির পুনর্জাগরণ চলেছে বাংলাদেশে তথা ভারতবর্ষে। রামমোহন-প্রজ্বলিত চতুর্শিখার প্রথমটি অনির্বাণ থেকেছে দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রাহ্মসমাজ-কর্তৃক পরিচালিত ধর্মান্দোলনকে আশ্রয় করে; দ্বিতীয় শিখার আলোকে সংস্কৃতি ও জ্ঞানের মুক্তি ঘটে চলেছে বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারকে আবর্তন করে; তৃতীয় ও চতুর্থ শিখার অগ্নিতে রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভাবদ্বন্দ্ব ডিরোজিয়ান গোষ্ঠীর চিন্তাধারায় ধূম্রজাল সৃষ্টি করেছে।

এবার এক-একটি করে ঐ চারটি ধারার পরবর্তী গতিপ্রকৃতি অনুসরণ করা যেতে পারে।

"বিকৃত ধর্ম হতে রাষ্ট্রীয় দুর্গতির সূচনা",—রামমোহনের এই মনোভঙ্গির ফলে যে ধর্মসংস্কার-আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তার উত্তরদায়িত্ব বর্তেছিল দেবেন্দ্রনাথে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সাধনা ও প্রচারে ধর্ম-আন্দোলনের ধারাটি ব্যাপকতর হয়ে উঠেছিল। 'তত্ত্ববোধিনী সভা' ছিল এই সাধনার পীঠস্থান। একথা স্বীকার্য, ব্রাহ্মধর্ম-আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফল এই যে, বিদেশি সংস্কৃতি ও খ্রীস্টধর্মের প্রতি মোহগ্রস্ত শিক্ষিত যুবকেরা ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির অঙ্গনে প্রত্যাবর্তন করেছিল। জাতীয় চেতনা-উদ্বোধনায় এই সংস্কৃতিচেতনা ও গৌরববোধ অনেকটা কার্যকরী হয়েছিল।

হিন্দু কলেজের ডিরোজিয়ানদের চৌম্বক-আকর্ষণ এবং তৎকালীন ঐতিহ্য-বিদ্রোহী আবর্তের মাঝেও যে দেবেন্দ্রনাথ স্বদেশ ও স্বাদেশিক সংস্কৃতির নিজস্ব বোধের মধ্যে স্থিতধী হয়ে থাকতে পেরেছিলেন চিন্তায়, কর্মে, আচরণে—আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন স্বদেশ-ভাবনার পটভূমিতে একথা বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য।

তৎকালে 'সর্বতত্ত্বদীপিকা' ('বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা', ১৮৩২ খ্রীঃ)-নামক সভা "স্বদেশীয় বিদ্যার আলোচনা' ও 'গৌড়ীয় ভাষার উত্তমরূপে অর্চনার্থ'—প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং দেবেন্দ্রনাথই পঞ্চদশবর্ষ বয়সে তার সম্পাদক ছিলেন। আবার সামাজিক ধর্মের ক্ষেত্রে সচেতন দেবেন্দ্রনাথ (১৮৩৯ খ্রীঃ), 'তত্ত্ববোধিনী সভা'-র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ধর্ম-প্রচারের উদ্দেশ্যে। বাংলার নবযুগ গঠনে এই সভার প্রভাব ছিল অসামান্য। এই সভার মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' উনিশ শতকের বাঙালির মানব সংস্কৃতির স্মারকলিপিরূপে আজও উল্লেখযোগ্য। এটিকে 'সমুদয় শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব এবং বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যার প্রচারের বাহন' করার মুখ্য উদ্দেশ্য দেবেন্দ্রনাথের ছিল; কিন্তু সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, পুরাতত্ত্ব, জীবনী, শাস্ত্রানুবাদ, সমাজনীতি ও রাজনীতি বিষয়ে নানা আলোচনায় তৎকালীন বাঙালি মনীষীদের চিন্তা এই পত্রিকার পৃষ্ঠায় আত্মপ্রকাশ করেছে। দেবেন্দ্রনাথ এদিক দিয়ে কেবলমাত্র 'The Nestor of Brahmo Samaj' ছিলেন না, বরং বলা যায় 'Nestor of Progressive thoughts' ছিলেন।

ইতিপূর্বে রামমোহন যেমন ভারতের জাতি ও শ্রেণীগত বৈষম্য দূর করার জন্য বেদান্তের একেশ্বরবাদের প্রচার কামনা করেছিলেন, দেবেন্দ্রনাথও বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রাহ্মধর্ম-প্রচারের পটভূমিকায় অনুরূপ একটি স্বাদেশিক প্রেরণা উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর 'আত্মজীবনী' থেকে এ-সম্পর্কে একটি উদ্ধৃতি দেওয়া যায়—

> যদি বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিতে পারি, তবে সমুদায় ভারতবর্ষের ধর্ম এক হইবে, পরস্পর বিচ্ছিন্ন-ভাব চলিয়া যাইবে, সকলে ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইবে, তার পূর্বকার বিক্রম ও শক্তি জাগ্রৎ হইবে, এবং অবশেষে সে স্বাধীনতা লাভ করিবে—আমার মনে তখন এত উচ্চ আশা হইয়াছিল।[৭]

বাস্তবিকই দেবেন্দ্রনাথের 'উচ্চ আশা' যে কত ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল, সে-সম্পর্কে শিবনাথ শাস্ত্রীর একটি মন্তব্য স্মরণ করা যায়—

> তিনি ধর্ম্মসংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু আপনার কার্য্যকে জাতীয়তারূপ ভিত্তির উপর স্থাপিত রাখিতে ব্যগ্র হইলেন।[৮]

রবীন্দ্রনাথের কথায়—

> যিনি দেশকে তাহার প্রাচীন ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার উদ্‌ঘাটিত করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছেন, যিনি তাঁহার তপঃপরায়ণ একলক্ষ্য জীবনের দ্বারা…ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের আদর্শ পুনঃ স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন।

—তিনি কিন্তু তৎকালীন রাজনৈতিক আন্দোলন হতে নিজেকে সরিয়ে রাখেন,

নি। তাই 'The National Association' বা 'দেশহিতার্থী সভা' (১৮৪১ খ্রীঃ) এবং 'The British Indian Association' বা 'ভারতবর্ষীয় সভা'-র (১৮৪১খ্রীঃ) প্রথম অবৈতনিক সম্পাদকরূপে রামগোপাল ঘোষ প্রমুখের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। এই সভার উদ্দেশ্য ছিল 'to assert our legal rights by legitimate means' (সভা প্রতিষ্ঠাকালীন প্রস্তাব)। প্রদত্ত তথ্যগুলির সাহায্যে স্পষ্ট বোঝা গেল, দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে আধ্যাত্মিকতার আশ্রয়ে স্বদেশচিন্তার উন্মেষ হয়েছিল।

দেবেন্দ্রনাথের সমকালীন দুজন বিশিষ্ট মনীষী অক্ষয়কুমার দত্ত ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মধ্যেও স্বদেশচিন্তার উন্মেষ দেখা যায়। দেবেন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তার ভূমি ছিল আধ্যাত্মিকতা, আর অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগরের স্বদেশচিন্তার ভূমি ছিল 'জ্ঞানোজ্জ্বলিত হৃদয়' ও মানবতাবাদ। দুজনেই 'তত্ত্ববোধিনী'র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

'তত্ত্ববোধিনী'র সম্পাদক অক্ষয়কুমার রামমোহন-প্রবর্তিত যুক্তিবাদের ধারাকে আরও প্রবল করে তুলেছিলেন। সেদিন বিজ্ঞান-চর্চায় বাংলা সাহিত্যে যে-বুদ্ধি-বাদের জয়ঘোষণা শোনা গিয়েছিল, বিশুদ্ধ জ্ঞানবাদের নৈর্ব্যক্তিক চেতনার যে-কণ্ঠস্বর সোচ্চার হয়েছিল, সমগ্র বাংলাদেশ হৃদয় দিয়ে তাকে গ্রহণ করতে না পারলেও মানসমুক্তির অভিধানে সে ধ্বনি বৃথা হয় নি। জাতীয় জ্ঞান ও চিন্তার মুক্তির ক্ষেত্রে 'তত্ত্ববোধিনী'র অবদান যথেষ্ট, আর দেবেন্দ্রনাথের দক্ষিণহস্তস্বরূপ যুক্তিবাদী অক্ষয়কুমার ছিলেন এই ব্যাপারে অগ্রণী। 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার'-কালে অক্ষয়কুমার যে-বুদ্ধিবাদের জয়ধ্বনি করেছেন, ভক্তিবাদী দেশের জন্যে তার প্রয়োজন ছিল। এই মানুষটির সংস্পর্শেই দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মের একটি মূল সিদ্ধান্ত সংশোধন করেন। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে তার সাক্ষ্য আছে—

> Finally, truth triumphed, the Brahmosamaj abjured the said doctrine, the Vedas as the revealed word of God.[৯]

জ্ঞানবাদী অক্ষয়কুমারের সাধনা যে স্বদেশচিন্তার পরিপোষক, উক্ত ইঙ্গিত এবং তথ্যগুলি তার প্রমাণ।

এদিকে বিদ্যাসাগরের হাতেও ছিল রামমোহন-প্রজ্বলিত বহ্নিশিখা। কিন্তু—

> সেই নির্মোহ জ্ঞানবাদের সহিত অনুস্যূত হইয়াছিল অকুণ্ঠ মানবপ্রেম—এই মানবপ্রেমই বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিচেতনা ও সমাজচৈতন্যকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে।

এই মানবপ্রেম কিন্তু শাস্ত্রসংহিতালব্ধ নয়, ঊনবিংশ শতাব্দীর নবলব্ধ মানবহিতবাদ হতে পাওয়া। বিদ্যাসাগরের জীবনদর্শন ছিল ঐ আলোকে প্রদীপ্ত। বিদ্যাসাগর

কেবল প্রাচীন জ্ঞানের পুনরুজ্জীবনের (revival of classical learning) জন্য শাস্ত্রালোচনা করেন নি, তিনি জ্ঞানের খড়্গো কুসংস্কারের বাঁধন কাটতে চেয়েছিলেন। স্ত্রীশিক্ষা-প্রচার ও বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের মূলে বিদ্যাসাগরের 'হিউম্যানিজম্' এবং 'হিউম্যানিটারিয়ানিজম্' দুই-ই ক্রিয়াশীল ছিল। রামমোহনের নির্ধূম জ্ঞান-যোগের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের হৃদয়বত্তার মিশ্রণ হয়েছিল। বাঙালির ভাববিপ্লবে এই হৃদয়বৃত্তির ক্রিয়াটি যথেষ্ট আবেদন সৃষ্টি করেছিল। রবীন্দ্রনাথ তাই আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেছিলেন যে—

> বিদ্যাসাগর দেশের চিত্তকে ভবিষ্যতের পরম সার্থকতার দিকে বহন করে নিয়ে যাবার সারথিস্বরূপ।[১০]

জ্ঞানের অদম্য স্পৃহা নিয়ে ইতিপূর্বেই একদল যুবক যাত্রা করেছিলেন। অক্ষয়কুমার-বিদ্যাসাগরের কিঞ্চিৎ পূর্ববর্তী এঁরা,—এঁদের কণ্ঠ ধ্বনিত হত 'Society for the acquisition of general knowledge' বা 'সাধারণ 'জ্ঞানোপার্জিকা সভা'র কক্ষে। এই 'ইয়ং বেঙ্গল'-গোষ্ঠী 'ডিরোজিয়ান' বলেও পরিচিত। হেনরি ভিভিয়ান ডিরোজিও এইসব যুব-মানসে প্রতিভার বিদ্যুৎস্পর্শ দিয়েছিলেন, যার ফলে কারও বা ঘটেছিল মানসিক উন্মেষ, কারও বা দৃষ্টি-বিভ্রম। সেদিনের 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন'-এর কক্ষে ডিরোজিওর আশাভরা কণ্ঠ শোনা যেত,—'I watch the gentle opening of your mind', শ্লোগান শোনা যেত, 'Love and die for truth'। ইউরোপের জ্ঞানভাণ্ডার উজার করে ঢেলে দিয়েছিলেন ডিরোজিও. নবযৌবনের প্রচণ্ড আঘাতে সেদিন বাংলা-দেশের অচলায়তন কেঁপে উঠেছিল। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেশচন্দ্র ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রাধানাথ শিকদার প্রমুখ ব্যক্তিস্বাধীনতার একটি পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছিলেন। সেদিনের ইয়ং বেঙ্গলের ইতিহাস সমাজের দাসত্ব হতে ব্যক্তির মুক্তির ইতিহাস। কৃষ্ণমোহন সেদিন 'Inquirer' পত্রিকা পরিচালনা করেছিলেন দুর্জয় সাহসে, 'Quill' পত্রিকায় তারাচাঁদ চক্রবর্তী ছড়িয়েছিলেন রাজনৈতিক চেতনার স্ফুলিঙ্গ, প্যারীচাঁদ আর রাধানাথ আরও পরে প্রকাশ করেছিলেন 'মাসিক পত্রিকা' এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্র জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো বিতরণ করে চলেছিলেন 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ'-এর মাধ্যমে। এঁরা সেদিনের নব্য-শিক্ষিত সমাজের যুগজিজ্ঞাসার মূর্তরূপ। এঁদের চিন্তাতেই সমকালীন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চেতনার জাগরণের রূপটি ধরা পড়েছিল।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ডিরোজিয়ান রামগোপাল ঘোষ 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর

প্রতিনিধিরূপে রাজনৈতিক আন্দোলনের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের সভায় যাঁর শিক্ষা, তিনি কলকাতার টাউন হলে বিদেশী ইংরেজ ও শিক্ষিত ভারতীয়দের সভায় জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে 'ভারতের ডিমস্থেনিস' বলে পরিচিত হয়েছিলেন। ১৮৪৯ খ্রীস্টাব্দের ব্ল্যাক অ্যাক্ট বা 'কালাকানুন-এর প্রতিবাদে শ্বেতাঙ্গসমাজ যে প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলন গড়ে ন্যায়নীতির অসম্মান করছিল—তার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন রামগোপাল ঘোষ। এই বিদ্রোহী কণ্ঠে সেদিন যে জোরালো রাজনৈতিক প্রতিবাদ শোনা গিয়েছিল—তাই পরবর্তী আইনানুগ রাজনৈতিক আন্দোলনের সূচনা। এই প্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ'-গ্রন্থে লিখেছেন—

> ফৌজদারী বালাখানা হইতে জর্জ টমসনের ও রামগোপাল ঘোষের রব বজ্র-নির্ঘোষে উত্থিত হইতে লাগিল। (ফৌজদারী বালাখানা অর্থাৎ ভারতপ্রেমী টমসন প্রতিষ্ঠিত 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি'—যে সভার প্রতিষ্ঠায় ডিরোজিও-শিষ্যদলই অগ্রণী ছিলেন)।
>
> রামগোপাল যে কেবল বক্তৃতার দ্বারাই রাজনীতির আন্দোলনে সহায়তা করিতেন তাহা নহে। সময়ে সময়ে লেখনী ধারণও করিতেন।

১৮৪৯-৫০ খ্রীস্টাব্দের দণ্ডবিধির বিরুদ্ধে ইংরেজগণ যে 'কালাকানুন'-আন্দোলন করেন তার প্রতিবাদে—

> তখন কেবলমাত্র রামগোপাল ঘোষ লেখনী ধারণ করিলেন এবং 'A few Remarks on certain Draft Acts, commonly called Black Acts'নামে একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করিলেন।[১১]

ফলে রামগোপাল ইংরেজ সমাজের বিদ্বেষভাজন হয়ে বিত্ত ও সম্মান হারালেন। [Agri-Horticultural Society'-র সহকারী সভাপতির পদ হতে তিনি অপসৃত হয়েছিলেন।] তথাপি দুর্জয় সাহস ও অদম্য সংগ্রামী মনোবৃত্তি নিয়ে সেকালে অনেক বড় বড় রাজনৈতিক ঝড়ের সম্মুখে দাঁড়িয়েছেন রামগোপাল। ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে চার্লস উডের খসড়া বিলের (যাতে ভারতীয়দের ব্যবস্থাপক সভা বা সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করা সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করা হয় নি) বিরুদ্ধে রামগোপালের নেতৃত্বে প্রতিবাদ ঐতিহাসিক ঘটনা। এককথায় নব্যবঙ্গের 'মাইটি রামগোপাল' বলে স্বদেশে বিদেশে শ্রদ্ধার পাত্র এই মানুষটি সেকালে স্বদেশচেতনার ভূমি প্রস্তুত করেছিলেন।

আমরা আগেই বলেছি যে ডিরোজিয়ানদের চিন্তায় কিছু কিছু স্ববিরোধিতা

লক্ষ্য করা যাবে। এমনকি ইয়ং বেঙ্গলের সর্বাধিক জোরালো কণ্ঠ রামগোপালের সম্বন্ধেও এ-মন্তব্য কিছুটা সত্য। তবে যুগধর্মে স্ববিরোধিতা যতই থাক, একথা অবশ্য স্বীকার্য যে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার আলোকেই বাঙালি-মানসে তীব্র আকাঙ্ক্ষার উন্মেষ হয়েছিল উক্ত ইয়ং বেঙ্গলদের চিন্তায়। যুগদ্বন্দ্ব বা আত্মবিরোধ যতই তীব্র হোক না কেন, একথা সুনিশ্চিত যে তাঁদের আত্মবীক্ষণ ও আত্ম-অনুশোচনা-বোধের সুফল পরবর্তী কালে সার্থক রূপ পেয়েছে। অতঃপর 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'র উদ্দেশ্য এ-প্রসঙ্গে পুনর্বার স্মরণ করা যায়—

> সাধারণভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা এবং স্বদেশের অর্থনৈতিক সামাজিক শিক্ষাবিষয়ক অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা এই সভার উদ্দেশ্য মধ্যে গণ্য হইল।[১২]

এই সভার বিভিন্ন বক্তা দেশের নানা অংশের ইতিহাস-ভূগোল বিবরণ সংক্রান্ত প্রবন্ধ পাঠ করতেন। আর ইতিহাস-চিন্তার সূচনা এই সভার কার্য-বিবরণীতেই আছে। এই সূত্রে উল্লেখ করা যায়, এই জাতীয় অসংখ্য আলোচনা-সভা[১৩] এই শতাব্দীর তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যেগুলি বাংলার নব্যসংস্কৃতিকে বহন করেছে। ভারতচেতনা বিস্তারে এঁদের অবদানের যথাযথ মূল্যায়ন করেছেন শ্রীবিনয় ঘোষ—

> এই মুষ্টিমেয় যুবকদের পক্ষে প্রকাশ্য সমাজ-প্রাঙ্গণে অবতীর্ণ হয়ে কোন রাজনৈতিক আন্দোলন বা ভাবধারা প্রচার করা তখন সম্ভব ছিল না। যা সম্ভব ছিল তাঁরা করেছিলেন অর্থাৎ সাহিত্য সভা, বিদ্যোৎসাহিনী সভা ইত্যাদি গঠন করে সভার আলোচনার ভিতর দিয়ে রাজনৈতিক ও সামাজিক ভাবধারা প্রচার করা।[১৪]

অতঃপর এই প্রসঙ্গে আরও দুজন অক্লান্তকর্মী মনীষীর অবদানের উল্লেখ করা প্রয়োজন; তাঁদের একজন রাজেন্দ্রলাল মিত্র, অন্যজন হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। দুজনেই স্বদেশচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পত্রিকা সম্পাদনা করতেন, রাজেন্দ্রলালের পত্রিকা ছিল 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' (১৮৫১ খ্রীঃ), আর হরিশচন্দ্রের 'দি প্যাট্রিয়ট' (১৮৫৩ খ্রীঃ)।

রবীন্দ্রনাথের উক্তিতে, মনীষী রাজেন্দ্রলাল মিত্র ছিলেন 'সব্যসাচী', 'তিনি একাই একটি সভা।' 'জীবনস্মৃতি'তে-উল্লিখিত 'সারস্বত সমাজ'-এর সভাপতি ছিলেন তিনিই। "এসিয়াটিক সোসাইটি সভার গ্রন্থপ্রকাশ ও পুরাতত্ত্ব আলোচনা ব্যাপারে অনেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতকে তিনি কাজে খাটাইতেন।" বাস্তবিকই ইতিহাসচেতনার ভিত্তিস্থাপনে রাজেন্দ্রলাল একজন মহৎ কর্মী। তৎসম্পাদিত

'বিবিধার্থ সংগ্রহ'-এর শিরোভাগে লিখিত থাকত, "পুরাবৃত্তেতিহাস, প্রাণিবিদ্যা-শিল্প সাহিত্যাদি দ্যোতক মাসিক পত্র।" প্রথম সংখ্যাতে পত্রিকার উদ্দেশ্য প্রকাশ করা হয়; সেই উদ্দেশ্য হল সাধারণ জনগণ, বণিক-মোদক, বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ ব্যক্তি সকলেরই বিদ্যালাভ ও জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়তা করা। সমালোচক ড. অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিকই বলেছেন—

> রাজেন্দ্রলাল যেমন পুরাতত্ত্ব ও ইতিহাসকে কেন্দ্র করিয়া বাঙালির আত্ম-জাগরণের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, ঠিক তেমনি সত্যকারের সমালোচনা, য়ুরোপীয় রসতত্ত্বের আদর্শে সাহিত্য বিচারের দুর্লভ কৃতিত্ব তাঁহারই প্রাপ্য।[১৫]

বস্তুত, ইতিহাসচেতনা-সঞ্চারের সঙ্গে সাহিত্য-সংস্কৃতির নিরপেক্ষ মূল্যায়নের সূচনা সংস্কৃতির উজ্জীবনে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। পরবর্তী কালে বঙ্কিম-রবীন্দ্র-এর সাহিত্য-সমালোচনাতে তার বিকাশ লক্ষ্য করা যাবে। রাজেন্দ্রলালের অবদান আছে ঐ দুই ক্ষেত্রেই। অন্যদিকে আবার, রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চারে হরিশ-চন্দ্রের 'দি প্যাট্রিয়ট' পত্রিকার অবদানও যথেষ্ট। রামগোপাল ঘোষ বাগ্মিতার দ্বারা যা করেছেন, হরিশচন্দ্র তাঁর শক্তিশালী লেখনীর দ্বারা তাই করেছেন। অর্থাৎ দু'জনেই সে-যুগের রাজনৈতিক আন্দোলনের অগ্নিচয়ন করেছিলেন ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে। এ-সম্পর্কে 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থের সাক্ষ্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে—

> সেই লেখনী আবার নীলকরদিগের অত্যাচার নিবারণার্থ সশস্ত্র হইয়া দাঁড়াইল। নীলকর-অত্যাচার-নিবারণ হরিশের এক অক্ষয় কীর্ত্তি। এই কার্যে তিনি দেহ, মন, অর্থ, সামর্থ্য সকলি নিয়োগ করিয়াছিলেন।

অবশ্য তৎকালীন বাঙালি মনীষীদের যে স্ববিরোধ রামমোহন হতে ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী পর্যন্ত ছিল, হরিশের মধ্যেও তা বর্তমান। তিনিও সিপাহী বিদ্রোহ কালে ইংরেজ শাসনের অনুকূলতা করেছেন।

> পেট্রিয়ট সারগর্ভ সুযুক্তিপূর্ণ তেজস্বিনী ভাষাতে কর্ত্তৃপক্ষের মনে এই সংস্কার দৃঢ়রূপে মুদ্রিত করিবার প্রয়াস পাইলেন যে, সিপাহীবিদ্রোহ কেবল কুসংস্কারাপন্ন সিপাহীগণের কার্য্যমাত্র, দেশের প্রজাবর্গের তাহার সহিত যোগ নাই।[১৬]

আধুনিককালে আমাদের মনে একাজের প্রতিক্রিয়া অনুকূল না হতে পারে, কিন্তু তৎকালীন পরিবেশে হয়ত এই স্বাভাবিক ছিল। এই মনোবৃত্তি ঈশ্বর গুপ্ত এমনকি বঙ্কিমচন্দ্রেও দেখা যাবে অতি সূক্ষ্মরূপে। মোটকথা বাংলা সাহিত্যে,

বঙ্কিম-আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত এই মনীষীদের চিন্তায় ও কর্মসাধনায় স্বাদেশিকতা ধীরে ধীরে মূর্তিপরিগ্রহ করেছিল। এঁদের মুক্তদৃষ্টি, জ্ঞানসাধনা এবং ধর্ম-সমাজ-সংস্কার মূলক কর্মপ্রেরণা তৎকালীন নব্যশিক্ষিত বাঙালি সমাজকে প্রভাবিত করেছিল। এই মানসভঙ্গি সমকালেই শিল্পিতরূপে প্রকাশিত হয়েছিল বাংলা সাহিত্যে। এবার এই যুগের পরিপ্রেক্ষিতে স্বদেশচিন্তার শিল্পিতরূপটি দর্শন করা যেতে পারে।

দুই.

উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের শিল্পিতরূপ বাংলা সাহিত্যে প্রথম দেখা গেছে কাব্যে, আর কাব্যের আসরে স্বদেশচিন্তামূলক প্রথম কবিতা ডিরোজিও-র রচনা, যদিও তা ইংরেজি ভাষায়। যে ডিরোজিও ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর প্রাণকেন্দ্র ছিলেন, যিনি তাঁর ভাবশিষ্যদের সংস্কারমুক্ত চিন্তায় দীক্ষিত করেছিলেন, তাঁরই প্রেরণায় নব্যশিক্ষিত সমাজে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল। কবি ডিরোজিও ভারতবর্ষের একটি পুরাতন আখ্যানমূলক কাব্যের মুখবন্ধ-রূপে লিখেছিলেন স্বদেশানুরাগের দুটি চতুর্দশপদী কবিতা: 'The Harp of India' এবং 'To India—My native land'[১৭]। দুটিতেই স্বদেশবন্দনা ছিল, যাতে প্রাচীন ভারত-সংস্কৃতিকে নতুন করে আবিষ্কার করার প্রয়াস ধ্বনিত। 'To India—My native land'-শীর্ষক সুন্দর সনেটটির কিছু অংশ উদ্ধৃত করা গেল—

My country in the days of glory past
A beauteous halo circled round thy brow
And worshipped as a deity wast—
Where is the glory, where that reverence now?

কবিতাটি অনুবাদ করেছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর—

স্বদেশ আমার! কিবা জ্যোতির মণ্ডলী
ভূষিত ললাট তব; অস্তে গেছে চলি
সে দিন তোমার; হায়! সেই দিন যবে
দেবতা সমান পূজ্য ছিলে এই ভবে।[১৮]

'স্বদেশ আমার' বলে এই গভীর মমতাভরা আহ্বান বাংলাদেশে তথা ভারতে সর্বপ্রথম শোনা গেল এক ভারতীয় ফিরিঙ্গি কবির কণ্ঠে। এ আহ্বান ইয়ং

বেঙ্গলের কয়েকটি বিদ্রোহী প্রাণ শুনেছিল,—তাই তো কবির পুরস্কার ; কবির কথায়—

এ শ্রমের এই মাত্র পুরস্কার গণি,
তব শুভ ধ্যায় লোকে, অভাগা জননি।

'My Country'-কে 'as a deity'—বন্দনা করার আহ্বান বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্'-রচনার অন্যূন চল্লিশ বৎসর পূর্বেই শোনা গিয়েছিল। অতীত গৌরবের মহিমা উপলব্ধি এবং পরাধীনতার বেদনাবোধ এই প্রথম উচ্ছ্বসিত হল কবিতায়। লক্ষণীয় এই—

রামমোহন বা দেবেন্দ্রনাথ ধর্মসংস্কারে অতীত যুগ বেদ-উপনিষদ-কাব্য-পুরাণের দেশকালাতীত মহিমা নিয়ে আমাদের সচেতন করে তুলেছিল। সেকালের কাব্যে ভারতচেতনার মধ্যে পরাধীনতার বেদনাই বড়ো হয়েছে। রাজনৈতিক স্বাধীনতার লোপ এবং প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির ক্রমবিলয়—এই দুই কারণেই কবিরা কাব্যকে বিলাপধ্বনিতে পূর্ণ করেছেন।[১৯]

উক্ত বিশ্লেষণ যথার্থ। আমরা লক্ষ্য করি, এই ভারতচেতনার আত্মপ্রকাশ সর্বপ্রথম ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের বাংলা কবিতাত্রয়ীতে। ('ভারত সন্তানের প্রতি', 'ভারতের অবস্থা', 'ভারতের ভাগ্যবিপ্লব' শীর্ষকে)। এগুলি শুধু বাংলা সাহিত্যে নয় বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসের উদ্বোধনী সঙ্গীত বলে গৃহীত হতে পারে। পতিত ভারতের জন্য বেদনাবোধ এবং নবযুগের অভ্যুদয়ে সেই গৌরব উদ্ধারের আশা, উক্ত কবিতাগুলিতে ভাষা পেয়েছে। কবি ডাক দিয়েছিলেন—

জাগ জাগ সব ভারতকুমার
আলস্যের বশ হয়ে ঘুমাইও না আর। (ভারতের অবস্থা)

রাত্রি আর নেই—কুয়াশা মাত্র আছে, তাই জননী ভারতভূমিকেও আহ্বান জানিয়েছিলেন কবি—

জননী ভারতভূমি আর কেন থাক তুমি
ধর্মরূপ ভূষাহীন হয়ে? (ভারতের ভাগ্যবিপ্লব)

অর্থাৎ কাব্যে তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক জাগরণের পদধ্বনি আর অস্পষ্ট নয়।

এদিকে ঈশ্বর গুপ্তের মাতৃভাষার জন্য বেদনাবোধ আরও গভীর, 'দেশের ভাষার প্রতি সকলের দ্বেষ' কবির আর সহ্য হয় নি। তাই 'সংবাদ প্রভাকর'-এ তিনি লিখেছিলেন—

সম্প্রতি স্বদেশীয় ভাষার উন্নতিকল্পে সর্ব্বতোভাবে সম্পূর্ণ যত্ন করা অতি

কর্তব্য হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত দেশের উচ্চ গৌরব কোনমতেই রক্ষা হইতে পারে না।....ভাষাই সকল বিষয়ের মূলাধার...সুতরাং এমত মহোপকারিণী যে জাতীয় ভাষা তাহার প্রতি অশ্রদ্ধা করাতে কিরূপ অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ হইতেছে, তাহা কি কেহই বিবেচনা করেন না?

এই প্রসঙ্গে 'মাতৃভাষা' কবিতার দুটি পংক্তিও স্মরণ্য—

মিছা মণি মুক্তা হেম স্বদেশের প্রিয় প্রেম
তার চেয়ে রত্ন নাই আর।

এই স্বদেশপ্রীতি স্বাভাবিকভাবে গুপ্তকবির শিষ্যদলেও সঞ্চারিত হয়েছে। রঙ্গলাল, দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বারকানাথ অধিকারী, মনোমোহন বসু প্রভৃতি নব্যতন্ত্রের কবি-নাট্যকারগণের রচনায় তারই প্রকাশ সুস্পষ্ট।

ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যেও তৎকালোচিত স্ববিরোধিতা ছিল। একদিকে রক্ষণশীল মানুষরূপে নারীশিক্ষা ও বিধবা-বিবাহ-আন্দোলনকে তিনি কটাক্ষ করেছেন, অন্যদিকে প্রগতিশীল রূপে নবযুগের স্বদেশচেতনাকে স্বাগত জানিয়েছেন। অপর দিকে সিপাহী বিদ্রোহকালে তিনি ইংরেজের জয়ধ্বনি করেছেন—তাঁতিয়াটোপি, নানাসাহেব, লক্ষ্মীবাঈ প্রমুখ বিদ্রোহী নেতাদের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করেছেন। তাঁর কবিতায় নানাসাহেব সম্বন্ধে কটাক্ষ ছিল—

সেটা ত পুষ্যি এঁড়ে দস্যি ভেড়ে নস্যি কর কারে।

লক্ষ্মীবাঈকে ব্যঙ্গ করে তিনি বলেছেন—

ঠোঁটকাটা কাকী।

রাণী ভিকটোরিয়াকে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি—

এই ভারত কিসে রক্ষা হবে ভেবো না মা সে ভাবনা,
সেই তাঁতিয়া টোপির মাথা আমরা ধরে দেব নানা।

ইংরেজ রাজত্বের প্রতি এই আস্থা তৎকালের শিক্ষিত বাঙালিদের প্রায় প্রত্যেকের মধ্যে ছিল, এমনকি বঙ্কিমচন্দ্রের কথাতেও তার প্রতিধ্বনি—

সমাজবিপ্লব, অনেক সময়েই আত্মপীড়ন মাত্র। বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী। ইংরেজেরা বাঙ্গালাদেশ অরাজকতা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন।

(আনন্দমঠের ১ম সংস্করণের বিজ্ঞাপন)

রঙ্গলাল, মধুসূদন, দীনবন্ধু, হেমচন্দ্রের কাব্যে ও নাটকেও এই দ্বন্দ্ব বর্তমান। এ-দ্বন্দ্ব উনবিংশ শতাব্দীর ভাবদ্বন্দ্ব।

আমরা পূর্বেই দেখেছি, ইতিহাসচেতনা রেনেসাঁর অন্যতম মূল লক্ষণ। অতীতের আলোকে ভবিষ্যৎ-দর্শনই স্বদেশচিন্তার প্রথম প্রতিশ্রুতি। বাংলা

কাব্যে তাই ঐতিহ্য-গৌরববোধের সঙ্গে সঙ্গেই সমাজচেতনার প্রতিফলন দেখা দিয়েছে এবং এইজন্যই রঙ্গলালকে 'নূতনযুগের নান্দীগায়ক' আখ্যা দিয়েছেন সাহিত্য-ইতিহাসকার ড. সুকুমার সেন। 'পদ্মিনী উপাখ্যান'-এ (১৮৫৮ খ্রীঃ) তাঁর "রোমান্টিক দেশপ্রেম মামুলি কবিতার জীর্ণ আধারে নূতন রস ঢালিয়া দিল।"[২০] বাস্তবিকই রঙ্গলালের ইতিহাসলুব্ধচিত্ত 'টডের রাজস্থান' হতে কাব্য-সামগ্রী চয়ন করে উল্লসিত হয়েছিল। কারণ রামমোহন হতে নবজাগরণের পালা শুরু হয়েছিল, রঙ্গলালের কালে তা একটা রাষ্ট্রচেতনায় ভাষা পাচ্ছিল। তাই স্বাদেশিকতা ও স্বাজাত্যবোধের আরও বিকাশ দেখা গেল রঙ্গলালে। ফলে রাজপুতজাতির স্বাধীনতা-সংগ্রাম বাঙালি-চিত্তকে উদ্দীপিত করল,—সাহিত্যে ভৌগোলিক পরিধি প্রসারিত করে সমগ্র ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলে গ্রহণ করার ঝোঁক এসে গেল। তাই দেশচেতনার উদাত্ত সুর শোনা গেল 'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্যে—'ক্ষত্রিয়দের প্রতি রাজার উৎসাহ বাক্যে'—

> কোটিকল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে
> নরকের প্রায়,
> দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গসুখ তায় হে
> স্বর্গসুখ তায়।

এই প্রসঙ্গেই ভারতের পরাধীনতার বেদনা কবির কাব্যে প্রশ্ন তুলেছে—

> স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
> কে বাঁচিতে চায়।

তৎকালে ইতিহাসাশ্রিত রোমান্টিক কাব্যে প্রতিধ্বনিত এই জিজ্ঞাসা একটি অসাধারণ আবেগ সৃষ্টি করল। 'কর্মদেবী' (১৮৬২ খ্রীঃ) কাব্যের নায়ক স্বদেশনিষ্ঠ 'সাধু' ঘোষণা করল—

> অন্যায় না সহ্য হয় মিথ্যাবাদ নাহি সয়
> সত্যের পরীক্ষা তরবারে।

পরবর্তী কালে এমনি ভঙ্গিতেই 'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে'—তার প্রতি কবির ঘৃণাপ্রকাশ আরও তীব্র হয়েছে।

শুধু ইতিহাস নয়, পুরাণ, দর্শন, প্রাচীন সাহিত্য হতে নানা কীর্তিগাথা অবলম্বন করে প্রাচীন গৌরব স্মরণ করা এবং জাতীয়চিত্তে সঞ্চারিত করার ব্রত নিয়েছিলেন মধুসূদন-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র তাঁদের মহাকাব্য ও আখ্যানকাব্যের মাধ্যমে। তাই রামায়ণের কাহিনী নিয়ে মহাকাব্য লিখলেন কবি মধুসূদন। কবি মোহিতলাল 'বাংলার নবযুগ' বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলেছেন—

নবযুগের এই নূতন উৎকণ্ঠা একজন কবির চিত্তগহন হইতে কাব্যচ্ছন্দে আত্ম-প্রকাশ করিল—জ্ঞানেও নয়, কর্মেও নয়, এবার তাহা প্রাণের অতি গূঢ়-গভীর আকৃতিরূপে বাণী হইয়া উঠিল; জাগ্রতচিত্তের যতকিছু উদ্বেগ, ভয়-ভাবনা অগ্রাহ্য করিয়া এবার তাহা মগ্নচৈতন্যে—ব্যক্তির স্বাধীন স্বতন্ত্র-আনন্দময় সত্তায় পৌঁছিয়াছে—তাহাকে স্রষ্টা কবি করিয়া তুলিয়াছে।

মধুসূদনের অন্তরের মুক্তিচেতনার অসীম আনন্দের কথা-প্রসঙ্গে সমালোচক মোহিতলালের উক্ত বিশ্লেষণ যথার্থ। এক গূঢ়তর কাহিনী 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর সাগরমন্দ্রিতছন্দে প্রকাশিত হয়েছিল,—মানুষের এই জয়ঘোষণা সিপাহী বিদ্রোহের কালিমাকে বুঝি ঢেকে দিয়েছিল—

ডমরুধ্বনি শুনি কালফণী,
কভু কি অলসভাবে নিবাসে বিবরে ?

এই ডমরুধ্বনি শুনে বাঙালির অলসতন্দ্রা সচকিত হয়েছিল। তাই মধুসূদনের কাব্যে মাতৃভূমি-রক্ষার দৃঢ়সংকল্প—

জন্মভূমি রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে ?

এই জন্মভূমি নিশ্চয়ই বৃহত্তর ভারতচেতনায় বিধৃত। কারণ কবির প্রার্থনাতেই ভারতচেতনার অভিব্যক্তি ধ্বনিত, "জ্যোতির্ময় কর বঙ্গ ভারতরতনে।" আমরা উপলব্ধি করি মধুসূদন এই জন্মভূমিকে বারবার স্মরণ করেছেন তাঁর 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'তে। সেই কপোতাক্ষ নদ, দ্বাদশ শিবের মন্দির, জয়দেব-কৃত্তিবাস-কাশীরাম-স্মৃতিমণ্ডিত বঙ্গভূমি প্রভৃতির প্রতি কবির সশ্রদ্ধ অর্ঘ্য সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছে যে পথভ্রষ্ট 'ইয়ং বেঙ্গল' এবার পথ খুঁজে পেয়েছে ।

তাই অব্যবহিত পরবর্তী দশকে বঙ্কিমচন্দ্র নির্দেশ দিয়েছিলেন—

কাল প্রসন্ন, ইউরোপ সহায়, সুপবন বহিতেছে দেখিয়া পতাকা উড়াইয়া দাও, তাহাতে নাম লেখ 'শ্রীমধুসূদন'।

কিন্তু কাল তখনও প্রসন্ন ছিল না, বৃহত্তর সমাজের ভীরু বাসনার অঞ্জলিতে এই পাশুপত অস্ত্রধারণের ক্ষমতা তখনও সঞ্চিত হয় নি। শ্রীঅরবিন্দ-কথিত সেই "sensitive man" যে প্রচণ্ড মানস-আন্দোলনে উদ্দীপ্ত হবে সে মানুষ তখনও 'কোটিকে গোটিক'। 'ভারতভূমি'-সনেটে কবির উন্মথিত দীর্ঘশ্বাস এই কারণেই শুনেছি—

হায় লো ভারতভূমি।······

*　　　*　　　*

কার শাপে তোর তরে, ওলো অভাগিনি,

চন্দন হইল বিষ, সুধা তিত অতি ?

কবি মধুসূদনের সনেটে ভারতভূমির জন্য যে দীর্ঘশ্বাস উত্থিত সেই দীর্ঘশ্বাস সহসা মাতৃবন্দনায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে তাঁরই সতীর্থ ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের অসামান্য রূপশিল্প 'পুষ্পাঞ্জলি'তে। আনন্দমঠের মাতৃবন্দনার কিছুকাল আগেই এই মাতৃরূপাদর্শ পুষ্পাঞ্জলির মাধ্যমে দেশবাসী লাভ করেছে। এখানেও দেবী-মূর্তির ব্যাখ্যাচ্ছলে দেশমাতৃকার আধিভৌতিক রূপ উদ্ভাসিত। এ-প্রসঙ্গে 'ভূদেব রচনাসম্ভার'-এর সম্পাদক শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর মন্তব্য উল্লেখ্য—

পুষ্পাঞ্জলি ও আনন্দমঠ পাশাপাশি রাখিয়া পড়িলে সন্দেহমাত্র থাকে না যে ১৮৭৬ সালের পুষ্পাঞ্জলি ১৮৮২ সালে প্রকাশিত আনন্দমঠের প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

আশ্চর্যের কথা এই বঙ্কিমের মাতৃমন্ত্রের মন্দ্রিত ঝঙ্কারে তার অব্যবহিত পূর্বে সৃষ্ট ও প্রকাশিত পুষ্পাঞ্জলি বাঙালি পাঠকের দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেছে। আরও দু'দশক পরে প্রকাশিত ভূদেবের 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস'-এ স্বাধীন ভারতবর্ষের স্বপ্ন রূপলাভ করেছিল। স্বপ্নলব্ধ এই স্বাধীন মাতৃভূমি হিন্দু-মুসলমানের মিলিত ভারতবর্ষ রূপেই অঙ্কিত। কিন্তু এ ইতিহাস রচিত হয় বঙ্কিম প্রয়াণের পর, তাই প্রাক্-বঙ্কিম শিল্পসৃষ্টির আলোচনার ক্ষেত্রে আমরা এর উল্লেখমাত্র করেই ক্ষান্ত হতে চাই। ('পুষ্পাঞ্জলি'র অনবদ্য সৃষ্টি আধুনিক সমালোচকদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ড. শিপ্রা লাহিড়ী রচিত 'ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য' এবং শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য রচিত 'বন্দেমাতরম্' গ্রন্থ দুটির কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে।)

পরবর্তী দশকেই কবি হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার'-এ এই দেশচেতনা আরও স্পষ্ট হয়েছে। এই জাতীয় পুরাণ কাহিনী অবলম্বনে ভারতীয় ঐতিহ্য-স্মরণ সে যুগের কবিদের সমাজ-নিষ্ঠারই পরিচয় দিয়েছে। তাঁদের (হেম-নবীনের) খণ্ড কবিতা-গুলিতেও ঐ আক্ষেপ ও আশার সম্মিলিত সুর উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে বঙ্কিমের সৃষ্টিকালের পরিধিতে।

যদিও ইতিপূর্বে সংঘটিত সাঁওতাল-হাঙ্গামা এবং সিপাহী-বিদ্রোহ সমসাময়িক শিক্ষিত বাঙালিসমাজের বিন্দুমাত্র সহানুভূতি পায় নি, তথাপি এই বিদ্রোহের পরই জাতীয়মানসের একটি পরিবর্তন এসেছিল। অবশ্য এ-সম্পর্কে দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, রঙ্গলাল, মধুসূদনের মত স্বাধীনচিত্ত মনীষীদের প্রতিক্রিয়া অজ্ঞাতই থেকেছে। (এই নীরব নিরপেক্ষতা ইংরেজিতে যাকে passiveness বলা চলে, হয়ত তাঁদের বিরূপতার প্রতি ইঙ্গিত করে)।

অন্যদিকে আমরা লক্ষ্য করেছি, ঈশ্বর গুপ্ত, দীনবন্ধু, হরিশচন্দ্র ও দক্ষিণারঞ্জনের প্রতিকূলতা। এ ঔদাসীন্যের কারণ হয়ত ইংরেজের প্রতি নির্বিচার আনুগত্য ততটা নয়, যতটা পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি সশ্রদ্ধ মনোভাব। এসব সত্ত্বেও একালে বৃহত্তর সমাজজীবনে একটি নতুন আকাঙ্ক্ষা ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হচ্ছিল। এ-প্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় সঠিক বিশ্লেষণ করেছিলেন—

> সিপাহী-বিদ্রোহের উত্তেজনার মধ্যে বঙ্গদেশের ও সমাজের এক মহোপকার সাধিত হইল; এক নবশক্তির সূচনা হইল; এক নব আকাঙ্ক্ষা জাতীয় জীবনে জাগিল।

বাস্তবিকই এক নবশক্তি ও নব আকাঙ্ক্ষা জাতির জীবনে যে জাগছিল, পরবর্তী নীল-বিদ্রোহে তার সাক্ষ্য পাওয়া যাবে। এ নীল-বিদ্রোহ কেবল অত্যাচারিত কৃষক সম্প্রদায়ের আন্দোলন নয়, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজেও এর সাড়া জেগেছিল। এই কালের রাজনৈতিক আশা আকাঙ্ক্ষা খণ্ডিত আকারে হলেও সাহিত্যে তা প্রতিফলিত হয়েছে। 'নীলদর্পণ' নাটক (১৮৬০ খ্রী:) সেই প্রতিফলন; দীনবন্ধু এই নাটকেই সর্বপ্রথম দেশের শাসক ও শাসিতের নিগূঢ় সম্বন্ধ, বৃটিশের অর্থনৈতিক শোষণের কুৎসিত রূপ এবং তথাকথিত সুসভ্য মানুষের বর্বরতার নির্লজ্জ মুখবিকার উদ্‌ঘাটিত করেছিলেন। স্বয়ং বঙ্কিম বলেছিলেন—

> নীলদর্পণ বাংলার Uncle Tom's Cabin 'টম্‌কাকার কুটির' আমেরিকান কাফ্রীদিগের দাসত্ব ঘুচাইয়াছে, নীলদর্পণ নীলদাসদিগের দাসত্বমোচনের অনেকটা কাজ করিয়াছে।

এ-সম্পর্কে ড. সুকুমার সেনের মন্তব্য যথার্থ—

> নীলদর্পণে সমগ্র দেশের মর্মবেদনার প্রকাশ হওয়ায় দেশে যেমন সাড়া পড়িয়াছিল তেমনটি ইতিপূর্বে কখনও ঘটে নাই। ইহার ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হইলে বিলাতেও এই আন্দোলনের ঢেউ গড়াইয়াছিল।...... পাপপ্রতিষেধক রচনা বলিয়া 'আঙ্কল টমস্ ক্যাবিন', 'নিকোলাস্ নিকল্‌বি' ও 'অলিভার টুইস্‌ট্' ইত্যাদির পাশে নীলদর্পণের স্থান।

উক্ত মন্তব্যে বিন্দুমাত্র অতিশয়োক্তি নেই। সমগ্র দেশের মর্মবেদনার এমন সুতীব্র ও সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি ছিল বলেই মধুসূদন উক্ত নাটকটির ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন ছদ্মনামে এবং সেই অনুবাদগ্রন্থটি প্রকাশ করেছিলেন পাদরী লঙ্ স্বয়ং। ঐ অপরাধে (!) লঙ্-এর বিচার ও কারাদণ্ড হয়। অবশ্য কোর্টেই কালীপ্রসন্ন সিংহ সহস্র মুদ্রা জরিমানা দিয়ে এই বিদেশীকে মুক্ত করেছিলেন।

স্পষ্টত বৃটিশ শাসকদের প্রতি তৎকালীন শিক্ষিত বাঙালি-সমাজের বিশ্বাসে ভাঙন ধরেছে। ফলে তৎকালে—

> রাজনৈতিক নেতিবাচক মনোভাবের অপর পিঠে একটা ইতিবাচক জাতীয় মনোভাব ও নবশক্তি ধীরে ধীরে রূপ নিতে থাকে।...যথার্থ পথ সন্ধানের নৈতিক তাগিদ এসেছে, কিন্তু তার সন্ধান এখনও অস্পষ্ট।[২১]

সমালোচকের এই প্রাসঙ্গিক মন্তব্যটি তাৎপর্যপূর্ণ।

বাস্তবিকই পথের সন্ধান দেবার মানুষ তখনও আবির্ভূত হন নি। কেবল ভূমিকর্ষণ হয়েছে, বীজমন্ত্রের আধান-ক্রিয়াটি তখনও পরবর্তী কালের অপেক্ষা করছে। সেই কাঙ্ক্ষিত মানুষটি বঙ্কিমচন্দ্র এবং ঈপ্সিত কালটি 'বঙ্গ-দর্শন'-যুগ।

তৃতীয় অধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশচিন্তার উৎস, বিবর্তন ও বৈশিষ্ট্য

যাত্রীর মশাল চাই রাত্রির তিমির হানিবারে।
সুপ্তিশয্যাপার্শ্বে দীপ বাতাসে নিভিছে বারেবারে।

যুগরাত্রির নিরন্ধ্র তিমিরে যিনি যাত্রীদলের মশালবাহী হয়ে এসেছিলেন বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে তথা সমাজপ্রাঙ্গণে—সেই মনীষী বঙ্কিমচন্দ্রের 'নবযুগ সাহিত্যের উৎস' উৎসারণের বাণীমন্ত্রটি স্মরণ ও মননের পূর্বে যুগপরিধি নির্ণয় করা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

যাহার শক্তিতে আছে অনাগত যুগের পাথেয়
সৃষ্টির যাত্রায় সেই দিতে পারে আপনার দেয়।

—এ শুধু পূর্বসূরীর প্রশস্তি নয়, এ যে বঙ্কিমযুগের দিগ্‌দর্শনী। সত্যিই, অনাগত যুগের পাথেয় নিয়ে এসে জাতি ও সাহিত্যসৃষ্টির যাত্রায় যিনি 'আপনার দেয়' দিয়েছেন, তাঁর যাত্রাপথ ও পাথেয় আমাদের অন্বিষ্ট। স্বদেশচিন্তার মৃৎ-প্রদীপগুলি, যা উনিশ শতকের প্রথম পাঁচ দশক ধরে একটি একটি করে জ্বালিয়ে তুলেছিলেন রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়চন্দ্র, বিদ্যাসাগর, ঈশ্বর গুপ্ত, রঙ্গলাল, দীনবন্ধু ও মধুসূদন—সে সবই জাতির সুপ্তিশয্যাপার্শ্বে ক্ষণকাল আলোকদান করেই কালের নৈশঝটিকায় নিভে গেছে বারে বারে। দেশ ও জাতি যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই বোধহয় প্রহর গুণছিল। এমনি 'রাত্রির তিমির হানিবারে' যাত্রীর মশাল নিয়ে এসেছিলেন বঙ্কিম।

ঐতিহাসিক ঘটনার বন্ধনী দিয়ে বঙ্কিমযুগটি যদি জাতিমানসক্ষেত্রে নির্দিষ্ট করে নেওয়া যায় তবে তার একপ্রান্তে সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৬) ও সিপাহী বিদ্রোহ (১৮৫৭) এবং নীল বিদ্রোহ (১৮৫৯); অন্যপ্রান্তে সুরেন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পুনা অধিবেশনের (১৮৯৫) ঘোষণা—

আমরা প্রথমে ভারতবাসী, পরে হিন্দু, মুসলমান, পার্শি, খ্রীষ্টান, পতহানী, মারাঠী, বাঙ্গালী, মাদ্রাজী।

এবং Neo-hindu-revival যুগের চরম গৌরবলাভ—শিকাগো ধর্ম-মহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের বিশ্বমৈত্রীসূচক বেদান্ত বাণী প্রচারে। উনবিংশ

শতাব্দীর এই দ্বিতীয়ার্ধ—যার সূচনায় শুনেছি 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর সমুদ্রগর্জন আর সমাপ্তিলগ্নে দেখেছি 'সোনার তরী'র নিরুদ্দেশ যাত্রা ; যার একদিকে নীলদর্পণের প্রচণ্ড প্রতিবাদ, অন্যদিকে স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠে ঐতিহ্য স্মরণ—"হে ভারত ভুলিও না⋯", যার এপাশে স্ত্রীলোক-বালকবোধ্য 'মাসিক পত্রিকা' (১৮৫৭), ওপাশে রবীন্দ্র-সম্পাদিত 'সাধনা' (১৮৯১), যার শুরুতে রাজনারায়ণ বসু প্রচারিত—

> Prospectus of a society for the promotion of national feeling among the educated Natives of Bengal (1861).

এবং শেষদিকে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক 'The Dawn' পত্রিকা প্রকাশ। এই যুগের একপ্রান্তে উদার সামাজিক চেতনার স্বাক্ষর বিধবা-বিবাহ আন্দোলন ও Religious reformation-এর ফলশ্রুতি ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলন ও ভাববিশ্বাস, আর অন্যপ্রান্তে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আবির্ভাবে হিন্দুত্ব পুনর্জাগরণের চরম-প্রাপ্তিতে আগ্রাসী-হিন্দুধর্ম আন্দোলনের সূচনা। বড় আশ্চর্য এই বঙ্কিম-যুগের পরিধি।

এক.

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে 'আত্ম-বোধের পুনরুজ্জীবন' শুরু হয়েছিল, এবং তারই ফলশ্রুতি লক্ষ্য করা যায় দ্বিতীয়ার্ধের বিকাশপর্বে ('flowering of the renaissance'-এর কালে)—যখন 'ঐতিহ্যের সমন্বয় ও স্বাঙ্গীকরণ' চলেছে চিন্তায় ও শিল্পসৃষ্টিতে।

বঙ্কিমের স্বদেশচিন্তার মূলটি প্রোথিত 'পুনরুজ্জীবন পর্ব'-এর পলিমৃত্তিকায় যা সঞ্চিত হয়েছিল রামমোহন, ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী ও দেবেন্দ্র-অক্ষয়-বিদ্যাসাগর প্রমুখ মনীষার ভাবপ্লাবনে। এই স্বদেশচিন্তার বীজটি পল্লবিত হয়ে উঠেছে পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষার আলোবাতাসে (যা এসেছিল হুগলি কলেজ ও প্রেসিডেন্সি কলেজের শিক্ষাপর্বে এবং নানা পাশ্চাত্ত্যদর্শন ও ইতিহাসের সাগ্রহ চর্চায়) এবং 'সংবাদ প্রভাকর'-এর স্বদেশপ্রীতির উত্তাপে। তবে ফুল ও ফল যখন ধরল তখন দেখা গেল উপ্ত বীজটি ভারতীয় সংস্কৃতির, তাই ফলের জাত বদলায় নি। কেবল পাশ্চাত্ত্য ভাব ও বোধির আলো হাওয়ার পরিপোষণে ফলটির আশ্চর্য বিবর্তন ঘটেছে স্বাদে ও গন্ধে।

আমাদের ইতিপূর্বের আলোচনায় কয়েকটি ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রথমত, ইউরোপের পুনরুজ্জীবন আর বাংলাদেশের পুনরুজ্জীবনের মধ্যে পার্থক্য এই যে, প্রথমটির পটভূমি স্বাধীনদেশ, দ্বিতীয়টির ঔপনিবেশিক রাজ্য। তাই বাংলাদেশের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত উজ্জীবন স্বভাবতই দ্বিধাগ্রস্ত। দ্বিতীয়ত, এর নায়ক সামন্ততন্ত্রশাসিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এই শ্রেণীর শিক্ষায় ত্রুটি, কর্মে সীমাবন্ধন, চিন্তায় ও ব্যবহারে অসঙ্গতি (একদিকে শাসকনির্ভরতা, অন্যদিকে স্বাধীনচিত্ততা) ইত্যাদির সমষ্টিগত ফল কিছুটা স্ববিরোধিতা। তৃতীয়ত, সমাজের একটা বৃহত্তর অংশ, মুসলিম-সমাজ এই পুনরুজ্জীবনের ব্যাপারে সম্পূর্ণ অনাসক্ত ও আগ্রহহীন। কিন্তু এসব সত্ত্বেও কালান্তর ঘটে চলেছে, ইউরোপীয় চিত্তের জঙ্গমশক্তির রসধারা আমাদের নিশ্চেষ্ট অন্তরে প্রবেশ করে প্রাণের অঙ্কুরে রসসিঞ্চন করে চলেছে, এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রেই এই ভাবসংঘাতের ফল বিস্তৃত হয়েছে। তৎকালীন সাহিত্যেও এই ভাবসঙ্গমের প্রতিক্রিয়ার ছাপটি বিশেষ স্পষ্ট, কখনও ভাবসংহতি কখনও বা ভাববিরোধের মধ্যেই এটি রূপ পেয়েছে। বঙ্কিমের সাহিত্য ও চিন্তাতেও এই বিরোধ ও সমন্বয়ের সুস্পষ্ট রেখাপাত ঘটেছে। বঙ্কিমের কৈশোর-যৌবনের অভিজ্ঞতা ও পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সাহিত্য-সৃষ্টির ভূমিকা বিচার করলেই স্পষ্ট হবে একথা।

কলকাতার টাউনহল এবং 'ফৌজদারী বালাখানা' হতে যখন "রামগোপাল ঘোষের রব বজ্রনির্ঘোষে উত্থিত" হচ্ছিল (১৮৪৯-৫০ খ্রীঃ) বঙ্কিম তখন হুগলি কলেজে ইংরেজ প্রধান শিক্ষক গ্রেভস-এর ছত্র-ছায়ায় যত্নসহকারে ইংরেজি সাহিত্য ও ইতিহাস অধ্যয়ন করছেন। তখন কলকাতার নানা আন্দোলনের তরঙ্গ হতে দূরে বঙ্কিমের কাছে একমাত্র 'সংবাদ প্রভাকর' পৌঁছেছে (১৮৫২-৫৬ খ্রীঃ)। সিপাহী বিদ্রোহকালে প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়নরত বঙ্কিমের মনের প্রতিক্রিয়া অজ্ঞাত, তারপরই তিনি সরকারি কর্মচারিরূপে মফঃস্বলে কার্যরত। নীল-বিদ্রোহকালে (১৮৬০ খ্রীঃ) বঙ্কিম যখন যশোরে ডেপুটি কালেক্টর, কলকাতায় তখন হরিশচন্দ্রের 'প্যাট্রিয়ট'-পত্রিকা ক্ষোভে ফেটে পড়ছিল।

বস্তুত বঙ্কিমের সমসাময়িক কালে একদিকে যেমন সমন্বয়ের প্রয়াস চলেছে, অন্যদিকে তেমনি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজে আশাভঙ্গের সূচনা হয়েছে। ইংরেজ-সরকারের আমলাতন্ত্রে উপযুক্ত মর্যাদালাভে বঞ্চিত শিক্ষিত বাঙালি মর্যাদার নবতম ক্ষেত্র অনুসন্ধান করে চলেছে। তাই উক্ত আশাভঙ্গের বেদনা শিক্ষিত বাঙালির মনে স্বাজাত্যবোধ, আত্মবিশ্বাস, সম্প্রীতি ও ঐক্যবোধ, এবং তার

প্রতিক্রিয়াস্বরূপ একশ্রেণীর জাতীয় উন্নাসিকতা ও দম্ভের সঞ্চার করে চলেছিল। ড. অরবিন্দ পোদ্দারের মতে 'জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা' আর 'হিন্দু-মেলা'র (১৮৬৭ খ্রীঃ) আবেগ উপরোক্ত মনোভঙ্গিরই প্রকাশ। "মিলে সবে ভারত সন্তান একতান মনঃপ্রাণ গাও ভারতের যশোগান" —সঙ্গীতটি সেই শ্রেষ্ঠতাবোধের সুরেই বাঁধা। এই আশাভঙ্গের বেদনায় রাঙা রক্ত-শতদল ফুটেছিল ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্রের নগরসংকীর্তনে—"যার আছে ভক্তি, পাবে মুক্তি, নাহি জাত বিচার।"[১] আবার এই আশাভঙ্গের বেদনার কালে অন্যত্রও শান্তি-সন্ধানের প্রয়াস চলছিল সমন্বয়বাদের আদর্শে। সনাতন ধর্মের চিরাচরিত গণ্ডী ভেঙে বেরিয়ে এসেছিলেন এক ব্রাহ্মণ সাধক, যিনি ঘোষণা করেছিলেন "যত মত তত পথ।" প্রচলিত ধর্মাচরণের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহজাত হিন্দু-জাগরণের নবতম সমন্বয়মন্ত্রই বঙ্কিম-কালের বাংলাদেশে সঞ্চারিত হয়েছিল। সন্দেহ নেই, চেতনায় ও অবচেতনায় বঙ্কিমমানসে এই সমন্বয়বোধ ছিল।

লক্ষ্য করা যায়, বঙ্কিমের স্বদেশচিন্তার উদ্ভব ও বিবর্তনের পশ্চাতে তৎকালীন বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজ পটভূমিরূপে বিরাজমান। 'নীলবিদ্রোহ'-এর হলাহলপানে নীলকণ্ঠ এই সমাজ উড়িষ্যা-পশ্চিমবাংলার দুর্ভিক্ষের শতলক্ষ ধিক্কার-লাঞ্ছনায় রুদ্ধবাক হয়েছিল। এদিকে তখনই ভারত সাম্রাজ্য ক্রয়ের মূল্য পরিশোধ করা হচ্ছিল ভারতের ধনভাণ্ডার উজাড় করে, কিন্তু রাজদ্বারে দুর্ভিক্ষের অন্নমুষ্টি বিতরণের ব্যবস্থা করা হয় নি। আরও কিছুকাল পরে ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দে 'দিল্লী-দরবার' আয়োজিত হয়েছিল ৫২ লক্ষ মানুষের কঙ্কালস্তূপের উপর এবং সেই দরবারে 'ভারত-সম্রাজ্ঞী' উপাধি ঘোষণার প্রহসনে হতভম্ব হয়েছিল বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণী। ফলে ইংরেজ সরকারের ন্যায়-নীতিবোধের প্রতি কখনও অভিমান জাগছিল, কখনও আবেদন-নিবেদনের দ্বারা সুবিচার প্রাপ্তির আশা মরীচিকার মত মিলিয়ে যাচ্ছিল। অথচ ঠিক এই কালেই ইউরোপের নব নব জাতির জাগরণের ইতিহাস রচিত হয়ে চলেছিল। ম্যাৎসিনী-গ্যারিবল্ডী-কাভুরের প্রচেষ্টায় সংঘবদ্ধ ইতালীর সংবাদ (১৮৬০ খ্রীঃ), বিসমার্কের একরাষ্ট্র-গ্রথিত জার্মানীর কথা, আমেরিকার দাসত্ব-প্রথা লোপের সংবাদ (১৮৬২ খ্রীঃ), প্যারিসের শ্রমিক সংগ্রামের উদ্দীপনা (১৮৭১ খ্রীঃ প্যারিস কম্যুন প্রতিষ্ঠা হয়) প্রভৃতি শিক্ষিত বাঙালিমানসে যে এক নূতন ভাবনা জাগিয়ে তুলছিল, বঙ্কিমও তার অংশীদার। এদিকে মার্কস-এর 'ফার্স্ট ইণ্টারন্যাশন্যাল' প্রতিষ্ঠার (১৮৬৪ খ্রীঃ) সংবাদও তিনি রেখেছেন, 'সাম্য'-প্রবন্ধই তার সাক্ষ্য। তৎকালীন বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজের সঙ্গে বঙ্কিমও এদেশ-ওদেশের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষায়

তুলেছেন। আবার অন্যদিকে ডেপুটি কালেকটর বঙ্কিমচন্দ্র, কর্তব্যপরায়ণ রাজ-কর্মচারির মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করে চলেছেন সুদীর্ঘ তেত্রিশ বৎসর ধরে।

বঙ্কিমের স্বদেশচিন্তার উৎস অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে তাঁর পূর্বগামী নানা চিন্তাধারা কখনও ক্রমপর্যায়ে, কখনও সমান্তরাল ধারায় এসে সাঙ্গীকৃত হতে চেয়েছে তাঁর মাঝে। ইতিপূর্বেই লক্ষ্য করেছি, 'ভারতের প্রাণপাখি ধর্ম'; তাই লোকাচার ও নানা অন্ধসংস্কারে আচ্ছন্ন এক অবচেতন আধ্যাত্মিকতায় জড়িত সমাজকে নাড়া দিতে হলে ধর্মসংস্কারের পথেই যেতে হবে,—রামমোহন হতে বিবেকানন্দ এই বিশ্বাসেই সমগ্র শতাব্দীর উজ্জীবনকে গতি দান করেছিলেন। ফলে ধর্ম-সংস্কারই তাঁদের প্রধান কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল, এবং ঈশ্বরলাভের চেয়ে মানবকল্যাণবোধকে জাগ্রত করাই হয়ে উঠেছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। এই পটভূমিতে বঙ্কিমের মনে রামমোহনের একটি বিশেষ চিন্তা প্রভাব বিস্তার করেছে পরোক্ষভাবে,—তা হল ইহজীবনের পুনর্গঠন এবং হিতবাদের অনুকূল দৃষ্টিভঙ্গি। এই জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গির কাম্য হল 'মানবত্বের মহিমাবোধ' (Humanism) এবং প্রয়োজনীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে সামাজিক হিতসাধনের নৈতিক শুভবুদ্ধির উজ্জীবন। রামমোহনের কাম্য এবং হিতবাদের মূল লক্ষ্যটিও তাই। উক্ত প্রভাবের ফলে বঙ্কিমমানসেও অনুরূপ লক্ষ্য নির্দিষ্ট হয়েছিল। পরবর্তী কালে বঙ্কিমচন্দ্র 'ধর্ম্মতত্ত্ব'-এ 'বহির্বিষয়ক জ্ঞান' বলতে বিজ্ঞানকে বুঝিয়েছিলেন এবং 'অন্তর্বিষয়ক জ্ঞান'-এর ভূমিরূপে তা অবশ্য শিক্ষণীয় বলেছিলেন। অতএব দেখা যাচ্ছে, বেন্থামের হিতবাদী দর্শনের অনুপ্রেরণা রামমোহনে যেমন ছিল, বঙ্কিম-মনেও তা ক্রিয়াশীল ছিল তেমনই। তবে বঙ্কিম এই আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন পরোক্ষভাবে। এ-প্রসঙ্গে আবার জ্ঞানযোগী অক্ষয়কুমারের চিন্তাধারার উল্লেখ করতে হয়। 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচারে'—প্রাকৃতিক নিয়ম পালনকে সুখলাভের উপায় বলেছেন তিনি, এবং ঐ নিয়মগুলি তিন শ্রেণীতে সাজিয়েছেন: ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক। বঙ্কিমও 'অনুশীলন ধর্ম্ম'-কে সুখলাভের হেতু বলে বিশ্লেষণ করেছেন পরবর্তী কালে। অবশ্য অক্ষয়কুমার চেয়েছেন ব্যক্তিত্বের বিকাশ, অন্যপক্ষে বঙ্কিমের সমন্বয়বাদে ব্যক্তি-চেতনা সমাজের মঙ্গলের দিকে উন্মুখ হয়ে উঠেছে; অর্থাৎ সামগ্রিক জীবনদর্শন রচনার যে ধারা রামমোহন হতে শুরু করে দেবেন্দ্রনাথ-অক্ষয়কুমার-এর চিন্তায় বহমান ছিল, বঙ্কিম সেই ভাবধারার সঙ্গে নিজস্ব চিন্তা যোগ করে তা সাঙ্গীকৃত করতে চেয়েছেন। মনে রাখতে হবে, বঙ্কিম অক্ষয়কুমারের মত বিশুদ্ধ যুক্তিপন্থী

নন, তাঁর পথ অনেকটা আত্মপ্রত্যয়ের (Intuition)। এদিক থেকে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর কিছুটা মিল লক্ষ্য করা যায়।

এই বিশেষ দৃষ্টিতে ইহজীবনকে স্বীকার করার প্রয়াসের মধ্যেই বঙ্কিমের স্বদেশ-চিন্তার মূল উৎসটি নিহিত। এ-প্রসঙ্গে ড. ভবতোষ দত্তের বিশ্লেষণ তাৎপর্যপূর্ণ—

> ঊনবিংশ শতাব্দীর চিন্তাধারার এই সাধারণ প্রকৃতিতে ইহচেতনার প্রাধান্য যেমন দেখতে পাই তেমনি দেখতে পাই ধর্মবোধের অনড় প্রভাব।

বাস্তবিকই বঙ্কিমমানসে উল্লিখিত প্রবণতাটি রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমারের চিন্তাস্রোতে অনেকটা পুষ্ট হয়েছিল। আর এর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পাশ্চাত্ত্য প্রভাবও যে ছিল সেকথা বিবেচনা করতে হবে। উক্ত তিন পূর্বস্থরীর অভিমতগুলি বিচার করলেই ঐ সিদ্ধান্তটি স্পষ্টতর হবে।

রামমোহন চেয়েছিলেন—

> It is I think that some change should take place in their religion at least for the sake of their political advantage and social comfort.

দেবেন্দ্রনাথ 'বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রাহ্মধর্ম' প্রচার করে আশা করেছিলেন—

> পরস্পর বিচ্ছিন্নভাব চলিয়া যাইবে, সকলে ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইবে·· এবং অবশেষে সে স্বাধীনতালাভ করিবে ···।

আর অক্ষয়কুমার 'সুখোৎপত্তির মূল অন্বেষণ' করেছেন 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার'-কালে এবং 'চারুপাঠ'-এ চিত্তবৃত্তির কর্ষণ ও সামঞ্জস্যের উপদেশ দান কালে বলেছেন—

> মনুষ্যের সকল প্রধান বৃত্তিই যথানিয়মে চালনা করা উচিত এবং কিঞ্চিৎকাল পরিশ্রম ও আমোদপ্রমোদ করাও কর্তব্য। তদ্ব্যতিরেকে কোনমতেই সম্পূর্ণরূপে সুস্থ ও সর্বতোভাবে সুখী হওয়া যায় না।

বোঝা গেল এঁদের সকলের মনেই উপরোক্ত ইহচেতনার প্রাধান্য এবং ক্রিয়াশীল ধর্মবোধ ছিল। ঐ বিশেষ মনোভঙ্গি বঙ্কিমমানসে আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে; দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁর প্রচারিত 'ধর্ম্মতত্ত্ব'-কে উল্লেখ করা যেতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'ধর্ম্মতত্ত্ব'-এ মনুষ্যের বৃত্তিগুলির 'অনুশীলন, প্রস্ফুরণ, ও চরিতার্থতায় মনুষ্যত্ব'—একথা বলে স্পষ্ট ঘোষণা করলেন, 'তাহাই মনুষ্যের ধর্ম্ম'। বঙ্কিম এই উদ্দেশ্যেই ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও ভারতীয় ধর্মের সমন্বয় চাইলেন। সমালোচক মোহিতলাল এ-প্রসঙ্গে বলেছেন—

> বঙ্কিম বুঝিয়াছিলেন যে, নবযুগের ধর্ম্ম এই মানবধর্ম্মই বটে, পূর্ণ মনুষ্যত্বের

উদ্বোধনের উপরেই মনুষ্যজীবনের সার্থকতা নির্ভর করে। কিন্তু আর একটি যে বড় তত্ত্ব তিনি তাঁহার পূর্বগামিগণের পন্থা বিশেষ হইতে লাভ করিয়াছিলেন তাহারই প্রভাব তাঁহার সর্বচিন্তার মূলে চিরদিন বিগুমান ছিল, তাহারই অনুচিন্তনে ও একাগ্র ধ্যানে তিনি মানবজীবনের মহত্ত্ব ও সদর্থ সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইতে পারিয়াছিলেন। এই তত্ত্বটির নাম—মানবপ্রীতি।[২]

একথা সত্য, বঙ্কিম ধর্মনেতা নন, প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গেও যুক্ত থাকেন নি, সমাজসংস্কারের কর্মেও আত্মনিয়োগ করেন নি। তাঁর যা অবদান তা বাঙালিকে নতুন যুগের সমন্বয়ী চিন্তায় দীক্ষিত করতে এবং যুক্তিগ্রাহ্য অনুশীলন ধর্মে আকৃষ্ট করে সমাজের ও স্বদেশের মঙ্গলকামী মানুষ হতে। সেদিক থেকে পূর্বগামিগণের প্রভাব তাঁর মনে ফলপ্রসূ হয়েছিল।

বঙ্কিমমানসে স্বদেশচিন্তার আর-একটি ধারা ইতিহাসচেতনা, যার উৎস পরোক্ষভাবে 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠীর 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা' ও জর্জ টমসনের প্রেরণা এবং প্রত্যক্ষভাবে 'সংবাদ প্রভাকর'-এর সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। আমরা লক্ষ্য করেছি, 'জ্ঞানোপার্জিকা সভা'র আলোচনার জন্য কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক রচিত প্রবন্ধ 'On the nature and importance of the study of History' এবং প্যারীচাঁদ মিত্র রচিত 'The state of Hindoostan under the Hindus' গ্রন্থ ঐ সময়ের নবলব্ধ ইতিহাসচেতনার প্রমাণ। এদেশে সদ্য আগত "জর্জ টমসনও তরুণ বঙ্গকে দেশের বর্তমান এবং অতীত ইতিহাস পর্যালোচনায় অনুপ্রাণিত করেন।" ভূদেব মুখোপাধ্যায়ও তাঁর 'বাঙ্গালার ইতিহাস' রচনায় টমসনের প্রেরণার কথা উল্লেখ করেছেন। বস্তুত এই সময়েই দেশের প্রাচীন ও বর্তমান অবস্থার পর্যালোচনা শুরু হয়েছিল। (উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হল ১৮৪৬ খ্রীঃ রচিত প্যারীচাঁদের 'The Zeminder and the Ryot'—Calcutta Review)।

ইতিহাসমুখিনতায় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণার উৎস নিঃসন্দেহে 'সংবাদ প্রভাকর'। এর মাধ্যমেই ঈশ্বর গুপ্ত বাংলাদেশ ও সমাজ সম্পর্কে একটি সশ্রদ্ধ কৌতূহল জাগ্রত করেছিলেন। ঈশ্বর গুপ্তের স্বদেশপ্রীতি এবং স্বদেশ ও সমাজের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা বঙ্কিম, দীনবন্ধু, রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র সকলের মনেই একটা বাঙালি মনোভাব উদ্দীপ্ত করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের মনীষায় এরই পূর্ণ প্রকাশ হয়েছিল, তাই "দেশের ইতিহাসের প্রকৃত যে ধ্যান"—তা হৃদয়ঙ্গম করে বঙ্কিম ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। এ-প্রসঙ্গে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের ঐতিহাসিক অনুসন্ধানও তাঁকে উৎসাহিত করেছে।

প্রকৃতপক্ষে, ইতিহাস অনুসন্ধানের দ্বারা পূর্ব গৌরব অনুভব করা এবং স্বদেশ-চিন্তায় উদ্দীপ্ত হওয়ার পশ্চাতে উনবিংশ শতাব্দীর পুনরুজ্জীবন প্রবাহ (কোন একক ব্যক্তির নয়, সমষ্টিগত চিন্তার ধারা-প্রবাহ) ক্রিয়াশীল হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র এই ভাবপ্রবাহের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিণতি।

এদিকে আবার ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মাতৃভাষা ও মাতৃভূমির প্রতি অনুরাগ বঙ্কিমের স্বদেশচিন্তাকে শিল্পিতরূপে প্রকাশে অনুপ্রাণিত করেছিল।[৩] বঙ্কিমের সুস্পষ্ট ঘোষণাটি ঈশ্বর গুপ্তের উক্তির সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেই একথা স্পষ্ট হবে। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন—

> The popular literature of a nation and the national character act and react on each other.[8]

আর অন্যদিকে "সম্প্রতি স্বদেশীয় ভাষার উন্নতিকল্পে সর্বতোভাবে সম্পূর্ণ যত্ন করা অতি কর্তব্য হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত দেশের উচ্চ গৌরব কোনমতেই রক্ষা হইতে পারে না।" ঈশ্বর গুপ্তের ঐকথা বঙ্কিমের বঙ্গদর্শনের অনুপ্রেরণাস্বরূপ ছিল। তাই বঙ্কিম লিখেছিলেন—

> আমার মনে হয় একটা বড় ভাবের কথা বাঙ্গালাভাষায় বাঙ্গালিদিগকে বুঝাইতে পারিলে সে ভাব তাহাদের হৃদয় স্পর্শ করিবে,……দেশব্যাপী একটা বিরাট ভাবের ঢেউ তুলিতে পারিবে। এই নবভাবে জাতি উদ্বুদ্ধ হইবে। জাতির হৃদয়ে সজীবতা আনয়ন করিবে, সমাজের কল্যাণ আপনিই সাধিত হইবে।

এ-পর্যন্ত বঙ্কিমের স্বদেশচিন্তায় উল্লেখযোগ্য দুটি মনোভঙ্গি অর্থাৎ (ক) ইহজীবনের প্রাধান্য এবং হিতবাদের অনুকূল দৃষ্টিভঙ্গি (যাকে এককথায় মানব-মহিমাবোধ বলেছেন মোহিতলাল) এবং (খ) ইতিহাসচেতনা, এবং তাতে পূর্বগামীদের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ প্রভাব, এ দুটিই আলোচনা করা গেল। এবার এক্ষেত্রে পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারার পরিপুষ্টির কথা বিবেচ্য।

'মানব-মহিমা-বোধ'-এর সঙ্গে বঙ্কিমমানসে আর একটি তত্ত্বের বীজ গভীর প্রবেশ লাভ করেছিল—তা হল 'মানব-প্রীতি'। এ-সম্পর্কে মোহিতলাল বিশ্লেষণ করেছেন—

> শোনা যায়, তিনি প্রথম বয়সেই ফরাসী দার্শনিক আগুস্ত কোঁৎ (Auguste Comte)-এর Positivism বা বিজ্ঞানসম্মত মানব-সেবা ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ইহার কারণ এই বলিয়া মনে হয় যে, তিনি মনুষ্যব্যক্তি

অপেক্ষা মনুষ্যজাতির কল্যাণকে—ব্যষ্টি অপেক্ষা সমষ্টির গৌরবকে উচ্চতর সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন।[৫]

এবার ড. ভবতোষ দত্তের 'বঙ্কিমচন্দ্র ও পাশ্চাত্য মনীষা' প্রবন্ধের কয়েকটি মন্তব্য এই প্রসঙ্গে বিবেচনা করা যায়—

> আত্মসচেতন পর্যবেক্ষণ এবং আরোহরীতি—এই দুটিই পাশ্চাত্ত্য বিচার প্রণালীর বৈশিষ্ট্য। · বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম থেকেই নতুন শিক্ষা এবং মননরীতিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠলেন।
>
> ইংরেজি শিক্ষার ফলে তিনি যেন নতুন অস্ত্র খুঁজে পেলেন। তারই দ্বারা তিনি বিষয়কে বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের সঙ্গে ব্যবচ্ছেদ করে নবজাগরণের একটা দিককে আমাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করলেন।
>
> বঙ্কিমচন্দ্র বাক্‌ল্‌-এর ঐতিহাসিক প্রণালীকে স্বীকার করে 'বঙ্গদেশের কৃষক'-এর কোন কোন জায়গায় প্রায় অনুবাদই করে দিয়েছিলেন।···আর একটি বই-এর দ্বারাও তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন, লেকির 'History of Rationalism in Europe'।
>
> ···এই সময় তিনি অভিজ্ঞতাবাদী এমপিরিসিষ্ট।···এই চিন্তাগুলি পরে একটি বৃহত্তর জীবনদর্শনের অঙ্গীভূত হয়ে উঠবে। এদের মধ্যে জাতীয়তা বোধ একটি বড় ভাবগ্রন্থি।[৬]

উপরোক্ত সমালোচকদ্বয়ের সুনিপুণ বিশ্লেষণে বঙ্কিমের মনোজগতে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রভাবটি পরিস্ফুট হয়েছে। বঙ্কিম 'ভারত-কলঙ্ক' প্রবন্ধে নিজেই ঘোষণা করেছেন যে ইংরেজের চিত্ত-ভাণ্ডার হতে প্রাপ্ত অমূল্য রত্নাবলীর প্রধান দুটি হল, "স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা এবং জাতিপ্রতিষ্ঠা। ইহা কাহাকে বলে, তাহা হিন্দু জানিত না।"

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ছাত্রজীবনে এবং কর্মজীবনের স্বাধ্যায়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় র‍্যাশন্যালিজম্-এর বেগ অনুধাবন করেছেন, এবং উনবিংশ শতকের ইংলণ্ডের 'Oxford movement'-এর প্রতিও লক্ষ্য করেছেন। এদিকে রবার্ট সীলির 'Ecce Home' (১৮৬৬ খ্রী:) এবং 'Natural Religion' (১৮৮২ খ্রী:) গ্রন্থ দুটি তাঁকে বিশেষ প্রভাবিত করেছিল; তিনি 'ধর্ম্মতত্ত্ব'-এ এর উল্লেখ করেছেন 'the substance of religion is culture' বলে। আর ইতিপূর্বেই তিনি কোঁৎ, বেন্থাম, স্টুয়ার্ট মিলের চিন্তাধারা অর্থাৎ 'Positivism' এবং 'utilitarianism'-এর প্রভাব বিশেষ ভাবে অনুভব করেছিলেন।[৭] কোঁৎ-এর অনুসরণে 'ধর্ম' অর্থে 'মানবতা'কেই তিনি মোটামুটি গ্রহণ করেছিলেন

ইতিপূর্বে। পরে অবশ্য 'কৃষ্ণচরিত্র' ব্যাখ্যায় বঙ্কিম সীলির আদর্শ নিয়েছিলেন। একই সঙ্গে আবার 'সামঞ্জস্যের অভাবই দুঃখ'—এই জাতীয় উক্তিতে জন স্টুয়ার্ট মিলের প্রতিধ্বনিও শোনা গিয়েছিল তাঁর 'ধর্ম্মতত্ত্ব'-এ।

আসলে সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির যোগ নির্ণয়ের দুরূহ কার্যটি ছিল সমন্বয়বাদী বঙ্কিমের। এই সমন্বয়ের সাধনায় স্পষ্টত দুটি স্তর লক্ষ্য করা যায় বঙ্কিমের চিন্তায়, তা হল প্রথম যুগে এম্পিরিসিজম্ এবং পরবর্তী যুগে র‍্যাশন্যালিজম্। একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে প্রথম যুগের এমপিরিসিস্ট-বঙ্কিম পরবর্তী যুগের র‍্যাশন্যালিস্ট-বঙ্কিমে পরিণত। আরও লক্ষণীয়, হার্বার্ট স্পেন্সার-এর 'সিন্থেটিক ফিলজফির' মত বঙ্কিমচন্দ্র একটি সংগতিপ্রাপ্ত দর্শন তৈরি করতে অনুপ্রাণিত হন শেষপর্বে। তাঁর এই 'বৃহৎ জীবনদর্শন'-এ 'জাতীয়তাবোধ একটা বড় ভাবগ্রন্থি' নিঃসন্দেহে। আরও একটা প্রভাব অবশ্য এতে যুক্ত হয়েছে, তা হল ভারতীয় সংস্কৃতির।

মোট কথা, ইউরোপীয় দর্শন-ইতিহাস-সাহিত্য-মন্থিত প্রাণশক্তি (power) আর তত্ত্বজ্ঞানের (knowledge) পুষ্টি যেন আলো হাওয়ার মত বঙ্কিমের স্বদেশ-চিন্তাকে বর্ধিত করেছে। তাই প্রবন্ধ রচনাকালে, এমনকি শিল্পসৃষ্টিকালেও স্বীয় বক্তব্য বিচারের পক্ষে ও বিপক্ষে প্রচুর উদ্ধৃতি দিয়েছেন বঙ্কিম, এবং তার অধিকাংশই পাশ্চাত্ত্য চিন্তাশীলদের সিদ্ধান্তগ্রন্থ হতে। বেকন, বাক্‌ল, বার্কার, সীলি, লেকি, রুশো, বেন্থাম, স্টুয়ার্ট মিল, হার্বার্ট স্পেন্সার, কোঁৎ, ডারউইন, ম্যাথ্‌ আর্নল্ড, মনীষীদের বিচিত্র অবদান এবং এম্পিরিসিজম্, র‍্যাশন্যালিজম্, ইউটিলিটারিয়ানিজম্, পজিটিভিজম্, অ্যাগ্নস্টিসিজম্, ন্যাশন্যালিজম্, সোশ্যালিজম্ —প্রভৃতি 'ইজ্‌ম্' বা মতবাদের তরঙ্গদোলায় তাঁর চিত্ত আন্দোলিত হয়েছে।

অন্যদিকে যে ইতিহাসচিন্তা বঙ্কিমের ছাত্রাবস্থা হতে ক্রমদীপ্ত হয়েছে তাতেও পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের কিছুটা সাঙ্গীকরণ লক্ষ্য করা যায়। কেবল পূর্বগামিগণের প্রভাবেই নয়, বঙ্কিমের নিজস্ব অনুসন্ধিৎসা ও বৈজ্ঞানিকসুলভ মনন ইউরোপের ইতিহাস মন্থনে তাঁকে সাহায্য করেছে। বাক্‌ল-এর 'History of the civilisation in England' এবং লেকির 'History of the Rationalism in Europe'—ছিল বঙ্কিমের চর্চার বস্তু। 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদনকালে ইউরোপীয় রাজনীতি ও অর্থনীতির পুস্তকগুলির সঙ্গে নানা ইতিহাসের উদ্ধৃতি এই কথাই প্রমাণ করবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, 'সাম্য'-এর মূলতত্ত্বটি রোপ হতে পাওয়া, তাই মার্কস্-পূর্ব সাম্যতন্ত্রের ইতিহাস, বঙ্কিমের বুদ্ধিদীপ্ত শ্লেষণে ঐ প্রবন্ধে স্থান পেয়েছে। ভারতীয় ও বঙ্গীয় সমাজের বিশ্লেষণে

ইউরোপীয় পদ্ধতিজাত ইতিহাস বিশ্লেষণের ধারা বঙ্কিম অঙ্গীকার করেছেন। এজন্যেই মার্শম্যান বা স্টুয়ার্ট রচিত বাঙলার ইতিহাসে তাঁর মন ভরে নি।

এই ইতিহাসচিন্তার সঙ্গে স্বদেশপ্রীতির মণিকাঞ্চন যোগেই বঙ্কিমের ঐতিহাসিক উপন্যাস সৃষ্টি। স্বদেশচিন্তার শিল্পিত রূপ-সৃষ্টিতেও পাশ্চাত্ত্য প্রভাব ও প্রাচ্য ভারতীয় সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটেছে বঙ্কিমচন্দ্রে।

বঙ্কিমের ইতিহাসচেতনা এবং স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি গভীর মমতা একদিকে জাতীয় কলঙ্কক্ষালনে তাঁকে ব্রতী করেছিল, অন্যদিকে জাতীয় গৌরব উদ্ধারে নিয়োজিত করেছিল। উক্ত মহান ব্রত দুটি পালনকালে বঙ্কিম ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। অবশ্য এই আকর্ষণের পশ্চাতে তৎকালীন যুগ-প্রবণতা, এবং জাতীয়তাবোধ তাঁর অন্তরে উদ্দীপ্ত ছিল।

ইতিপূর্বে রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ ও বিদ্যাসাগর যে নিষ্ঠায় ও মমতায় ভারতীয় সংস্কৃতিজাত ধর্মচিন্তা ও সাহিত্যের খনিগর্ভ হতে নানা রত্ন উদ্ধার করে ইংরেজি-শিক্ষিত সমাজের চোখের সামনে তুলে ধরেছিলেন, বঙ্কিমের মনে সেই নিষ্ঠামমতারূপ পরশমণির স্পর্শ লেগেছিল। তাই পাশ্চাত্ত্য তত্ত্বরাজি ও ইতিহাসচেতনাজাত তথ্যাবলী এবং নানা খণ্ড খণ্ড 'আইডিয়া'গুলিকে সমন্বিত ও সাঙ্গীকৃত করে এক 'বৃহৎ জীবনদর্শন' রচনা করেছিলেন বঙ্কিম, এবং সেকাজে 'জাতীয়তাবোধ একটি বড় ভাবগ্রন্থি'।

রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথ ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ নিয়ে উচ্চ আদর্শের বাণী সংকলন করেছিলেন, অর্থাৎ বেদান্ত ও উপনিষদের ঋক্‌,থ তুলে ধরেছিলেন। যদিও সেযুগে 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর কেউ কেউ নিস্পৃহ দৃষ্টিতে ভারতীয় সংস্কৃতির বিচার করেছিলেন 'এশিয়াটিক সোসাইটি'র আদর্শে, 'তত্ত্ববোধিনী' সভার সভ্যরা কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির আলোচনায় লেগেছিলেন শ্রদ্ধাপ্লুত হৃদয় নিয়ে। অক্ষয়কুমার, ঈশ্বরচন্দ্র, রাজনারায়ণ ও দ্বিজেন্দ্রনাথ,—এঁরা সকলেই ঐ ব্রতে নিয়োজিত ছিলেন। অনুরূপভাবে বঙ্কিমও ভারতীয় সংস্কৃতির বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন যুক্তিতথ্য বিশ্লেষণের সঙ্গে আদর্শ ও কল্পনার সমন্বয়ে। এ-ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য এই 'বঙ্গদর্শন' প্রচারের পূর্বেই কয়েকটি ঘটনা বঙ্কিমের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, যেগুলিকে তৎকালীন যুগপ্রবণতা হিসাবে গ্রথিত করা যায়—

ক. যুক্তিবাদী অক্ষয়কুমার 'ভারতীয় উপাসক সম্প্রদায়' এবং 'প্রাচীন হিন্দুদিগের

সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্য বিস্তার' রচনা করে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন।

খ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' এবং মহাভারতের অনুবাদ—গ্রন্থদুটি ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছিল।

গ. ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত নীলমণি বসাক তাঁর 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' ১ম খণ্ডটিতে হিন্দুযুগের উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন—মনুসংহিতা, মহাভারত, রামায়ণ, পুরাণ, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বিবিধার্থ সংগ্রহ, আসিয়াটিক রিসার্চ, ওয়ার্ড সাহেবের হিন্দুবৃত্তান্ত ইত্যাদি হতে।

ঘ. সংবাদ প্রভাকরের আবির্ভাব, যাতে ছিল ঈশ্বর গুপ্তের ভারত-ঐতিহ্যের প্রতি সুনিবিড় শ্রদ্ধার অবদান।[৮]

উপরোক্ত ঘটনাগুলির প্রেরণা বঙ্কিমমানসে স্বভাবত ক্রিয়াশীল ছিল। কিন্তু 'এহো বাহ্য'। বঙ্কিম স্বয়ং ভারতবর্ষের গৌরবময় অতীত সংস্কৃতি নিয়ে চিন্তা করেছেন, অধ্যয়ন ও অনুসন্ধান করেছেন। তার প্রমাণ, ইতিহাস-অনুসন্ধানী বঙ্কিমের প্রেরণাতেই 'বঙ্গদর্শন'কে কেন্দ্র করে একটি ভারতীয় সংস্কৃতি আলোচনার মণ্ডলী গড়ে উঠেছিল। তার ইঙ্গিত আছে আরও একটি ব্যাপারে, তা হল, বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই জুলাই নবীনচন্দ্রকে একটি পত্রে ভারতবর্ষের ইতিহাস সংকলনের সংকল্প জানিয়েছিলেন; সময় ও সুযোগের অভাবে সে-সংকল্প যদিও কার্যে পরিণত হয় নি, তবুও তার ভূমি প্রস্তুতিস্বরূপ যা তিনি করেছিলেন তা কম নয়। সে আলোচনায় পরে আসা যাবে।

বঙ্কিম 'বঙ্গদর্শন' প্রচারের পূর্বেই 'Buddhism and Sankhya Philosophy' এবং এক বৎসরের মধ্যেই 'The Study of Hindu Philosophy' এই প্রবন্ধ দুটি লিখেছিলেন। প্রবন্ধ দুটিতে ভারতীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনে বঙ্কিমের মানসপ্রবণতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। 'বঙ্গদর্শন'-পর্বে এই জাতীয় প্রবন্ধের কথাও এ-প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। এমন কি বঙ্কিমের শেষ উল্লেখযোগ্য অভিভাষণটি ছিল, 'Vedic Literature' প্রসঙ্গে। এ-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করলে সন্দেহ থাকে না, "বঙ্কিমচন্দ্র সে যুগের পক্ষে রাজনীতিক স্বাধীনতার চেয়ে সাংস্কৃতিক স্বাধীনতাকেই অধিকতর প্রয়োজনীয় বলে মনে করেছেন।"[৯] তাই রাজনৈতিক আন্দোলনের ঢক্কানিনাদ হতে দূরে থেকে তিনি মানুষ গঠনের আদর্শ সন্ধান করেছিলেন আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের প্রাচীন যুগাদর্শের মধ্যে, এই সূত্রেই তিনি 'অনুশীলন'-এর আদর্শ মানুষ বলে তুলে ধরেছিলেন মহাভারতের গীতাপ্রবক্তা শ্রীকৃষ্ণকে। হেষ্টির সঙ্গে লেখনীযুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় এই সংকল্প

আরও দৃঢ় হয়েছিল। প্রসঙ্গসূত্রে স্মরণ করা যায়, শোভাবাজারের রাজবাড়ির শ্রাদ্ধকে উপলক্ষ্য করে পাদ্রী হেষ্টি 'স্টেটসম্যান'-পত্রিকার পৃষ্ঠায় হিন্দুসমাজ, ধর্ম এবং সংস্কৃতির প্রতি কটুক্তি ও উপদেশ বর্ষণ করেছিলেন, বঙ্কিম সেই জাতীয় অপমানের বিরুদ্ধে মসীযুদ্ধ করেছিলেন। এ-ব্যাপারের পর বঙ্কিম হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির অনুসন্ধানে আত্মনিয়োগ করেছিলেন আরও গভীর মনোযোগে। শেষ পর্বে বঙ্কিম তাঁর উপলব্ধিজাত মূল সিদ্ধান্ত স্বরূপ 'বহির্বিষয়ক জ্ঞান'-এর সঙ্গে 'অন্তর্বিষয়ক জ্ঞান'-এর চর্চার কথা বলেছেন,—আর একথাও জানিয়েছেন যে অন্তর্বিষয়ক জ্ঞান হিন্দুধর্মের সারভাগে সঞ্চিত।

পাশ্চাত্ত্য 'হিতবাদ' ও 'ধ্রুববাদ' দ্বারা প্রভাবিত বঙ্কিম ঐগুলির সমন্বয় করলেন ভারতীয় সংস্কৃতিজাত গীতোক্ত জ্ঞান-কর্ম-ভক্তিযোগের সঙ্গে, সমন্বিত ফলশ্রুতি হল 'অনুশীলন ধর্ম'। তিনি হিন্দুধর্মের নতুন ব্যাখ্যা দিতে চেয়েছিলেন বলেই ভারতীয় সংস্কৃতি নূতন আলোকে তাঁর চোখে ধরা পড়েছিল। এই অর্থেই তিনি দ্রষ্টা এবং জাতি-সংগঠক। শ্রীঅরবিন্দের উক্তিতে তারই প্রশস্তি উচ্চারিত—

The earlier Bankim was only a poet and stylist,—the later Bankim was a seer and nation-builder.

—Bankim-Tilak-Dayananda.

এই উক্তিতে বঙ্কিমের স্বদেশচিন্তার বিবর্তনের মূল কথাটি ধ্বনিত হয়েছে। 'seer and nation-builder' বা দ্রষ্টা ও জাতিসংগঠক বঙ্কিমকে ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য যে প্রভাবিত করেছিল—তার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ 'ধর্ম্মতত্ত্ব'-এ আখ্যাত 'অনুশীলন ধর্ম', যার মানবিক আদর্শ ও বিশ্লেষণ আছে 'কৃষ্ণচরিত্র'-এ এবং শিল্পায়িতরূপে 'ত্রয়ী'-তে। গীতা ও মহাভারত বঙ্কিমের ধ্যানদৃষ্টিতে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং দ্রষ্টা বঙ্কিম ঐগুলির দ্বারা প্রভাবিত। আর কবি ও শিল্পী বঙ্কিম আকৃষ্ট ও প্রভাবিত হয়েছিলেন সংস্কৃত কাব্যরাজিতে, তাই ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস, ভবভূতির কাব্যরাজি বঙ্কিমের কাব্যসাধনায় পুনরুদ্ভাসিত। এদিকে ভারতীয় দর্শন সাংখ্য ও বেদান্ত বঙ্কিম-মনীষার গবেষণার সামগ্রী হয়ে উঠেছিল; শেষজীবনে 'বেদ' তাঁর বিশেষ অধ্যয়নের বস্তু হয়েছিল। যাঁকে রাজনারায়ণ বসু তাঁর 'আত্মজীবনী'তে কটাক্ষ করে 'জঘন্য কোঁৎবাদী' বলেছিলেন, তিনিই ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রভাবে গীতোক্ত অনুশীলনধর্মের প্রবক্তা হয়ে উঠেছিলেন,—এতে আশ্চর্যের কিছু নেই, সমন্বয়বাদী বঙ্কিম-প্রতিভার পক্ষে এটাই স্বাভাবিক। এই স্বাভাবিক মানস-বিকাশেই তাঁর স্বদেশচিন্তার বিবর্তনধারার পরিচয় বিদ্যমান।

এ-প্রসঙ্গে আলোচনাকালে আমাদের সব সময়েই মনে রাখতে হবে যে—
বঙ্কিমচন্দ্রের যত কিছু চিন্তা—তাঁহার ধ্যান, জ্ঞান ও কর্ম—স্বজাতির
কল্যাণ-চিন্তাতেই গণ্ডিবদ্ধ হইয়া আছে।……স্বজাতি, স্বসমাজ ও স্বদেশ—
এই তিনে এক বা একে তিন ছাড়া তাঁহার যেন স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বই ছিল না।

'বঙ্কিম-বরণ' গ্রন্থে মোহিতলালের এই মন্তব্য উচ্ছ্বাসজনিত অত্যুক্তি নয়, যুক্তিসহ এবং বিশ্লেষণসহ যথার্থ সিদ্ধান্ত।

দুই.

বঙ্কিমের স্বদেশচিন্তার উৎস অনুসন্ধানকালে মূলত তিন প্রকার প্রভাব লক্ষ্য করা গেল। এই মিলিত প্রভাবে, বিশেষত তৃতীয় প্রভাবে অর্থাৎ ভারতীয় সংস্কৃতি-চিন্তার প্রভাবে তাঁর ক্রমবিকশিত স্বদেশচিন্তার বিবর্তন ঘটেছে—এ ব্যাপারটি পূর্বে উদ্ধৃত শ্রীঅরবিন্দের মন্তব্যে সুস্পষ্ট হয়েছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, বঙ্কিমজীবনীকারদ্বয় ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত বঙ্কিমের সাহিত্য-জীবনকে চারটি পর্বে বিভক্ত করে বলেছেন যে আদি পর্বে (১৮৫২-১৮৬৫ খ্রীঃ) ও প্রস্তুতিপর্বে (১৮৬৫-১৮৭২ খ্রীঃ) বঙ্কিমচন্দ্র লেখক, যুদ্ধপর্বে (১৮৭২-৮৯ খ্রীঃ) সম্পাদক ও সমালোচক এবং শান্তিপর্বে (১৮৮৯-৯৪ খ্রীঃ) পিতামহ ভীষ্মের মত উপদেষ্টা।

ঐ ইঙ্গিতটি বঙ্কিমের স্বদেশভাবনার বিবর্তন বিচারে তাৎপর্যপূর্ণ। মোটামুটি-ভাবে বলা চলে, 'বঙ্গদর্শন'-এর আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত প্রস্তুতি-পর্বেও বঙ্কিমচন্দ্র নিজের প্রতিভা-নির্দেশিত পথটি খুঁজে পাবার চেষ্টা করেছিলেন, আর পরবর্তী কালে নানা রচনায় পরিণত চিন্তার প্রকাশের মধ্যে তিনি স্বদেশ ও স্বজাতির সংগঠক এবং দ্রষ্টার ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এদিক দিয়ে বিশ্লেষণ করলে বঙ্গদর্শন আবির্ভাবের কিছু পূর্বেই ভবিষ্যৎ পরিণতির কয়েকটি ইঙ্গিত পাওয়া যাবে বঙ্কিমচন্দ্রের দুটি প্রবন্ধে। বেঙ্গল সোশ্যাল সায়ান্স এসোসিয়েশনে প্রবন্ধ দুটি পঠিত হয়; প্রথমটি 'On the origin of Hindu Festival' (২০. ১. ১৮৬৯-তে পঠিত, মুদ্রিত) দ্বিতীয়টি 'A popular literature for Bengal.' (২৮-২-১৮৭০-তে পঠিত, মুদ্রিত)। প্রথম প্রবন্ধে বঙ্কিম হিন্দু উৎসবের ঐতিহাসিক মূল অনুসন্ধান উপলক্ষে বলেছেন—

Indeed historical festival can scarcely be expected to be found among a nation devoid of historical association.
—Transaction III, pp 61-67.

এরও পূর্বে মৃণালিনীতে সমভাবের আক্ষেপ শোনা গিয়েছিল। এই ক্ষোভ-ই বঙ্কিমচন্দ্রকে ইতিহাস-অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত করেছিল (পরবর্তী) বঙ্গদর্শন-পর্বে।

এদিকে দ্বিতীয় প্রবন্ধে—"The popular literature of a nation act and react on each other." —এই উক্তিটির সংকেত লক্ষণীয়। এই প্রবন্ধেই বলা হয়েছিল, সাহিত্যের ললিতমধুর অলসবিলাসে বাঙালি নতপ্রাণ, এবং সমগ্র জাতি "inactive and effeminate"। বঙ্কিমচন্দ্র তাই উক্ত পৌরুষহীন সাহিত্যকে পৌরুষমণ্ডিত করার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। নিকট ভবিষ্যতে জাতি-সমালোচক ও সংগঠকরূপে তাঁর প্রবন্ধ রচনার সংকল্প যেন ঐখানেই ব্যঞ্জিত হয়েছিল।

অতঃপর একবৎসর পরে রচিত আরও দুটি ইংরেজি প্রবন্ধে 'বঙ্গদর্শন'-সম্পাদকের সম্ভাবনা দেখা গেছে। প্রবন্ধ দুটি তৎকালীন ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'The Calcutta review'-তে প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে; তার একটি 'Bengali Literature' আর অন্যটি 'Buddhism and Sankhya Philosophy'। প্রথম প্রবন্ধে বঙ্কিমমানসের আশাবাদী স্বদেশচেতনা ধ্বনিত—

> …it is possible to imagine that Bengalis are now doing a great work by so to speak acclimatising European ideas…[১০]

দ্বিতীয় প্রবন্ধে বঙ্কিমের ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসন্ধান-কামনা ও গৌরববোধ সংকেতিত। উল্লিখিত প্রবন্ধগুলিতেই স্বদেশ ও সমাজের হিতচিন্তার বীজ ছিল। বঙ্গদর্শন'-এ সেই বীজ মাতৃভাষার মাধ্যমে ফলবান বৃক্ষরূপে বিকশিত হয়েছে।

'বঙ্গদর্শন' (এপ্রিল, ১৮৭২) প্রকাশের কয়েক সপ্তাহ পূর্বে লেখা একটি পত্রে পত্রিকাটির লক্ষ্য সম্বন্ধে সংকল্প ব্যক্ত হয়েছিল। পত্রটি 'Mukherjee's Magazine'-এর সম্পাদক ড. শম্ভুচন্দ্র মুখার্জিকে ১৪. ৩. ১৮৭২ তারিখে লিখিত হয়েছিল। সেটির কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করছি—

> I have myself projected a Bengali Magazine with the object of making it the medium of communication and sympathy between the educated and the uneducated classes .
>
> …We ought to *disanglicise* ourselves…Just as we ought to address ourselves to the masses of our own race…

বোঝা গেল, এই সময়েই বঙ্কিমমানসে স্বদেশচিন্তা স্পষ্ট মূর্তিপরিগ্রহ করেছে।

তাই বাঙালিজাতিকে ইংরেজিয়ানার সর্বনাশা জাদু হতে মুক্ত করার ঈপ্সা প্রবল হয়ে উঠেছে তাঁর মনে এবং 'বঙ্গদর্শন'-এর নানা প্রবন্ধে, 'লোকরহস্তে' ও 'কমলাকান্তের দপ্তরে'—এই ঈপ্সা সরব হয়ে উঠেছে। বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনাতে যে তিনটি উদ্দেশ্য ঘোষণা করেছিলেন বঙ্কিম—তাতে ছিল, প্রথমত বাংলা ভাষার প্রতি বাঙালির অনাদর ঘুচিয়ে দেওয়া, দ্বিতীয়ত বঙ্গমধ্যে জ্ঞানের প্রচার করা, তৃতীয়ত নব্যসম্প্রদায়ের সহিত আপামর সাধারণের সহৃদয়তা বৃদ্ধি করা ; এই সবগুলিই হল 'Popular Literature'-শীর্ষক প্রবন্ধে ব্যক্ত সংকল্প—জাতীয় সাহিত্য ও জাতীয় চরিত্রের সংগঠন করার উদ্দেশ্যে। স্পষ্টত মাতৃভাষার মাধ্যমে শুধু ইউরোপীয় ভাবাদর্শকে অঙ্গীকরণ করাই নয়,—নবভাবে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করে সমাজের কল্যাণসাধন করাও বঙ্কিমের লক্ষ্য ছিল। বঙ্কিম আশা করেছিলেন, নবভাবে উদ্বুদ্ধ জাতি ইতিহাস অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হবে এবং ফলস্বরূপ ঐতিহ্যগৌরবে জাতিমানসে মাতৃমূর্তির প্রতিষ্ঠা হবে। তাই বঙ্কিমের শ্লোগান ছিল—

> বাঙ্গলার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গলার ভরসা নাই। কে লিখিবে ?
> তুমি লিখিবে আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে।

এই ইতিহাসচেতনাই জাতিজাগৃতির প্রথম পাঠ। বঙ্কিমের স্বদেশচেতনা তাই জাতীয় ঐতিহ্যের দিকে এক প্রশস্ত রাজপথ নির্মাণে ব্রতী হয়েছিল। একদিকে চিন্তামূলক প্রবন্ধ রচনা, অন্যদিকে শিল্পিত প্রকাশের ক্ষেত্রে আবেগভরা ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস সৃষ্টির মাধ্যমে আদর্শ প্রতিষ্ঠা—এই দুইভাবে বঙ্কিমের প্রতিভায়—"আমাদের গৃহে আমাদের সমাজে, আমাদের অন্তরে একটা নূতন জ্যোতি বিকীর্ণ হইল।" বলা বাহুল্য, বঙ্কিমের এই ইতিহাসচেতনাই তাঁর সমাজচিন্তা এবং পরিণামে স্বদেশচিন্তার ভূমিকাস্বরূপ।[১১] আমরা যথাস্থানে আমাদের আলোচনায় লক্ষ্য করব, কোঁৎ-মিল অনুরাগী বঙ্কিম, 'সাম্য'-লেখক বঙ্কিম তৎকালীন হিন্দুসমাজের তথা বাঙালিসমাজের দুষ্টক্ষতগুলির নিরাময় করার দিকে সমগ্র সমাজকে অগ্রসর হতে বলেছিলেন। 'বঙ্গদর্শন'-এর আধারে এ যেন লেখকের আত্মদর্শন বা সমাজদর্শন। এই সমাজচিন্তা থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল সামগ্রিক স্বদেশচিন্তা। পরিণামে সমাজচিন্তা এবং সমাজের ইষ্টসাধনের সংকল্পের সঙ্গে সমাজদর্শনের অর্থাৎ দেশপ্রীতির সঙ্গে বিশ্বপ্রীতির সামঞ্জস্য খুঁজে পেয়েছিলেন বঙ্কিম। কিন্তু সে সামঞ্জস্য পরবর্তী পর্যায়ে ; তার আগে লক্ষ্য করা প্রয়োজন, শিল্পিতরূপে তাঁর স্বদেশচিন্তার প্রকাশগুলি। 'ত্রয়ী' সেই শিল্পরূপ। বস্তুত, 'ত্রয়ী' অর্থাৎ 'আনন্দমঠ' 'দেবী চৌধুরানী' ও 'সীতারাম'—এই

উপন্যাসত্রয়ের অনুপম শিল্পরূপে বঙ্কিমের দেশভাবনা আবেগময়। এই আবেগেই আনন্দমঠে মাতৃমন্দির প্রতিষ্ঠা করে তিনি মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন 'বন্দেমাতরম্'। লক্ষণীয় এই, কমলাকান্তের 'আমার দুর্গোৎসব'-এ যে বুকফাটা কান্না ও প্রার্থনা ধ্বনিত হয়েছিল, 'আনন্দমঠ'-এর আদর্শকল্পনায় তাই যেন আশাবাদী হয়ে ধ্যান-গোচর করেছিল—'মা যা হইবেন'। এইভাবে বঙ্কিমের স্বদেশচিন্তার শিল্পিতরূপ সমগ্র বাংলাদেশের এবং কিছুকাল (৩টি দশক) পরে সমগ্র ভারতবর্ষের হৃদয়ে দেশজননীর চিন্ময়ীসত্তার প্রতিষ্ঠা করেছিল।

অতঃপর শেষ পর্বে (শান্তিপর্বে) বঙ্কিম যেন শান্ত-আবেগ, সংহত-চিত্ত, সমাজ-সংগঠকের ভূমিকায় আবির্ভূত। ইতিপূর্বে 'ত্রয়ী'-তে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশচিন্তার একটি অভিনব অবদান ছিল গীতাকে রাজনৈতিক আন্দোলনের উদ্দীপনী আদর্শরূপে ব্যবহার অর্থাৎ রাজনীতিকে গীতার নিষ্কাম কর্মের উপর স্থাপনের প্রয়াস। এবার শান্তিপর্বে তাঁর আদর্শবাদী সংগ্রাম সমাপ্তির পথে এসেছে; 'ধর্ম্মতত্ত্ব'-এর সমন্বয়বাদে বঙ্কিম যেন শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের মত সমগ্রজীবনের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছেন। তাঁর অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে কষা স্বদেশচিন্তা—যা সমাজ, ব্যক্তি, রাষ্ট্র, মানবজীবন এবং ধর্মাচরণকে একটি পূর্ণ বৃত্তে বলয়িত করেছে, তার কেন্দ্রে আছে স্বদেশপ্রীতির অমৃত। তাই তাঁর স্বদেশচিন্তার পরিণত সিদ্ধান্ত—"সকল ধর্ম্মের উপরে স্বদেশপ্রীতি, ইহা বিস্মৃত হইও না।"

আবার একথাও আমরা বিস্মৃত হতে পারি না যে এই স্বদেশচিন্তায় বঙ্গ-প্রীতির আবেগ ভারতপ্রীতি এবং ভারতবোধ সৃজনের অনুকূল প্রয়াস করেছে। এই ভারতপ্রীতি অথবা স্বদেশপ্রীতি অবশেষে 'জগৎপ্রীতির' দিগন্তে প্রসারিত হতে পেরেছে।

মোট কথা, উনবিংশ শতাব্দীর নানা মনোদ্বন্দ্বের একটি সুসমন্বিত বিশ্বাস-প্রতিষ্ঠার প্রয়াস করেছেন বঙ্কিম, তথাপি তাঁর স্বদেশভাবনাতেও কিছুটা আপাত স্ববিরোধিতা থেকে গেছে। 'আনন্দমঠ'-এর শেষে যে মানসদ্বন্দ্ব, যা সত্যানন্দের আক্ষেপ এবং মহাপুরুষের সান্ত্বনা—লক্ষ্য করা যায় তা যেন একই বঙ্কিমের দুটি সত্তার অভিব্যক্তি। এই দ্বন্দ্ব শতাব্দীর মানসদ্বন্দ্ব, 'বড় ইংরেজ' ও 'ছোট ইংরেজ'-এর পক্ষে ও বিপক্ষে সমর্থন ও বিরোধিতার রূপে রবীন্দ্রনাথের যুগেও তা উপলব্ধি করা যাবে। তবে মনে হয় 'আনন্দমঠ'-এর শেষ অধ্যায়ে মহাপুরুষের মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিতে বাস্তব রাজনীতিকে উপলব্ধি করেছেন। তাই তিনি দেশপ্রেম সঞ্চার করেও তাৎক্ষণিক বিপ্লব

কামনা করলেন না। আরও মনে হয়, ইংরেজ-সহযোগিতায় জাতি-সংগঠনের সম্ভাবনা তাঁর লেখনীকে উচ্ছ্বাসমুক্ত ও সংযত এবং সিদ্ধান্তকে দৃঢ়তর করেছে।

যদিও বঙ্কিম সমাজের সংস্কার কামনা করেছেন, কখনও বা অনেকটা অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছেন 'সাম্য' 'বঙ্গদেশের কৃষক' ইত্যাদি রচনার যুগে, কিন্তু বিপ্লবের পথে কোন সমাধান তিনি কামনা করেন নি। এদিক দিয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত নির্ভুল। "সম্পূর্ণ সংশোধন কালসাপেক্ষ" (সাম্য), কিম্বা "সমাজ বিপ্লব অনেক সময় আত্মপীড়ন মাত্র। বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী।"—এই কালে বঙ্কিমের উদ্দেশ্যই ছিল দেশবাসীকে স্বদেশপ্রেমের ধর্মে দীক্ষিত করা, কিন্তু এজন্য সশস্ত্র বিপ্লবের তাৎক্ষণিক প্রয়োজন তিনি স্বীকার করেন নি। সন্দেহ নেই, বঙ্কিমের স্বদেশচিন্তার মধ্যে যে অভূতপূর্ব সংযম, তাঁর সংগঠনমূলক লক্ষ্য এবং সিদ্ধান্তে যে অস্খলিত নিষ্ঠা দেখা যায় তা সে-যুগের পরিপ্রেক্ষিতে অনন্য। কোন সামাজিক অসাম্য অথবা রাজনৈতিক অবিচার তাঁকে সঠিক পথ নির্ধারণ করতে কখনও বিচলিতচিত্ত আবেগবিহ্বল করে আত্মহননের পথে ডাক পাঠায় নি।

বঙ্কিমের স্বদেশচিন্তার আর-একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, তা হল, 'ত্রয়ী' অর্থাৎ 'আনন্দমঠ'-'দেবী চৌধুরানী'-'সীতারাম' রচনার সময় হতেই বঙ্কিমমানসে 'Neo-Hindu-Revivalism'-এর একটি সূক্ষ্ম সম্পাত বিদ্যমান। হিন্দুত্ব পুনর্জাগরণের কিছু প্রভাব যে বঙ্কিমের গীতোক্ত নিষ্কাম-ধর্ম প্রচারের মধ্যে বিদ্যমান, একথা একেবারে অস্বীকার করা চলে না। 'সীতারাম' ও 'রাজসিংহে' বঙ্কিম এর জন্য সুস্পষ্ট কৈফিয়ৎ দিলেও ভারতের মুসলিম-সাম্প্রদায়িকতামূলক একটি বিরোধী মনোভাবের সূচনা পরবর্তী কালে হয়েছিল বলে মনে হয়। তবে এ-ব্যাপারটি গভীরভাবে যথাযথ বিচারের অপেক্ষা রাখে।

লক্ষ্য করা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র যেন শেষপর্বে স্বদেশবাসী সম্পর্কে কিছুটা নৈরাশ্য-পীড়িত হয়েই 'ধর্ম্মতত্ত্ব'-এর আদর্শলোকে স্বদেশচিন্তাকে ঊর্ধ্বায়িত করেছেন। তাই তাঁর আদর্শান্বিত দেশপ্রীতি, মানবপ্রীতি ও বিশ্বপ্রীতিতে ওতপ্রোত হয়ে 'ধর্ম্মতত্ত্ব'-এর আধ্যাত্মিকতায় উত্তীর্ণ হয়েছে।

বঙ্কিম গুরু-শিষ্যের কথোপকথনের মাধ্যমে স্পষ্ট বলেছেন—

> আমি তোমাকে যে দেশপ্রীতি বুঝাইলাম, তাহা ইউরোপীয় Patriotism নহে। ইউরোপীয় Patriotism একটা ঘোরতর পৈশাচিক পাপ!

এই উক্তি থেকেই বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রীতি বা 'Patriotism'-এর স্বরূপটি উপলব্ধি করা যায়। বঙ্কিম সেকালেই ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদের স্বরূপ অর্থাৎ স্বজাতি ও স্বদেশের স্বার্থে পররাজ্যগ্রাস এবং ঔপনিবেশিক শোষণ যে কত

নির্মম, তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই উক্ত 'পৈশাচিক পাপ' কে তিনি সমর্থন করেন নি। এবং এই কারণেই তিনি স্বদেশপ্রীতি ও বিশ্বপ্রীতির সামঞ্জস্যে স্বাভাবিক ভাবে এসে পৌঁছেছেন।

সবচেয়ে বড় কথা এই, স্বদেশপ্রীতিকে ধর্মতত্ত্বের অঙ্গীভূত করে বঙ্কিমচন্দ্র স্বদেশধর্মকে একটি 'creed'-এ পরিণত করেছেন। এ শুধু তৎকালীন ভারতবর্ষেই অভিনব ছিল না, আজও তার বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য অপরিসীম। পরবর্তী কালে বিবেকানন্দ, অরবিন্দ ও আরও পরে গান্ধীজী পর্যন্ত এই পথেই ধর্মতত্ত্ব ও দেশপ্রীতিকে একই ভূমিতে স্থাপনের প্রয়াস করেছেন। যথাস্থানে বিস্তৃত বিশ্লেষণে প্রকাশ পাবে, বঙ্কিমের শেষ সিদ্ধান্ত এই যে, 'অনুশীলন তত্ত্ব' উপলব্ধি করলে ঈশ্বরে ভক্তি এবং তদনুযায়ী স্বদেশপ্রীতি উদ্‌ঘারিত হবে। তথাপি মনে হয় পরিণামে তাঁর স্বদেশচিন্তা ভক্তিতে সিক্ত হয়ে অনেকটা দার্শনিকতত্ত্বে পর্যবসিত হতে চলেছে।

অতঃপর বঙ্কিমচন্দ্রেরই উত্তরাধিকার গ্রহণ করে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশপ্রীতিকে নতুনখাতে বইয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন, সেই নতুন খাতটি প্রথম পর্যায়ে 'স্বদেশী সমাজ' সংগঠনের পথে, পরবর্তী পর্যায়ে 'ভারততীর্থ' প্রতিষ্ঠার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে।

চতুর্থ অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তার উৎস, বিবর্তন ও বৈশিষ্ট্য

> বৃহৎ ভারতবর্ষ গড়িয়া তুলিবার জন্যই আমরা আছি, মহা ভারতবর্ষ গঠনের এই ভার আজ আমাদের উপর পড়িয়াছে⋯সেই ভারতবর্ষ সমস্ত মানুষের ভারতবর্ষ।[১]

কবি রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনব্যাপী স্বদেশচিন্তায় বৃহৎ ভারতবর্ষ এবং সমস্ত মানুষের ভারতবর্ষ গড়ে তোলার স্বপ্ন ও সাধনা ওতপ্রোত ছিল। কবির এই সাধনার উৎস ও বিবর্তন অনুসরণ করতে গেলে প্রথমেই মনে আসে রবীন্দ্র-প্রতিভার অভ্যুদয় যেন 'তিমির বিদার উদার অভ্যুদয়', প্রকাশ যেন সূর্যের মতন। বঙ্কিম-প্রতিভাকে যদি বলি জাহ্নবী-যমুনা বিগলিত করুণা ধারা, যা জাতির মানসমরুতে রসসঞ্চার করেছে; রবীন্দ্র-প্রতিভাকে তবে বলতে পারি সূর্যসারথি, যার আলো ও উত্তাপে রসসিঞ্চিত মানসভূমি ফুলে ও ফসলে ভরে উঠেছে। তাই বুঝি তাঁর কাব্যে-গানে অজস্র অসংখ্য উপমা চিত্রকল্পে সূর্য শব্দ আর সাবিত্রীমন্ত্র আপনি ধ্বনিত। কবিপ্রতিভার নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ লগ্নেও প্রাণের পরে রবির কর প্রবেশ করেছে আর জীবন পরিক্রমার সমাপ্তিতেও দিবসের শেষ সূর্য তার কাছে শেষ প্রশ্ন উচ্চারণ করেছে। তাই বুঝি কবির অসংখ্য গানের আকুতি শুনেছি—'আলোকের এ ঝর্ণাধারায় ধুইয়ে দাও', কতবার কবির তৃপ্ত উচ্ছ্বাসে ধ্বনিত হয়েছে 'আলোয় আলোময় করে হে এলে আলোর আলো'। কখনও মন্দ্রিত হয়েছে কবির দৃপ্ত প্রার্থনা—

> ঘন অশ্রু বাষ্পে ভরা মেঘের দুর্যোগে খড়্গ হানি ফেলো ফেলো টুটি।
> হে সূর্য, হে বন্ধু মোর জ্যোতির কনক পদ্মখানি দেখা দিক ফুটি।

সত্যিই রবি-কবি বাংলা সাহিত্য গগনে সূর্যসারথি, ভারতের জাতীয় জীবনের 'আবিঃ' যিনি উচ্চারণ করতে পেরেছেন 'অপাবৃণু'।

স্বদেশচিন্তার দিগন্তে এই সাবিত্রী সখার পরিক্রমা এবং প্রহরে প্রহরে তার নব নব দিগন্ত উন্মোচন অনুধাবন করতে গেলে কবি বর্ণিত সেই বিখ্যাত জাপানী চিত্রটি মনে হয়—

> ⋯একটি অন্ধ, এক গাছ, এক সূর্য, আর সোনায়-ঢালা এক সুবৃহৎ আকাশ—

…কেবল অন্ধ মানুষের নয়, অন্ধ প্রকৃতির এই প্রার্থনা 'তমসো মা জ্যোতির্গময়' সেই গ্রাম গাছের একাগ্রপ্রসারিত শাখাপ্রশাখার ভিতর দিয়ে জ্যোতির্লোকের দিকে উঠছে। —জাপানযাত্রী

কি জানি কেন মনে হয়, কবি-সমকালীন ভারতবর্ষ বোধহয় কবিপ্রতিভার আলোর বন্যাতেও এমনি অন্ধ ছিল। আজ অনেক আঘাতে ঘুম ভেঙেছে আমাদের, চোখ মেলে সেই আলোর পরিমাপ করতে চলেছি যে দর্শনে সেই দর্শন তাঁরই আলোয় উদ্ভাসিত।

রবীন্দ্রনাথের সারা জীবনের সাধনা ছিল ভারতীয় সংস্কৃতির পুনর্জাগরণ যা ব্যক্তিমানসের মুক্তিতে ও সমাজমানসের মুক্তিতে প্রোজ্জ্বল আর সেই জাগৃতি, সেই মুক্তি হবে বৃহত্তর বিশ্বের আকাশে। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তার উৎস ও বিবর্তন অনুসরণকালে ঐ সত্যটি মনে রাখতে হবে।

এক.

রবীন্দ্র-জীবনের প্রথম তিনটি দশক বঙ্কিমের সাহিত্য-জীবনের 'প্রস্তুতি পর্ব' 'সংগ্রামপর্ব' ও 'শান্তিপর্বের' সমকালীন। যেকালে 'বঙ্গদর্শন' জাতিচিত্তে 'মুষলধারে ভাববর্ষণ' করছিল, নানা প্রবন্ধ-উপন্যাসের মাধ্যমে "প্রাণের সহিত ভাবের একটি আনন্দ-সম্মিলন সংঘটন" করে চলছিল এবং যেকালে 'প্রচার' পত্রিকায় 'অনুশীলন তত্ত্ব' ব্যাখ্যাত হয়ে চলেছিল—সে-কালটিতে কবির কাব্য-কমলে অতি ধীরে মধু সঞ্চিত হয়ে উঠছিল। 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২খ্রীঃ) প্রকাশ-কাল হতে 'সাধনা'-র (১৮৯১খ্রীঃ) আবির্ভাব-কাল পর্যন্ত এই দুটি দশক রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তার উন্মেষ-পর্ব বলে গণ্য করা যায়।

উক্ত দুটি দশকব্যাপী বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবিসংবাদিত নেতা, সব্যসাচীর মত সংগ্রামশীল রথী। সুতরাং একথা বলা যায়, কাব্যজগতে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠা ঘটেছে সাহিত্যসূর্য বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যাহ্ন প্রতাপকালেই। এমনকি তৎকালীন প্রবীণ সাহিত্য-নেতা বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে লেখনীযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন উদীয়মান কবি রবীন্দ্রনাথ, এবং অবশেষে তাঁদের আদর্শগত বিবাদের নিষ্পত্তিও ঘটেছে। এদিকে বঙ্কিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কোন কোন মহতী সভায় সামাজিক, রাজনৈতিক ও শিক্ষাসমস্যামূলক প্রবন্ধ পাঠ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। অতঃপর কবি যখন 'সোনার তরী'

(১৮৯৩-৯৪ খ্রীঃ) কাব্যের রোমান্টিক সৌন্দর্যলোক রচনায় নিমগ্ন, তখনই বঙ্কিমের তিরোধান ঘটে। তাই বলা চলে বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য-ক্ষেত্র হতে বিদায় নেবার কালে দেখে যেতে পেরেছিলেন নূতন যুগের সারথি প্রস্তুত এবং তাঁর ললাটে তাঁরই আশীর্বাদী জয়-তিলক।

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তার উৎস নিরূপণে বৃহত্তর সামাজিক পরিবেশ বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না, এই প্রসঙ্গে তাঁর পারিবারিক পটভূমিটি তুলে ধরাই যথেষ্ট। তদানীন্তন বৃটিশ-ভারতের রাজধানী কলকাতা ছিল পুনরুজ্জীবন যুগের কেন্দ্র। আর জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িকে কলকাতার সাংস্কৃতিক উজ্জীবনের পীঠস্থান বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার উন্মেষ এই পরিবারে। কবির আত্মকথায় এই পারিবারিক পরিবেশটি সুন্দর ফুটে উঠেছে—

> আমাদের পরিবার আমার জন্মের পূর্বেই সমাজের নোঙর তুলে দূরে বাঁধাঘাটের বাইরে এসে ভিড়েছিল। আচার অনুশাসন ক্রিয়াকর্ম যেখানে সমস্তই বিরল।

অর্থাৎ পুরাতনকাল বিদায় নিয়ে নূতনকাল সদ্য এসে নেমেছে এখানে। এই সন্ধিক্ষণে উনিশ শতকের নবজাগরণের সবগুলি ধারা ঠাকুরবাড়ির মোহনায় এসে মিলেছিল, ইউরোপীয় দর্শন-সাহিত্যজাত নব নব উন্মেষ ও বুদ্ধিদীপ্ত প্রাণোচ্ছলতা এবং ভারতীয় ঐতিহ্যপুষ্ট ঔপনিষদিক প্রশান্তি ও উদারতা জোড়াসাঁকোতে এসে জোড় মিলিয়েছিল। পূর্ব ও পশ্চিমের এই মিলনক্ষেত্রেই রবীন্দ্রচেতনার উন্মেষ ঘটেছে।

জোড়াসাঁকোতে সদ্য আগত আধুনিক প্রাণবন্যার মাঝে ভারতীয় ঐতিহ্য এবং ঔপনিষদিক আধ্যাত্মিকতার প্রতীকরূপে বিরাজ করছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। এদিকে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র দার্শনিক-কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ 'স্বপ্নপ্রয়াণ' রচনায় মগ্ন, ওদিকে স্ত্রী-স্বাধীনতার অত্যুৎসাহী সমর্থক বিলাতফেরৎ সত্যেন্দ্রনাথ এবং আধুনিক যুবক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অন্তঃপুরেও স্বাধীনতার হাওয়া বইয়ে দিয়েছেন। মোট কথা বাঙালির সমাজে ও সংস্কারে যে নবীন প্রাণের উচ্ছ্বাস লেগেছিল তার আনন্দে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুত্রকন্যারা 'নূতন যুগের ভোরে' জেগে উঠেছিলেন,—জাগিয়ে তুলেছিলেন পরিবেশকে—'সময় বিচার করে' বৃথা কাল কাটান নি। কাব্য-নাটক-গীতি-উচ্ছ্বাসে ভরা ঠাকুরবাড়ি কবি রবীন্দ্রনাথের কেবলমাত্র কাব্যপ্রতিভারই উৎস নয়—স্বদেশচিন্তারও উৎস। কবি স্বয়ং লিখেছেন—

বাংলার আধুনিক যুগকে যেন তাঁহারা সকল দিক দিয়াই উদ্‌বোধিত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। বেশে-ভূষায় কাব্যে-গানে চিত্রে-নাট্যে ধর্মে-স্বাদেশিকতায়, সকল বিষয়েই তাঁহাদের মনে একটি সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ জাতীয়তার আদর্শ জাগিয়া উঠিতেছিল। —জীবনস্মৃতি

এই সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ জাতীয়তার আদর্শ ঠাকুরবাড়িতে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ-ভাবনাকে শিশুকাল হতেই পুষ্ট করেছে।

এদিকে গগনেন্দ্রনাথ, গুণেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সেই নাট্য-গীতি সম্মেলন, তৎকালীন বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী-গুণিগণের আসা-যাওয়া আলাপ আলোচনায় মুখরিত ঠাকুরবাড়ির বৈঠকখানার অপূর্ব পরিবেশ কিশোর কবি-মনকে সাহিত্য-শিল্পের সস্নেহ আলোকে ও উত্তাপে পুষ্পিত করে তুলেছে।

একদিকে পিতৃদেব দেবেন্দ্রনাথের দূরবাসী ব্যক্তিত্ব-প্রভাব, বড়দা দ্বিজেন্দ্র-নাথের দার্শনিকতা ও কবিপ্রাণতা, 'ভাই মেজদার' শ্রদ্ধেয় সখ্যতা, নতুনদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রীতিরসে ভরা সহযোগিতা আর অন্যদিকে ন'দিদির 'ভারতী'-র আসর ও বধূঠাকুরানীর স্নেহ-প্রীতি রবীন্দ্রনাথের এই পরিজন-পরিবেশ অপূর্ব। রবীন্দ্র-মানসবিকাশে পরিজন-পরিবেশের এই প্রভাবটি ড. সুকুমার সেন তাঁর 'রবীন্দ্রবিকাশ' গ্রন্থে বিস্তৃত বিশ্লেষণ করেছেন তথ্যযোগে।

সেযুগে ভারত-সাম্রাজ্যের রাজধানী কলকাতা ছিল তৎকালীন আলোক-প্রাপ্ত বাঙালির বিদগ্ধ ব্যক্তিবর্গের মিলনপীঠ আর এই মিলনপীঠের সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতির আসনখানি বুঝি পাতা হয়েছিল জোড়াসাঁকোর এই ঠাকুরবাড়িতে। তাই এখানে গগনেন্দ্র-গুণেন্দ্রের নাট্য-সংগীতের আসরে, জ্যোতিরিন্দ্র-রবীন্দ্র-এর যুগ্ম সংগীত-সাধনায়, স্বর্ণকুমারী-ইন্দিরা-প্রতিভা-সরলা প্রমুখ বিদুষীদের সহযোগিতায় 'বিদ্বজ্জন সমাগম' হত। কখনও বৌঠাকুরানীর 'সাধের আসনে' বসে কবি বিহারীলাল 'সারদামঙ্গল' শোনাতেন, কখনও বা 'বাল্মীকিপ্রতিভা' কিম্বা 'কালমৃগয়া'-র অভিনয় দেখে বঙ্কিমচন্দ্র, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ মনীষীবৃন্দ মুগ্ধ হতেন। এখানে এই ভারতীয় ঐতিহ্য আর পাশ্চাত্য জীবনধর্মের কলাসঙ্গমে "ভারত আত্মার বাণীমূর্তি" রূপে রবীন্দ্রনাথ বিন্দু বিন্দু করে পুষ্টি ও তুষ্টি আহরণ করে গড়ে উঠেছিলেন।

বাস্তবিকই এখানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভাব-সম্মিলন ও সাঙ্গীকরণ চলছিল। বাঙালি মানসে স্বদেশচিন্তার 'আনন্দমঠ' প্রতিষ্ঠার পূর্বেই এ-বাড়ির প্রাঙ্গণে 'হিন্দু মেলা' বা 'চৈত্র মেলার' সূচনা হয়েছিল (১৮৬৭ খ্রীঃ) এবং বিপ্লব সাধনার দীক্ষাদানের 'রিহার্সাল' বা মহড়া চলেছিল। এখানে ঐ মহড়া বা রিহার্সাল

শব্দটিই যথার্থ বলে মনে হয়। অর্থাৎ জাতীয় মহাসভার (কংগ্রেসের) রঙ্গমঞ্চেও অভিনয়ের পূর্বে ঠাকুরবাড়ির সৌখিন বৈঠকখানায় "হিন্দু মেলা"র মহড়া আর অরবিন্দের সন্ত্রাসবাদী সমিতির কার্যকলাপের বহুপূর্বে তাঁরই মাতামহ রাজনারায়ণের সভাপতিত্বে চলছিল "সঞ্জীবনী সভা"র মহড়া। এদিকে যদিও পরিবারে "অনেক বিদেশীপ্রথার চলন ছিল কিন্তু…পরিবারের হৃদয়ের মধ্যে একটা স্বদেশাভিমান স্থির দীপ্তিতে জাগিতেছিল।" পিতা দেবেন্দ্রনাথের আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল ধ্রুবতারার মত যা সমগ্র পরিবারে সঞ্চার করেছে স্বদেশপ্রেম এবং ফলে সেখানে দেশের ভাষা ও ভাবের চর্চা হয়েছে স্বতোচ্ছ্বাসিত অনুরাগে। আবার "ন্যাশন্যাল" নবগোপালের উৎসাহে "হিন্দু মেলা"র সূচনা এই পরিবারে একটা নতুন আবেগ এনে দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ বর্ণনা দিয়েছেন—

> ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা সেই প্রথম হয়। মেজদাদা সেই সময়ে বিখ্যাত জাতীয় সংগীত "মিলে সবে ভারত সন্তান" রচনা করিয়াছিলেন। এই মেলায় দেশের স্তবগান গীত, দেশানুরাগের কবিতা পঠিত, দেশী শিল্প ব্যায়াম প্রভৃতি প্রদর্শিত ও দেশী গুণীলোক পুরস্কৃত হইত। —জীবনস্মৃতি

উক্ত হিন্দুমেলার উদ্দেশ্য রবীন্দ্রনাথেরই ভাষায় বলা যায়—

> স্বজাতীয়দিগের মধ্যে সদ্ভাবস্থাপন করা ও স্বদেশীয় ব্যক্তিগণ দ্বারা স্বদেশের উন্নতিসাধন করাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। —জীবনস্মৃতি

এই হিন্দুমেলার নবম অধিবেশনে পার্শীবাগানের মেলায় কিশোর কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম স্বাদেশিক কবিতা পাঠ করেন 'হিন্দুমেলার উপহার'। সেদিন শ্রোতৃবর্গের মধ্যে কবি নবীনচন্দ্রও উপস্থিত ছিলেন। এরপর উক্ত মেলার একাদশ অধিবেশনে পঠিত (১৮৭৭ খ্রীঃ) 'দিল্লী দরবার' কবিতায় কবির আহ্বান ছিল—"এসো গো আমরা যে কজন আছি, আমরা ধরিব আর এক তান।" বাস্তবিকই সেদিন ঠাকুরবাড়ির কয়েকজন আরেকতান ধরেছিলেন। আর ছিল জ্যোতিদাদার উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত "হাঞ্চুপামুহাফ্" এবং তাতে ঋক্-মন্ত্রে দীক্ষা দিতেন[২] রাজনারায়ণ। উত্তেজনার আগুন-পোহানো সভায় যে রিহার্সাল চলত তাতে কবি গাইতেন—

> একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন।

কখনও-বা এই পরিবারের স্বাদেশিকতা-সাধনার উদ্ভট পরিকল্পনা ও কর্ম প্রচেষ্টা, যথা সার্বজনীন পোশাক প্রচলন, স্বদেশী দেশলাই-এর কারখানা কিংবা কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা অথবা জাহাজের খোল কিনে সর্বস্বান্ত হওয়ার উত্তেজনা ও

ব্যর্থতা কবির স্মৃতিচারণাতে হাস্যকর ও করুণ হয়ে উঠেছে। তবু সেই আপাতব্যর্থ প্রয়াসের মধ্যেই বাঙালির নবোদ্ভূত স্বদেশচেতনার কার্যকরী প্রকাশের সূচনা ঘটেছে।

লক্ষ্য করা যায়, কিশোর রবীন্দ্রনাথ দেশাত্মবোধক কবিতাগুচ্ছের মাধ্যমে সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। বস্তুত পরাধীন দেশের কবিদের এই পথেই প্রথম যাত্রী হতে হয়,—তাঁরাই সবদেশে একসূত্রে সহস্রটি মন বেঁধে দেন বাণীর রাখীতে। কবি রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও তা লক্ষণীয়; 'ভারতী' মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত কবির কৈশোরক রচনা--"তোমারি তরে মা সঁপিনু"—সঙ্গীতটি পরবর্তী কালের জাতীয় আন্দোলনের চারণ কবির প্রথম উন্মেষ।

অতঃপর স্বদেশচিন্তার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রমানসের বিকাশের মূলে যে প্রভাবগুলি কার্যকরী হয়েছিল সেগুলি অনুসরণ করা যেতে পারে।

বঙ্কিমমানসে পূর্বগামীদের প্রভাব এসেছিল যুগের আলো-হাওয়াতে পরিবারের বাইরে থেকে, আর রবীন্দ্র-মানসে এই প্রভাব এসেছে বহুলাংশে পারিবারিক পরিবেশে। ঠাকুরবাড়ির সংস্কৃতি-মধুচক্রে যে ভাব, আদর্শ ও কল্পনা আহৃত হয়েছিল—রবীন্দ্রনাথ তাই পান করেছেন আশৈশব।

'চারিত্রপূজা'য় উল্লিখিত তিনজন—রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও দেবেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রজীবনে আদর্শ হয়ে প্রতিভাত হয়েছেন। পূর্বগামীরূপে রামমোহনের প্রভাব এসেছে পিতা দেবেন্দ্রনাথের মাধ্যমে, আর বিদ্যাসাগরের কচিৎ সংস্পর্শে কবি এসেছিলেন যৌবনকালে।

> জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির পরিমণ্ডল প্রায় সম্পূর্ণভাবেই দেবেন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের বিকিরণ।···ব্রহ্ম-উপাসনার একটি প্রধান মন্ত্র—উপনিষদের উক্তি 'পিতা নোহসি পিতা নো বোধি'—রবীন্দ্রনাথ যেন নিজে পিতৃদেবের মধ্যে কিছু উপলব্ধি করেছিলেন।[৩]

পুত্রের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চরিত্রগঠনে এই দূরবাসী মহর্ষির দুর্লভ সান্নিধ্য সবচেয়ে বেশি কার্যকরী হয়েছিল। কবিজীবনে উপনিষদের আনন্দবিকিরণও এই উৎস হতে। রামমোহনের ব্রহ্ম-উপাসনা স্বীকার করেও দেবেন্দ্রনাথ অদ্বৈতবেদান্তকে পুরোপুরি মেনে নেন নি। উপনিষদের সত্য ও আনন্দবোধের সঙ্গে শান্ত-রসাস্পদ ভক্তি মিলিয়ে নিয়েছিলেন দেবেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথের অন্তরে এই অধ্যাত্মসম্পদ বিশ্বব্যাপী মধুররসে অভিষিক্ত হয়ে উঠেছিল। দেবেন্দ্রনাথের প্রভাব কবির স্বদেশচিন্তাকে এক অপূর্ব আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যে ভরে তুলেছিল এবং

স্বদেশদেবতাকে "নৈবেদ্যর" ডালি সমর্পণে উদ্বুদ্ধ করেছিল। আর ভারতপথিক রামমোহনের অদেখা ব্যক্তিত্ব-প্রভাব পিতা ও পরিবারের মাধ্যমে কেবল অনুভব করেই ক্ষান্ত হন নি কবি; বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জাগরণের পটভূমিতে রামমোহনকে সত্যের আলোকে প্রতিষ্ঠা করবার মহৎ প্রয়াসও তিনিই প্রথম করেছিলেন 'চারিত্রপূজা' গ্রন্থে। তাই লক্ষ্য করি "মনুষ্যত্বের সাধনা, ভেদবুদ্ধির অহঙ্কার থেকে মুক্তি লাভের সাধনায়"—কবি অজস্র রচনায় এই ভারতপথিকের প্রভাব অনুভব করেছেন।

সেই সময়ের দুই মনীষী বিদ্যাসাগর ও রাজেন্দ্রলালের প্রতি রবীন্দ্রনাথের গভীর শ্রদ্ধা ছিল।

> রবীন্দ্রনাথের মনে বিদ্যাসাগরের প্রতি যে শ্রদ্ধা সঞ্চারিত হয়েছিল তা ব্যক্তি-সংস্পর্শবিহীন।...তিনি আধুনিক কালের দুটি বাঙালীকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়ে গেছেন। একজন তাঁর অদেখা—রামমোহন রায়। আর-একজন তাঁর দেখা—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।[৪]

রাজেন্দ্রলাল কেবল ভাষাতত্ত্ব নয় বৌদ্ধবিদ্যার পথপ্রদর্শক ও ইতিহাস ভাবনার প্রবক্তা রূপেও কবির লেখায় স্বীকৃত হয়ে থাকবেন। এই প্রত্নতাত্ত্বিক ও ইতিহাসচিন্তার উদ্বোধক মনীষীর সুস্পষ্ট প্রভাব আছে কবির ইতিহাসমুখী স্বদেশভাবনায়। ড. সুকুমার সেনের মতে, রবীন্দ্রনাথ-লিখিত 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা'র জন্য আমাদের কৃতজ্ঞতার কিঞ্চিৎ অংশ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রাপ্য।

এদিকে পারিবারিক পরিবেশে দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তার আলোতে নানা রঙের পরশ দিয়েছে, একথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে।

সাহিত্য ক্ষেত্রে দু'জন পূর্বসূরীর প্রতি রবীন্দ্রনাথ বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন তাঁর 'আধুনিক সাহিত্য'-এ। একজন বঙ্কিমচন্দ্র, অন্যজন বিহারীলাল। তিনি দুজনেরই দুর্লভ সংসর্গে এসেছিলেন কিশোর বয়সে নিজ পরিবারের গণ্ডীতে। তারপর যৌবনে সাহিত্য-সাধনক্ষেত্রে, স্বদেশচিন্তার আকাশে রবির পূর্ণ উদয় হয়েছে তখনই যখন 'সাধনা'-পর্বের সমাপ্তিতে কবি কাব্যলক্ষ্মীকে আহ্বান করে বলেছেন, "এবার ফিরাও মোরে" (২৩শে ফাল্গুন, ১৩০০) অর্থাৎ রবির পূর্ণোদয় হয়েছে যখন, পশ্চিমে বঙ্কিমচন্দ্র তখন অস্তগামী। এদিকে বঙ্কিমচন্দ্র ও বিহারীলালের তিরোধান প্রায় পরে পরেই ঘটেছে। (বঙ্কিম-তিরোধান) ২৬শে চৈত্র ১৩০০, (বিহারীলাল) ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০১। স্বভাবতই এই দুই সাহিত্যগুরুর উত্তরাধিকার বর্তেছে কবি রবীন্দ্রনাথে।

'বঙ্গদর্শন' আর 'অবোধবন্ধু' পত্রিকায় প্রবাহিত দুটি বিশিষ্ট ভাবধারার যুগ্ম উত্তরাধিকার নিয়ে 'সাধনায়' রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সাধনার সূত্রপাত এবং 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শন'-এর মধ্যেই তার সার্থক পরিণতি। বিহারীলালের প্রভাব রবীন্দ্রকাব্যে যেটকুই থাক, আমাদের আলোচ্য তা নয়, কিন্তু বঙ্কিমের প্রভাব কবির স্বদেশচিন্তার ক্ষেত্রে যথেষ্ট চর্চার অপেক্ষা রাখে। এ-ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের সার্থক উত্তরাধিকারী।[৫] "বন্দেমাতরম" হতে "জনগনমন অধিনায়কের" রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক ব্যবহৃত শব্দ জয়-সঙ্গীতে যে স্বদেশচিন্তার বিবর্তন উনবিংশ শতাব্দী হতে বিংশ শতাব্দীর জয়যাত্রার সূচনা করেছে—তারই আলোচনাসূত্রে স্পষ্ট উপলব্ধি করা যাবে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব রবীন্দ্রনাথে কতটা কার্যকরী হয়েছে এবং কিরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাত-কুমার মুখোপাধ্যায় এ-সম্পর্কে বলেছেন—

> আলোচনা হইলে দেখা যাইবে বহু বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমকে অনুবর্তন করিয়া তাঁহার আরব্ধ কার্য সংচালিত করিয়াছিলেন।...একথা নিশ্চিত যে সাহিত্যের মধ্য দিয়া দেশপ্রীতি-উদ্‌বোধন বিষয়ে উভয়ে সমধর্মী।
>
> —রবীন্দ্রজীবনী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৪

দেখা গেল, রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তার উন্মেষ এবং তার বিকাশে পূর্বসূরীদের প্রভাব পারিবারিক পরিবেশেই অনেকটা ঘটেছে। এবার লক্ষ্য করা যাবে, কিছু পাশ্চাত্ত্য প্রভাবও কবির চিন্তাশক্তিকে প্রভাবিত করেছে; আর এই প্রভাব প্রধানত কৈশোর ও যৌবনে কিছুকাল সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মাধ্যমে এসেছে ঐ একই পরিবেশে। রবীন্দ্রনাথের নিজের কথায়—

> আমি যখন জীবন আরম্ভ করেছিলুম তখন ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে এই বাহ্য আচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেশের শিক্ষিত মনে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। এই সদাচারের স্থলে সভ্যতার আদর্শকে আমরা ইংরেজ জাতির চরিত্রের সঙ্গে মিলিত করে গ্রহণ করেছিলুম।...আমি সেই ভাবের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলুম। এবং সেই সঙ্গে আমাদের স্বাভাবিক সাহিত্যানুরাগ ইংরেজকে উচ্চাসনে বসিয়েছিল।

অর্থাৎ তাঁর জীবনের প্রথম ভাগে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব এসেছে সাহিত্যানুরাগের পথে, স্কুল-কলেজের বিদ্যায় নয়। এ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি'তে সাহিত্য-দীক্ষাদাতা অক্ষয় চৌধুরী মহাশয়ের কথা আছে। আর আছে ইংরেজি সাহিত্য-চর্চার বন্ধু লোকেন পালিতের উল্লেখ। "তখনকার দিনে আমাদের সাহিত্যদেবতা ছিলেন শেক্‌স্‌পীয়র মিল্‌টন ও বায়রন।" হৃদয়াবেগের

প্রবলতা, "ইউরোপীয় চিত্তের চাঞ্চল্য" যা সেখানকার ইতিহাস হতে সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে—তার উন্মাদনা কবিকে দোলা দিয়েছে। আবার—

> তখনকার কালের য়ুরোপীয় সাহিত্যে নাস্তিকতার প্রভাবই প্রবল। তখন বেন্থাম, মিল ও কোঁতের আধিপত্য।···ইহাকে আমরা শুদ্ধমাত্র একটা মানসিক বিদ্রোহের উত্তেজনারূপেই ব্যবহার করিয়াছি। নাস্তিকতা আমাদের একটা নেশা ছিল। —জীবনস্মৃতি

অতঃপর কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিলগ্নে বিলাতপ্রবাসকালে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ওদেশের সংস্কৃতির পরিচয় ভালোয় মন্দয় মিশিয়ে রবীন্দ্রনাথের মনে ছাপ ফেলেছিল। বঙ্কিমের মনে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব পড়েছিল ইংরেজি শিক্ষা ও স্বাধ্যায়ের মাধ্যমে দর্শন-ইতিহাস চর্চায়। আর রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি সাহিত্য আস্বাদ করেছেন, ইংরেজির মাধ্যমে ইউরোপীয় চিত্তের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন[৬] এবং পাঁচবার ইউরোপ ভ্রমণ করে ওদেশের মনীষীদের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসেছেন। এরই ফলে ইউরোপীয় চিত্তমুক্তির স্বাভাবিক প্রকাশ তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। তাই পরিণত বয়সে তৃতীয়বার ইউরোপ ভ্রমণ (১৯১২ খ্রীঃ) কালে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> য়ুরোপেরও একটা ভিতর আছে, তাহারও একটা আত্মা আছে, এবং সে আত্মা দুর্বল নহে।
>
> য়ুরোপের সেই আধ্যাত্মিকতাকে যখন দেখিব তখনই তাহার সত্যকে দেখিতে পাইব—তখনই এমন একটি পদার্থকে জানিতে পারিব যাহাকে আত্মার মধ্যে গ্রহণ করা যায়, যাহা কেবল বস্তু নহে যাহা কেবল বিদ্যা নহে, যাহা আনন্দ। —যাত্রার পূর্বপত্র, 'পথের সঞ্চয়'

বেশ বোঝা যায়, পাশ্চাত্ত্যের জঙ্গমশক্তি ও গতিবাদে মুগ্ধ রবীন্দ্রনাথ ওদের গভীর জীবনপিপাসাকে অনুভব করেছেন। 'বলাকা'র যুগে তিনি যে নবযৌবনের গান গেয়েছেন—স্বদেশের চিত্তে তারই বাণী দুর্বার জীবনসাধনায় ডাক দিয়েছে।[৭]

ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি ইউরোপ হতে উনিশ শতকের অবদান মানবমুক্তি ও বিশ্বমৈত্রীর বাণী—তৎকালের বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজ গ্রহণ করেছিল। এই বোধে উদ্বুদ্ধ দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মিলন-সাধনার যে ব্রত গ্রহণ করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ সেই সাঙ্গীকরণ ও সমন্বয়-সাধনাকে আরও সাফল্যের দিকে অগ্রসর করে দিয়েছিলেন।

কবির পত্রগুচ্ছে তাই ইউরোপকে ভাল লাগার কথা বহুবার উল্লিখিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র পঠিত সাহিত্যের মাধ্যমেই নয়, পাশ্চাত্ত্য ভ্রমণের দ্বারাও ওদেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও চিত্তশক্তির এবং ওদেশের সঙ্গীত-কলা-সাহিত্যের আস্বাদ পেয়ে ঠিক যেন জৈবিক শক্তিতে ওদেশের প্রাণকণিকাগুলি গ্রহণ করেছেন নিজের বোধিতে। একই সময়ে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব রবীন্দ্রমানসে বহু মনীষীর সংস্পর্শের ফলেও সাঙ্গীকৃত হয়েছে। শিল্পী রোদেনস্টাইন, কবি ইয়েট্স এবং ইংলণ্ডের অন্যান্য কবি-লেখক-গোষ্ঠী, ইউরোপের মনীষীবৃন্দ যথা, ফরাসি মনীষী সিলভাঁ লেভি, ফরাসি দার্শনিক ও সাহিত্যিক রমাঁ রলাঁ, আঁদ্রে জিদ, এমনকি তাঁর সঙ্গী এলম্‌হার্স্ট ও এণ্ডরুজ প্রমুখের দুর্লভ সঙ্গ তাঁর স্বদেশ-ভাবনাকে অতি ধীরে এক উদারতর বিশ্বমানবতার পথে এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করেছে। রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন ও তার অনেকখানি সাফল্য, জাপানের বিজ্ঞানের উন্নতি কবিকে ক্রমেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের 'শিক্ষার মিলনের' জন্য উদ্বুদ্ধ করেছে।

একই সঙ্গে একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন, রবীন্দ্রনাথ যেমন পাশ্চাত্ত্যের প্রাণশক্তি বিজ্ঞান-সাধনা প্রভৃতিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে গ্রহণ করেছেন, তেমনি ওদেশের লক্ষ্মীশ্রীর পরিবর্তে কুবেরত্বের প্রতি লোভ, যান্ত্রিকতার প্রচণ্ড উন্মত্ততা প্রভৃতি বিকৃতিগুলি সমর্থন করেন নি; বরং নানা স্থানে এর প্রতি বিরূপতা প্রকাশ করেছেন। এই পাশ্চাত্ত্য-ভ্রমণ কালেই ইউরোপীয় 'ন্যাশন্যালিজম্'-এর চরম বিকৃত পরিণতিও কবি লক্ষ্য করে এসেছেন এবং শেষ জীবনে যে সংকীর্ণ জাতীয়তাকে ধিক্কার দিয়েছেন 'সভ্যতার সঙ্কট'-এ (১৯৪১)—সেও ঐ পাশ্চাত্ত্য সম্পর্কে বহু অভিজ্ঞতা-লাভ ও বহু চিন্তার পরে।

তাই বলা চলে প্রথম জীবনে পাশ্চাত্ত্য প্রভাবে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তা প্রচণ্ড প্রাণশক্তিকে গ্রহণ করেছে, আর শেষ জীবনে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের সমন্বয় সাধনা পাশ্চাত্ত্য ভ্রমণের অভিজ্ঞতা গ্রহণ করে সিদ্ধিলাভ করেছে।

'কালান্তর' প্রবন্ধাবলীতে কবির স্বদেশচিন্তার এই বিবর্তনের অভিব্যক্তি পাওয়া যাবে। এ-প্রসঙ্গে ১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দে অধ্যাপক গিলবার্ট মারেকে লিখিত একটি পত্রে কবি স্বীকার করেছেন, তিনি নিজেও স্বদেশের ঐতিহ্য-পুষ্ট পরিণত মন নিয়েই বিদেশের ভাবসম্পদকে গ্রহণ ও সাঙ্গীকরণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তা সুদীর্ঘকাল ধরে বিরাট বনস্পতির মত ভারতীয় ঐতিহ্যের মৃত্তিকা হতে রস ও খাদ্যপ্রাণ গ্রহণ করেছে, আর পাশ্চাত্ত্য (শুধু পাশ্চাত্ত্য না বলে বিশ্বের বললেই বুঝি যথার্থ হয়) প্রাণশক্তি ও জঙ্গমচিত্ততার মুক্ত আকাশের

আলো-হাওয়া হতে পুষ্টি আহরণ করেছে। 'To accept and assimilate culture'—বলতে রবীন্দ্রনাথ যা বুঝিয়েছেন তা কোন ব্যক্তিবিশেষের নয়—সমগ্র পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির। আর এই সাঙ্গীকরণ চলেছে তাঁর শেষ জীবন পর্যন্ত। রবীন্দ্রনাথের ঐ পত্রে স্বদেশের ঐতিহ্যপুষ্ট পরিণত মনের উল্লেখ আছে। সেই প্রসঙ্গটি এবার আলোচনা করা প্রয়োজন।

বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিতে রাজনৈতিক স্বাধীনতার চেয়ে সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা অপেক্ষাকৃত বেশি। এদিকে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তায় সর্বাঙ্গীন মুক্তি কাম্য ছিল; শুধু রাষ্ট্র ও সমাজের স্বাধীনতাই নয়,—"চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির" তেমন পরিবেশে জ্ঞানে, কর্মে, আনন্দে ব্যক্তির মুক্তি তাঁর কাম্য। "এই নিত্য অবনতি দণ্ডে পলে পলে, এই আত্ম-অবমান"—তাঁর অসহ্য হয়েছিল, তাই তিনি প্রার্থনা করেছিলেন—

মঙ্গল প্রভাতে
মস্তক তুলিতে দাও অনন্ত আকাশে,

রবীন্দ্রমানসে অনন্ত আকাশের এই মুক্তি-কামনাকে উপনিষদের আলোকে বিশ্লেষণ করা যায়। ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত 'উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্রমানস' গ্রন্থে বিস্তৃত বিশ্লেষণ দিয়েছেন এ-সম্পর্কে। আমরাও এ-সিদ্ধান্তে পৌছতে পারি যে, রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচেতনা ভারতীয় ঐতিহ্যের গভীরতায় মূল প্রসারিত করে রসপুষ্টি আহরণ করেছে। কারণ, ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা ও দর্শনের শ্রেষ্ঠ ঋক্‌থ উপনিষদের বাণী রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করেছে আশৈশব। পিতৃসংসর্গে, ব্রাহ্মসমাজে, শান্তিনিকেতনের আশ্রমে এই প্রভাব তাঁর জীবনের মর্মে মর্মে সঞ্চারিত হয়েছে। তাই উপনিষদের বাণী, ঋক্‌বেদের সূক্তধ্বনি ও সামগীতি তাঁর অজস্র সংগীতে ধ্বনিত। তাঁর 'শান্তিনিকেতন' প্রবন্ধমালা তো এই আধ্যাত্মিকতারই নির্যাস।

কেবল উপরোক্ত প্রভাবই নয়, বৌদ্ধধর্ম ও বুদ্ধবাণী কবির মানসগঠনে আর-একটি মুখ্য প্রেরণা। বুদ্ধের মৈত্রী, করুণা ও প্রেমের বার্তা এবং পরবর্তী কালে অশোকের ধর্মবিজয় কবিকল্পনাকে ভারতীয় ঐতিহ্যে অভিসিঞ্চিত করেছে। আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেন তাঁর 'রবীন্দ্রসাহিত্যে অতীত ভারত'-শীর্ষক প্রবন্ধে[৮] বলেছেন যে, রবীন্দ্রনাথ অতীত-ভারতের তিনটি যুগচিত্রকে ঐতিহাসিক নিষ্ঠা ও কবিকল্পনার দ্বারা বারে বারে অঙ্কিত করেছেন। প্রথম চিত্রটি হল প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণমহিমার পীঠভূমি ঋষিগুরুর তপোবন আশ্রম, "নির্বাক গম্ভীর শান্ত

সংযত উদার"। দ্বিতীয় যুগচিত্র হল বৌদ্ধ-সংস্কৃতি উদ্ভাসিত ভারতের ইতিহাসের নানা তথ্য ও বৌদ্ধ-জাতকের নানা কাহিনীর পটভূমি, যা কবিকল্পনায় নবতম সত্য বলে প্রতিভাত হয়েছে। তৃতীয় যুগচিত্রটি হল কালিদাসের কাল "সে চিত্র আমাদের চোখে ফুটে ওঠে সুখস্বপ্নের মতো।" একই সঙ্গে রবীন্দ্রমানসে প্রাচীন ভারতের তিনজন ব্যক্তি সর্বাধিক শ্রদ্ধালাভ করেছেন, তাঁরা হলেন বুদ্ধদেব, অশোক ও মহাকবি কালিদাস। মোট কথা প্রাচীনযুগের ভারতীয় ঐতিহ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কার রবীন্দ্রমানসে পুনর্জন্ম লাভ করেছে, তিনি তার 'মর্মের মাঝখানে' এঁদের সঞ্চার শুনেছেন। আবার মধ্যযুগের শিখ, মারাঠা ও রাজপুত ঐতিহাসিক কাহিনীগুলিও তাঁকে আকৃষ্ট করেছে। অতীত ভারতের উদার আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গে মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের শৌর্যবীর্যের কাহিনী কবিকে সমানভাবেই প্রভাবিত করেছে। মধ্যযুগের কবীর, নানক, দাদূ প্রমুখ ভারতীয় সাধকগণের ভক্তিসাধনা ও মানবকল্যাণের বাণী রবীন্দ্রনাথের কাব্যে রূপলাভ করেছে। এঁদের প্রভাবও রবীন্দ্রমানসের আর-একটি উপকরণ। 'Religion of Man' বা মানবধর্ম কবির প্রজ্ঞায় যেভাবে উদ্ভাসিত হয়েছে, তাতে উপনিষদের ভূমানন্দের সঙ্গে এঁদের সাধনাও একযোগে সঞ্চারিত।

লক্ষ্য করা যায়, রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তা বিশ্বজনীন হয়ে উঠেছে তাঁর পরিণত বয়সে। বঙ্গচিন্তা হতে 'ভারততীর্থ'-এর সাধনার মূলে কেবল বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসের ইঙ্গিতই নেই, উপনিষদের পরম ব্যাপ্তিও সেখানে ক্রিয়াশীল; এবং ভারতীয় ঐতিহ্যের চিরন্তন আধ্যাত্মিক উদারতা সেই সাধনক্ষেত্রে প্রভাবশালী হয়েছে। ফলত সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের ভেদবুদ্ধি ঘুচিয়ে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের প্রেরণা রবীন্দ্রনাথকে দিয়েছে উপনিষদের ঐতিহ্য, যার মূলমন্ত্র হল—

যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে।

দুই.

এবার রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তার বিবর্তনের ধারা ও তার বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যেতে পারে। এ-প্রসঙ্গে আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেন বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম কবিতা 'অভিলাষ' নিশ্চিতরূপেই বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাঙ্গালীর বাহুবল' প্রবন্ধের প্রতিবাদ। [দ্র. 'ভোরের পাখী'] অর্থাৎ প্রথম হতেই রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় একটি নূতন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়।

বাস্তবিকই ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে 'আনন্দমঠ'-এর সন্তানদলের মন্ত্রোচ্চারণ 'বন্দেমাতরম্' যখন শোনা গেল বাংলা সাহিত্যে, রবীন্দ্রপ্রতিভার আম্রকুঞ্জে তখন কচি আমের গুটি "সবে দেখা দিয়েছে শ্যামল রঙে। রস ধরে নি তাই তার দাম কম।" অথচ ঠিক এই সময়ে 'বৌঠাকুরানীর হাট' উপন্যাসে তাঁর নবতম ইতিহাস-দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া গেল।

বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তার অর্ধশতাব্দীব্যাপী [১৮৯১-১৯৪১ খ্রীঃ] একটি যুগকে বিচার করলে এক-একটি সাহিত্য-পত্রিকা সম্পাদনার কালকে এক-একটি অধ্যায় হিসাবে গণ্য করা চলে। এমন কি সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্য সম্পর্কেই এই অধ্যায় ভাগ করা যায়। এইরূপে বিন্যস্ত কাল বা পর্যায়কে বিশ্লেষণ করে দেখা যাবে, কবির স্বদেশ-ভাবনা ক্রমে ক্রমে বিবর্তিত হয়েছে এক-একটি বিশেষ প্রেরণায় অথবা রাজনৈতিক তথা সামাজিক আন্দোলনে। সমালোচকের মতে—

> 'ভারতী'-র প্রথম যুগ গিয়েছে সাহিত্যিক শিক্ষানবিশির যুগ, 'হিতবাদী' নিয়ে এসেছে গল্পের প্রবাহ, 'সাধনা' মুক্ত করল বিচিত্রমুখী মননের দ্বার, 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শন' এবং 'ভাণ্ডার' সমাজ চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করেছে—'সবুজপত্রে' দেখা গেল রবীন্দ্রপ্রতিভার মস্ত দিক পরিবর্তন।[৯]

আগেই বলেছি যে জাতি-সংগঠক (Nation-builder) বঙ্কিমের আবির্ভাব 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার পৃষ্ঠায়, আর বঙ্কিমের উত্তরাধিকার নিয়ে রবীন্দ্রপ্রতিভার নবঅভ্যুদয় 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শন'-এ [১৯০১ খ্রীঃ]। এ যেন বিংশ শতাব্দীর দুয়ার ভেঙে এক জ্যোতির্ময় মূর্তির 'তিমির বিদার উদার অভ্যুদয়'। কিন্তু তারও পূর্বে ছিল উনিশ শতকের শেষ দশকের 'সাধনা' [প্রথম প্রকাশ ১৮৯১ খ্রীঃ, সম্পাদক—সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর] যার পৃষ্ঠাতে 'সোনার তরী'-র সৌন্দর্য-স্বপ্নই রচিত হয় নি—জাতি ও সমাজের জাগৃতির সংগীতও ধ্বনিত হয়েছিল।

আমরা দেখেছি, কবিচিত্তে স্বদেশচিন্তার উন্মেষ 'হিন্দুমেলা'র কাল হতেই। 'ভারতী'-র সম্পাদকগোষ্ঠীর অন্যতম সদস্য রবীন্দ্রনাথ, সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথের 'মটো' (motto) মনে রেখে চলেছেন। সেই নির্দেশ ছিল "ভাবালোচনার সময় স্বদেশীয় ভাবকেই বিশেষ স্নেহদৃষ্টিতে" দেখবার। তদনুসারে 'ভারতী'-র যুগে লেখা 'দয়ালু মাংসাশী', 'চীনে মরণের ব্যবসায়' ইত্যাদি প্রবন্ধে একটি নূতন কণ্ঠ সোচ্চার হয়েছিল। সামাজিক ক্ষেত্রে কবির মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ আছে শ্লেষতিক্ত কণ্ঠে—'দামু ও চামু' এবং 'আর্য ও অনার্য'-এ। রবীন্দ্র-স্বদেশচিন্তার প্রথম সুস্পষ্ট প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় 'ভারতী'-র 'মন্ত্রি অভিষেক' [১৫ই মে

১৮৯৩ খ্রীঃ] প্রবন্ধেই। 'ভারতী'-র ছত্রছায়ায় সমকালীন 'বালক'-পত্রিকা [বৈশাখ ১২৯২] একবৎসর পদচারণা করেছে। রবীন্দ্রনাথ তার প্রধান লেখকরূপে 'চিরঞ্জীবেষু' ও 'চিরঞ্জীবেষু' শীর্ষক পত্রে নবীনকিশোরের সমাজ-দৃষ্টিভঙ্গি উন্মোচিত করেছেন।

'হিতবাদী'-তে ছয় সপ্তাহ ধরে রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্প লিখেছেন। তার পরই 'সাধনা'-পর্ব, যার সম্পর্কে রবীন্দ্র-মন্তব্য ছিল—

> 'সাধনা' পত্রিকার অধিকাংশ লেখা আমাকেই লিখিতে হইত এবং অন্ত লেখকের রচনাতেও আমার হাত ভূরি পরিমাণে থাকিত। —আত্মপরিচয়

এই 'সাধনা'-তে রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ-ভাবনা ক্রমপুষ্ট ও ক্রমস্পষ্ট হয়ে এসেছে। 'কর্মের উমেদার' (মাঘ ১২৯৮) ও 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধদুটি দেশের মনীষীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে[১০]। বঙ্কিমচন্দ্রের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় রবীন্দ্রনাথ যেদিন 'ইংরেজ ও ভারতবাসীর' বাস্তব সম্পর্ক নিরূপণ করে বক্তৃতা পাঠ করলেন সেদিন বঙ্কিমও সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন এবং ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন।[১১] অতঃপর 'রাজা ও প্রজা' শীর্ষক প্রবন্ধমালায় তাঁর বিচারভঙ্গি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

এই 'সাধনার'-যুগ আসলে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তার আত্ম-প্রস্তুতির যুগ। 'বিশ্বাসের ছবি' নিয়ে আসার ব্রত ছিল তাঁর—এই যুগটিতে। 'কথা'-কাব্যে অঙ্কিত চরিত্র 'গুরু-গোবিন্দ'-এর মত একটি দশক বুঝি তাঁরও অজ্ঞাতবাসের সাধনা। কদাচিৎ কখনও প্রকাশ্য সভায় ক্ষণকালের জন্য তিনি এসেছেন কিন্তু তাঁর অধিকাংশ সময়ই কেটেছে নির্জনবাসে। কখনও কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে (১৮৯৬ খ্রীঃ) তিনি 'বন্দেমাতরম্' সংগীত গেয়েছেন, কখনও বা নির্জনবাস হতে 'ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ' বলে দেশবাসীকে সচেতন করেছেন। এদিকে আবার তিনি 'নৈবেদ্য' রচনাকালে সাম্রাজ্যবাদী রক্তলোলুপতাকে ধিক্কার দিয়েছেন, ভারতীয় অধ্যাত্মচিন্তা ও স্বদেশচিন্তার ধ্রুপদরাগিণীতে তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাপ্তি ঘোষণা করে প্রার্থনা করেছেন, "চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির"—সেখানে ভারতের জাগৃতি হোক। তাই দেশের হৃদয়ের সঙ্গে যোগসাধনের কথা এবং পূর্ণ মনুষ্যত্ব উদ্বোধনের কথা এ-পর্বের অধিকাংশ প্রবন্ধে বলা হয়েছে। এই কালেই রচনায় মনুষ্যত্ববোধের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন কবি,—আর এই মনোভাব পরবর্তী পর্বগুলিতে বর্তমান ছিল। "বঙ্গদর্শনের পরেই কবিজীবনে একটু মোড় ফিরল। বস্তুত এই সময় থেকে রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিক জীবনের আরম্ভ।" নবপর্যায় বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনাতে

সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ বললেন,—"সেই বঙ্কিমের কঠিন আদর্শ ও কঠোর বিচার তাহাকে সর্ব প্রকার শৈথিল্য হইতে রক্ষা করিবে।" অর্থাৎ বঙ্কিমের আদর্শ অনুসরণ করে এবং 'বিস্তৃততর ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ আদর্শকে' ধারণ করেই বর্তমান সম্পাদক অগ্রসর হবেন। উক্ত সংকল্প বৃথা হয় নি। রবীন্দ্রনাথ মৃগতৃষ্ণিকায় মোহগ্রস্ত হন নি, সাময়িক কলকোলাহল হতে নিজেকে সযত্নে দূরে রেখে যুগের বাণী ধ্বনিত করেছিলেন। তাই লক্ষ্য করা যায়, বঙ্গদর্শন-পর্বে রাজনৈতিক আলোচনার ধারা প্রবলতর বেগে নির্দিষ্ট গতিমুখী হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচেতনার আদর্শ তখন সুস্পষ্ট। 'ভারতবর্ষ' এবং 'আত্মশক্তি'-র প্রবন্ধগুলি রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্গদর্শন'-এই লিখলেন। বাঙালিকে আত্মসচেতন করে তুলবার জন্য স্বদেশের ঐতিহ্যের স্বরূপ খোঁজ করতে গিয়ে এই আলোচনা এল। অর্থাৎ একই কালে 'নৈবেদ্য'-র ভাবগম্ভীর কবিতা এবং প্রাচীন ভারতের ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যমূলক প্রবন্ধ এই পত্রিকায় মুদ্রিত হচ্ছিল। সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য 'ভারতবর্ষের ইতিহাস'—আলোচনা এবং 'স্বদেশী সমাজ' প্রতিষ্ঠার ঘোষণাপত্রটি—যে দুটি এ-পর্বের কবি-মনীষীর বিশেষ অবদান। 'আত্মশক্তি'-র সাহায্যে সর্বাঙ্গীন স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে—এই বিশ্বাস ক্রমেই দৃঢ়মূল হয়ে উঠেছিল রবীন্দ্রচিত্তে।

অতঃপর ১৩১২ সালের উল্লেখযোগ্য ইতিহাস। রবীন্দ্রনাথ তখন বাঙালির জাতীয় মানসে এক আশ্চর্য প্রেরণারূপে বিদ্যমান। তৎকালে 'বঙ্গদর্শন' ও 'ভাণ্ডার' পত্রিকা একযোগে পরিচালনা করছিলেন তিনি, তাই রাজনৈতিক প্রবন্ধ আর স্বদেশী সঙ্গীতের প্রাচুর্যে এই দুটি পত্রিকা ভরে উঠেছিল। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের ১৬ অক্টোবর বঙ্গচ্ছেদ হল। তার প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ জনতার মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন। বিদেশী দ্রব্য বর্জনের সঙ্গে স্বদেশী উদ্যোগের প্রস্তাব করলেন তিনি। এবং 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদ' স্থাপনের প্রধান উদ্যোক্তাও হলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথ তখন স্বদেশচিন্তাকে জাতিসংগঠনের বাস্তবকর্মে রূপায়িত করতে এগিয়ে এসেছেন। অজস্র জনপ্রিয় সঙ্গীত সৃষ্টি করে নিজস্ব সুর-সংযোগে পরিবেশন করে তিনি সংকল্পবাক্য উচ্চারণ করলেন, —'আমি ভয় করব না।' এইভাবে একাদিক্রমে তিন বৎসর 'ভাণ্ডার' পত্রিকা সম্পাদনার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশীযুগের এক ঐতিহাসিক প্রয়োজন সিদ্ধ করলেন। লক্ষ্য করা গেল, 'সাধনা'তে যার সূত্রপাত, 'বঙ্গদর্শন'-এর মধ্য দিয়ে 'ভাণ্ডার'-এ তার পরিণতি। পরবর্তী কালে প্রত্যক্ষ রাজনীতির পথ হতে কবি সরে দাঁড়িয়েছিলেন সত্য কিন্তু জাতির শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল মনীষীরূপে রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় চিন্তার মাধ্যমে

তাঁর গভীর স্বদেশচিন্তা জাতীয়-চিত্তে সঞ্চারিত করেছিলেন নানা প্রবন্ধে, নানা আলোচনায় এবং নানা বক্তৃতায়। অতঃপর 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ (বৈশাখ ১৩১৮) রবীন্দ্রনাথের মানস-বিবর্তনের আর-এক নব পর্যায়ের সূচনা করল। তাঁর রচনায় সংহত ধর্মচিন্তার প্রকাশ সুস্পষ্ট হল এবার। যে জীবন-দর্শন তাঁর সাহিত্য ও জীবনচর্যার ভিত্তিভূমি—ধর্মচিন্তাও সেই ভূমিতেই প্রতিষ্ঠিত হল। 'বঙ্গদর্শন' ও 'ভাণ্ডার'-পর্বে তিনি স্বাদেশিক ভাবনাতে ভারতীয় মর্মসন্ধানের প্রয়াস করেছিলেন, 'তত্ত্ববোধিনী'র ধর্মালোচনা আসলে তারই পরিণাম। 'সঞ্চয়' ও 'পরিচয়' নামক প্রবন্ধ-সংকলনে এ-পর্বের স্বদেশচিন্তার দিক্‌নির্ণয় করা যায়।

অতঃপর রবীন্দ্র-স্বদেশচিন্তার রস-পরিণতিরূপে 'গোরা' উপন্যাসের আবির্ভাব (শ্রাবণ ১৩১৬)। এই মহাকাব্যিক উপন্যাস জাতিজাগৃতির উদার পথ-নির্দেশ দিয়েছে ভারতবর্ষকে—সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের গণ্ডী হতে নিখিল মানবের জয়যাত্রায়। তারপর কিছুদিনের মধ্যেই 'প্রায়শ্চিত্ত'-এর ধনঞ্জয় বৈরাগী অহিংস আন্দোলনের ভবিষ্যৎ সূচনা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করল। অনতিকাল পরেই 'গীতাঞ্জলি'-র কবি রবীন্দ্রনাথ 'ভারততীর্থ' রচনার আহ্বান জানিয়েছিলেন। এখানে রবীন্দ্রনাথ যেন ভারতবর্ষের ভাবী ইতিহাসের দ্রষ্টা। 'অচলায়তন'-এর গণ্ডী-সংকীর্ণতা ভেঙে উদার মহামিলনের ক্ষেত্রে উদাত্ত সুরে জাতিকে জাগ্রত হতে বলেছিলেন। এরপরই 'ভারত ভাগ্যবিধাতা'-র মহৎ কল্পনার আশ্রয়ে জাতি-সংহতির জয়গান তিনি শোনালেন,—'জনগণ-মন-অধিনায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা।' (রচনাকাল ১৯১৯ খ্রীঃ)।

পরবর্তী পর্বে বিশ্বপথের পথিক রবীন্দ্রনাথ বিশ্বদেবতা ও স্বদেশদেবতাকে অদ্বয়মূর্তিতে দর্শন করে বললেন—

মিলে গেছ ওগো বিশ্বদেবতা, মোর সনাতন স্বদেশে।

অর্থাৎ 'ভারততীর্থ'-এর কবি এবার জাতীয়তাবোধ হতে আন্তর্জাতিকতাবোধে উত্তীর্ণ হয়েছেন। 'সবুজ পত্র'-পর্বে 'বলাকা'-র কবিতায় সেই বাণীই শোনা গেল—"যাত্রা করো যাত্রীদল, বন্দরের কাল হল শেষ।" 'ভারততীর্থ'-যাত্রী এবার বন্দরের সংকীর্ণ আশ্রয় পরিত্যাগ করে বিশ্বমহাসাগরে তরী ভাসাতে প্রস্তুত।

'লোকহিত' (ভাদ্র ১৩২১), 'লড়াইয়ের মূল' (পৌষ ১৩২১) প্রভৃতি প্রবন্ধে একদিকে যেমন স্বাদেশিকতার ভণ্ডামি ও ভীরুতা ঘুচিয়ে দেবার প্রয়াস ব্যক্ত, অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী বণিকবুদ্ধি ও শোষণ-লোলুপতার প্রতি ধিক্কার ধ্বনিত হয়েছে। বস্তুত 'Nationalism' শীর্ষক বক্তৃতামালায় রবীন্দ্র-স্বদেশ-

চিন্তার আর-একটি পর্বের সূচনা। এই পর্বেই লক্ষ্য করা যায়, উগ্র জাতীয়তাবাদ হতে উদার মানবতাবোধের পথে শুরু হল তাঁর দৃপ্ত পদক্ষেপ। বন্ধু-মনীষী রোমাঁ রলাঁ এ পথে তাঁর সহযাত্রী। স্পষ্টত রবীন্দ্রনাথ যে ক্রমে আন্তর্জাতিক চিন্তাবিদ্ হয়ে উঠেছেন, এগুলির মধ্যে তারই নিদর্শন পাওয়া যায়। 'কালান্তর'-এর কবি স্বদেশের কথায় আরও স্পষ্টবাদী হয়ে উঠেছেন এবং 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' তার সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত। 'ছোট ও বড়', সত্যের আহ্বান', 'স্বরাজসাধন' প্রভৃতি প্রবন্ধের সর্বত্র তাঁর স্বচ্ছ নিরপেক্ষ দৃষ্টি জাগ্রত। তাঁর স্বদেশচিন্তা এখন বাস্তব সমাজবুদ্ধিতে সচেতন, অথচ তা বিশ্ববোধে উদার। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতা আর সংকীর্ণ জাতীয়তাতে নয়—বিশ্ববোধের মূলসুরে বাঁধা।

এই কালেই রবীন্দ্রনাথ 'শিক্ষার মিলন'-এ যে-আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছিলেন তাই রূপায়িত করলেন বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠায় (২৩. ১২. ১৯১৮)।

স্বদেশচিন্তার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের শেষ পরিচয়, "তিনি 'কালান্তরের' কবি, জটিল যুগচেতনা কবিচেতনায় সংকেতায়িত।"[১২] সমালোচকের এ-মন্তব্য যথার্থ কারণ একথা প্রমাণিত হয়েছে পরবর্তী রচনাগুলিতেই।

'রাশিয়ার চিঠি'-কে (১৯৩১) রবীন্দ্রনাথের উক্ত স্বদেশ-ভাবনার অন্যতম পরিচয় বলে গ্রহণ করা যায়। এতে আছে মুক্ত দৃষ্টিতে দেখা এবং মানব-প্রেমিকের মন দিয়ে গ্রহণ করা অভিজ্ঞতা। রবীন্দ্রনাথের 'সমবায়'-মূলক-সামাজিক চিন্তাগুলি আরও প্রতিষ্ঠালাভ করেছে ঐ বাস্তব দৃষ্টান্তে।

সত্যিই 'কালের যাত্রা'র সাক্ষী রবীন্দ্রনাথ আমাদের কালান্তরের দ্রষ্টা হয়ে উঠেছেন। 'মানুষের ধর্ম' (১৯৩৩) সেই দ্রষ্টার জীবনদর্শন-স্বরূপ। এগুলির মধ্যে প্রকাশিত তাঁর স্বদেশভাবনাতে ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্র একত্রে বিধৃত। লক্ষ্য করা যাবে, রাজনীতির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ বারম্বার দেশবাসীকে সচেতন করেছেন ভাবালুতাবর্জিত সংগঠনমূলক কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করার জন্য ; তাই মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা ও সত্যাগ্রহের মূল নীতিকে তিনি সমর্থন করেও চরকা-কাটার যান্ত্রিকতাকে অস্বীকার, ব্রিটিশের 'ল অ্যাণ্ড অর্ডার'-কে ধিক্কার দিয়েছেন, আবার চিত্তবৃত্তির উদ্বোধনের দ্বারা 'স্বদেশী সমাজ' প্রতিষ্ঠা, সমবায় আন্দোলনের প্রসার ও 'শিক্ষার মিলন' কামনা করেছেন। এদিকে 'মানুষের ধর্ম'-আশ্রিত বিশ্ববোধ ও আন্তর্জাতিকতাকে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস তো তাঁর ছিলই। আরও লক্ষ্য করা যায়, এযুগে কবি রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ রাজনীতির রঙ্গভূমি হতে সরে এলেও দেশের যুবশক্তিকে বারে বারেই ডাক দিয়েছেন, 'তাসের দেশ'-কে নতুন আবেগে ভরে তোলার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন—"জীর্ণ পুরাতন যাক্ ভেসে যাক।"

তিনি এই সময়ই অর্থাৎ ১৯৩৯-এ দেশনায়করূপে সুভাষচন্দ্রকে বরণ করতে আহ্বান করেছেন দেশবাসীকে। আবার 'চার অধ্যায়'-এ সন্ত্রাসবাদের অবক্ষয় হতে দেশবাসীকে ফেরার কথাও বলেছিলেন তিনি। কিন্তু কালান্তরের কবিকে ভুল বোঝার সম্ভাবনা তাতে নেই। রাষ্ট্রীয় মুক্তির লক্ষ্যে পৌঁছনর পথকে মানবিকতা-হননের পাপে রক্তাপ্লুত করাতে তাঁর মন সায় দিতে পারে নি। লক্ষ্যে পৌঁছনর সংগ্রামও তাঁর কাছে গৌরবময়, তা যেন কলঙ্কিত না হয়।

আমরা আবার বলি, বিংশ শতাব্দীর প্রতিনিধিরূপে রবীন্দ্রনাথ যুগের সাক্ষীস্বরূপ বিদ্যমান, আর শুধু সাক্ষী নন, রবীন্দ্র-প্রতিভা তার সারথিও। সেই যুগের প্রতিনিধিরূপে তিনি যেমন অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছেন, যুগোচিত নানা আন্দোলনে যেমন নিজস্ব বক্তব্য দিয়েছেন, তেমনি যুগোত্তীর্ণ বাণী দিয়েছেন পৃথিবীর কবিমনীষীরূপে। জাতীয় ক্ষেত্রে যেমন, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও তদ্রূপ, তিনি মানবতাকে যখনই অপমানিত হতে দেখেছেন তখনই তার তীব্র প্রতিবাদ করেছেন, কারণ মানব-সত্য তাঁর আমরণ ধ্যান। তাই ইতিপূর্বে রচিত 'প্রান্তিক'-এ (১৯৩৭) কবির বজ্রকণ্ঠ শোনা গিয়েছিল—

মহাকালসিংহাসনে
সমাসীন বিচারক, শক্তি দাও, শক্তি দাও মোরে,
কণ্ঠে মোর আনো বজ্রবাণী।

মানবিকতাকে ধিক্কারদান এবং মানবিকতাতে বিশ্বাস করাই রবীন্দ্র-স্বদেশচিন্তার শেষতম পর্বের বৈশিষ্ট্য। 'শিশুতীর্থ'-এর পথিক রবীন্দ্রনাথের এই দুর্মর বিশ্বাসের ঘোষণা আছে দ্ব্যর্থহীন ভাষায়,—"জয় হোক মানুষের, ওই নবজাতকের, ওই চিরজীবিতের।" সুদীর্ঘ অর্ধ শতাব্দীর জীবন-পরিক্রমায় রবীন্দ্রনাথ দুটি শতাব্দীর ভাবসাধনার সেতু হয়ে আছেন—রাজনৈতিক আন্দোলন, সামাজিক সংস্কার ও সাংস্কৃতিক চেতনার সঙ্গে 'মানুষের ধর্ম'-বিকাশের সাক্ষী ও সারথি হয়ে উঠেছেন তিনি। স্বদেশচিন্তার এই ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন বাস্তবিকই ভারতীয় সমাজ-বিবর্তনের সঙ্গে জড়িত। অধ্যাপক গোপাল হালদারের পূর্বোক্ত মন্তব্য অনুসারে তিনি এ-বিবর্তনের সাক্ষী ও সারথি দুই-ই। তিনি 'গ্রেট সেন্টিনেল'—এই কথায় বিন্দুমাত্র অতিশয়োক্তি তো নেই-ই বরং একটি ঐতিহাসিক সত্যের স্বীকৃতি আছে।

আলোচিত বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্র-স্বদেশচিন্তার মূল বৈশিষ্ট্যগুলি এবার বিন্যস্ত করা যেতে পারে। এ-প্রসঙ্গে আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেনের বিশ্লেষণ হতে দুটি প্রধান সূত্র গ্রহণ করা যাবে—"রবীন্দ্রনাথের ভারত-চিন্তার দুটি প্রধান

দিক। এক দিকে ভারতসত্তার মহাভাষ্য, অপর দিকে সেই ভাষ্যের আলোকে যুগোচিত কর্মপথের নির্দেশ।" উপরোক্ত মূল সূত্র দুটির সঙ্গে নিম্নলিখিত সূত্রগুলিও সাজানো যায়—(১) বিগত শতাব্দীর শেষদশকে রবীন্দ্রচিন্তার বৈশিষ্ট্য ছিল অন্তঃসারশূন্য-এজিটেশন বিরোধিতা, এবং সমাজ-সংস্কার ও শিক্ষা-সংস্কারের অগ্রাধিকার দান করে political agitation—রূপ ভিক্ষাবৃত্তিকে রোধ করার প্রয়াস। (২) বঙ্গদর্শন-পর্বের কিছু পূর্ব হতেই তাঁর মনে আধ্যাত্মিকতা ও স্বদেশপ্রীতি মিশ্রিত হয়েছে, এবং আত্মশক্তি বিকাশের 'মাভৈঃ' মন্ত্রে আস্থা দৃঢ়তর হয়েছে। (৩) 'নৈবেদ্য'-যুগ হতে কবির স্বদেশচিন্তায় কিছুকাল যাবৎ হিন্দু-পুনরুজ্জীবনবাদের প্রভাব ক্রিয়াশীল থেকেছে। পরে অবশ্য এ-প্রভাব হতে তিনি মুক্ত হয়েছেন। (৪) রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসচেতনা, সমাজচিন্তা ও ধর্ম-ঐতিহ্য-চেতনা এ-তিনের সমন্বয় ঘটেছে 'ভারতসত্তার মহাভাষ্য'— নির্ণয়ে এবং 'যুগোচিত কর্মপথ নির্ধারণে'। (৫) 'স্বদেশী সমাজ'-এ উল্লিখিত প্রস্তাবগুলিই কবির স্বদেশচিন্তার স্বরূপ। এর মূল সিদ্ধান্ত হল—"সমাজের স্বাধীনতাই যথার্থভাবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা। কারণ মঙ্গল করিবার স্বাধীনতাই স্বাধীনতা, ধর্মরক্ষার স্বাধীনতাই স্বাধীনতা।" (৬) "রাষ্ট্রতন্ত্রমূলক শাসনগত ঐক্য নয়, হিন্দুসমাজের বিশাল ও বৈচিত্র্যময় ঐক্য আমাদের কাম্য।" রবীন্দ্রনাথের উক্ত কামনা এক সঙ্গে হিন্দুসমাজবোধ হতে বিশ্ববোধে উত্তীর্ণ হবারও কামনা। পরবর্তী কালে বঙ্গপ্রীতির কেন্দ্র প্রসারিত হয়ে যেমন 'ভারততীর্থ'-এর প্রতিষ্ঠা হয়েছে রবীন্দ্র-চিন্তায় তেমনি হিন্দুত্বের গণ্ডী হতে মানবতার গণ্ডীতে উত্তীর্ণ হয়ে তাঁর স্বদেশ-বোধও উদারতর রূপ লাভ করেছে। (৭) 'Nationalism'—শীর্ষক বক্তৃতামালায় আলোচিত সংকীর্ণ জাতীয়তার প্রতি ধিক্কার কবির স্বদেশচিন্তার শেষপর্বের বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ দানবিকতাকে ধিক্কার ও মানবিকতাতে বিশ্বাসই শেষতম বৈশিষ্ট্য।

এবার উপরোক্ত সবগুলি সূত্র যদি একটিমাত্র সংকল্পে কেন্দ্রীভূত করা হয় তবে রবীন্দ্রনাথেরই ভাষায় তা হবে—

> বৃহৎ ভারতবর্ষ গড়িয়া তুলিবার জন্যই আমরা আছি, মহাভারতবর্ষ গঠনের এই ভার আজ আমাদের উপর পড়িয়াছে....সেই ভারতবর্ষ সমস্ত মানুষের ভারতবর্ষ।

এই ভারতবর্ষ যে অখণ্ড মহাভারত তাতে সন্দেহ মাত্র থাকে না।

এখানেই বিশ্বদেবতা এসে সনাতন স্বদেশে মিলে গেছেন। মোটকথা, রবীন্দ্রনাথ কেবল যুগচেতনাকেই বহন করেন নি,—যুগসারথ্য নিয়ে বিশুদ্ধ রাজনীতির পথে তাকে পরিচালিত করার প্রয়াসও করেছেন।

দ্বিতীয় পর্ব

প্রথম অধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তার তুলনা
রাজনীতিমূলক প্রবন্ধাবলীতে

পূর্ববর্তী অধ্যায় দুটিতে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তার উৎস, বিবর্তন ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হয়েছে। এবার ঐ আলোচিত পটভূমিতে পূর্বসূরী ও উত্তরসূরী দুজনের চিন্তাধারাকে পাশাপাশি রেখে তুলনা করাই আমাদের অভীপ্সা। লক্ষ্য করা যাবে, যুগপরিবেশগত রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় পটভূমির বিভিন্নতা তাঁদের দুজনের স্ব স্ব দৃষ্টিভঙ্গিতেও স্বভাবতই পার্থক্যের সৃষ্টি করেছে।

আলোচনায় দেখা যাবে, বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশচিন্তা উনবিংশ শতাব্দীর শেষ তিনটি দশকের বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষকে অবলম্বন করে প্রতিফলিত, আর রবীন্দ্রনাথের উক্ত চিন্তা দুটি শতাব্দীকে সেতুবন্ধনে বেঁধেছে, (উনিশ শতকের শেষ দশক হতে বিশ শতকের চারটি দশক পর্যন্ত) এবং ঐ চিন্তার পরিধি বাংলা ও ভারতবর্ষ ছাড়িয়ে সমগ্র পৃথিবী ব্যাপ্ত হতে পেরেছে। তাই এঁদের দুজনের স্বদেশচিন্তার তুলনামূলক আলোচনায় আমাদের দেশের সামগ্রিক উজ্জীবন সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়ে উঠবে।

ত্রিকোণ কাঁচের দ্বারা বিশ্লিষ্ট সূর্যরশ্মির বর্ণালীতে যেমন দেখা যায় পাশাপাশি সাতটি রঙের মেলা, যদিও ওদের সম্মিলিত সত্তাই শুভ্র আলো, ঠিক তেমনি আমাদের তুলনামূলক আলোচনায় বিশ্লিষ্ট স্বদেশচিন্তার বর্ণালীতে চারটি রঙ দেখা যাবে,— রাজনীতিমূলক চিন্তা, সমাজচিন্তা, ধর্মচিন্তা এবং শিল্পিত রূপে স্বদেশচিন্তা। এর মধ্যে প্রথম তিনটি চিন্তামূলক প্রবন্ধমালায় পরিব্যাপ্ত, চতুর্থটি বিকশিত সাহিত্য-সৃষ্টির নানা আঙ্গিকে,— উপন্যাসে, সঙ্গীতে, নাটকে, কাব্যে, ব্যঙ্গ-প্রহসনে। এক্ষেত্রে যে দুজনকে নিয়ে আলোচনা তাঁরা দুজনেই বাংলা সাহিত্যের দুটি যুগের সারথি। রবীন্দ্রনাথ মূলত কবি, আর বঙ্কিমচন্দ্র ঔপন্যাসিক হলেও তাঁর মানসসত্তা কবিজনোচিত আত্মভাবপ্রাবল্যে আলোড়িত। অতএব স্বভাবত এঁদের প্রবন্ধাবলী সাহিত্যরসে অভিসিঞ্চিত হয়ে বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করেছে। আমাদের আলোচনায় এই সাহিত্যরস-সিঞ্চিত চিন্তামূলক প্রবন্ধাবলীকে তিনটি পর্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

এছাড়া সাহিত্যের অন্যান্য শিল্পিতরূপের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ-চিন্তার তুলনা করা যায় মাত্র দুটি প্রকাশ-রূপ অবলম্বন করে,—উপন্যাস ও সঙ্গীত। কারণ নাটক ও কাব্য রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তার শক্তিশালী বাহন হলেও বঙ্কিমচন্দ্র এ দুটিকে ব্যবহার করেন নি। তাই এ দুটি আমাদের তুলনামূলক আলোচনার পরিধিভুক্ত করা হয় নি, অবশ্য প্রাসঙ্গিক তথ্যরূপে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাবিশ্লেষণে এগুলির যথাযথ উল্লেখ করা হয়েছে।

এক.

প্রত্যক্ষ রাজনীতির আসরে বঙ্কিমচন্দ্র কখনও অবতীর্ণ হন নি। যদিও উচ্চ রাজকর্মচারি বঙ্কিমের পক্ষে তখনকার দিনে 'ইণ্ডিয়ন এসোসিয়েশন' বা 'ভারত সভা (১৮৭৬) কিংবা মিঃ এ. ও. হিউম প্রতিষ্ঠিত 'ন্যাশন্যাল লীগ' (১৮৮৩) অথবা 'নিখিল ভারত কংগ্রেস' (১৮৮৫) প্রতিষ্ঠানে আইনত যোগদানের কোন বাধা ছিল না[১] তথাপি হয়ত তাঁর পক্ষে ব্যবহারিক কিছু অসুবিধা ছিল। ('আনন্দমঠ' রচনার পর বঙ্কিমচন্দ্র যে কিছুটা ইংরেজ কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হন, তার ইঙ্গিত তিনি স্বয়ং রেখে গেছেন)। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে ঐ প্রকার অসুবিধা ছিল না। তবু কবি রবীন্দ্রনাথ মাঝে মধ্যে কংগ্রেসের সভাতে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করলেও রাজনীতিক চক্রের বাইরেই থাকতেন।[২] ব্যতিক্রমস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, একবার মাত্র তিনমাসের জন্য (আশ্বিন-অগ্রহায়ণ ১৩১২) বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের আবর্তে ঝাঁপ দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তারপরেই তিনি দূরে সরে গেছেন। এর কারণগুলি পরে আলোচনা করে দেখবার চেষ্টা করা যাবে। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই ইংরেজ শাসনকে ভারতবর্ষের পক্ষে আপাতত মঙ্গলজনক বলে বিশ্বাস করতেন, তবে রবীন্দ্রনাথের মনোভঙ্গি পরিবর্তিত হয়েছে 'কালান্তর'-এর যুগে। মনে রাখতে হবে, বঙ্কিমচন্দ্র রাজনৈতিক স্বাধীনতার চেয়ে অধিকতর গুরুত্ব দান করেছেন সাংস্কৃতিক স্বাধীনতাকে, রবীন্দ্রনাথ গুরুত্ব দিয়েছেন সামাজিক স্বাধীনতাকে।

এবার রাজনীতির ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধারাকে অনুসরণ করা যেতে পারে। তাঁর চিন্তাগুলি প্রকাশিত হয়েছে অনধিক দ্বাদশবর্ষকাল ধরে নানা রচনায় (ব্রজেন্দ্রনাথ-সজনীকান্ত আখ্যাত যুদ্ধপর্বে, ১৮৭২ হতে ১৮৮৯ পর্যন্ত)। এই চিন্তা প্রধানত অভিব্যক্ত হয়েছে এই ভাবে—(১) মৃদু রহস্য-ব্যঙ্গচ্ছলে অথবা

উষ্মাবিহীন বিশ্লেষণে ইংরেজ শাসনের স্বরূপ-উদ্ঘাটন ও ইংরেজ-ভারতবাসীর বিসদৃশ সম্পর্ক নির্ণয় (২) ইতিহাসচেতনার আশ্রয়ে জাতীয় কলঙ্কক্ষালন, গৌরব কথন ও আদর্শীকরণ (৩) জাতীয় দোষক্রটির তীব্র সমালোচনা, আত্মসমীক্ষা এবং সংগঠনমূলক নির্দেশ।

এইগুলি মোটামুটি গ্রন্থবদ্ধ অবস্থায় আছে 'লোকরহস্য', 'কমলাকান্তের দপ্তর' এবং 'প্রবন্ধাবলী'র ১ম ও ২য় পর্বে, আর আছে কয়েকটি 'গ্রন্থসমালোচনা' রূপে। এই রচনাগুলি একই যুদ্ধপর্বের বিভিন্ন রণাঙ্গনের বার্তাবাহী। এই মসীযুদ্ধের আক্রমণ একযোগে চালানো হয়েছে বিভিন্ন ফ্রন্টে এবং জয়লাভের পর সংগঠন-প্রক্রিয়া চলেছে একই কালে। একদিকে জাতির ক্লীবত্ব, দুর্বলতা, আলস্য, রাষ্ট্রীয়চিন্তা-বিমুখতাকে বঙ্কিমচন্দ্র কখনও রহস্যে-ব্যঙ্গে, কখনও মৃদু গঞ্জনায়, কখনও প্রচণ্ড রোষে আক্রমণ করেছেন, অন্যদিকে তিনি ইতিহাস অনুসন্ধান করে মোহমুগ্ধ বাঙালি তথা ভারতবাসীকে পূর্ব গৌরব স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই ভাবী আশার স্বর্ণদ্বার খোলার ইঙ্গিত দিয়েছেন। অর্থাৎ কি লঘু প্রবন্ধে, কি গুরু প্রবন্ধে বঙ্কিমের সদাজাগ্রত কামনা ছিল মোহগ্রস্ত ক্লীবত্ব-প্রাপ্ত দেশবাসীর ঘুম ভাঙানো এবং তাদের বৃহত্তর কর্মযজ্ঞে যোগদানের জন্য প্রস্তুত করা। পূর্বেই লক্ষ্য করেছি, স্বদেশচিন্তার ক্ষেত্রে এই কর্মটির সূচনা হয়েছিল এর এক দশক আগেই, ইতিপূর্বে 'জাতীয় গৌরবেচ্ছা সমিতি' এবং 'হিন্দুমেলা'ও এমনি সংকল্প ঘোষণা করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদের প্রতি নিবেদন'-এ অনুরূপ ইঙ্গিত সূত্রবদ্ধ, এবং বঙ্কিমের নিজের রচনায় সর্বাংশে তা অনুসৃত—

> যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গলসাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে পারেন তবে অবশ্য লিখিবেন।

মঙ্গলসাধন অথবা সৌন্দর্যসৃষ্টি বঙ্কিমের দৃষ্টিতে দুয়ে এক বা একে দুই। উপন্যাসে প্রধানত সৌন্দর্যসৃষ্টি এবং প্রবন্ধরচনায় মঙ্গলসাধনের ঈপ্সা ক্রিয়াশীল। কিন্তু পরিণামে বিস্তৃত বিশ্লেষণে এই বিভিন্নরূপী রচনার মধ্যেই উভয় উপাদানের সমাবেশ ও সামঞ্জস্য দেখতে পাওয়া যায়; পূর্বোল্লিখিত তিনটি ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ের ক্রমিক আলোচনায় তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এই উদ্দেশ্যে প্রথমে রাজনৈতিক চিন্তার প্রথম পর্যায়ভুক্ত প্রবন্ধগুলিকে তালিকাবদ্ধ করে নেওয়া গেল—

১।	ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল	লোকরহস্য	বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত
২।	ইংরাজস্তোত্র	ঐ	ঐ

৩।	বাবু	লোকরহস্য	বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত
৪।	গর্দ্দভ	"	"
৫।	বর্ষ সমালোচনা	"	"
৬।	হনুমদ্বাবুসংবাদ	"	"
৭।	ইউটিলিটি বা উদর-দর্শন	কমলাকান্তের দপ্তর	"
৮।	হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা	গ্রন্থভুক্ত নয়	"
৯।	মৃত মাইকেল মধুসূদন দত্ত	"	ভাদ্র ১২৮০, ঐ
১০।	জাতিবৈর	"	১১ই কার্ত্তিক, ১২৮০ সাধারণী
১১।	সর্ উইলিয়ম গ্রে ও সর্ জর্জ কাম্বেল	"	জ্যৈষ্ঠ ১২৮১, বঙ্গদর্শন
১২।	লর্ড রিপণের উৎসবের জমা-খরচ	"	পৌষ ১২৯১, প্রচার

বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যাতে (বৈশাখ ১২৭৯) সম্পাদক লিখিত নানা প্রবন্ধের মধ্যে দুটি বিশেষ রচনা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে—একটি 'ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল', অন্যটি 'ভারত-কলঙ্ক'। প্রথমটিতে মৃদু রহস্য-মণ্ডিত ব্যঙ্গচ্ছলে ইংরেজ শাসনের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন এবং ইংরেজ ও ভারতবাসীর সম্পর্ক নির্ণয়, দ্বিতীয়টিতে ইতিহাসচেতনাজাত জাতীয় কলঙ্কক্ষালনের প্রয়াস আছে। উক্ত রচনাদুটিতে লেখকের মনের দুটি বিশিষ্ট ভঙ্গি রাজনৈতিক চিন্তাকে প্রকাশ করেছে, আর এই দুটি ভঙ্গির শিল্পিত সমন্বয় ঘটেছে তৃতীয় আর-একটি প্রকাশভঙ্গিতে, যার নিদর্শন 'কমলাকান্তের দপ্তর', যেখানে পরাধীনতার সামগ্রিক ক্ষতির বাস্তব পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় দোষ-ত্রুটির তীব্র সমালোচনা এবং কলঙ্কমুক্তির ইঙ্গিত একত্রে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। বঙ্কিমের রাজনৈতিক চিন্তার প্রকাশ এই তিনটি ভঙ্গিতেই লক্ষ্য করা যায়। প্রথমোক্ত প্রবন্ধ দুটির বক্তব্য বিচারের পূর্বে আর-একটি কথা মনে করা দরকার—এই রাজনৈতিক চিন্তাধারায় অতি সহজেই ও স্বাভাবিকভাবেই সমাজচিন্তার মিশ্রণ ঘটেছে। কারণ বঙ্কিম নিছক রাজনীতিকে অথবা রাজনৈতিক আন্দোলনকে পরিহার করেছেন অথবা নিজের মনোভঙ্গির সঙ্গে তা খাপ খাওয়াতে পারেন নি। তাছাড়া রাজনৈতিক স্বাধীনতা সে যুগের কাম্যও ছিল না। ফলে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধে রাজনৈতিক চেতনা ও সমাজচিন্তা অঙ্গাঙ্গীভাবে সমীকৃত

('বাঙ্গালীর উৎপত্তি', 'সাম্য' ইত্যাদি)। আমরা এই শ্রেণীর প্রবন্ধগুলিকে বর্তমান পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করেছি।

'লোকরহস্য'-এর লঘুরহস্যে বঙ্কিমের রাজনৈতিক চিন্তা ও সমাজচিন্তার টানা-পোড়েনে বোনা একটি প্রায়স্বচ্ছ বহির্বাসে শিক্ষিত বাঙালির সমাজদেহকে আচ্ছাদিত করে পাদপ্রদীপের আলোয় আনা হয়েছে। লেখক বা পাঠক মুহূর্তের মধ্যেই ঐ আবরণ সরিয়ে পচনশীল ক্ষতস্থানগুলি দেখে শিউরে উঠবেন। কিন্তু লেখক বা পাঠক ঐ আবরণটুকু লোকরহস্যে সরিয়ে দিতে চান নি। পরবর্তী কালে 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এ কখনও কখনও গভীর সমবেদনায় এই জাতীয় রহস্য-আবরণটি উন্মোচন করে দেখানো হয়েছে। 'লোকরহস্য'-এর প্রবন্ধ-গুলিতে তৎকালীন ইঙ্গ-বঙ্গীয় সমাজের প্রভুপদলেহন, অনুকরণ এবং 'বাবু' কালচারের বিলাস হতে সমাজকে রক্ষা করার বাসনা (Disanglicise করার কথা বঙ্কিমের পত্রে উল্লেখ করা হয়েছে) রহস্যচ্ছলে অভিব্যক্ত হয়েছে। 'ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল'-এ বর্ণিত সুন্দরবনের ব্যাঘ্রসভা ভারতবর্ষের পাণ্ডিত্যগর্বী ইংরেজ শাসককুলের প্রতিনিধি, যারা আহারান্বেষণকে বিষয়কর্ম বলে অহংকার করে ('ইউটিলিটি' নিবন্ধের হিতবাদ দর্শন ও উদর-দর্শনের একতা প্রতিপাদনের কমলাকান্তী ব্যঙ্গ স্মরণযোগ্য), যারা অসভ্য প্রাচীন ভারতীয় জাতিকে সভ্য করার কষ্ট স্বীকার করেছে, যাদের চোখে মুদ্রাই দেবতা,—তাদের আমরা যেন চিনে রাখি। আর পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের উচ্ছিষ্টভোজী তামসিক দেশী বৈয়াকরণ (বানররূপী) হতেও আমরা যেন সাবধান হই।

আধুনিক বাঙালি 'বাবু' সম্বন্ধে ব্যঙ্গ যথেষ্ট তীব্র। আহার-নিদ্রাকুশলী চশমালঙ্কৃত, বহুভাষী, বেত্রহস্ত বাবু দশাবতার গ্রহণ করে হয়েছে কেরানি, মাস্টার, ব্রাহ্মণ, মুৎসুদ্দী, ডাক্তার, উকিল; হাকিম, জমিদার, সংবাদপত্র সম্পাদক এবং নিষ্কর্মা। এদেরই 'Disanglicised' করার বাসনা বঙ্কিমের। 'অধঃপতন সঙ্গীত'-এ এদের কথাই তো আছে। সেখানে স্পষ্ট কথা—"দেশহিত করিব কি, একা ক্ষুদ্র প্রাণী! ঢাল মদ! তামাক দে! লাও ব্রাণ্ডি পানি।"

'গর্দ্দভ' প্রবন্ধে নির্বোধ, বিচারক, গায়ক, শিক্ষক সকলকেই গর্দভমুণ্ডধারী জড়পদার্থ বলে মনে হয়েছে লেখকের। তাই শান্তশিষ্ট বাঙালির প্রতি কটাক্ষপাত—

> বিধাতা তোমায় তেজ দেন নাই, এজন্য তুমি শান্ত, বেগ দেন নাই, এজন্য সুধীর, বুদ্ধি দেন নাই, এজন্য তুমি বিদ্বান; এবং মোট না বহিলে খাইতে পাও না, এজন্য তুমি পরোপকারী।

মাতৃভাষার প্রতি নাসিকাকুঞ্চিত-করা টুপ্যাবৃতমস্তক বাঙালিবাবুকে আবার দেখা গেল 'হনুমদ্বাবুসংবাদ'-এ। এই বাবু আবার 'লোক্যাল সেল্‌ফ-গভর্ণমেণ্ট' মদগর্বিত। তাই তার মুখে ধিক্কার,—"ছি! ছি! বুঝিলাম, বাঁদরে আত্মশাসন বুঝিতে পারে না।"—এখানে আত্মদৈন্যের স্বীকৃতি বুমেরাং হয়ে ফিরে এসেছে।

উনিশ শতকের পাশ্চাত্ত্যশিক্ষা-গর্বিত নব্য বাঙালির যতগুলি দুর্বলতা ছিল, মাতৃভাষার প্রতি অবজ্ঞা তার মধ্যে অন্যতম প্রধান। এই ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজ 'ইংরাজস্তোত্র' আবৃত্তি করে ও প্রভুচরণে আত্মসমর্পণ করে বলে—

হে মিষ্টভাষিন্! আমি মাতৃভাষা ত্যাগ করিয়া তোমার ভাষা কহিব; তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও।

দেশী হাকিমদের বিচারাধিকারে ইউরোপীয় আসামীর অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে 'Ilbert Bill' উপলক্ষে যে আন্দোলন চলছিল, তার এক চিত্তাকর্ষক নক্সা আছে 'Bransonism' শীর্ষকে। ইউরোপীয় সমাজের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য কত দুস্তর সেকথা এমন লঘুস্বরে ইতিপূর্বে বলা হয় নি।

এইরূপ নানা নক্সাতে ইঙ্গ-বঙ্গীয় সমাজের প্রতি রহস্য ও কটাক্ষ উপভোগ্য, অথচ এগুলি বেশ ফলপ্রদ টোটকা চিকিৎসা। এই উদ্দেশ্যমূলক হাস্যরসসৃষ্টি পরবর্তী কমলাকান্তী তলোয়ার যুদ্ধের শিক্ষানবিসি। এগুলিতে পরপদলেহী, গর্দভমুণ্ডধারী ইংরেজি বুলি-আওড়ানো বাঙালির 'local self-government' প্রাপ্তির মরীচিকা হতে বাঙালিকে সচেতন করার প্রয়াস লক্ষণীয়। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র বেশি কিছু আশা রাখেন না, সপ্তদশ অশ্বারোহী-জিত বাঙালির কলঙ্ক তাঁর মনে থাকে—"তুমি কলিযুগে বঙ্গদেশে বৃদ্ধ সেনরাজা ছিলে,—নাহলে বঙ্গদেশে মুসলমান কেন?" এদের দেখেই হনুমান বলেছে—"এরূপ পরানুকৃত-বেশ, গমন, চাহনি প্রভৃতি অন্য কোন দেশে অসম্ভব। এ আমার স্বদেশী ও স্বজাতি, অতএব ইহাকে আমি অবশ্য আদর করিব।" এই হনুমানী আদরই আমাদের প্রাপ্য! এই বাঙালির প্রতি লেখকের ভরসা কম। "আপনার ও আমার পক্ষে সমান কথা, কেন না আপনার ও আমার পঁচাত্তরেও ঘাস জল, ছিয়াত্তরেও ঘাস জল।" এই প্রসঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তীয় কটাক্ষ মনে পড়ে—"তুমি মা কল্পতরু আমরা সব পোষা গরু" ইত্যাদি।

তৎকালীন সামাজিক অসঙ্গতির প্রতি ব্যঙ্গ 'লোকরহস্য'-এ অপেক্ষাকৃত মৃদু, কিন্তু 'কমলাকান্ত'-এর কটাক্ষ বেশ তীব্র। বাঙালিবাবু সেখানে ঢেঁকি—বোতলস্বরূপ গড়ে পিতৃধন পিষে বার করে—পিলে যকৃৎ; বাঙালি সম্পাদক, উকিল, শিক্ষক, লেখক, সবাই ঘরের ঢেঁকি কুমীর—বৈ আর কি!

এবার রবীন্দ্র-সাহিত্য থেকে এই শ্রেণীর সমর্থনী বক্তব্যের সন্ধান করা যেতে পারে।

মৃদু রহস্য-ব্যঙ্গচ্ছলে ইংরেজশাসনের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন রবীন্দ্রনাথের 'ভারতী' পর্বের কয়েকটি শ্লেষাত্মক লঘু প্রবন্ধে লক্ষ্য করা যাবে —

১।	দয়ালু মাংসাশী	শ্রাবণ ১২৮৮
২।	চীনে মরণের ব্যবসায়	জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮
৩।	জুতা ব্যবস্থা	১২৮৮
৪।	চেঁচিয়ে বলা	চৈত্র ১২৮৯
৫।	জিহ্বা আস্ফালন	শ্রাবণ ১২৯০
৬।	ন্যাশনাল ফণ্ড	১২৯০
৭।	টৌনহলের তামাসা	পৌষ ১২৯০
৮।	হাতে কলমে	১২৯০
৯।	অকাল কুষ্মাণ্ড	চৈত্র ১২৯০

রাজনীতি সম্বন্ধীয় প্রথম পরিহাস রচনা 'দয়ালু মাংসাশী'তে রবীন্দ্রনাথ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে বিদ্রূপ করেছেন বেশ সুস্পষ্ট ভাষায়। বঙ্কিমের 'ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল'-এ যে স্বচ্ছ পরিহাসের ওড়না আছে, এখানে একটি দমকা হাওয়ায় তা প্রায় উড়ে গেছে, ঝোঁকের মুখে লেখার উত্তেজনায় কবি লিখে চলেছেন—

> উদ্ভিদ্‌ভোজী ভারতবর্ষকে ইংরাজ-শ্বাপদেরা দিব্য হজম করিতে পারিয়াছেন, কিন্তু পাকযন্ত্রের প্রতি অবিশ্বাস থাকাতে মাংসাশী কান্দাহার গ্রাস করিলেন, ভাল হজম হইল না;

এই জাতীয় লঘু রাজনৈতিক নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমের ধারাটিই বজায় রেখেছেন;[৩]—কিন্তু কোথাও কোথাও সুর বড় চড়া—

> চীন কাঁদিয়া কহিল—'আমি অহিফেন থাইব না।' ইংরেজ বণিক কহিল—'সে কি হয়?' চীনের হাত দুইটি বাঁধিয়া তাহার মুখের মধ্যে কামান দিয়া অহিফেন ঠাসিয়া দেওয়া হইল, দিয়া কহিল—'যে অহিফেন খাইলে তাহার দাম দাও।' —চীনে মরণের ব্যবসায়।

বেশ লক্ষ্য করা যায়, "ব্যাঘ্রদিগের কর্তব্য, অগ্রে মনুষ্যদিগকে সভ্য করিয়া পশ্চাৎ ভোজন করেন,"—বঙ্কিমের এই জাতীয় লঘু রহস্যের আবরণ ছিন্ন করে স্পষ্ট কথা বলেছেন যুবক কবি, তাই ইংরেজ বণিকের বিরুদ্ধে তাঁর ফরিয়াদ তীব্র হয়ে উঠেছে। অবশ্য বঙ্কিমের অভিযোগও কখনও বা স্পষ্ট, কিন্তু সেটা যেন প্রসঙ্গক্রমে সহসা স্মরণ করেই প্রসঙ্গান্তরে গমন করেছেন—

> ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা লোকের কাণে মন্ত্র দিয়া তাহাদের হিতসাধন করিয়া

থাকেন। ইউরোপীয় জাতিগণ অনেক বন্য জাতির হিতসাধন করিয়াছেন, এবং রুসেরা এক্ষণে মধ্য-আসিয়ার হিতসাধনে নিযুক্ত আছেন।

—ইউটিলিটি বা উদর-দর্শন।

অথবা—

ইহাই এখনকার ইউরোপের International Law। যদি সভ্য এবং উন্নত হইতে চাও, তবে কাড়িয়া খাইবে। গো শব্দে ধেনুই বুঝ আর পৃথিবীই বুঝ, ইনি তস্করভোগ্যা।

বঙ্কিমী-ব্যঙ্গ ও কটাক্ষ যুবক রবীন্দ্রনাথের কলমে আরও ধারালো হয়ে উঠেছে। প্রবন্ধগুলিতে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত কেউই গ্রহণ করেন নি, তবে রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তাঁর রাজনৈতিক চিন্তার ক্রমবিকাশ সূচনা করেছে এগুলি।

তৎকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনের অন্তঃসারশূন্যতাকে তীব্র ব্যঙ্গ ও ধিক্কার দিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ দুজনেই। এই মনোভঙ্গিটি যাকে আমরা আলোচনা সূত্রে 'জাতীয় দোষত্রুটির তীব্র সমালোচনা ও আত্মসমীক্ষা' মূলক বলে অভিহিত করেছি,—এটি 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর প্রায় সব নিবন্ধেই লক্ষণীয়। এদিকে 'ভারতী' পর্বে ও 'সাধনা' পর্বে রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি প্রবন্ধে হাস্যকর এজিটেশন বিরোধিতার মধ্যেও একই সুরের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। যেমন কমলাকান্তী কটাক্ষে দেশহিতৈষীরা শিমুল ফুল রূপে প্রকাশিত—

এ দেশে এক জাতি লোক সম্প্রতি দেখা দিয়াছেন, তাঁহারা দেশহিতৈষী বলিয়া খ্যাত। তাঁহাদের আমি শিমুল ফুল ভাবি। —মনুষ্য ফল।

অতঃপর সনদী ঘ্যানঘ্যানে বাঙালি জাতির প্রতি কমলাকান্তের সরস কটাক্ষ ক্রমেই লক্ষ্যভেদী হয়ে উঠেছে—

কেহ বা মনে করেন, ঘ্যান্‌ঘ্যানানির চোটে দেশোদ্ধার করিবেন…। তোমাদের জাতির ঘ্যান্‌ঘ্যানানি আর ভাল লাগে না।…একটু বকাবকি লেখালেখি কম করিয়া কিছু কাজে মন দাও—তোমাদের শ্রীবৃদ্ধি হইবে।

এবার 'ভারতী' পর্বে রবীন্দ্রনাথের শ্লেষ পাশাপাশি সাজানো যেতে পারে। এজিটেশনের তারাবাজি তাঁরও মনঃপূত নয়, তাই—

আমার মতে আকাশে এরূপ দুশো তারাবাজি উড়িলেও বিশেষ কোন সুবিধা হয় না, আর ঘরের কোণে মিটি মিট করিয়া একটি মাটির প্রদীপ জ্বালিলেও অনেক কাজে দেখে। —চেঁচিয়ে বলা।

কমলাকান্তের "চক্ষে নেড়া গাছে অত রাঙ্গা ভাল দেখায় না", রবীন্দ্রনাথের চোখে দুশো তারাবাজিও তদ্রূপ। অন্যত্র—

সেদিন টাউন হলে একটা মস্ত তামাসা হইয়া গিয়াছে। দুই চারিজন ইংরেজে মিলিয়া আশ্বাসের ডুগডুগি বাজাইতে ছিলেন ও দেশের কতকগুলি বড়লোক বড় বড় পাগড়ি পরিয়া নাচন আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন।

—টৌনহলের তামাসা।[৪]

এমনি চিত্রই ছিল 'হনুমদ্বাবুসংবাদে', যেখানে বাঙালিবাবু হনুমানের স্বজাতি, তাই সে ইংরেজ রাজত্বের সুপক্ক কদলী 'local self-government'-এর লোভে নেচেছে।

রবীন্দ্রনাথ 'ন্যাশনাল ফণ্ড' প্রবন্ধে স্পষ্ট বললেন—

আমাদের দেশে পোলিটিক্যাল অ্যাজিটেশন করার নাম ভিক্ষাবৃত্তি করা।····
ভিক্ষুক মানুষেরও মঙ্গল নাই, ভিক্ষুক জাতিরও মঙ্গল নাই।

ইতিপূর্বে কমলাকান্তের দীর্ঘশ্বাস-মথিত কথা শুনেছি—

ভাই পলিটিকস্‌ওয়ালারা, আমি কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী তোমাদিগের হিতবাক্য বলিতেছি, পিয়াদার শ্বশুরবাড়ী আছে, তবু সপ্তদশ অশ্বারোহী মাত্র যে জাতিকে জয় করিয়াছিল, তাহাদের পলিটিক্‌স্‌ নাই। 'জয় রাধে কৃষ্ণ! ভিক্ষা দাও গো!' ইহাই তাহাদের পলিটিক্‌স্‌!

কমলাকান্তের তীব্র কটাক্ষ, আত্মসমীক্ষা, জাতির দুর্বলতায় রোষ-প্রদর্শন এবং সঙ্গে সঙ্গেই অশ্রুমোচন—এগুলি কখনও একসঙ্গে, কখনও একই নিবন্ধে, কখনও বা ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্যে প্রকাশ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথও এই পর্বে বঙ্কিমের পন্থা অনুসরণ করেছেন। তবে তাঁর কথা কিছু বেশি কড়া, নির্দেশ প্রসঙ্গক্রমে নয়—সুস্পষ্ট আদেশের রূপে। কমলাকান্ত নেশার প্রলাপে যা বলেছে, ভ্রমরের গুণগুণানিতে যা শুনিয়েছে, রবীন্দ্রনাথ সুস্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন ঘোষণায় তা জানিয়েছেন। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য এই যে, কতকগুলি বাঁধিবোলে সময় নষ্ট না করে সমাজের নানা প্রকার কর্তব্যে আমাদের এখন মনোনিবেশ করা উচিত। এবং তাঁর ইচ্ছা—"বঙ্গবিদ্যালয়ে দেশ ছাইয়া সেই সমুদয় শিক্ষা বাংলায় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ুক।" অর্থাৎ 'হাতে কলমে' প্রতিরোধ জানানোর সুস্পষ্ট আহ্বান তাঁর বক্তব্যের মধ্যে বিশেষভাবে সোচ্চার।

সে শুভদিন বা কখন আসিবে যখন স্বদেশের লোককে সাহায্য করিবে। এ যে শিক্ষা, এ যথার্থ শিক্ষা, এ জিহ্বার ব্যায়াম নহে, ইহাই স্বদেশ-হিতৈষিতার প্রকৃত চর্চা।

—হাতে কলমে।

এই 'জিহ্বার ব্যায়াম' রবীন্দ্রনাথের অসহ্য। তাই এজিটেশনমূলক জ্বালাময়ী বক্তৃতার প্রতি তীব্র ব্যঙ্গ 'মানসী'-র কয়েকটি কবিতাতেও অট্টহাস্যের রূপে

প্রকাশিত হয়েছিল। আমরা "অন্নপায়ী বঙ্গবাসী স্তন্যপায়ী জীব", তাই "বোতাম আঁটা জামার নীচে শান্তিতে শয়ান"—জীবনের প্রতি কবির বিতৃষ্ণা ফেটে পড়েছে। এমনি কশাঘাত আরও আছে—"অন্ধকারে ওইরে শোন, ভারতমাতা করেন প্রোণ", এহেন কালে ভীষ্ম-দ্রোণ যখন নেই, তখন—"এসো তো করি নামটা সহি লম্বা পিটিশানে"। আর 'বঙ্গবীরের' আশাও কম নয়। তাদের "উদ্দীপনায় শুধু মাথা ঘোরে", তবু "স্বদেশের তরে একটুকু হয় আশা"। বঙ্কিমের 'অধঃপতন সঙ্গীত'-এ একা ক্ষুদ্র প্রাণী বাঙালি দেশহিত করার চেয়ে ব্রাণ্ডি পানি হতে সান্ত্বনা চেয়েছে,—এরা লম্বা পিটিশনে নামটা সহি করে আশা করেছে 'স্বদেশের তরে'।

তীব্র ব্যঙ্গের সঙ্গেই বঙ্কিমের উপদেশ ছিল বকাবকি লেখালেখি ছেড়ে কিছু কাজ করার, রবীন্দ্রনাথেরও মনে 'স্বদেশহিতৈষিতার প্রকৃত চর্চা'-র কথা সুদীর্ঘ দিন ধরে একটা রূপ লাভ করেছে। এ-বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করব পরম্পরাক্রমে।

রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক প্রবন্ধের প্রথম পর্বের তীব্র পরিহাসবৃত্তি 'সাধনা' পর্বেও গম্ভীর বিশ্লেষণ-মূলক রচনার পাশাপাশি বেশ কিছুদিন ধরে স্থান পেয়েছে। বিশেষ করে 'সাধনা' পর্বের সমাজচিন্তামূলক রচনায় ব্যঙ্গ-কটাক্ষ তীব্র। ('কর্মের উমেদার', 'আলট্রা কনসারভেটিভ' ইত্যাদি)। এই শ্রেণীর মধ্যে তীব্রতম ব্যঙ্গের পরিচয় আছে 'সার লেপেল গ্রিফিন'-এ—যেখানে তীব্র ব্যঙ্গের চাবুক শন্‌শনিয়ে উঠেছে প্রবন্ধকারের হাতে। উক্ত অশিষ্ট প্রবন্ধ লেখক গ্রিফিনকে তিরস্কার করেছেন রবীন্দ্রনাথ, কারণ জাতীয় অবমাননা তাঁর সহ্য হয় নি। আসলে ইংরেজজাতির পৌরুষ ও উদারতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণা এইকালে প্রচণ্ড নাড়া খেয়েছে। এইকালেই জাতীয় চরিত্রের প্রতি কটাক্ষ ছিল জুরি প্রথার অবসানকল্পে 'ইলিয়ট রিপোর্ট'-এ। এ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নিজের বেদনা প্রকাশ করেছেন তাঁর 'ছিন্নপত্র'-এর ৮৪ ও ৮৭ নং পত্রে। পূর্বোক্ত প্রবন্ধে লেখক তীব্র ব্যঙ্গে বলেছেন, সার লেপেল গ্রিফিনের লেখায় "ভারি-একটা খেঁই খেঁই আওয়াজ দিতেছে। ইহাতে লেখকের জাতি নিরূপণ করা কিছু কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।" কারণ "সিংহের জাতে খেঁকি সিংহ কখনও শুনা যায় নাই।"

দু'বছর পরে 'অপমানের প্রতিকার' (বঙ্গদর্শন ১৩০১) প্রবন্ধতেও এই মর্মবেদনা প্রকাশ পেয়েছে।

এবার পরবর্তী প্রসঙ্গে আসা যেতে পারে। ইংরেজ শাসনের স্বরূপ-উদ্‌ঘাটন

এবং ইংরেজ ও ভারতবাসীর বিসদৃশ সম্পর্ক নির্ণয়ে বঙ্কিম যে কেবল মৃদু রহস্য-ব্যঙ্গের আশ্রয় নিয়েছিলেন তা নয়,—উষ্মাবিহীন বিশ্লেষণে সুচিন্তিত অভিমতও ব্যক্ত করেছেন দু'একটি রচনায়, যা সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয় বেনামীতে, কিন্তু পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নি। যেমন, 'জাতিবৈর' প্রবন্ধটি (১১ কার্তিক ১২৮০) বঙ্কিমচন্দ্রের রাজনৈতিক চিন্তাধারার একটি দিগ্‌দর্শনী বলা যেতে পারে। ইংরেজ শাসকের সঙ্গে ভারতবাসীর সম্পর্ক কিরূপ হওয়া উচিত, তার স্পষ্ট ইঙ্গিত এতে আছে।

> এতদুভয় জাতির মধ্যে যে বিদ্বেষ ভাব, তাহাকেই জাতিবৈর বলিতেছি। প্রায় অধিকাংশ সদাশয় ইংরেজ ও দেশীয় লোক জাতিবৈরের জন্য দুঃখিত।

বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্লেষণ করেছেন, এই জাতিবৈরের সমতা সম্ভব কিনা। "ইংরেজরা আমাদের অপেক্ষা বলে, সভ্যতায়, জ্ঞানে, এবং গৌরবে শ্রেষ্ঠ।" অর্থাৎ সাধারণ বাঙালি অপেক্ষা ইংরেজ শ্রেষ্ঠ, অতএব যদি নিকৃষ্ট পক্ষ আজ্ঞাকারী হয়, তবে জাতিবৈরের উপশম হয়। "কিন্তু ইংরেজেরা জেতা, আমরা বিজিত।" অতএব জেতা ও বিজিতের সম্পর্কের সমস্যা থাকে। ঐতিহ্যগর্বিত আমরা ভারতবাসী বা বাঙালি—ইংরেজের সম্মুখে মুখে বিনয় করলেও অন্তরে বিদ্বেষই পোষণ করি।

> অতএব এই জাতিবৈর, আমাদিগের প্রকৃত অবস্থার ফল—যত দিন দেশী বিদেশীতে বিজিত-জেতৃ-সম্বন্ধ থাকিবে, যত দিন আমরা নিকৃষ্ট হইয়াও পূর্বগৌরব মনে রাখিব, ততদিন জাতিবৈরের শমতার সম্ভাবনা নাই।

তাই বঙ্কিমচন্দ্র জাতিবৈরের তাৎকালিক স্থায়িত্ব কামনা করেছেন আমাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ইচ্ছা জাগিয়ে রাখবার জন্যে, কারণ "উন্নত শত্রু উন্নতির উদ্দীপক—উন্নত বন্ধু আলস্যের আশ্রয়।" অতএব, "জাতিবৈর এখনও বহুকাল বঙ্গদেশে বিরাজ করুক।" কিন্তু বঙ্কিম এই সূত্রে বৈপ্লবিক পন্থা অথবা বিদ্রোহের আশ্রয় নিতে নিষেধ করেছেন "জাতিবৈর স্পৃহণীয় বলিয়া, পরস্পরের প্রতি দ্বেষভাব স্পৃহণীয় নহে।" তাই বঙ্কিমচন্দ্রের মতে—বাঙালি ও ইংরেজ পরস্পরের প্রতি বিরক্ত থাকুক—কিন্তু অনিষ্ট কামনা না করুক। প্রতিযোগিতায় আমাদের নিকৃষ্ট জাতি উৎকৃষ্ট ইংরেজ জাতির সঙ্গে সমতা অর্জন করুক। ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের এই বিশ্লেষণ ইণ্ডিয়ন এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠার তিন বৎসর পূর্বে এবং কংগ্রেসপ্রতিষ্ঠার ঠিক বার বৎসর পূর্বে প্রকাশিত। আশ্চর্য নয় যে, তৎকালীন রাজনৈতিকচিন্তা অথবা সমাজচিন্তার প্রতিভূরূপে বঙ্কিমের এই মনোভঙ্গির সঙ্গে জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম যুগের দৃষ্টিভঙ্গির সুস্পষ্ট মিল দেখা যায়। এ-প্রসঙ্গে

তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতির বক্তব্যে এযুগের ইংরেজমুখিনতার উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা যেতে পারে—

To England we look for inspiration and guidance···from England must come the crowning mandate···[৫]

আবার, ইংরেজের শাসনকার্যে সর্বত্র যে ন্যায়বুদ্ধি বা প্রজারঞ্জনের প্রমাণ পাওয়া যায় না, বৈষম্য যে কম নয়—একথা বঙ্কিম নানাভাবে প্রকাশ করেছেন, নানা প্রাসঙ্গিক মন্তব্যে। অথচ একই সঙ্গে উন্নত শত্রু বঙ্গদেশে বহুদিন বিরাজ করুক—বঙ্কিম এমনি ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। স্বভাবতই উভয় উক্তির বৈষম্য আমাদের মনে সংশয়ের সৃষ্টি করে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, এ-সংশয় পরবর্তী কালে 'আনন্দমঠ'-এর (১৮৮২ খ্রীঃ) সমাপ্তিতেও এসেছিল, কিংবা 'সাম্য' প্রবন্ধের উপসংহারেও জেগেছিল। এ-বিষয়টি ক্রমেই আমাদের আলোচনায় আসবে। উন্নত শত্রুর সংস্পর্শে জাতির একটা উন্নতির আকাঙ্ক্ষা জাগবে, এই বিশ্বাস বঙ্কিমের মনে দৃঢ় ছিল। ইংরেজের সহযোগিতার কামনা এবং জাতীয় স্বাতন্ত্র্য-লাভ এ দুটি তাই আপাতবিরোধী মনে হলেও, খুব ধীর বিশ্লেষণে একে দেশভক্তির পরিপন্থী তো বলা যায়ই না,—পরিবর্ধক বলতেও আপত্তি হয় না। আমরা আরও দেখতে পাচ্ছি, বঙ্কিম জাতিগত বৈষম্যকে আলোচনার পরিধি-বহির্ভূত করেছেন। কারণ—"সেই বৈষম্য এতদ্দেশীয়গণ কর্তৃক সর্ব্বদা বিচারিত হইয়া থাকে, সুতরাং এ গ্রন্থে তাহার সবিস্তারে বিচার করিবার প্রয়োজন দেখা যায় না।" (রচনাকাল : কার্তিক ১২৮২)। বাস্তবিকই বঙ্কিমচন্দ্র জেতা ও বিজিতের মধ্যে যে বৈষম্য, তা নিয়ে বিস্তারিত বিশ্লেষণ প্রায় কোথাও করেন নি, কখনও কখনও ইঙ্গিতে দু'একটি কথা বলেছেন, কিংবা প্রসঙ্গক্রমে রসসন্দর্ভে, উপন্যাসে অথবা প্রবন্ধে কিঞ্চিৎ মন্তব্য অথবা কটাক্ষ করেই অন্য প্রসঙ্গে সরে গেছেন। এই আপাত অনীহা অথবা রচনা-সংযমের কারণ স্বরূপ এই সিদ্ধান্তে পৌছান যায় যে (১) তাঁর মতে, (ক) আপাতত ইংরেজ শাসন মঙ্গলজনক ; (খ) উন্নত শত্রু জাতীয় উন্নতির উদ্দীপক ; (গ) রাজনৈতিক স্বাধীনতার অপেক্ষা সমাজের স্বাধীনতা অধিকতর প্রয়োজনীয় ; এবং (২) বঙ্কিমের স্বাভাবিক সংযমবোধ।

এবার রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণে ইংরেজ শাসনের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন এবং ইংরেজ ও ভারতবাসীর সম্পর্ক কি ভাবে নির্ণীত হয়েছে, দেখা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ এ-বিষয়ে সবিস্তারে বিচার করেছেন,—সুদীর্ঘকালব্যাপী চিন্তাবিবর্তনের নানা পর্বে বিশ্লেষণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তাধারায় এটি মূল

উপজীব্য। তাঁর স্বদেশচিন্তার 'সাধনা' পর্বটিতে এই জাতীয় রাজনৈতিক প্রবন্ধই মূল ধারা-রূপে প্রবাহিত। তারপরেও 'বঙ্গদর্শন' পর্ব ও 'কালান্তর' পর্বে এই প্রবাহ অব্যাহত ছিল। আমরা এর একটি কালানুক্রমিক তালিকা প্রস্তুত করে সংযোজিত করছি—

গ্রন্থ	প্রবন্ধের নাম	প্রকাশকাল
রাজা ও প্রজা (সংযোজন)	মন্ত্রি-অভিষেক	১৫ই মে ১৮৯০ পঠিত, এমারেল্ড থিয়েটারের সভাতে
সমূহ (পরিশিষ্ট)	সার লেপেল গ্রিফিন	সাধনা, শ্রাবণ ১২৯৯
রাজা ও প্রজা	ইংরাজ ও ভারতবাসী	ভাদ্র ১৩০০, চৈতন্য লাইব্রেরীতে পঠিত
"	ইংরাজের আতঙ্ক	ঐ, পৌষ ১৩০০
"	রাজনীতির দ্বিধা	ঐ, চৈত্র ১৩০০
"	অপমানের প্রতিকার	ঐ, ভাদ্র ১৩০১
"	সুবিচারের অধিকার	ঐ, অগ্রহায়ণ ১৩০১
সমূহ (পরিশিষ্ট)	রাজা ও প্রজা	ঐ, চৈত্র ১৩০১
	কণ্ঠরোধ	ভারতী, বৈশাখ ১৩০৫
	রাজভক্তি	ভাণ্ডার, মাঘ ১৩১২

'সাধনা' পর্বের পরেও এই জাতীয় চিন্তাধারা লক্ষ্য করা যাবে। 'বঙ্গদর্শন' (নবপর্যায়) পর্বের এই জাতীয় প্রবন্ধ তালিকা—

প্রবন্ধ	গ্রন্থ	প্রকাশকাল
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা		জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮
নেশন কী		শ্রাবণ ১৩০৮
বিরোধমূলক আদর্শ		আশ্বিন ১৩০৮
অত্যুক্তি	(ভারতবর্ষ ও স্বদেশ)	কার্তিক ১৩০৯
রাষ্ট্রনীতি ও ধর্মনীতি		" ১৩০৯
ধর্মবোধের দৃষ্টান্ত		" ১৩০৯
ইম্পীরিয়ালিজ্‌ম্		ভারতী, বৈশাখ ১৩১২
বহুরাজকতা		ভাণ্ডার, আষাঢ় ১৩১২
প্রাচ্য ও প্রতীচ্য		ভাদ্র ১৩১৫

আরও পরবর্তী যুগে 'কালান্তর' পর্বেও ঐ জাতীয় বিশ্লেষণ যথেষ্ট লক্ষ্য করা যায়—

প্রবন্ধ	প্রকাশকাল
লড়াইয়ের মূল	পৌষ ১৩২১
ছোটো ও বড়ো	অগ্রহায়ণ ১৩২৪

স্বাধিকারপ্রমত্তঃ মাঘ ১৩২৪
কালান্তর শ্রাবণ ১৩৪০
সভ্যতার সংকট ১লা বৈশাখ ১৩৪৮

প্রায় অর্ধশতাব্দীর পরিধি হতে পূর্বোক্ত তালিকা বিন্যস্ত করা হল ; এ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের স্বমুখে উচ্চারিত সতর্কবাণীকে স্মরণ করছি—

যে মানুষ সুদীর্ঘ কাল থেকে চিন্তা করতে করতে লিখেছে তার রচনার ধারাকে ঐতিহাসিকভাবে দেখাই সংগত।...রাষ্ট্রনীতির মতো বিষয়ে কোনো বাঁধা মত একেবারে সুসম্পূর্ণভাবে কোনো-এক বিশেষ সময়ে আমার মন থেকে উৎপন্ন হয় নি—জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে নানা পরিবর্তনের মধ্যে তারা গড়ে উঠেছে। সেই-সমস্ত পরিবর্তনপরম্পরার মধ্যে নিঃসন্দেহ একটা ঐক্যসূত্র আছে। —'রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত', কালান্তর।

জীবনের অভিজ্ঞতা ও নানা পরিবর্তন বিচারের ইঙ্গিত রবীন্দ্রনাথ নিজের লেখাতেই রেখে গেছেন। 'সাধনা' পর্ব আরম্ভের ঠিক আগেই তিনি দ্বিতীয়বার বিলাত ঘুরে এসেছেন, 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারী' সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। তাঁর চোখে ইংলণ্ড তার শতাব্দীশেষের নতুন ভাবধারা নিয়ে ততটা আকর্ষণীয় হয় নি বলেই মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক মনে তখন সুখকে চাবকে চাবকে মত্ততার সীমায় না নিয়ে যাবার সংকল্প এবং বৈলাতিক কর্মশীলতার সম্পর্কে ঔদাস্য। ইউরোপীয় সভ্যতার অন্ধকার দিক কবিকে আঘাত করেছে, তাই তিনি 'Song of the shirt' কবিতা পাঠের (কবি 'Thomas Hood'-এর) প্রতিক্রিয়ায় লিখেছেন যে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চিত হচ্ছে অন্ধকার মহাদেশ আফ্রিকায়—"সেই খানেই প্রলয়ের গুপ্ত জন্মভূমি" (অনেককাল পরে 'আফ্রিকা' কবিতায় এই সাবধান বাণী উচ্চারিত)। একদিকে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার ত্রুটি যেমন তাঁর চোখে ধরা পড়েছে, তেমনি একই সঙ্গে আবার বিলেতের মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও বিশেষত নারী-স্বাধীনতার আদর্শ রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করেছে। এমনি দ্বন্দ্ব-দোলায়িত মন নিয়ে তাঁর 'সাধনা' পর্বের সূত্রপাত। এই দ্বন্দ্বের ফলে তাঁর প্রবন্ধের প্রকাশভঙ্গি দুইরূপ নিয়েছে।

'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারী'র ভূমিকাটি সাধনা পর্বের মুখবন্ধ রূপে গণ্য করা যেতে পারে। এই প্রবন্ধটি বর্তমানে দুটি স্বতন্ত্র শীর্ষকে মুদ্রিত, —'নূতন ও পুরাতন' (স্বদেশ) এবং 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য' (সমাজ)। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তায় তৎকালীন চিন্তা ও আদর্শগত বিরোধ এবং উগ্র জাতীয়তাবোধ ও বাস্তববোধের দ্বন্দ্ব তাঁর প্রায়-বিবিক্ত মনে ধরা পড়েছে। হিন্দুত্ব পুনর্জাগরণের আবেগ এবং

আলট্রামডার্নিজমের মাঝখানে তিনি দাঁড়িয়ে নিজের রায় দেবার চেষ্টা করেছেন। একদিকে যেমন প্রগতিশীল কর্মমুখর ইউরোপীয় আদর্শের প্রতি তাঁর ঝোঁকটা লক্ষণীয়, অন্যদিকে তেমনি প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি স্নেহসিক্ত প্রশ্রয়ও বিদ্যমান। এই প্রবন্ধে একদিকে ইউরোপীয় যান্ত্রিকতার প্রতি সংশয় প্রকাশিত, অন্যদিকে হিন্দুসমাজের খর্ব নাসিকা সীটকার করার অসঙ্গত আচরণের প্রতি কটাক্ষ বর্ষিত। অবশেষে উভয়পক্ষ বিশ্লেষণ করে রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হল, একদিকে নত না হয়ে চতুর্দিকে প্রসারিত হওয়ার উন্নতি আমাদের কাম্য।

এইবার বঙ্কিমের রাজনৈতিক মনোভঙ্গির সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে রবীন্দ্রনাথের উক্ত মনোভঙ্গি প্রায় পরিপূরক বলেই মনে হবে। "উন্নত শত্রু উন্নতির উদ্দীপক", জাতিবৈর স্পৃহনীয় কিন্তু দ্বেষভাব স্পৃহনীয় নয়,—বঙ্কিমের এই উক্তি মনে রেখে, রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত প্রবন্ধ 'ইংরাজ ও ভারতবাসী'-র বক্তব্য বিচার করা যাক। এই প্রবন্ধটি বঙ্কিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় চৈতন্য লাইব্রেরিতে তিনি পাঠ করেছিলেন ১৩০১ সালে। ইংরেজ জাতির বর্ণবিদ্বেষ ও আত্মম্ভরিতার সম্পর্কে ম্যাথু আর্নল্ডের মন্তব্য সত্য, এবং ভারতবর্ষে এই স্বরূপ আরও ভয়াবহ। "ইংরাজ সর্বত্রই ইংরাজ, কোথাও সে আপনার বুটজোড়াটা খুলিয়া আসিতে রাজি নহে।" এদিকে আমাদের কাগজে অনেক সময় 'অন্যায় খিটিমিটি' ও 'অমূলক কোন্দল' থাকে। দেশীয় পত্রে "ইংরেজের নিন্দা—অবশ্য দেখিতে পাইব।" ('জাতিবৈর') বঙ্কিম-কথিত এই 'জাতিবৈর'-এর মূলে যে পারস্পরিক অবিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যে তা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে; এজন্য ইংরেজও দায়ী, "পতিত ভারতবর্ষের যে একটা হৃদয় আছে"—সে তা জানতে চায় না, জয় করতে চায় না। বঙ্কিমচন্দ্র এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, যদি শ্রেষ্ঠপক্ষ নিস্পৃহ হিতাকাঙ্ক্ষী এবং শমিতবল হয়ে থাকতে পারেন—তবে এপক্ষও বিনীত হবে এবং প্রীতি আসবে। রবীন্দ্রনাথের এই কথা আরো স্পষ্ট, "আজকালকার অধিকাংশ আন্দোলন গূঢ় মনক্ষোভ হইতে উৎপন্ন", আর আছে—"সর্বপ্রথম সংকট বর্ণ লইয়া।…শ্বেতকায় আর্যগণ কালো রঙটাকে বহু সহস্র বৎসর ঘৃণাচক্ষে দেখিয়া আসিতেছেন।" ইংরেজ রাজপুরুষদের হাতে লাঞ্ছনা ও দুঃসহ অপমানও সহ্য করে দরিদ্র বাঙালি, তথাপি ইংরেজি সংবাদপত্রে বিষোদগার শুনি, এবং ইংরেজি সাহিত্যে দেখি, কালা আদমি, পারিয়া কুকুরের দেশ যেন একটি সেনানিবাস।

> বিধিবিড়ম্বনায় আমরা ইংরাজের অপেক্ষা অনেক দুর্বল এবং ইংরাজকৃত অসম্মানের কোনো প্রতিকার করিতে পারি না।

বঙ্কিমের অনুরূপ উক্তি শুনেছি—

ইংরেজেরা যে এ দেশের লোকের অপেক্ষা সাধারণতঃ শ্রেষ্ঠ তাহা আত্ম-গৌরবান্ধ ব্যক্তি ব্যতীত কেহই অস্বীকার করিবেন না।

শাসক ইংরেজ-চরিত্রের এই ঔদ্ধত্য ভারতবাসীর চিত্তজয়ের ধার ধারে না, ওদিকে নব প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় কংগ্রেস তখনও যেন দায়ে পড়ে প্রেমভিক্ষা করার নীতিই আঁকড়ে ধরতে চায়। রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণে এই বেদনাদায়ক চিত্রটি যে কত মর্মস্পর্শী হয়েছে, তীক্ষ্ণ তীব্র কটাক্ষে তা যে কী নিদারুণ হয়েছে —এই বিশাল প্রবন্ধের ছত্রে ছত্রে তার সাক্ষ্য আছে। আমরা দু'একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি—

ইংলণ্ড উত্তরোত্তর ভারতবর্ষকে তাঁহাদেরই রাজগোষ্ঠের চিরপালিত গরুটির মতো দেখিতেছেন।...যদি কখনো দৌরাত্ম্য করে সেজন্য শিং দুটা ঘষিয়া দিতে ঔদাসীন্য নাই,...ভারতবর্ষ কেবল হিসাবের খাতায় শ্রেণীবদ্ধ অঙ্কপাতের দ্বারায় নির্দিষ্ট।

এহেন পরিস্থিতিতে—"আমরা আজ পৃথিবীর রণভূমিতে কী অস্ত্র লইয়া দাঁড়াইলাম। কেবল বক্তৃতা এবং আবেদন?" এই বাক-সর্বস্ব কংগ্রেসী আন্দোলন নিষ্ফল, অতএব রবীন্দ্রনাথের পরামর্শ—"আমাদেরও এখন আত্ম-নির্মাণ—জাতিনির্মাণের অবস্থা, এখন আমাদের অজ্ঞাত-বাসের সময়।"

যদিও সক্রিয় রাজনীতি সম্পর্কে কবির অভিজ্ঞতা ছিল না, তথাপি তাঁর এই রচনায় দেশের অবস্থা-বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ সত্য। আরও লক্ষ্য করা যায় যে, ইংরেজের প্রতি কবির পূর্বের আস্থা ও বিশ্বাস ক্রমশ শিথিলমূল হয়ে পড়ছে। সেকালে কংগ্রেস সভাপতি দাদাভাই নৌরজীর ঘোষণা (১৮৯০ খ্রীঃ) শোনা গিয়েছিল, "I have never faltered in my faith in the British Character", অথচ তখন 'ছোট ইংরেজ' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের পূর্বধারণা ধূলিসাৎ হতে চলেছে। তাই গঠনমূলক দেশসেবার আহ্বান জানালেন রবীন্দ্রনাথ—

অতএব, সকল দিক পর্যালোচনা করিয়া রাজাপ্রজার বিদ্বেষভাব শমিত রাখিবার প্রকৃষ্ট উপায় এই দেখা যাইতেছে, ইংরাজ হইতে দূরে থাকিয়া আমাদের নিকট কর্তব্যসকল পালনে একান্ত মনে নিযুক্ত হওয়া।...আমাদের স্বভাবকে সমস্ত ক্ষুদ্রতার বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে পারিলে তবেই আমাদের যথার্থ দৈন্য দূর হইবে...।

ওদিকে বঙ্কিমের প্রার্থনা ছিল, "যতদিন ইংরেজের সমতুল্য না হই তত দিন যেন আমাদিগের মধ্যে জাতিবৈরিতার প্রভাব এমনই প্রবল থাকে।" কারণ, উন্নত শত্রু উন্নতির উদ্দীপক।

প্রকৃতপক্ষে, ইংরেজ ও ভারতবাসীর সম্পর্ক নির্ণয়ে রবীন্দ্রনাথ যেন বঙ্কিমের 'জাতিবৈর' সূত্রের ভাষ্যকার। উভয়ের মনোভঙ্গি পরস্পরের পরিপূরক। বঙ্কিম যে রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্য সহর্ষে সমর্থন করেছিলেন, সে হয়ত এজন্যই। তবে 'জাতিবৈর' প্রবন্ধের রচনাকাল (১২৮০ সাল) হতে 'ইংরাজ ও ভারতবাসী' প্রবন্ধের রচনাকালের (১৩০০ সাল) ব্যবধান দু'দশক। ইতিমধ্যে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়ে আবেদন নিবেদনের থালা হাতে অ্যাজিটেশন করতে লেগেছে, অর্থাৎ ইতিপূর্বের 'ইলবার্ট বিল' এবং 'ইলিয়ট রিপোর্ট'-এর প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। তাই রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণ—অথবা বঙ্কিমী-সূত্রের ভাষ্য যাই বলি, তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির আলোকে স্পষ্ট। এই প্রবন্ধে ব্রিটিশের দুঃশাসনের মুখোস উন্মোচন করা হয়েছে, এবং ভারতবাসীর দুর্বলতা ও দোষ-ত্রুটির উদ্‌ঘাটন করা হয়েছে নিরপেক্ষ বিশ্লেষণের দ্বারা। জাতির প্রতি নির্দেশও সুচিন্তিত। ইতিপূর্বে বিশ্লেষিত বঙ্কিমের উক্তিতে ছিল, ইংরেজ শাসন আপাতত স্পৃহনীয়; রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণেও প্রায় অনুরূপ সিদ্ধান্ত—

> কিন্তু কে বলিতে পারে, এই মানসিক বিদ্রোহই বিধাতার অভিপ্রেত নহে।...বোধ করি তাঁহার অভিপ্রায় এই যে, আমরা ইংরাজি সভ্যতার জ্ঞানালোকে নিজের স্বাতন্ত্র্যকেই সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিব।

উদ্ধৃত সিদ্ধান্তের বৈশিষ্ট্য এই, রবীন্দ্রনাথের মানসিক বিরূপতা ও বিদ্রোহ এখানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পরবর্তী কালে পর্যায়ে পর্যায়ে প্রবন্ধে প্রবন্ধে—এই বিরূপতা স্পষ্টতর হয়েছে।

এবারে পুনরায় বঙ্কিমের প্রবন্ধ লক্ষ্য করা যেতে পারে। 'বঙ্গদর্শন', জ্যৈষ্ঠ ১২৮১ সংখ্যায় 'শ্রীভজরাম' ছদ্মনামে বঙ্কিমচন্দ্র যে ভাষায় ও ভঙ্গিতে 'সর উইলিয়ম গ্রে ও সর জর্জ কাম্বেল'-প্রবন্ধে বৃটিশ শাসনের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছিলেন, তা অতি সংযত ও নিরুত্তাপ। এই রচনাটিই 'বাঙ্গালা শাসনের কল' শিরোনামে সংক্ষিপ্ত আকারে 'বিবিধ প্রবন্ধ'-এর (২য় ভাগ) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল (১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে অর্থাৎ প্রায় আঠার বছর পরে, বঙ্কিমের অবসর গ্রহণের পর)। এই প্রবন্ধে, সর গ্রে সকলের প্রিয় কোন্ গুণে এবং সর কাম্বেল অপ্রিয় কোন্ দোষে—এই কথা বুঝাতে কয়েকটি বিশেষ মন্তব্য করেছেন বঙ্কিম—"এই ব্রিটিশভারতীয় শাসনপ্রণালী দূর হইতে দেখিতে বড় জাঁক, শুনিতে ভয়ানক, বুঝিতে বড় গোল—ইহার প্রকৃতি কি প্রকার?" অতঃপর কোন্ রীতিতে একজন গভর্নরের দ্বারা শাসনের কল চলে—তা একটি কল্পিত ঘটনা অবলম্বনে বুঝান হয়েছে। বঙ্কিমের বক্তব্য, এই যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চলে 'কলে

শাসন'। কাম্বেল এই কল নিজে চালাতেন, আর 'গ্রে' সেই কলের অংশমাত্র। এই প্রসঙ্গে জুরি প্রথার কিয়দংশ লোপ করার প্রস্তাব বঙ্কিমের মতে একরকম ভালই,—কারণ প্রচলিত জুরি প্রথায় ইংলণ্ডের দেশাচারের অনুকরণভক্ত আমাদের দেশে নানা অবিচার হচ্ছে। আবার কার্যবিধি আইন সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য—"বৃটিশ ভারতবর্ষীয় রাজ্যে সর্ব্বাপেক্ষা তিমিরময় কলঙ্ক—দেশী বিদেশীতে বিচারাগারে বৈষম্য। দেশীর জন্য এক আইন আদালত—সাহেবের জন্য ভিন্ন আইন আদালত।" কাম্বেল এই কলঙ্ক কিছুটা অপনীত করার চেষ্টা করে প্রশংসার্হ হয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এর কিছুদিন পরেই ইলবার্ট বিল-কে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক আবহ তপ্ত হয়ে উঠেছিল (১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে)। এখন আলোচ্য প্রবন্ধে লক্ষ্য করা যায় বঙ্কিম কাম্বেলের দোষ সত্ত্বেও তাঁর গুণের প্রতি অন্ধ নন, এ-বিষয়ে কোন ভ্রান্ত উপদেশও দেন নি,—কেবল সত্যানুরোধে সমালোচনা করেছেন। কারণ বঙ্কিম জানেন, "এদেশে অন্ধ অন্ধকে পথ দেখাইতেছে, ভ্রান্ত ভ্রান্তকে উপদেশ দিতেছে।

পরবর্তী কালে নূতন কর্মবিধি আইনের জন্য প্রশংসা-অংশটুকু 'বাঙ্গালা শাসনের কল' প্রবন্ধে লোপ করা হয়েছে। মনে হয় ইলবার্ট বিলের ঝটিকায় উড়ে গেছে তা। কিন্তু প্রবন্ধটির প্রথম প্রকাশকালের বিশ্লেষণ উল্লেখযোগ্য, "তাঁহার দ্বারা যে কিছু সৎকার্য সিদ্ধ হইয়াছে তাহা কলে—তাঁহার দ্বারা যে কিছু অনিষ্ট হইয়াছে সে কলে।" গ্রে-র কলচালিত শাসন, ব্রিটিশ শাসনের প্রতীক বলতে পারা যায়। এই জাতীয় আর-একটি ছোট হিসাবনিকাশ পাই 'লর্ড রিপণের উৎসবের জমা-খরচ' শীর্ষকে আরও দশ বৎসর পরে। উক্ত রাজকীয় উৎসবে লাভের খতিয়ান নিম্ন প্রকার—

> প্রথমতঃ, আমরা এ উৎসবে লাভ করিয়াছি রাজভক্তি।...রাজভক্তি জাতীয় উন্নতির একটি গুরুতর কারণ।
>
> ...দ্বিতীয় লাভ, জাতীয় ঐক্য। এই বোধহয়, ঐতিহাসিক কালে প্রথম সমস্ত ভারতবর্ষ এক হইয়া একটা কাজ করিল। আমরা এই প্রথম বুঝিলাম যে, আমাদের মধ্যে ঐক্য ঘটিতে পারে। আমরা এই প্রথম বুঝিলাম, ভারতবর্ষীয়েরা একজাতি।
>
> তৃতীয় লাভ, রাজকীয় শক্তি।...আজ, লর্ড রিপণকে সুশাসনের জন্য পুরস্কৃত করিয়া ভারতবর্ষীয় সমাজ সেই রাজদণ্ড স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছে। ইহাই স্বাধীনতা।
>
> চতুর্থ লাভ,—এটুকু কেবল বাঙ্গালার লাভ;—সমাজের কর্তৃত্ব ভূম্যাধি-

কারীদের হাত হইতে এই প্রথম মধ্যবিত্ত লোকের হাতে গেল।... আমাদের নিবেদন, তাঁহারা সমাজ ধীরে ধীরে সুপথে চালাইলে, বিপ্লব না ঘটে।

ক্ষতি কি কি? ব্যয়বাহুল্য এবং গলাবাজির দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি,—এই দুটি মাত্র। উপরোক্ত বিশ্লেষণে একথা স্পষ্ট হয়েছে, ব্রিটিশ শাসনের কলচালনায় নানা অবিচার যে ঘটে চলেছে তার প্রতি বঙ্কিমচন্দ্র সজাগ। বিশেষত দেশী-বিদেশীতে বিচারালয়ে বৈষম্য তাঁর সর্বাধিক বেদনার কারণ। তথাপি জমা-খরচের খাতায় জমার অঙ্ক বেশি। বঙ্কিমের বক্তব্য অনুসারে, তৎকালে রাজভক্তির প্রয়োজন ভারতীয় জনতার ঐক্যের জন্যই, এবং শাসক বিদেশী থাকলেও সমাজের স্বাধীনতা এলেই যথেষ্ট; আর বিপ্লব যেন না হয়।

উপরোক্ত দুটি রচনার একটি ইলবার্ট বিল আন্দোলনের পূর্বকালীন, দ্বিতীয়টি ন্যাশন্যাল লীগ (১৮৮৩ খ্রীঃ) প্রতিষ্ঠার পরবর্তী। তৎকালের পরিস্থিতিতে এমনি বিশ্লেষণ এবং তদনুযায়ী নির্দেশ দান সমযোচিত বলেই মনে হয়। এর কয়েক বৎসর পরে 'মন্ত্রি-অভিষেক'—প্রবন্ধ পাঠ করে রবীন্দ্রনাথ লর্ড ক্রস প্রস্তাবিত 'Indian Council Bill'-এর সমালোচনা করলেন। তাঁর ক্ষোভ প্রকাশে মৃদু উত্তেজনার আভাস ছিল; কিন্তু ইংরেজ শাসককে ভারতীয় প্রজার আনুগত্যের আশ্বাসদানও ছিল। প্রবন্ধের বক্তব্য ছিল, প্রাচ্যজাতীয় ভারতবর্ষীয়েরা মন্ত্রি-অভিষেকের ভার পেলে নিশ্চয়ই অসন্তুষ্ট হবে না, ইংরেজের দুশ্চিন্তা এজন্য অস্বাভাবিক। বেশ বোঝা যায়, ইংরেজ-শাসনের প্রতি মোহ তৎকালে রবীন্দ্র-নাথেরও ছিল কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মতই। "তোমাদের প্রতি ভক্তি আছে বলিয়াই কথা কহি, নহিলে নীরব থাকিতাম।" এ-ভক্তি বঙ্কিমচন্দ্রের কথায় 'রাজভক্তি' বৈকি। এই সময়ে ইংরেজের বিবেকবুদ্ধির প্রতি ভরসাও রবীন্দ্রনাথের আছে, (পরবর্তী যুগে বড়ো ইংরেজের প্রতি যা ছিল) আবার কংগ্রেস আন্দোলনের প্রতি সমর্থনও তিনি জানিয়েছেন, "কংগ্রেসের বিরোধীপক্ষে যোগ দিতে পারিব না।" এ-সময়ের স্মৃতি প্রসঙ্গে ১৩৪৬ সালে তাঁর উক্তি উদ্ধৃত করছি—

> আমরা ছিলুম দাঁড়ের কাকাতুয়া, পাখা ঝাপটিয়ে চেঁচালুম পায়ের শিকল আরো ইঞ্চিদুয়েক লম্বা করে দেবার জন্যে...তখন সেই ইঞ্চিদুয়েকের মাপের দাবি নিয়েও রাজপুরুষের মাথা গরম হয়ে উঠত।

বঙ্কিমের সাবধানী মনোভঙ্গি—যেন 'বিপ্লব না ঘটে', যুবক রবীন্দ্রনাথের মনেও যুগপরিবেশের প্রভাবে কিছুটা সংক্রামিত। বঙ্কিমের ইংরেজ-শাসনের স্বরূপ উন্মোচন-মূলক পূর্বোদ্ধৃত অন্য-একটি উক্তির ভাষ্য পাওয়া যাবে রবীন্দ্র-

নাথের 'সাধনা'পর্বের বেশ কয়েকটি রচনায়, এগুলি বঙ্কিমের জীবনকালেই প্রকাশিত হয়েছিল। ব্রিটিশ শাসনের আভ্যন্তরিতা, জটিলতা ও কূটনীতি প্রভৃতির সার্থক উদ্ঘাটন আছে 'ইংরাজের আতঙ্ক'-এ৬। তৎকালীন ভারতীয় কংগ্রেস যে "নবনির্মিত জাতীয় জয়ঢাক" (বঙ্কিমের কথায় যেখানে কেবল 'গলাবাজির দৌরাত্ম্য'), "প্রচণ্ড শব্দকারী পলিটিক্যাল জুজুমাত্র" তা ইংরেজ জানত, কিন্তু 'গোরক্ষণী সভা' স্থাপনায় ইংরেজদের আতঙ্ক শুরু হয়েছে। অতএব হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ সৃষ্টি করতে ব্রিটিশ শক্তি উঠে পড়ে লেগেছে। এদিকে 'রাজনীতির দ্বিধা' বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট বললেন—"য়ুরোপীয় জাতি য়ুরোপে যত সভ্য, যত সদয়, যত ন্যায়পর, বাহিরে ততটা নহে, এপর্যন্ত ইহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গেছে।" অনেক প্রমাণ উপস্থিত করেও তিনি 'বড়ো ইংরেজ'-এর ন্যায়পরতার উপর আস্থা স্থাপন করতে চেয়েছেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সামগ্রিক রূপ উদ্ঘাটন করেও রবীন্দ্রনাথ এই বিশ্বাস বজায় রেখেছেন, প্রতিরোধ সংগ্রামের কথা বিবেচনা করার আগ্রহ তাঁর মনে এখনও আসে নি।

কিন্তু 'অপমানের প্রতিকার' হবে কি করে? একথা সত্য, বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে ইংরেজের বিচারালয়ে; বঙ্কিম যাকে 'সর্বাপেক্ষা তিমিরময় কলঙ্ক' বলেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতে দেশবাসীর হীনতাবোধও এজন্য দায়ী। আমাদের দাস-মনোবৃত্তির অপনোদন করতে হবে। 'মেঘ ও রৌদ্র'-গল্পের শশিভূষণের যে ব্যথা, পরবর্তী কালে 'গোরা' ও 'নিখিলেশ' যার সাক্ষ্যদান করেছে সে নিষ্ঠুর সত্য এই, "অন্যায়ের বিরুদ্ধে যদি দণ্ডায়মান হইতে হয়, তবে সর্বাপেক্ষা ভয় আমাদের স্বজাতিকে।" এদিকে রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণ ক্রমেই সঠিক তথ্যভিত্তিক হয়ে উঠেছে—

> অতএব পঁচিশ কোটি ভারতবাসীর অদৃষ্টে যাহাই থাক্ মোটা বেতনের ইংরাজ কর্মচারীকে এক্‌সচেঞ্জের ক্ষতিপূরণস্বরূপ রাশি রাশি টাকা ধরিয়া দিতে হইবে। —'রাজনীতির দ্বিধা'।

বঙ্কিমচন্দ্র উৎসবের জমাখরচে অতি শান্তস্বরে বলেছিলেন, "যে সঞ্চিত বলে সমাজযন্ত্র দ্রুতবেগে চলিবে, তাহার কিছু ব্যয় হইয়াছে।" আর পূর্বোক্ত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের ক্ষুব্ধ বেদনা ক্রমেই যেন অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। তাই 'অপমানের প্রতিকার'-কল্পে সার্বিক প্রতিরোধ করার কথা দৃঢ়স্বরে ঘোষিত হল। একদিকে ইংরেজের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হবার আহ্বান, অন্যদিকে সামাজিক লাঞ্ছনার কারণগুলো দূর করার প্রস্তাব জানালেন তিনি। তাঁর গভীর বেদনার অভিব্যক্তির পরই সংকল্পবাক শোনা গেল, "এইসব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে ধ্বনিয়া

তুলিতে হবে আশা"। জনতার জন্য তাঁর এই সংগ্রামের আহ্বান যতই ক্ষণস্থায়ী হোক,—কংগ্রেস কিন্তু তখনও নীরব।

আরও কয়েকমাস পরে 'রাজা ও প্রজা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এদেশীয় অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজের ভারতবিদ্বেষের তীব্র সমালোচনা করলেন। সমগ্র ভারতবর্ষকে পশুশালারূপে গণ্য করায় আর চাবুকের ভয় ও অস্থিখণ্ডের প্রলোভন দেখিয়ে সার্কাস দেখানোতে ইংরেজের মহত্ব প্রকাশ পায় না। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ কবি কিপলিং-এর দম্ভভরা স্পর্ধা প্রকাশের মাধ্যমে যা সৃষ্টি হয় তা ইংরেজের পক্ষে সাহিত্য কিন্তু আমাদের পক্ষে মৃত্যুর নিদান। ইউরোপীয় সভ্যনীতি কি ভারতবর্ষের জন্য নয়? স্পষ্টত বঙ্কিম-কথিত 'জাতিবৈর' আর স্পৃহনীয় নয় এবং 'দেশী বিদেশীতে বিচারাগারে বৈষম্য' সার্বিক বৈষম্যে রূপান্তরিত। রবীন্দ্রনাথ এ-প্রবন্ধে কেবল ক্ষোভ প্রকাশই করেন নি, পন্থা নির্ণয়ের উচ্ছ্বাস ও আদর্শনিষ্ঠা দেখিয়েছেন, 'বিশ্বাসের ছবি' নিয়ে এসেছেন প্রায়ই আদর্শের স্বর্গ হতে—

> যখন আমরা বহুকালব্যাপী পরাধীনতার বিষময় শিক্ষা ভুলিতে পারিব, যখন প্রবলের অন্যায়াচরণকে বিধির বিধানের স্বরূপ নীরবে অবশ্যসহ্য বলিয়া স্থির করিব না,…ত্যাগস্বীকার ও কষ্ট সহ্য করিতে পরাঙ্মুখ হইব না, তখন আমাদের যথার্থ আনন্দের দিন উপস্থিত হইবে। —রাজা ও প্রজা।

অথচ মাত্র একটি দশক পূর্বে লেখকের বক্তব্য ছিল—

> বিধিবিড়ম্বনায় আমরা ইংরাজের অপেক্ষা অনেক দুর্বল এবং ইংরাজকৃত অসম্মানের কোনো প্রতিকার করিতে পারি না। —ইংরাজ ও ভারতবাসী

ঐ মনোভঙ্গি যেন বঙ্কিমী মনোভাবের অনুরূপ;—এবার বঙ্কিমযুগশেষে (বঙ্কিমের তিরোধান ঘটেছে চৈত্র, ১৩০০) রবীন্দ্রনাথ-এর প্রবন্ধে এক নতুন সুর ধ্বনিত হল, সে সুরে প্রতিকারের ঈপ্সা ব্যঞ্জিত। পুনা-কংগ্রেসের মডারেটপন্থী সভাপতি সুরেন্দ্রনাথ যখন ঘোষণা করছেন—

> …but we have a right to appeal for help to all rightminded Englishmen,

তখন রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস—"ইংরেজের দ্বারা হত ও আহত হইবার মূল প্রধান কারণ আমাদের নিজেদের স্বভাবের মধ্যে।" জাতীয় মানসের সর্বাত্মক নৈতিক দৃঢ়তার কথা পরবর্তী 'সুবিচারের অধিকার' (১৩০১) প্রবন্ধে ছিল। হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ জিইয়ে রাখাই স্বার্থবাদী শাসকের নীতি, তাই, "আমাদের নিজেরা ব্যতীত আমাদের নিজেদের প্রতি অন্যায় ও অবিচারের প্রতিকার কাহারও সাধ্যায়ও নহে।" অতঃপর রবীন্দ্রনাথ সাম্রাজ্যবাদী শাসকের মুখোস

উন্মোচনে আরও দৃঢ়তর নিষ্ঠায় তথ্যমূলক যুক্তি প্রয়োগ করেছেন। তিনি তাঁর রাজনীতিক চিন্তাকে ক্রমেই বাস্তব ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করেছেন। বঙ্কিমী-সূত্রের ভাব্যরচনা নয়,—এবার তাঁর নিজস্ব অভিমত সুস্পষ্ট ও তীব্রতর ভাষায় প্রকাশ পাচ্ছে। কংগ্রেসের তখনও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উপর আস্থা ছিল, তাই চোখ রাঙিয়ে ভিক্ষে করা ও গলা মোটা করে গভর্নমেণ্টকে জুজুর ভয় দেখানোর বীরত্ব রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করছিলেন। 'সাধনা' পত্রিকা বন্ধ হলেও 'ভারতী'-র 'প্রসঙ্গকথায়' কংগ্রেসের 'পোলিটিকাল অধ্যবসায়ের' অবাস্তব ভূমিকাকে রবীন্দ্রনাথ যেমন বিশ্লেষণ করলেন—ইংরেজের ভীতিমূলক দমননীতিকে তিনি তেমনি নূতন সংজ্ঞা দিলেন 'প্রজাবিদ্রোহ'।[৭] সিডিশন বিলের সমালোচনা কালে তাঁর তীক্ষ্ণ মন্তব্য শোনা গেল—

> এ ভারতবর্ষটা টুপিওআলারই ভারতবর্ষ। পাগড়িওআলা ও থালিমাথা-গুলো কেবলমাত্র তাঁহাদের চা-বাগানের কুলি, নীলক্ষেত্রের চাষি, পাট-জোগানের পাইকড় এবং লাঙ্কাশিয়রের খরিদ্দার। —প্রসঙ্গকথা-৪।

ইংরেজ ও ভারতবাসীর সম্বন্ধের এত নগ্নরূপ আর ইতিপূর্বে কেউ উন্মোচিত করেন নি। বঙ্কিমের অনুত্তেজিত কণ্ঠে রাজশক্তির শ্রেষ্ঠতা স্বাকৃত ছিল. "রাজভক্তি ভারতীয় উন্নতির একটি গুরুতর কারণ"; পুনা কংগ্রেসের—"To England we look for inspiration and guidance" (1895—Poona Congress)—এই অভিমানও শোনা গিয়েছিল, কিন্তু এদিকে ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে অমরাবতী কংগ্রেসের অধিবেশনের পর, সিডিশন বিল পাশ হবার ঠিক একদিন পূর্বে রবীন্দ্রনাথের লিখিত ভাষণ শোনা গেল কলকাতা টাউনহলে—"আমি বিদ্রোহী নহি, বীর নহি, বোধকরি নির্বোধও নহি।" অতএব তাঁর নিশ্চয়ই সমালোচনার অধিকার আছে। এখানে তার কিয়দংশ উদ্ধরণযোগ্য—

> একদিকে পুরাতন আইন-শৃঙ্খলের মরিচা সাফ হইল, আবার অন্যদিকে রাজ-কারখানায় নূতন লৌহশৃঙ্খল-নির্মাণের ভীষণ হাতুড়িধ্বনিতে সমস্ত ভারতবর্ষ কম্পান্বিত হইয়া উঠিয়াছে।

এই নিদারুণ উন্মোচনের পর লেখকের কণ্ঠ ক্ষোভে ফেটে পড়েছে—মুদ্রাযন্ত্রের

> স্বাধীনতাবরণ উত্তোলন করিয়া লইলে আমাদের পরাধীনতার সমস্ত কঠিন কঙ্কাল একমুহূর্তে বাহির হইয়া পড়িবে।...দুই শত বৎসর পরিচয়ের পরে আমাদের মানবসম্বন্ধের এই কি অবশেষ?

নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথের মানসিক বিদ্রোহ এখানে সোচ্চার এবং 'সভ্যতার সংকট' পর্যন্ত এই বিদ্রোহীকণ্ঠ বারে বারে শোনা গিয়েছে। এদিকে

নাটুভ্রাতৃদ্বয় নির্বাসিত, তিলক কারারুদ্ধ হয়েছেন, আর রবীন্দ্রনাথ তিলকের সাহায্যার্থে অর্থ সংগ্রহ করছেন,—সমগ্র ভারতে রাজনৈতিক আন্দোলন তখন নতুন মোড় নিচ্ছিল। ওদিকে বিপ্লবী অরবিন্দ তখন বরোদায়, স্বামী বিবেকানন্দ ভারতে ফিরে এসেছেন এবং কম্বুকণ্ঠে ডাক দিয়েছেন দেশবাসীকে, আর নিবেদিতার বিপ্লবের অগ্নিশিখা দীপ্তিময়ী হয়ে ওঠার প্রতীক্ষা করছে। এমনি মুহূর্তে যখন ঈশানের পুঞ্জমেঘে সব অন্ধকার হয়ে এসেছে তখনই রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠ শোনা গেল, "এবার চলিনু তবে। /সময় হয়েছে নিকট, এখন/বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।" 'বর্ষশেষে' খরতর ঝঙ্কার ঝনঝনায় উচ্চসুর শোনা গেল; এবং শতাব্দীশেষে কবিমানস বুঝি রুদ্র কাপালিকের মত প্রত্যক্ষ করলেন—"শতাব্দীর সূর্য আজি রক্তমেঘ-মাঝে/অস্ত গেল", এখন হতে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ ও ভারতবাসীর সম্বন্ধকে আর আদর্শগত দুর্বলতা অথবা মহৎ ইংরেজের মহত্ত্বের আবরণে ঢেকে বিচার করেন নি। তাই বঙ্গদর্শন (নবপর্যায়) পর্বে দেখা গেল—'right-minded Englishmen'-এর প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র আস্থাও নেই।

ইংরেজের জাতিবিদ্বেষ ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের সুতীব্র ঘৃণা ও উষ্মা এইকালে যেমন প্রকাশিত হয়েছে, বৃহত্তর পটভূমিকায় আন্তর্জাতিক পরিবেশে ঔপনিবেশিক শাসকচক্রের প্রতিও তদ্রূপ তাঁর দৃষ্টি জাগ্রত হয়েছে। বঙ্গদর্শন ও ভাণ্ডার-পর্বের প্রবন্ধতালিকা বিচার করলে দেখা যাবে ইংরেজের দমননীতির প্রতিবাদ মাত্র চারটি প্রবন্ধে, কিন্তু গঠনমূলক স্বাদেশিকতা ও যুগধর্মের বিচারমূলক নিবন্ধ লিখিত হয়েছে 'বঙ্গদর্শনে' অন্তত চল্লিশটি ও 'ভাণ্ডারে' পনেরটি। এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধগুলি পরবর্তী পর্যায়ে বিচার্য। অবশ্য এসব প্রবন্ধে যুগধর্মের বিচারকালে প্রসঙ্গসূত্রে ইংরেজ-ভারতবাসীর সম্পর্ক এবং ব্রিটিশ শাসনের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন এসেছে, "হিন্দুসভ্যতার মূলে সমাজ, য়ুরোপীয় সভ্যতার মূলে রাষ্ট্রনীতি" (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা); কিংবা ইউরোপীয় ধনতান্ত্রিক কৃষ্টি ও সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতার বিরুদ্ধে উক্তি—"বর্তমানকালে সাম্রাজ্যলোলুপতা সকলকে গ্রাস করিয়াছে এবং জগৎ জুড়িয়া লঙ্কাভাগ চলিতেছে।" (ব্রাহ্মণ)। আবার 'বিরোধমূলক আদর্শ' প্রবন্ধে ইউরোপীয় ন্যাশন্যালিজম্‌-এর সর্বগ্রাসী ক্ষুধা এবং পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষের সর্বনাশা পরিণামের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

অতঃপর কার্জনী-যুগের সাম্রাজ্যবাদী দাম্ভিকতার প্রতিবাদে 'অত্যুক্তি' প্রবন্ধ প্রকাশিত হল বাদশাহী দরবারের প্রসঙ্গে—

আগামী দিল্লী-দরবারও সেইরূপ প্রতাপ বিকিরণ করিবে, কিন্তু আশা

ও আনন্দ দিবে না। শুদ্ধমাত্র দম্ভপ্রকাশ সম্রাটকেও শোভা পায় না—ঔদার্যের দ্বারা, দয়াদাক্ষিণ্যের দ্বারা, দুঃসহ দম্ভকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখাই যথার্থ রাজোচিত।

'রাজভক্তি' (১৩১২)-প্রবন্ধেও প্রিন্স অব ওয়েলসের আগমনে এমনি ক্ষুব্ধ আক্ষেপ ছিল, যারা প্রতাপের আড়ম্বরে চোখ ধাঁধায় তাদের স্বাগত জ'নান চলে না। ওদিকে বারাণসী কংগ্রেসে স্বাগতবাণী উচ্চারিত হলেও রবীন্দ্রনাথ বললেন—

আমাদের চোখ ধাঁধিয়া যায়, হৃৎকম্পও হইতে পারে, কিন্তু রাজা-প্রজার মধ্যে অন্তরের বন্ধন দৃঢ় হয় না—পার্থক্য আরও বাড়িয়া যায়।

অথচ বঙ্কিমের 'লর্ড রিপণের উৎসবের জমাখরচে' জমার ঘরে রাজভক্তি ও জাতীয় ঐক্য এবং ক্ষতির ঘরে ব্যয়-বাহুল্য এবং গলাবাজির দৌরাত্ম্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। কারণ কালব্যবধান, অর্থাৎ ১২৮১ সাল হতে ১৩১২ সাল ঠিক তিনটি দশকের ব্যবধান।

তাই রবীন্দ্রনাথ 'রাষ্ট্রনীতি ও ধর্মনীতি' প্রবন্ধে ব্রিটিশ চণ্ডনীতির স্বরূপ বিশ্লেষণকালে বললেন—

পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার আধুনিক ধর্মশাস্ত্রে পলিটিক্স্ সর্বোচ্চে, ধর্ম তাহার নিচে।
....পোলিটিকাল প্রয়োজনে ন্যায় বিচারকেও বিকারপ্রাপ্ত হইতে হয়।

'ধর্মবোধের দৃষ্টান্ত' প্রবন্ধে ঔপনিবেশিক উৎপীড়ন যে কিভাবে পলিটিকাল স্বার্থে চালিত হয়—তার অসংখ্য দৃষ্টান্তে সাম্রাজ্যবাদী প্রবক্তাদের ভণ্ডামী ধরা পড়েছে। আফ্রিকায় অথবা দক্ষিণ আমেরিকায় জাতি-বিদ্বেষ কী বীভৎস দানবিকতার সৃষ্টি করেছে তার বিবরণ দিতে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এসেছে। বেশ বোঝা যায়, তাঁর আন্তর্জাতিক দৃষ্টি ক্রমেই স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে। ইতিপূর্বেই আমরা দেখেছি, সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ সম্পর্কে বঙ্কিমের বক্রহাসিতে একটু মাত্র ইঙ্গিত ছিল, "যদি সভ্য এবং উন্নত হইতে চাও, তবে কাড়িয়া খাইবে।" এই হল 'International law'-এর নবভাষ্য অথবা 'হিতবাদ দর্শন' ও 'উদর-দর্শন'-এর সামঞ্জস্য—"ইউরোপীয় জাতিগণ অনেক বন্যজাতির হিতসাধন করিয়াছেন এবং রুসেরা এক্ষণে মধ্য আসিয়ার হিতসাধনে নিযুক্ত আছেন।" (ইউটিলিটি বা উদর-দর্শন)। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ 'ইম্পীরিয়লিজমের' সুর এই বক্র ইঙ্গিতের তুলনায় যেন বজ্রনিনাদ—

ব্রিটিশ এম্পায়ারের মধ্যে এক হইয়া যাওয়াই ভারতবর্ষের পক্ষে যখন পরমার্থ-লাভ তখন সেই মহদুদ্দেশ্যে ইহাকে জাঁতায় পিষিয়া বিশ্লিষ্ট করাই হিয়ুম্যানিটি।......

> নিজেদের নিশ্চিন্ত একাধিপত্যের জন্য একটি বৃহৎ দেশের অসংখ্য লোককে নিরস্ত্র করিয়া তাহাদিগকে চিরকালের জন্য পৃথিবীর জনসমাজে সম্পূর্ণ নিঃস্বত্ব নিরুপায় করিয়া তোলা যে কতো বড়ো অধর্ম, কী প্রকাণ্ড নিষ্ঠুরতা, তাহা ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন নাই।

স্পষ্টত পূর্বসূরী ও উত্তরসূরীর বাচনভঙ্গি ও সুরের বেশ পার্থক্য। বঙ্কিমচন্দ্র ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষায় ঋণস্বীকার করে বলেছেন, "ইউরোপীয় জাতির অধীন না হইলে আমাদের কপালে এ সুখ ঘটিত না।" এমন কি ব্রাহ্মণ-শাসিত ভারতবর্ষ হতে ইংরেজ-শাসিত ভারতবর্ষ যে অনেক ভাল সে বিচারের পর বঙ্কিম বলেছিলেন, "আমরা পরাধীন জাতি—অনেক কাল পরাধীন থাকিব—সে মীমাংসায় আমাদের প্রয়োজন নাই।" ('ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা')। বঙ্কিমের পর্যালোচনার মাত্র তিনটি দশক পরেই সেই মীমাংসার ঐতিহাসিক প্রয়োজন হয়েছে এবং তাঁরই উত্তরাধিকারী সেই মীমাংসার প্রয়োজনে অক্লান্তভাবে লিখে চলেছেন এবং ব্রিটিশ 'ইম্পীরিয়লিজম'-এর স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে চলেছেন সঙ্গত কারণেই। 'ইম্পীরিয়লিজম' প্রবন্ধ রচনার সম্পূর্ণ একটি দশক পরে জীবনের নানা ঘটনার অভিঘাত ও আন্দোলনের শেষে রবীন্দ্রনাথ আরও কয়েকটি রচনায় পূর্বোক্ত মীমাংসার প্রয়াস করেছেন। কিন্তু সেই প্রয়াসের স্বরূপটি একটু আলাদা, কারণ ইতিমধ্যে পটভূমিকা পরিবর্তিত হয়েছে। অর্থাৎ এখন শুধু ভারতবর্ষের স্বাধীনতাই নয়, বিশ্বমানবের স্বাধীনতার প্রশ্ন এখানে উঠেছে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের উদ্‌গাতা রবীন্দ্রনাথ, স্বদেশীসমাজ সংগঠনের সংকল্পবদ্ধ কবি, রাজনীতির ঘূর্ণাবর্ত হতে বাইরে এসে বর্তমানে শান্তিনিকেতনের যজ্ঞভূমিতে দাঁড়িয়েছেন, এবং শান্তিনিকেতনের সংগঠনমূলক বিপুল কর্মের মাধ্যমে ভারতীয় ঐতিহ্য-ধর্ম-কর্মের সমন্বয় প্রয়াস করেছেন। এর মধ্যেই তিনি তৃতীয়বার ইউরোপ পরিভ্রমণ করে এসেছেন এবং বিশ্বকবিরূপে বন্দিত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ এখন আর শুধুমাত্র ভারতবর্ষের গণ্ডীতেই আবদ্ধ নন, আন্তর্জাতিক চিন্তাবিদ্‌। তিনি প্রথম মহাযুদ্ধের কালোমেঘে ইতিহাসের নায়কের আগমনী শুনেছেন,—"মত্ত সাগর দিল পাড়ি গহন রাত্রিকালে/ঐ যে আমার নেয়ে।" (১৩২১)। এই 'ঝড়ের খেয়া'র নেয়ে কবিমানসকে নতুন যুগের আশা দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ আন্তর্জাতিক পটভূমিতে দাঁড়িয়ে 'সবুজ পত্র'-এ বিশ্লেষণ করেছেন 'লড়াইয়ের মূল' (পৌষ ১৩২১)। এখানে তাঁর বক্তব্য এই যে, বৈশ্য রাজকতন্ত্রের সাধনায় ইউরোপ মদমত্ত। সেখানে—

> বাণিজ্য-প্রবাহের মতো রাজত্ব-প্রবাহেরও দিনরাত আমদানি রফতানি

চলিতেছে। ইহাতে পৃথিবীর ইতিহাসে সম্পূর্ণ একটা নূতন কাণ্ড ঘটিতেছে—তাহা এক দেশের উপর আর-এক দেশের রাজত্ব এবং সেই দুই দেশ সমুদ্রের দুই পারে।......য়ুরোপের সেই প্রভুত্বের ক্ষেত্র এশিয়া ও আফ্রিকা। ...য়ুরোপের বাহিরে যখন এই নীতির প্রচার হয় তখন য়ুরোপ ইহার কটুত্ব বুঝিতে পারে না।

অথচ রবীন্দ্রনাথেরও এক সময় বিশ্বাস ছিল, (তাঁর এই বিশ্বাস রামমোহন হতে বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত সব মনীষীর উত্তরাধিকার)—

ইংরেজ ভারতের কাছে সত্যে বদ্ধ; ইংরেজ য়ুরোপীয় সভ্যতার দায়িত্ব বহিয়া এই পূর্বদেশে আসিয়াছে......। য়ুরোপের প্রধান সম্পদ বিজ্ঞান এবং জনসাধারণের ঐক্যবোধ ও আত্মকর্তৃত্বলাভ। —কর্তার ইচ্ছায় কর্ম।

এই বিশ্বাসে ভাঙন ধরেছে, তাই এবারে তিনি তাঁর বিশ্লেষণে সুস্পষ্ট ও নির্ভীকস্বরে তিক্ত বাস্তবসত্য শোনালেন—

এ পর্যন্ত ইংরেজের রাজত্বে আমরা এক-শাসন পাইয়াছি কিন্তু এক-দায়িত্ব পাই নাই। তাই আমাদের ঐক্য বাহিরের। এ ঐক্যে আমরা মিলি না, পাশে পাশে সাজানো থাকি। —ছোটো ও বড়ো।

বঙ্কিমের 'জমাখরচ'-এ লিখিত রাজভক্তিজাত ঐক্যের স্বপ্ন ভেঙে গেছে, রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণে বাস্তবদৃষ্টি সজাগ হয়ে উঠেছে। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে 'ছোটো ও বড়ো' প্রবন্ধে (অগ্রহায়ণ ১৩২৪)—'ছোটো-ইংরেজ'ও 'বড়ো-ইংরেজের' পার্থক্য নির্দেশ করলেন তিনি—

বড়ো-ইংরেজ অব্যবহিতভাবে ভারতবর্ষকে স্পর্শ করে না—সে মাঝখানে রাখিয়াছে ছোটো-ইংরেজকে। এইজন্য বড়ো-ইংরেজ আমাদের কাছে সাহিত্যে ইতিহাসের ইংরেজি পুঁথিতে।......ভারতবর্ষ তার কাছে স্তূপাকার স্ট্যাটিস্‌টিক্‌সের সমষ্টি।

আমরা মরীচিকালব্ধ দুর্ভাগা, বড়ো-ইংরেজের কাছ থেকে 'হোমরুলের' বর চেয়ে জাহাজের পথ চেয়ে থাকি আর একদিকে "ভারতসাগরের তলায় তলায় ছোটো-ইংরেজের মাইন সার বাঁধিয়া আছে"—একথা ভুলে যাই। এই ভুলের মোহেই আমাদের পূর্ববর্তী মনীষীগণ ঘোষণা করেছিলেন—"To England we look for inspiration"; বঙ্কিমের চিন্তায়ও ছিল—

ইংরেজ ভারতবর্ষের পরমোপকারী।....যে সকল অমূল্য রত্ন আমরা ইংরেজের চিত্তভাণ্ডার হইতে লাভ করিতেছি, তাহার মধ্যে....স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা এবং জাতিপ্রতিষ্ঠা ইহা কাহাকে বলে তাহা হিন্দু জানিত না। —ভারত-কলঙ্ক।

রবীন্দ্রনাথ সেই ইংরেজেরই একাংশ ছোটো-ইংরেজের প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করলেন এবং ক্ষুব্ধ স্বরে প্রশ্ন করলেন—

> দেশের সমস্ত বালক ও যুবককে আজ পুলিসের গুপ্ত দলনের হাতে নির্বিচারে ছাড়িয়া দেওয়া—এ কেমনতরো রাষ্ট্রনীতি? —স্বাধিকারপ্রমত্তঃ।

ইংরেজের দেড়শো বৎসরের শাসনে—

> এত কালের সম্বন্ধ থাকা সত্ত্বেও পূর্ব ও পশ্চিম মেলে নাই।······এ সংস্রব হইতে যত উপকারই পাই ইহার বোঝা বড়ো ভারী।

এই বোঝা যে কত দুর্বহ তা আর মাত্র দু-বছর পরেই মর্মান্তিক সত্যরূপে উদ্‌ঘাটিত করেছে একটি ঐতিহাসিক পত্র, যেটি লেখা হয়েছিল জালিয়ানওয়ালা-বাগের হত্যাকাণ্ডের পর। ২৯শে মে রাত্রে ভাইসরয় লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ডকে লেখা এই ঐতিহাসিক পত্রটি পরদিন প্রকাশিত হয়েছিল সংবাদপত্রে। এই পত্রে রবীন্দ্রনাথ নাইটহুডের প্রতীক 'স্যার' উপাধি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এই ঐতিহাসিক পত্রের অগ্নিঅক্ষরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নির্লজ্জ নগ্নরূপের উদ্‌ঘাটন আছে। অতি সংযত ভাষায় এত মর্মান্তিক সত্যকে আর কেউ ইতিপূর্বে প্রকাশ করেছেন বলে মনে হয় না। আমরা এর দু-একটি ছত্রমাত্র পড়লেও উত্তেজনা অনুভব করতে পারি আজও—

> The enormity of the measures taken by the Government in the Punjab for quelling some local disturbances has with a rude shock, revealed to our minds the helplessness of our position as British subjects in India····
>
> ·····and the universal agony of indignation roused in the hearts of our people has been ignored by our rulers······ possibly congratulating themselves for imparting what they imagine as salutary lesson···

এর অনুবাদ রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং করেছিলেন, যা দৈনিক বসুমতীতে, ১৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬ সালে প্রকাশিত হয়। এ-ব্যাপারের আরও বার বৎসর পরে (১৩৩৮) হিজলী ও চট্টগ্রামে গুলিচালনার প্রতিবাদে কবির অভিভাষণ শোনা গিয়েছিল এক জনসভায় (কার্তিক, ১৩৩৮)। সেদিন তিনি বিদেশী শাসনের নির্লজ্জ মুখবিকারকে সাবধান করে দিয়েছিলেন—নরঘাতক নিষ্ঠুরতাকে ধিক্কার দিয়েছিলেন,—সেদিন তিনি সংহত কঠিন কণ্ঠে বলেছিলেন—"এতে শাসন-কর্তাদের নৈতিক পৌরুষের প্রতি আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাসহানি ঘটবে।" (হিজলী

ও চট্টগ্রাম)। এর দু'বৎসর পরে প্রকাশিত হল 'কালান্তর' (শ্রাবণ ১৩৪০) শীর্ষক প্রবন্ধটি। শাসনকর্তাদের প্রতি বিশ্বাসহানি যে সম্পূর্ণ ঘটেছে তার সুচিন্তিত উপস্থাপনের কর্তব্যে রবীন্দ্রনাথ তখনও অতন্দ্র স্বদেশচিন্তানায়ক। উক্ত প্রবন্ধটির বক্তব্য এই, 'নব্য ইউরোপের চিত্তপ্রতীক রূপে' ইংরেজ এসেছিল, ভারতবর্ষের ইতিহাসে সেই কালান্তর সংঘটনের বিচিত্র ব্যাপার আমাদের পর্যালোচনা করতে হবে।

> অনেক দিন আশা করেছিলুম, বিশ্ব-ইতিহাসের সঙ্গে আমাদেরও সামঞ্জস্য হবে, আমাদেরও রাষ্ট্রজাতিক রথ চলবে সামনের দিকে; এবং এও মনে ছিল যে, এই চলার পথে টান দেবে স্বয়ং ইংরেজও। অনেকদিন তাকিয়ে থেকে অবশেষে দেখলুম চাকা বন্ধ। —কালান্তর।

'ল' এবং 'অর্ডার'-এর জগদ্দল পাথরের নীচে চাপা পড়েছে ঐ আশা। "য়ুরোপের বাইরে অনাত্মীয়মণ্ডলে য়ুরোপীয় সভ্যতার মশালটি আলো দেখাবার জন্যে নয়, আগুন লাগাবার জন্যে।" (কালান্তর)। এই বিশ্লেষণ ১৩৪০ সালের; রবীন্দ্রনাথ ইতিমধ্যে পৃথিবী পরিভ্রমণ করেছেন কয়েকবার, 'Nationalism' শীর্ষক বক্তৃতামালা দিয়েছেন, 'মানুষের ধর্ম' বিশ্লেষণ করেছেন,—'রাশিয়ার চিঠি' লিখেছেন। তারপরে একটি দশক ধরে নানা সূত্রে দেশের অবস্থায় ক্ষুব্ধচিত্তে ব্রিটিশ শাসনের 'ল' এবং 'অর্ডার'-এর স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন।

জীবনের শেষ প্রান্তে এলেও রবীন্দ্রনাথের ঐ 'ল' এবং 'অর্ডারের' স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে বিরতি আসে নি, তার দৃষ্টান্ত 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধটি (১লা বৈশাখ ১৩৪৮), আর 'মিস রাথবোনের' উক্তির প্রতিবাদে সংবাদপত্রে প্রেরিত চিঠিটি (৫ই জুন, ১৯৪১)। শেষোক্ত প্রতিবাদপত্রটি অন্তিমশয্যায় রোগযন্ত্রণার মধ্যেই প্রতিলিখিত হয়েছিল। এ-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের চরম ধিক্কারবাক্য উচ্চারিত হয়েছিল 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে। এতে তিনি ইতিপূর্বে আলোচিত সিদ্ধান্তগুলিই আরও গভীর নিষ্ঠা ও আস্থাভরে ব্যক্ত করেছেন। প্রথমেই তিনি তাঁর আজীবনপোষিত বিশ্বাসভঙ্গের বেদনা প্রকাশ করেছেন। "এই বিজিত জাতির স্বাধীনতার পথ বিজয়ী জাতির দাক্ষিণ্যের দ্বারাই প্রশস্ত হবে"—এই বিশ্বাসের সমাধি রচিত হয়েছে 'সভ্যতার সংকট'-এ। এই প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট ভবিষ্যৎদর্শন করেছেন যে, লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনা এই ভারতবর্ষ তার বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যায় দুর্বিষহ নিষ্ফলতাকে বহন করে পড়ে থাকবে—এই 'উচ্ছিষ্ট সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপের' বেদনা কী দুঃসহ হয়ে উঠবে। "জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের অন্তরের সম্পদ এই

সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল।"

'কালান্তর'-এ এসে বিশ্বাসে দেউলিয়া হলেও কবির অন্তিমবাণী ছিল, "মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।" ইতিপূর্বের 'সেঁজুতির' 'জন্মদিন' কবিতায় এই ঘোষণা ছিল : বলে যাব, "দ্যূতচ্ছলে দানবের মূঢ় অপব্যয়/গ্রন্থিতে পারে না কভু ইতিবৃত্তে শাশ্বত অধ্যায়।" এই দুর্মর বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের বহুচিন্তাপোষিত এবং বহু আঘাতে অটল, কারণ তিনি বারম্বার বলেছেন—"পূর্ব-পশ্চিমের যদি মিলন ঘটে তবে একটা মহৎ আইডিয়ালের উপর হইবে।" (ছোটো ও বড়ো)। হয়ত ঐ মহৎ আইডিয়ালের পরম মূর্তি 'মহামানব',—কবি শেষতম জন্মদিনে যার আগমনী গান গাইলেন,—'ঐ মহামানব আসে'। সভ্যতার সংকটত্রাণের ত্রাতারূপে ঐ মহামানব আসবে।

উক্ত মহৎ আইডিয়ালের উপর অগাধ বিশ্বাস রবীন্দ্রমানসে দৃঢ়তর হয়েছিল ভারতবর্ষের ইতিহাস উদ্‌ঘাটনে। আবার এই ইতিহাসচেতনাজাত প্রজ্ঞাও উত্তরাধিকার-সূত্রেই বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে পাওয়া, একথা অবশ্য স্বীকার্য। এবার তাই ইতিহাসচেতনার আলোকে এই দুই মনীষীর চিন্তার তুলনামূলক আলোচনা করছি। কিন্তু তৎপূর্বে পুনর্বার স্মরণ করি, বঙ্কিমের 'জাতিবৈর' প্রবন্ধ (১১ই কার্তিক ১২৮০) হতে রবীন্দ্রনাথের 'সভ্যতার সংকট' (১লা বৈশাখ ১৩৪৮) পর্যন্ত প্রায় সাত দশকের পরিক্রমার অভিজ্ঞতাটি। এতে আমরা স্পষ্ট লক্ষ্য করেছি, বঙ্কিম ইংরেজশাসনকে জাতীয় উন্নতির উদ্দীপক বলেছিলেন এবং 'বহুকাল পরাধীন থাকিব' আশঙ্কা করেছিলেন আর উত্তরসূরী রবীন্দ্রনাথ প্রথম পর্বে (সাধনা পর্বে) ঐ জাতীয় মনোবৃত্তি পোষণ করলেও শেষ পর্বে (কালান্তর পর্বে) 'ল' ও 'অর্ডারের' স্বরূপ দেখে বারম্বার শিউরে উঠেছেন এবং বিনিপাত জানিয়েছেন ইংরেজশাসনের সাম্রাজ্যবাদী শোষণযন্ত্রকে। পূর্বসূরী হতে উত্তরসূরীর মনোভঙ্গির এই পার্থক্য অর্ধশতাব্দীর দুরন্ত ইতিহাসপ্রবাহের ফলশ্রুতি।

দুই.

বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যাতেই বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাসচিন্তার প্রথম প্রকাশ 'ভারত-কলঙ্ক' নিবন্ধ (বৈশাখ ১২৭৯) আর রবীন্দ্রনাথের প্রথম ঐতিহাসিক প্রবন্ধ

প্রকাশিত হয়, নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শনে' 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' (ভাদ্র ১৩০৯)। ঊনবিংশ শতাব্দীর উত্তরাধিকার বহন করেছেন বিংশ শতাব্দীর যে উত্তরসূরী— তাঁর চিন্তাতে একটি ধারাবাহিকতা আছে কিন্তু তাতে সুস্পষ্ট বিবর্তনও এসেছে। পূর্বসূরীর ব্রত শুরু হয়েছিল জাতির কলঙ্কক্ষালনের প্রয়াসের মধ্যে আর উত্তরসূরীর যাত্রা ভারতবর্ষের ইতিহাসের মূল বৈশিষ্ট্যের আলোকিত পথে। পূর্বসূরীর ইতিহাসচেতনা আবেগমথিত দীর্ঘশ্বাসে কখনও করুণ কখনও ঐতিহ্য-গৌরবে আত্মবিহ্বল, উত্তরসূরীর চেতনায় অপ্রমত্ত নিস্পৃহতা এবং ঐতিহাসিক মূল্যমানের বিচার নিরপেক্ষতা। প্রথমজন ভারতচিন্তাকে চালচিত্ররূপে রেখে বঙ্গ-ইতিহাসের অতীতচিত্র অঙ্কনে নিবদ্ধ-দৃষ্টি, দ্বিতীয়জন ভারতচিন্তাকে কেন্দ্র করে বিশ্ব-ইতিহাসের বৃত্ত অঙ্কনে প্রবৃত্ত।

বঙ্কিমের ইতিহাসচেতনা রাজবৃত্ত, লোকবৃত্ত ও নৃবৃত্ত এই তিন পর্যায়েই প্রকাশ পেয়েছে—প্রধানত দুটি মানস প্রতিক্রিয়ায়: কলঙ্কচেতনা এবং গৌরবচেতনা। ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি একথা, এখন আর-একটি বিশেষ প্রবণতার কথা স্মরণ করছি। বঙ্কিমের অধিকাংশ স্বদেশচিন্তামূলক প্রবন্ধকে বঙ্গপ্রীতি ও ভারতপ্রীতির বৃত্তে বিন্যস্ত করা যায় এবং তাতে দেখা যাবে বঙ্গপ্রীতি হতে উৎসারিত প্রবন্ধের সংখ্যাই অধিক। ইতিহাসচেতনাজাত প্রবন্ধাবলীর ক্ষেত্রে এই সূত্রটি অতি স্পষ্ট। অবশ্য বঙ্গপ্রীতি ও ভারতপ্রীতি পরস্পর বিরোধী নয়—বরং দুই-এ মিলে 'জ্যোতির্ময় কর বঙ্গ ভারতরতনে' এই ভাবটিকে প্রতিফলিত করেছে। এই জাতীয় প্রবন্ধগুলিকে নিম্নরূপে বিন্যস্ত করা যায়—

ভারতপ্রীতিমূলক—

১। ভারত-কলঙ্ক (ভারতবর্ষ পরাধীন কেন?) বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১২৭৯।
২। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা।
৩। প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি।

বঙ্গপ্রীতিমূলক—

১।	বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার	১ম—বঙ্গদর্শন, ১২৮০
২।	বাঙ্গালার ইতিহাস	২য়— ঐ, ১২৮২
৩।	বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা—	ঐ, অগ্রহায়ণ ১২৮
৪।	বাঙ্গালীর উৎপত্তি	১ম প্রস্তাব, ঐ, পৌষ ১২৮৭
		২য় " ঐ, মাঘ "
		৩য় " ঐ, ফাল্গুন "

বাঙ্গালীর উৎপত্তি ৪র্থ প্রস্তাব, বঙ্গদর্শন, চৈত্র ১২৮৭
৫ম " ঐ, বৈশাখ ১২৮৮
৬ষ্ঠ " ঐ, জ্যৈষ্ঠ "
৭ম " ঐ, জ্যৈষ্ঠ "

৫। বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ ঐ, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৯

৬। বাঙ্গালার কলঙ্ক প্রচার, শ্রাবণ ১২৯১

৭। 'জ্ঞান সম্বন্ধে দার্শনিক মত'—(ক্ষুদ্র পরিসরে নানা পুস্তক সমালোচনাকে উপলক্ষ করে বাঙ্গালীর গৌরব এবং লজ্জার কথা দুইই বিবৃত।)

'ভারত-কলঙ্ক' প্রবন্ধের শিরোনামায় একটি প্রশ্ন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে; "ভারতবর্ষ এতকাল পরাধীন কেন?" উত্তর প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বললেন, "Effeminate Hindoos—ইউরোপীয়দিগের মুখাগ্রে সর্ব্বদাই আছে। ইহাই ভারতের কলঙ্ক।" সকলেরই এককথা, ভারতীয়েরা হীনবীর্য দুর্বল।

বঙ্কিমচন্দ্র যুক্তি প্রদর্শন করে এই কলঙ্কের অসারতা প্রতিপন্ন করেছেন। "প্রাচীন ভারতবর্ষীয় পুরাবৃত্ত নাই।" এদিকে বিদেশী লিখিত ইতিবৃত্ত আছে কিন্তু ভিন্নদেশীয় ইতিহাসবেত্তা আর কথামালার সিংহচিত্রকারী মনুষ্য সমগ্রোত্রীয়। তথাপি মুসলমান ও গ্রীক পুরাবৃত্তের প্রমাণ দ্বারাও ভারতের কলঙ্ক মোচন করা যায়।

হিন্দুদের সাত শত বৎসরের পরাধীনতা সত্ত্বেও হিন্দুর বীরত্বের অপ্রমাণ হয় না। কারণ, "আরব্য, তুরকী, এবং পাঠান এই তিন জাতির যত্নপারম্পর্য্যে সার্দ্ধপাঁচশত বৎসরে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লুপ্ত হয়।"

আসলে ভারত-কলঙ্কের কারণ তিনটি—"প্রথম,—হিন্দু ইতিবৃত্ত নাই"; দ্বিতীয়,—হিন্দু পররাজ্যাপহারী নয়; তৃতীয়,—"হিন্দুরা বহুদিন হইতে পরাধীন"।

একথা উঠতে পারে যে, পরাধীন জাতির বীর্যগৌরব হাস্যকর। তাই প্রশ্ন ওঠে, বীর্যবত্তায় হীন না হয়েও হিন্দু পরাধীন জাতি কেন? এর স্পষ্ট বিশ্লেষণ হয়—

> প্রথম, ভারতবর্ষীয়েরা স্বভাবতই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষারহিত। স্বদেশীয়, স্বজাতীয় লোকে আমাদিগকে শাসিত করুক, পরজাতীয়দিগের শাসনাধীন হইব না, এরূপ অভিপ্রায় ভারতবর্ষীয়দিগের মনে আইসে না।···রাজ্য রাজার সম্পত্তি···যে রাজা হয় হউক, আমরা কাহারও জন্য অঙ্গুলি ক্ষত করিব না।

বাস্তবিকই হিন্দুর স্বাতন্ত্র্যে অনীহা সম্পর্কে বঙ্কিমের এই নির্মম বিশ্লেষণে

চমকে উঠতে হয়, কিন্তু অপ্রিয় হলেও এটি নির্মম সত্য। "স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে?" এ-প্রস্তাবে স্বীকৃতি দিতে পারে বোধ হয় পৃথিবীতে একটি মাত্র জাতি, সে হিন্দুজাতি!

আর হিন্দুসমাজের অনৈক্য ও জাতিহিতৈষার অভাব—জাতি প্রতিষ্ঠায় বাধা দিয়েছে। তাই ক্রমে "ভারতভূমি মক্ষিকাসমাকুল মধুচক্রের ন্যায় নানা জাতি, নানা সমাজে পরিপূর্ণ হইল।"

এই একতাহীন স্পৃহাহীন ভারতবর্ষ, জাতি প্রতিষ্ঠায় নিশ্চেষ্ট ভারতবর্ষ যে পরাধীন থাকবে এতে আর আশ্চর্য কি?

এই সাহসিক বিশ্লেষণে বঙ্কিমচন্দ্র শুধু ভারত-কলঙ্ক ক্ষালনের চেষ্টাই করেন নি, জাতীয় ত্রুটি স্বীকার করে জাতি প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছেন 'nation-builder' রূপে। আবার প্রসঙ্গ-সূত্রে তিনি ইংরেজের ঋণও স্বীকার করেছেন নির্দ্বিধায়—"ইংরেজ ভারতবর্ষের পরমোপকারী"। কারণ স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা ও জাতিপ্রতিষ্ঠারূপ দুটি অমূল্য রত্ন হিন্দুরা পেয়েছে ইংরেজের সুশাসনে।

কলঙ্কমোচন এবং জাতীয় ত্রুটি নির্ধারণে বঙ্কিম তাঁর কর্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গেই পালন করেছেন। কিন্তু 'হিন্দু সাতশত বৎসর পরাধীন'—তাঁর এই আক্ষেপ অন্য প্রকার একটি সন্দেহের সৃষ্টি করেছে। বিজেতা মুসলমান জাতি কি সাত শতাব্দীতেও বিদেশী বলে গণ্য হবে? তবে কোন্ জাতির স্বাধীনতা কাম্য? বঙ্কিমচিন্তায় এই অস্পষ্ট কথাটি পরবর্তী কালে বহু বিতর্কের সূচনা করেছে। বঙ্কিম স্বয়ং এর একটা পাশ-কাটানো জবাব দিয়েছেন—পরবর্তী 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা' প্রবন্ধে।

আর-একটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে, তা হল হিন্দুগরিমার ইঙ্গিত। এই সূত্রেই বঙ্কিমের চিন্তা ভারতপ্রীতির বৃহত্তর বৃত্তকে বঙ্গপ্রীতির কেন্দ্রে আকর্ষণ করবে। "বাঙ্গালীর উৎপত্তি" শীর্ষক নিবন্ধমালায় এবং 'বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার' নিরূপণকালে ঐ আর্যগৌরবের সূত্রেই বঙ্গপ্রীতিমূলক চিন্তা গ্রথিত হবে।

জাতিপ্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গে—বাঙালি, পাঞ্জাবী, তৈলঙ্গী, মহারাষ্ট্রী, রাজপুত, জাঠ হিন্দু, মুসলমান—প্রভৃতি সকলের কথাই উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু উল্লেখযোগ্য ইঙ্গিত আছে এই উক্তিতে—ইতিহাসে "দুইবার হিন্দুসমাজ মধ্যে জাতি প্রতিষ্ঠার উদয় হইয়াছিল।" আর তা হয়েছিল মহারাষ্ট্রে শিবাজী আর পাঞ্জাবে রণজিৎ সিং-এর নেতৃত্বে; এখানেও মুসলমানদের স্থান জাতির কোন্ অংশে সে প্রশ্ন থেকে যায়।

মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্র 'Effeminate Hindoo'-র কলঙ্কের বেদনায় কেবল হিন্দু

শৌর্যবীর্যের কথাই স্মরণ করেছেন, এবং হিন্দুসমাজের বহুধাবিচ্ছিন্নতায় ত্রুটি প্রদর্শন করেছেন। আর প্রবন্ধশেষে ইংরেজশাসনের উপর ভরসা স্থাপন করেছেন। হিন্দু সেখানে নিছক হিন্দুমাত্র নয়—ভারতবর্ষের জাতির একটা দুর্বলতর অথচ বৃহত্তর অংশ, যে অংশ দেহে দুর্বল, মনে দ্বিধাগ্রস্ত এবং সম্প্রদায় ও লোকাচারগত সংকীর্ণতায় সহস্রধা। সেই অংশের দুর্বলতার মূল নিরূপণ করাই তাঁর আশুকর্তব্য মনে হয়েছিল। বৃহত্তর ক্ষেত্রে অবশ্য তিনি জাতি-প্রতিষ্ঠার কথাতে হিন্দু, মুসলমান, বাঙালি, পাঞ্জাবী প্রত্যেকের কথাই উল্লেখ করেছেন, কিন্তু পরিণামে তাঁর চিন্তা হিন্দুসমাজকে আশ্রয় করেই কেন্দ্রীভূত হয়েছে। যেমন ভারতের অন্যান্য অংশের কথা উল্লেখমাত্র করে বাঙালির সমস্যা আলোচনাই তার আশু প্রয়োজন, তেমনি মুসলমান সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করেই হিন্দুদের দুর্বলতার দিকেই দৃষ্টি দিয়েছেন আগে।

আমরা লক্ষ্য করেছি 'Effeminate Hindoos'—এই কলঙ্ক বঙ্কিম-মানসে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছিল। এই ব্যথাতেই তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাস রক্তাক্ত, এই চেতনাতেই নানা লঘুনিবন্ধ এমনকি রহস্যব্যঙ্গ-রচনা, নানা গুরু প্রবন্ধের নানা প্রাসঙ্গিক মন্তব্য বেদনাতুর। সে ব্যথার প্রথম দীর্ঘশ্বাস শোনা গিয়েছিল 'মৃণালিনীতে'—"মন্দভাগিনী বঙ্গভূমি সহজেই দুর্ব্বলা, আবার তাহাতে শত্রুহস্তে চিত্রফলক।" (৪র্থ পরিচ্ছেদ, ৪র্থ খণ্ড)।

বিশেষত সপ্তদশ অশ্বারোহীবিজিত বাংলার কলঙ্কের কথা বারবার তাঁর রচনায় প্রতিধ্বনিত হয়েছে আর এই কলঙ্কক্ষালনের প্রয়াসে ঐতিহাসিক অনুসন্ধান, যুক্তি-প্রয়োগ, উপমায় ও কথিকায় উপদেশ দান এবং প্রয়োজনে মৃদু যষ্ট্যাঘাত, বঙ্কিম কিছুই বাকি রাখেন নি। দু-একটি মন্তব্য উল্লেখ করছি—

ক. 'সপ্তদশ পাঠান কর্ত্তৃক বঙ্গজয় হইয়াছিল, এ কলঙ্ক মিথ্যা।'

—বাঙ্গালার ইতিহাস।

খ. 'সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বখতিয়ার খিলিজি বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল, এ কথা যে বাঙ্গালীতে বিশ্বাস করে, সে কুলাঙ্গার।'

—বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা।

গ. 'পিয়াদার শ্বশুরবাড়ী আছে, তবু সপ্তদশ অশ্বারোহী মাত্র যে জাতিকে জয় করিয়াছিল, তাহাদের পলিটিক্স নাই।' —পলিটিক্স।

স্পষ্টত 'ভারত-কলঙ্ক' প্রবন্ধে বিবৃত কলঙ্কচেতনা আগের দুটি ভারতচিন্তামূলক প্রবন্ধেই সীমাবদ্ধ, এর পরে তাঁর সমগ্র দৃষ্টি বাংলার কলঙ্কে নিবদ্ধ হয়েছে। আর ক্ষোভ উচ্ছ্বসিত হয়েছে মিনহাজউদ্দীন প্রদত্ত মিথ্যা (বঙ্কিমের মতে) অপবাদের জন্য।

'বালক-মনোরঞ্জন যোগ্য উপন্যাস মাত্র' রচয়িতা বিদেশী ইতিহাসবেত্তাগণ যারা 'কথামালার সিংহচিত্রকারী মনুষ্যের সমতুল্য'—বঙ্কিমকে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ করেছিল এবং এই ক্ষোভে তিনি ইতিহাসের তথ্য অনুসন্ধানে রত হয়েছিলেন। দেশের যথার্থ ইতিহাস না থাকার ক্ষোভ তাঁর বহু প্রবন্ধে অভিব্যক্ত হয়েছে—

ক. 'প্রাচীন ভারতবর্ষীয় পুরাবৃত্ত নাই।' —ভারত-কলঙ্ক।

খ. 'হিন্দুদিগের ইতিবৃত্ত নাই, এক একটি শাসনকর্ত্তার গুণগান করিয়া শত শত পৃষ্ঠা লিখিবার উপায় নাই।' —প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি।

গ. 'সাহেবেরা যদি পাখী মারিতে যান, তাহারও ইতিহাস লিখিত হয়, কিন্তু বাঙ্গালার ইতিহাস নাই।' —বাঙ্গালার ইতিহাস।

অতএব কলঙ্কমোচনের জন্য ইতিহাস অনুসন্ধান এবং গৌরববোধে ঐতিহ্য উন্মোচন করার কামনা। কারণ—

ইতিহাস-বিহীন জাতির দুঃখ অসীম।···সেই হতভাগ্য জাতিদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য বাঙ্গালী। উড়িয়াদিগেরও ইতিহাস আছে। —বাঙ্গালার ইতিহাস।

ভারতবর্ষের ইতিহাস না থাকার দুঃখ আরও তীব্র হয়েছে 'বাঙ্গালার ইতিহাস' না থাকার মর্মদাহে।

যাহার সুখ গিয়াছে—সুখের নিদর্শন গিয়াছে—বঁধু গিয়াছে, বৃন্দাবনও গিয়াছে, এখন আর চাহিবার স্থান নাই—সেই দুঃখী, অনন্ত দুঃখে দুঃখী।

—একটি গীত।

এই ইতিহাস রচনার তীব্র ইচ্ছা বঙ্কিম 'বিবিধ প্রবন্ধ' ২য় ভাগের ভূমিকায় ব্যক্ত করেছিলেন—

এক সময়ে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, বাঙ্গলার ঐতিহাসিক তত্ত্বের অনুসন্ধান করিয়া, একখানি বাঙ্গলার ইতিহাস লিখিব। অবসরের অভাবে, এবং অন্যের সাহায্যের অভাবে সে অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। অন্যকে প্রবৃত্ত করিবার জন্য বঙ্গদর্শনে বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম।

বঙ্কিমের আবেগদীপ্ত আকাঙ্ক্ষা বঙ্গদর্শনে পূর্বোক্ত প্রবন্ধগুলিতে বাংলার অতীত দর্শন করেছে। ঐ অতীত কীর্তিময়, দীপ্তিময়, প্রাণস্পন্দিত। শুধু প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান নয়,—"ইতিহাসের প্রকৃত যে ধ্যান তাহা হৃদয়ঙ্গম করা চাই"—এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েই বঙ্কিম বাংলার গৌরব উপলব্ধি করেছেন। কলঙ্কক্ষালনের পরই গৌরব-বোধের প্রতিষ্ঠা বঙ্কিমের অভীপ্সা।

বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই। কে লিখিবে?

তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। যে বাঙ্গালী, তাহাকেই লিখিতে হইবে। মা যদি মরিয়া যান, তবে মার গল্প করিতে কত আনন্দ। আর এই আমাদিগের সর্ব্বসাধারণের মা জন্মভূমি বাঙ্গালাদেশ, ইঁহার গল্প করিতে কি আমাদিগের আনন্দ নাই ?

—বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস সংগ্রহ ও গ্রন্থনের একান্ত কামনার অভিব্যক্তিগুলি এখানে স্মরণ করা যেতে পারে—

ভারতবর্ষের যে ইতিহাস আমরা পড়ি এবং মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা দিই, তাহা ভারতবর্ষের নিশীথকালের একটা দুঃস্বপ্নকাহিনীমাত্র।

যে-সকল দেশ ভাগ্যবান তাহারা চিরন্তন স্বদেশকে দেশের ইতিহাসের মধ্যেই খুঁজিয়া পায়, বালককালে ইতিহাসই দেশের সহিত তাহাদের পরিচয়সাধন করাইয়া দেয়। আমাদের ঠিক তাহার উল্টা। দেশের ইতিহাসই আমাদের স্বদেশকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। —ভারতবর্ষের ইতিহাস।

অতএব ইতিহাস চাই।

হে ঐতিহাসিক, আমাদের সেই দিবার সংগতি কোন্ প্রাচীন ভাণ্ডারে সঞ্চিত হইয়া আছে তাহা দেখাইয়া দাও, তাহার দ্বার উদ্‌ঘাটন করো।

—ভারতবর্ষের ইতিহাস।

স্বদেশী প্রণালীর শিক্ষার প্রধান ভিত্তি যেমন নিষ্ঠাবান গুরু, "তাঁহার অধ্যাপনের প্রধান অবলম্বন স্বদেশের একখানি সম্পূর্ণ ইতিহাস।" এর ফলশ্রুতি রবীন্দ্রনাথের মতে—

স্বদেশের ইতিহাস নিজেরা সংগ্রহ এবং রচনা করিবার যে উদ্‌যোগ সেই উদ্‌যোগের ফল কেবল পাণ্ডিত্য নহে। তাহাতে আমাদের দেশের মানসিক বদ্ধ জলাশয়ে স্রোতের সঞ্চার করিয়া দেয়। সেই উদ্যমে, সেই চেষ্টায় আমাদের স্বাস্থ্য—আমাদের প্রাণ। —ঐতিহাসিক চিত্র।

"বাঙ্গালীর ইতিহাস চাই" এবং "তুমি লিখিবে আমি লিখিব",—বঙ্কিমের এই ইচ্ছার ঠিক পরিপূরক,—"স্বদেশের ইতিহাস নিজেরা সংগ্রহ এবং রচনার উদ্‌যোগ।" শুধু তাই নয়। বঙ্কিম বললেন, "মার গল্প করিতে কত আনন্দ," রবীন্দ্রনাথের—

…প্রস্তাব এই যে, ইতিহাসকে কথা ও যাত্রার আকারে, স্থান ও কালের উজ্জ্বল বর্ণনার দ্বারা সজীব সরস করিয়া দেশের সর্বত্র প্রচার করিবার উপায় অবলম্বন করা হউক। —ইতিহাস কথা।

কারণ—

> আমাদের দেশে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে যে জ্ঞানের বৈষম্য সবচেয়ে বেশি করিয়া অনুভব করা যায়, তাহা ইতিহাসজ্ঞান। —ইতিহাস কথা।

দেখা গেল দুজনেরই ইতিহাস-উদ্ধারের কামনা সমভাবে তীব্র। এই ইতিহাস রচনার সময় কিরূপ দৃষ্টিভঙ্গি থাকবে, সেকথা বঙ্কিম আগেই জানিয়েছিলেন। এজন্য "গুণহীনা মাতার প্রতি সৎপুত্রের যে স্নেহ" সে স্নেহ নয়,—"গুণবতী মাতার প্রতি সৎপুত্রের যে স্নেহ"—সেই স্নেহ প্রয়োজন। বাঙালির দুর্ভাগ্য—

> যে জাতি জন্মভূমিকে 'স্বর্গাদপি গরিয়সী' মনে করিতে না পারে সে জাতি জাতিমধ্যে হতভাগ্য। আমরা সেই হতভাগ্য জাতি বলিয়া এ রোদন করিলাম। —'Three Years in Europe' গ্রন্থের সমালোচনা।

ইংরেজ জাতির সঙ্গে তুলনায় আমাদের কিছু কি ভাল নয়, সবই নিকৃষ্ট? বঙ্কিম এই প্রশ্নেই ইতিহাসমূলক দৃষ্টিভঙ্গির কথা তুলেছিলেন। অবশ্য ইতিহাস-চর্চা বাংলাদেশে ইতিপূর্বেই শুরু হয়েছিল, একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। সেযুগে ত্রিধারায় তিন প্রকার দৃষ্টিভঙ্গিতে এই আলোচনা চলেছিল—

১। জোনস, কোলব্রুক সাহেব প্রমুখ পণ্ডিতগণের গবেষণায় বৈজ্ঞানিক নিস্পৃহ দৃষ্টিভঙ্গি।

২। শ্রীরামপুর মিশনের কেরী, মার্শম্যান, ওয়ার্ড প্রমুখ আলোচকদের খ্রীস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে কিঞ্চিৎ অবজ্ঞার দৃষ্টিভঙ্গি।

৩। ভারতীয় পণ্ডিতগণ: রামমোহন এবং তত্ত্ববোধিনী গোষ্ঠীর—দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার, রাজেন্দ্রলাল এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখের সশ্রদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি।

বঙ্কিম স্পষ্টতই এই তৃতীয় দৃষ্টিভঙ্গির কথাই বলেছেন। আর রবীন্দ্রনাথও এই দৃষ্টিভঙ্গিতেই 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা' বিশ্লেষণ করেছেন। শুধু বুদ্ধিবাদী বিশ্লেষণ নয়, তাতে স্বাজাত্য-গৌরববোধ-জনিত আবেগ যুক্ত হয়েছে 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' প্রভৃতি প্রবন্ধে। এই আবেগ পূর্বসূরী বঙ্কিমের রচনাতেও ওতপ্রোতভাবে ছিল।

> আমরা যদি অন্য জাতির অপেক্ষা বাঙ্গালী জাতির, অন্য দেশের অপেক্ষা বাঙ্গালাদেশের কোন বিশেষ গুণ না দেখি, তবে আমাদিগের দেশবাৎসল্যের অভাব হইবে।

এইজন্যই "গুণবতী মাতার প্রতি সৎপুত্রের যে স্নেহ"—তাই বঙ্কিমের কাম্য। এবং তজ্জন্য "ইতিহাসের প্রকৃত যে ধ্যান তাহা হৃদয়ঙ্গম করা চাই"।

বঙ্কিম বাংলাদেশ ও বাঙালিজাতির ইতিহাস উদ্‌ঘাটনে অপেক্ষাকৃত বেশি মনোযোগী হয়েছিলেন, আর রবীন্দ্রনাথ 'ভারতবর্ষকে' উপলব্ধি করার সাধনা করেছেন—যে সাধনাকে আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেন 'ভারতসত্তার মহাভাষ্য নির্ণয়' আখ্যা দিয়েছেন।

উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গিজাত বিশ্লেষণে, অনুসন্ধানে এবং 'প্রকৃত ধ্যানে' যে ইতিহাস উদ্‌ঘাটিত ও সৃষ্ট হবে তার স্বরূপ ও প্রকৃতি বঙ্কিমের ভাষায় "কতক উপন্যাস, কতক বাঙ্গালার বিদেশী বিধর্মী অসার পরপীড়কদিগের জীবনচরিতমাত্র" হবে না কারণ, মাতৃভূমির গুণানুসন্ধান প্রয়োজন, প্রয়োজন পালরাজা-সেনরাজাদের কীর্তিকথনের, পাঠান রাজত্বকালের Renaissance-র উৎস সন্ধানের। ইউরোপের ইতিহাসের সঙ্গে তুলনা করে এ নবজাগরণের বার্তাবাহীর নামকীর্তন করে গর্ববোধ করা প্রয়োজন।

কেবল রাজবৃত্ত নয়, লোকবৃত্ত ও নৃবৃত্তও প্রয়োজন। গৌর, তাম্রলিপ্ত, সপ্তগ্রামাদি নগরশোভিত বাংলা, নৈষধচরিত্র-গীতগোবিন্দ সৃষ্টির মানসভূমি, রঘুনাথ শিরোমণি ও চৈতন্যদেবের মনীষাসমৃদ্ধ দেশের গৌরবময় ঐতিহ্য উদ্‌ঘাটনও প্রয়োজন।

"আমাদের এই Renaissance কোথা হইতে।" 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' বলতে গিয়ে বঙ্কিম এই প্রশ্নের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ দিয়েছেন। কলঙ্কক্ষালন এবং ঐতিহ্য উন্মোচনই নয়, অধঃপতনের মূল কারণ অনুসন্ধান করে ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দেওয়ার প্রয়াসও এগুলির মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। কেবল 'বাঙ্গালীর উৎপত্তি' নির্ণয় করে ক্ষান্ত হন নি বঙ্কিম,—বাঙালির ভবিষ্যৎ আশার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণও করেছেন—

> এখন সে সময় বোধ হয় উপস্থিত। বাহুবলে না হউক, বুদ্ধিবলে যে বাঙ্গালী অচিরে পৃথিবীমধ্যে যশস্বী হইবে, তাহার সময় আসিতেছে।
>
> —বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার, ২য় প্রস্তাব।

এইখানেই বঙ্কিমচন্দ্র 'ইতিহাসের ধ্যানে' ধ্যানী (seer and nation-builder); তাই তিনি আবেগ-মথিত আনন্দে ধ্যান-নেত্রে দেখেছেন দেশ-মাতৃকার গৌরবময় রূপ—"মা যা হইবেন।" কমলাকান্তের দপ্তরে ('একটি গীত', 'আমার দুর্গোৎসব') ইতিহাসের সেই ধ্যান-সঞ্জাত মূর্তি উন্মোচিত। সেখানে বঙ্কিমের ইতিহাসচেতনা ভবিষ্যৎকে আদর্শায়িত করেছে। এই Idealisation

বা আদর্শীকরণ রবীন্দ্রনাথের মহাভাষ্য-নির্ণয় কালেও ঘটেছে। প্রথমে রবীন্দ্রনাথের মতে ইতিহাস রচনার জন্য অপেক্ষিত দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করা যায়—

ক. আমরা যে ইতিহাস সংকলন করিব তাহাও যে বিশুদ্ধ সত্য হইবে এ আশা করি না, কিন্তু ইতিহাসের যে অংশ প্রমাণ অপেক্ষা ঐতিহাসিকের মানসিক প্রকৃতির উপর বেশি নির্ভর করে সে অংশে আমাদের স্বজাতীয় প্রকৃতির সৃজন কর্তৃত্ব আমরা দেখিতে চাই। —ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিত।

খ. যিনি সমস্ত ভারতবর্ষকে সম্মুখে মূর্তিমান করিয়া তুলিবেন অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়াইয়া সেই ঐতিহাসিককে আমরা আহ্বান করিতেছি।

—ভারতবর্ষের ইতিহাস।

গ. ইতিহাস সকল দেশে সমান হইবেই এ কুসংস্কার বর্জন না করিলেই নয়।

—ভারতবর্ষের ইতিহাস।

লোকবৃত্ত অর্থাৎ সমগ্র জাতির ইতিহাস রচনাই কবির লক্ষ্য। তাঁর মতে, ভারতবর্ষের ইতিহাস রাষ্ট্রীয় ইতিহাস নয়, যে ঐক্যসূত্রে ভারতবর্ষের অতীত ভবিষ্যৎ বিধৃত তাকে যথার্থভাবে অনুসরণ করতে গেলে আমাদের শাস্ত্র, পুরাণ, কাব্য, সামাজিক অনুষ্ঠান প্রভৃতির মধ্যে প্রবেশ করতে হয়—রাজবংশাবলীর জন্য বৃথা আক্ষেপ করে বিশেষ লাভ নেই। এই দৃষ্টিভঙ্গিতেই 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা' অনুসরণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনা ও সেই ইতিহাসের ধারার তাৎপর্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে তার মধ্যেও স্বদেশভাবনার আদর্শায়িত রূপের ইঙ্গিত পাওয়া যাবে।

এইবার আলোচনা করা যায় বঙ্কিম ইতিহাসের ধ্যানে কিভাবে সামগ্রিক ইতিহাস রচনার প্রেরণা ও ইঙ্গিত রেখেছেন, তাঁর ঐতিহাসিক প্রবন্ধমালায়। "বস্তুতঃ বাংলাদেশের ইতিহাস রচনায় বঙ্কিম তিন দিক দিয়েই অনুসন্ধানের সূচনা করেছিলেন—নৃতত্ত্ব, রাজবৃত্ত এবং লোকবৃত্ত।"[৮]

অতঃপর নিম্ন প্রকারে বঙ্কিমের এই জাতীয় প্রবন্ধগুলি বিন্যস্ত করা যায়—

প্রথম শ্রেণীতে— ক. বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার
খ. বাঙ্গালীর উৎপত্তি

দ্বিতীয় শ্রেণীতে— ক. বাঙ্গালার ইতিহাস
খ. বাঙ্গালার কলঙ্ক
গ. বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ

তৃতীয় শ্রেণীতে— ক. বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা
খ. বঙ্গদেশের কৃষক
গ. বাঙ্গালির বাহুবল

নৃ-তত্ত্বের সাহায্যে লোকবৃত্তকে জানার উদ্দেশ্যে বঙ্কিম 'বাঙ্গালীর উৎপত্তি' বিশ্লেষণ করেছেন। 'এশিয়াটিক রিসার্চেস' পত্রিকায় প্রকাশিত কোলব্রুক সাহেবের নিবন্ধের পর এর গুরুত্ব সমধিক। ঐতিহাসিক রমাপ্রসাদ চন্দ বঙ্কিমকে এজন্যেই 'বাঙ্গলার বাঙ্গলাভাষায়' জাতিতত্ত্ব আলোচনায় গুরু বলেছেন। বঙ্কিমের বিশ্লেষণে বুদ্ধিজাগ্রত সচেতনতা আছে যা আর্যগৌরববোধে স্ফীত নয় এবং যাতে ঐতিহাসিক সত্যকে অস্বীকার করে আদর্শায়িত করার চেষ্টা নেই। বস্তুত উনবিংশ শতাব্দীসুলভ আর্যামির বড়াই বঙ্কিমের প্রবন্ধে অন্তত অনেকাংশে সংযত, বরং বলা চলে অনুপস্থিত। তাঁর নিম্ন সিদ্ধান্তগুলি এখনও অকাট্য—

ক. 'বাঙ্গালী কেবল দুইভাগে বিভক্ত, ব্রাহ্মণ ও শূদ্র।'
খ. 'বাঙ্গালী শূদ্রদিগের মধ্যে এইরূপে হিন্দুত্বপ্রাপ্ত অনার্য্য থাকা অসম্ভব নহে।'
গ. 'প্রথম কোলবংশীয় অনার্য্য, তারপর দ্রাবিড়বংশীয় অনার্য্য, তারপর আর্য্য, এই তিনে মিশিয়া আধুনিক বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি হইয়াছে।'

বর্ণধর্মিত্বহেতু এই তিনটি স্রোত পৃথক থেকেছে। চার প্রকার বাঙালির—
এক আর্য্য, দ্বিতীয় অনার্য্য হিন্দু, তৃতীয় আর্য্যানার্য্য হিন্দু আর তিনের বার এক চতুর্থ জাতি বাঙ্গালী মুসলমান।

বাংলার ইতিহাস কল্পনায় অথবা ধ্যানে বঙ্কিমের বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ্য। বাঙালি জাতি বলতে তিনি কেবল উচ্চবর্ণকেই বোঝেন নি,—অনার্য ও মিশ্রিত রক্তের নিম্নবর্ণ এবং মুসলমানকেও ধরেছেন। দূর হতে দেখে বাঙালির ইতিহাস আর্যজাতির ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তাই বঙ্কিমের মতে বাংলার ইতিহাস কেবল রাজবৃত্ত নয়, লোকবৃত্ত। সামাজিক ইতিহাসে তাঁর বিশ্লেষণও যথেষ্ট চিন্তাশীল। 'বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার' প্রবন্ধের ৭টি অধ্যায়ে তার প্রমাণ আছে। এখানেও বঙ্কিমী সিদ্ধান্তগুলি যুক্তিগ্রাহ্য—

ক. 'ইহা সিদ্ধ যে যখন ভারতে বেদ, স্মৃতি এবং ইতিহাস সঙ্কলিত হইতেছিল, তখন এদেশ ব্রাহ্মণশূন্য অনার্য্য ভূমি।' —১ম প্রস্তাব।

তথাপি আর্যগরিমার গর্ব একেবারে খারিজ না করে বঙ্কিম সিদ্ধান্ত করলেন—

খ. 'আর্য্যগণ বাঙ্গালায় তাদৃশ কিছু মহৎ কীর্ত্তি রাখিয়া যান নাই—আর্য্য-কীর্ত্তিভূমি উত্তর পশ্চিমাঞ্চল। এখন দেখা যাইতেছে যে আমরা সে কীর্ত্তি ও যশেরও উত্তরাধিকারী।'

গ. 'এই বাঙ্গালা নয়শত বৎসর পূর্বে আর্য্যভূমি ছিল না, অনার্য্যভূমি ছিল; এবং এক্ষণে ভারতবর্ষের সঙ্গে ইংরেজদিগের যে সম্বন্ধ, বাঙ্গালার সহিত আর্য্যদিগের সেই সম্বন্ধ ছিল।'

ঘ. 'সুতরাং সপ্তদশ অশ্বারোহী কর্ত্তৃক বঙ্গজয়ের যে কলঙ্ক, তাহা আর্য্য-দিগের কিছু কমিতেছে বটে।'

ইতিহাসের এই ব্যাখ্যাটুকুতে বঙ্কিমের আবেগ-ব্যাকুলতা স্বাভাবিক, 'মৃণালিনী' হতেই এর সূত্রপাত। এক্ষেত্রে কলঙ্কক্ষালনের ইচ্ছা তাঁর পক্ষে যেমন স্বাভাবিক, উত্তরাঞ্চলের আর্যদের পূর্বপুরুষ বলে স্বীকার করে বৃহত্তর জাতিগঠনের কামনাও তদ্রূপ যুগোচিত এবং বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গিজাত।

বঙ্কিম-রচিত বাংলার ইতিগাসে রাজবৃত্ত অবহেলিত হয় নি। আবার রাজনৈতিক উত্থান-পতন এদেশের শান্ত সমাজজীবনেও তরঙ্গ তুলেছে; নবধর্মের উদ্ভব, নব সাহিত্যের বিকাশ ও সাংস্কৃতিক জাগরণ তারই ফল।

পাল, সেন, পাঠান ও মোগল রাজত্বকালের ইতিকথায় তার প্রমাণ দিয়েছেন বঙ্কিম। 'বাঙ্গালার ইতিহাস' প্রবন্ধে "আসিয়াখণ্ডের এথিনীয় তুল্য" বাঙালির উপনিবেশ-স্থাপন-কীর্তির আলোচনা করে পাল রাজত্বকালের গৌরব স্মরণ করেছেন লেখক। 'effiminate Hindoos'—কথাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছেন তিনি, এমন কি "আসিয়াখণ্ডের এথিনীয় তুল্য বাঙ্গালী'—এই বীর্যবত্তার ব্যাখ্যায় তিনি এতটুকু অত্যুক্তি করেন নি।

তাঁর তৃতীয় মন্তব্য অত্যন্ত জোরালো, "সপ্তদশ পাঠান কর্ত্তৃক বঙ্গবিজয়ের কলঙ্ক সম্পূর্ণ মিথ্যা।" পুনরায় কলঙ্কক্ষালন।

চতুর্থ মন্তব্য অতি গুরুত্বপূর্ণ—

"পাঠান শাসনকালে বাঙ্গালীর মানসিক দীপ্তি অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছিল।" অর্থাৎ বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, রঘুনাথ ও চৈতন্যদেবের আবির্ভাব এবং ন্যায়শাস্ত্র, বৈষ্ণবধর্ম ও বৈষ্ণব সাহিত্যের জ্যোতিতে উজ্জ্বল বাংলাদেশ আমাদের গর্বের সামগ্রী।

একথা আজ নিঃসন্দেহে প্রমাণিত বঙ্কিমের বিভিন্ন অনুসন্ধানের অনেক

ইঙ্গিত যা "ইতিহাসের প্রকৃত যে ধ্যান তাহা হৃদয়ঙ্গম"—করে লিপিবদ্ধ, তার অধিকাংশই সত্য। সপ্তদশ অশ্বারোহীর কিংবদন্তী যে মিথ্যা এ কেবল দেশ-প্রীতিজাত অন্ধবিশ্বাস নয়—ঐতিহাসিক তথ্যদ্বারা প্রমাণিত। মীনহাজউদ্দীনের উক্তিতে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

মোগল শাসনের শোষণের কুফল সম্বন্ধে দ্বিমত নেই। পাঠান রাজত্বকালের উজ্জীবন সম্পর্কে বঙ্কিমের সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি অন্তত বঙ্কিমমানসের হিন্দুপ্রীতি এবং পক্ষপাতিত্ব সম্পর্কে অভিযোগ কিছুটা প্রশমিত করে। 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা' প্রসঙ্গে অনুরূপ উক্তি আছে—

> মোগলদিগের শাসিত ভারতবর্ষকে বা সেরাজদ্দৌল্লার শাসিত বাঙ্গালাকে পরাধীন বা পরতন্ত্র বলা গিয়া থাকে।

এই বিচারের মানদণ্ড ছিল প্রজার সুখ। "যে রাজ্য পরজাতিপীড়নশূন্য, তাহা স্বাধীন।" সেক্ষেত্রে আবার আকবরের শাসিত ভারতবর্ষকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বলি। কিন্তু এ তো ভারতবর্ষের বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে সত্য। বাংলাদেশ সম্পর্কে বঙ্কিম স্পষ্ট বলেছেন, "বাঙ্গালার সৌভাগ্য মোগল কর্তৃক বিলুপ্ত হইয়াছে।" কিম্বা—

> মোগলজয়ের পরে বাঙ্গালার অধঃপতন হইয়াছিল।...বাঙ্গালা স্বাধীন প্রদেশ না হইয়া পরাধীন বিভাগমাত্র হইয়াছিল।

কিন্তু "পাঠানেরা কস্মিন্ কালে প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালা অধিকার করেন নাই।" অর্থাৎ বাংলার স্বাধীন রাজগণ একজন Suzerain রূপে পাঠান নবাবকে মেনে চলতেন। আবার চৈতন্যচন্দ্রোদয়জাত জলোচ্ছ্বাস পাঠান রাজত্বকালে সম্ভব হয়েছিল। অবশ্য চৈতন্য যুগের উজ্জীবনের সঙ্গে ইংরেজ যুগের উজ্জীবনের পার্থক্য স্বীকার করেছেন তিনি। সেযুগে ছিল মৌলিকতা, এযুগে বিদেশী সংস্কৃতির প্রভাবে অনুকরণই অনেকটা, যদিও সবটাই কুফল নয়।

মোগল রাজত্বকালে দেখা গেল বাংলার সাংস্কৃতিক জড়তা এবং অবনতি, যদিও বৃহত্তর ভারতের সঙ্গে সংযুক্তির ফলে শান্তি ও শৃঙ্খলাও স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু তৎকালেই জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব ও 'করসংগ্রহের কনট্রাকটর'দের অত্যাচার বাংলাকে নির্জীব করেছে। 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে একথাটি আরও স্পষ্ট রূপে ঘোষিত। আমরা এই প্রবন্ধটি সমাজচিন্তার পর্যায়ে 'সাম্য' প্রবন্ধের সঙ্গে এক যোগে পুনর্বিচার করব।

রাজবৃত্ত হতে লোকবৃত্তে এসে বঙ্কিম 'ভেতো বাঙ্গালী'-র কলঙ্কমোচনে প্রয়াসী হয়েছেন। "বাঙ্গালীর পূর্ব বীরত্ব, পূর্ব গৌরব কিছু জানা আছে কি ?"

বঙ্কিম স্বয়ং তা জানিয়েছেন পাল-সেনরাজাদের আমলের কথায়, তবে ভৌগোলিক জলবায়ুর প্রভাববশত বাঙালির দুর্বলতার কথাও তিনি অস্বীকার করেন নি। তবে কি বাঙালির ভরসা নেই? আছে বৈকি, উত্তম অধ্যবসায় ঐক্য ও সাহস সঞ্চারিত হলে তার ভরসা আছে—

> অতএব যদি কখন (১) বাঙ্গালির কোন জাতীয় সুখের অভিলাষ প্রবল হয়, (২) যদি বাঙ্গালি মাত্রেরই হৃদয়ে সেই অভিলাষ প্রবল হয়, (৩) যদি সেই প্রবলতা এরূপ হয় যে, লোকে প্রাণপণ করিতে প্রস্তুত হয়, (৪) যদি সেই অভিলাষের বল স্থায়ী হয়, তবে বাঙ্গালির অবশ্য বাহুবল হইবে।
>
> —বাঙ্গালির বাহুবল

অর্থাৎ বাহুতে শক্তি এবং হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার হলে বাঙালির আর উন্নতি রোধ করা সম্ভব নয়। ভক্তি অবশ্য পরবর্তী যুগের সংযোজন।

লক্ষ্য করে দেখা যাবে যে, কলঙ্কমোচনার্থে বঙ্কিম ভারতীয় কিংবা বাঙালির পূর্ব শৌর্যবীর্যের প্রামাণিক উদাহরণ উপস্থিত করে প্রমাণ করেছেন 'effiminate Hindoos' কথাটা মিথ্যা কথা। দুর্বলতার মূল অন্যত্র। এই সূত্রে গৌরব চেতনায় ভারতীয় আর্য হিন্দুদের কিংবা বাঙালিদের পাঠানযুগের ধর্ম, দর্শন, শাস্ত্র, পুরাণ, সাহিত্য, শিল্প, এমনকি রাজনীতির শ্রেষ্ঠত্বের কথা 'প্রাচীন ভারতের রাজনীতি' প্রবন্ধে তিনি প্রমাণ সহযোগে উপস্থাপিত করেছেন। নানা প্রসঙ্গে ভারতীয় অথবা বাঙালির শৌর্যবীর্যের কয়েকটি উল্লেখ উদ্ধৃত করছি—

> ক. ভারত জয় দিগ্বিজয়ী আরবদিগের সাধ্য হয় নাই।......

কারণ—

> আমরা বলি রণনৈপুণ্য,—যোদ্ধৃশক্তি। —ভারতকলঙ্ক
>
> খ. প্রাচীন ভারতবর্ষীয়দিগের রণদক্ষতা সম্বন্ধে যদি কাহারও সংশয় থাকে, তবে তিনি ভারতবর্ষের বৃত্তান্তলেখক গ্রীকদিগের গ্রন্থ পাঠ করিবেন। —ঐ
>
> গ. বাঙ্গালীর বলবীর্য্যের ভয়ে আলেকজাণ্ডার যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়াছিলেন এ কথা কেহ বিশ্বাস করুন বা না করুন, ইহার সাক্ষী স্বয়ং মেগাস্থিনিস।
>
> —বাঙ্গালার কলঙ্ক

এ ছাড়া বাংলার গঙ্গারাঢ় ও পালরাজার বীর্যগরিমার কথা তো বিস্তৃত রূপে বিবৃত। বাঙালির শৌর্য-বীর্য এবং ভারতীয়দের রণকৌশলের চিত্র বঙ্কিমের ঐতিহাসিক উপন্যাসে এক আশ্চর্য দীপ্তি দিয়েছে। আর অসংখ্য মন্তব্যে যখনই সুযোগ এসেছে, বঙ্কিম এ-সম্বন্ধে নিজে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। 'দেবী

চৌধুরাণী'-তে বাঙালির হাতে লাঠির গরিমা, কিংবা 'রাজসিংহে' রাজপুত জাতির বীরত্বের কথা এই সূত্রে স্মরণ করা যায়।

শিল্প-সাহিত্য-দর্শন শাস্ত্রের প্রতি সশ্রদ্ধ মন্তব্যও নানা উপন্যাসে যত্রতত্র দেখা যায় এবং প্রবন্ধেও তা যথেষ্ট লক্ষ্য করা যাবে। একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে 'জ্ঞান সম্বন্ধে দার্শনিক মত' শীর্ষক সমালোচনায়—

> ভারতবর্ষীয় প্রত্নতত্ত্বের যতই গাঢ়তর অনুসন্ধান হইতেছে—ততই দেখা যাইতেছে যে সাহিত্যে, দর্শনে, গণিতশাস্ত্রে,—স্থাপত্যে, সঙ্গীতে, ব্যবস্থা-শাস্ত্রে—ঐশ্বর্য্যে, বাহুবলে—একদিন ভারতভূমি, ভূমণ্ডলে রাজ্ঞীস্বরূপা ছিলেন।....
>
> কিন্তু ন্যায়শাস্ত্রে বাঙ্গালিরা অদ্বিতীয় উদয়নাচার্য্য বোধ হয় বাঙ্গালি। রঘুনাথ শিরোমণি, মথুরানাথ তর্কবাগীশ, ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ, কৃষ্ণদাস সার্বভৌম...প্রভৃতি বাঙ্গালি।
>
> ...নবদ্বীপে চৈতন্যদেবের অভ্যুদয়—নবদ্বীপে বৈষ্ণব সাহিত্যের আকর।
>
> —'বঙ্গদর্শন', ফাল্গুন ১২৮১

অন্যত্র—

> বাঙ্গালির মধ্যে মনুষ্য জন্মিয়াছে কে? আমরা বলিব, ধর্ম্মোপদেশকের মধ্যে শ্রীচৈতন্যদেব, দার্শনিকের মধ্যে রঘুনাথ, কবির মধ্যে শ্রীজয়দেব ও শ্রীমধুসূদন। —বঙ্গদর্শন, ভাদ্র ১২৮০

আর 'ধর্ম্মতত্ত্ব'-এ "গীতা থাকিতে লোকে বেদ, স্মৃতি, বাইবেল বা কোরাণে ধর্ম্ম খুঁজিতে যায়—ইহা আশ্চর্য বোধ হয়।"

অথচ বাহুবলের প্রতি বঙ্কিমের অযথা আসক্তি নেই—কেবল 'effiminate Hindoos'—এদের কলঙ্কমোচনার্থ বারবার একথার উল্লেখ করা, কিন্তু তাঁর নিশ্চিত বিশ্বাস জ্ঞান-গরিমায়, ধর্মে-দর্শনে-সাহিত্যে এবং সমাজ-সংস্কৃতির পথেই দেশের প্রকৃত উন্নতি সম্ভব। "বিদ্যালোচনার কারণেই প্রাচীন ভারত উন্নত হইয়াছিল, সেই পথে আবার চল, আবার উন্নত হইবে।" (বঙ্গদর্শন, ভাদ্র ১২৮০) এই হল বঙ্কিমের ঐতিহাসিক চেতনার মূল নির্দেশ। এই নির্দেশ সম্বন্ধে পরে বিস্তৃত আলোচনা করা হবে, আপাতত বঙ্কিমের ইতিহাসচিন্তায় যে প্রবণতা লক্ষিত হল, তার কতটা রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসচিন্তায় পরিবাহিত, তা দেখা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের—

> এমন প্রবন্ধ কমই আছে যাতে তিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কিছু না কিছু ঐতিহাসিক প্রসঙ্গের অবতারণা না করেছেন। বস্তুত চিন্তনীয়

বিষয়মাত্রকেই তিনি দার্শনিক ও ঐতিহাসিক এই দুই দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করতেন, আর এই দ্বিবিধ দৃষ্টিও পরস্পরনিরপেক্ষ নয়।[৯]

লক্ষ্য করা যাবে, রবীন্দ্রনাথের প্রথম ঐতিহাসিক রচনা 'ঝান্সীর রাণী' (১২৮৪) এবং শেষ আলোচনা 'তপোবন' (১৩৪৭)। বিস্তৃত আলোচনার উদ্দেশ্যে আমরা প্রথমে রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসচিন্তামূলক প্রবন্ধগুলির কালানুক্রমিক তালিকা প্রস্তুত করছি—

		গ্রন্থনাম	রচনাকাল
১।	ঝান্সীর রাণী	ইতিহাস	১২৮৫
২।	ভারতবর্ষের ইতিহাস	ভারতবর্ষ ও স্বদেশ	ভাদ্র, ১৩০৯
৩।	(ক) ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের ধারা	পরিচয়	১৩১৮
	(খ) "A vision of India's History"	Biswavarati Qr.	1923
৪।	শিবাজী ও মারাঠাজাতি	ইতিহাস	১৯০৮
৫।	শিবাজী ও গুরু গোবিন্দসিংহ	"	
৬।	ভারত-ইতিহাস চর্চা	"	

এছাড়া, 'ইতিহাস' গ্রন্থের পরিশিষ্টভুক্ত প্রবন্ধচয়—

(ক) 'কাজের লোক কে', 'বীর গুরু', 'শিখ-স্বাধীনতা' এবং 'ঐতিহাসিক চিত্র' (১, ২)।

(খ) 'ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ', 'সিরাজদ্দৌল্লা', 'গ্রন্থসমালোচনা', এবং 'ইতিহাসকথা' (ভাণ্ডার ১৩১২)।

ইতিহাসচিন্তা সমৃদ্ধ অন্যান্য প্রবন্ধ—

৭।	পথ ও পাথেয়	চৈতন্য লাইব্রেরীতে পাঠ	জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৫
৮।	পূর্ব ও পশ্চিম	ব্রাহ্মসমাজের ছাত্রদের কাছে	ভাদ্র, "
৯।	তপোবন	(শিক্ষা)	১৩১৬
		(ওভারটুন হলে বক্তৃতা)	১৫ অগ্রহায়ণ
১০।	বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ		আশ্বিন, ১৩২৮
১১।	বুদ্ধদেব	প্রবাসী	আষাঢ়, ১৩৪২
১২।	বৃহত্তর ভারত	কালান্তর	

এছাড়া 'জাভাযাত্রীর পত্র', 'ধর্ম', 'শান্তিনিকেতন', 'পারস্যভ্রমণ' প্রভৃতি গ্রন্থগুলিকেও ঐ ইতিহাসচিন্তা-সমৃদ্ধ রচনা বলে উল্লেখ করা যায় এবং "স্বদেশী

আন্দোলন ইতিহাসের গুটিকয়েক সূত্র"—যা দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়কে পত্র-মাধ্যমে পাঠান হয়, (১লা অগ্রহায়ণ ১৩১২) তারও বিশেষ মূল্য আছে।

বস্তুত ভারতের বৈদিক যুগ হতে আরম্ভ করে আধুনিক যুগ পর্যন্ত ইতিহাসের সত্যরূপ উদ্‌ঘাটন করে রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের সেই যোগের ইতিহাস আবিষ্কার করেছেন। "সমস্ত বৈচিত্র্য ও বৈষম্যের ভিতরে ভিতরে একটি মূলগত অপ্রত্যক্ষ যোগসূত্র"—যা ভারতের অতীত ও ভবিষ্যৎকে সূক্ষ্ম যোগসূত্রে গ্রন্থিত করেছে বলে রবীন্দ্রনাথের দৃঢ় বিশ্বাস—সেই সূত্রটিই তিনি অনুসরণ করেছেন। এ কাজে অন্য দেশের পোলিটিক্যাল ইতিহাস থেকে কোন শিক্ষা নিতে তিনি অস্বীকার করেছেন, কারণ—

> আমাদের ইতিহাস স্বতন্ত্র। আমাদের দেশে মনুষ্যত্বের একটি উদার অতি বিরাট ইতিহাস সৃষ্টির আয়োজন চলছে এই আমার নিশ্চয় বিশ্বাস।
>
> —অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লিখিত পত্র ; ২৩ আশ্বিন, ১৩১৬

আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেন রবীন্দ্রনাথের এই ইতিহাস দর্শনকে যথার্থই বলেছেন, 'ভারতসভার মহাভাষ্য নির্ণয়'। রবীন্দ্রনাথ শুধু যোগসূত্র অনুসরণ করেন নি, ইতিহাস-বিধাতার মূলগত নীতিসূত্রের মহাভাষ্য নির্ণয় করেছেন।

ভারত-ইতিহাস দর্শনের মূল সূত্রটি রবীন্দ্রনাথ নানাস্থানে খুব স্পষ্ট করে ঘোষণা করেছেন—

> ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করিয়া দেওয়া এবং বহুর মধ্যে এককে নিঃসংশয়রূপে অন্তরতররূপে উপলব্ধি করা—বাহিরে যে সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয় তাহাকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে অধিকার করা। —ভারতবর্ষের ইতিহাস

এ হল তাঁর মতে—

> দেহস্থিত প্রাণের ন্যায় প্রত্যক্ষ সত্য অথচ প্রাণের ন্যায় সংজ্ঞা ও ধারণার পক্ষে দুর্গম।

এই ধারণা অন্যত্রও প্রতিষ্ঠিত—

> বিধাতা যেন একটা বৃহৎ সামাজিক সম্মেলনের জন্য ভারতবর্ষেই একটা বড়ো রাসায়নিক কারখানা খুলিয়াছেন।···
>
> বহুর মধ্যে ঐক্য-উপলব্ধি, বিচিত্রের মধ্যে ঐক্য-স্থাপন—ইহাই ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত ধর্ম। —স্বদেশী সমাজ

আমরা লক্ষ্য করেছি, ইতিহাসের এই দিকটি দর্শন করে একদা নিজস্ব প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র চরম সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন—

ভিন্ন দেশ, ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন রাজ্য, ভিন্ন ধর্ম্ম, আর এক জাতীয়ত্ব কোথায় থাকে? সাগরমধ্যস্থ মীনদলবৎ ভারতবর্ষীয়েরা একতা শূন্য হইল।···

বাঙ্গালি, পাঞ্জাবী, তৈলঙ্গী, মহারাষ্ট্রী, রাজপুত, জাঠ, হিন্দু, মুসলমান ইহার মধ্যে কে কাহার সঙ্গে একতাযুক্ত হইবে? —ভারত-কলঙ্ক

আমরা ইতিপূর্বেই অনুভব করেছি, জাতিপ্রতিষ্ঠা লোপ হয়েছে বলেই বঙ্কিমের আক্ষেপ, কারণ বৈদিককালে আর্যগণ কর্তৃক জাতিপ্রতিষ্ঠার পর আর সে কাজ চলে নি। সমস্যা সমাধানের জন্য অবশেষে বঙ্কিম বাইরের শক্তির উপর ভরসা করেছিলেন, তা হল ইংরেজি ভাষা ও ইংরেজ শাসনের উপর সমস্যা সমাধানের ভরসা; অবশ্য খুব স্পষ্ট করে তিনি কিছু বলেন নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে ইতিহাস দর্শনের আলোয় সুস্পষ্টস্বরে ভারতের অন্তর্নিহিত ধর্মের কথা বললেন, একের উপলব্ধির সাধনা আজও চলছে, তাইত "যজ্ঞশালার খোলা আজি দ্বার।"

বঙ্কিম যেন এই সমস্যার সত্য সমাধান না পেয়ে বঙ্গদেশ-দর্শনে ('বঙ্গদর্শন'-নামটি ইঙ্গিতময়) 'বাঙ্গালীর উদ্ভব' ইত্যাদিতে নিবদ্ধদৃষ্টি হলেন। (অবশ্য ভারতের সঙ্গে কেবল সাংস্কৃতিক ও সনাতন ধর্মের যোগ রক্ষিত হল)।

কিন্তু এ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ পূর্বোক্ত মহাভাষ্য রচনা করে সমগ্র বিশ্বকে আহ্বান করলেন উপনিষদের কণ্ঠে—"অয়ন্তু সর্বতো স্বাহা।" তিনি এই বিশ্বাসেই বিশ্বমানবতার পথযাত্রী হলেন, জাতীয়তাবাদ হতে আন্তর্জাতিকতার লক্ষে তাঁর যাত্রা সুরু হল এই 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা' নির্ণয়ের পরেই (১৩১৮)।

"দেহস্থিত প্রাণের ন্যায় প্রত্যক্ষ সত্য অথচ প্রাণের ন্যায় সংজ্ঞা ও ধারণার পক্ষে দুর্গম" সেই বিচিত্র শক্তিকে— সেই 'জনগণ ঐক্যবিধায়ক' শক্তিকে রবীন্দ্রনাথ ব্যাখ্যা করলেন 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারায়' এবং এরই পুনরালোচনা করলেন 'A vision of India's History' (১৯২৩) শীর্ষক নিবন্ধে। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে রবীন্দ্রনাথ মানব-ইতিহাসের বিবর্তনকে বিধাতার মঙ্গল-ইচ্ছার সার্থকতা অথবা অমোঘ শক্তির স্বতোৎসারিত লীলাছন্দরূপে দেখেছেন, ভারতবর্ষের ইতিহাসের বিবর্তনও সেই দৃষ্টিতে দেখা—অভিব্যক্তিবাদ ও ইতিহাসের পারম্পর্যে আলোচিত। তাঁর মধ্যে 'কেয়ার্ড'-এর মত দার্শনিক ইতিহাস-শাস্ত্রীর তত্ত্বদৃষ্টিই শুধু নেই—কবিদৃষ্টির স্বচ্ছ সত্যবোধও আছে নিশ্চয়ই।[১০] রবীন্দ্র-বিশ্লেষণ অনুযায়ী সভ্যতার ইতিহাসের গোড়ার কথা হল

জাতিসংঘাত যা ভারত-ইতিহাসের আদিকাণ্ডে দুইরূপে ঘটেছে— আর্য-অনার্য গোষ্ঠী-সংঘাত এবং আর্য গোষ্ঠীর আভ্যন্তরীণ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়গত সংঘাত। অবশ্য বিরোধই শেষকথা নয়—বিরোধের অন্তে আর্য-অনার্যের মিলনসেতু গড়তে যাঁরা অগ্রণী হলেন তাঁরা ক্ষত্রিয় পুরুষ—জনক, বিশ্বামিত্র এবং রামচন্দ্র।

এদের ভূমিকা ঠিকমত বিশ্লেষণ করা যায় ভারতের প্রাচীন সমাজ-ইতিহাসে। ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ বিরোধের কথা, সমাজের অন্তর্বিপ্লবের ইতিকথাই তো দুই মহাকাব্যে—রামায়ণে ও মহাভারতে সংকলিত।

আবার বৈষ্ণবধর্মও আদিতে ক্ষত্রিয়-প্রবর্তিত হয়েছে— বিষ্ণুর অবতার বলে স্বীকৃত রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা। রবীন্দ্রনাথ রামায়ণের কাহিনীর স্থলবিশেষে প্রতীকীব্যাখ্যার সাহায্যে আপন বক্তব্য প্রতিপাদন করেছেন, তাঁর মতে বিশ্বামিত্র, জনক ও রামচন্দ্রের পারস্পরিক চুক্তিতে দাক্ষিণাত্যে অনার্য সভ্যতার উচ্ছেদ ও কৃষি সভ্যতার বিস্তার ঘটেছে; এদিকে কালক্রমে দাক্ষিণাত্যের শৈবধর্মই ভক্তিধর্মের রূপ লাভ করেছে এবং ব্রহ্মজ্ঞানে দ্বৈত ও অদ্বৈত দুই ধারাই স্বীকৃতিলাভ করেছে।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণগোষ্ঠীর বাহ্য ক্রিয়াকাণ্ডকে উপেক্ষা করে ব্রহ্মবিদ্যার মধ্যে ধর্মের ঐক্যভূমি আবিষ্কার করলেন ক্ষত্রিয় সমাজ, আর অন্যদিকে ব্রাহ্মণ-সমাজের রক্ষণশীলতা অবশেষে একদিকে ক্ষত্রিয়-ব্রহ্মবিদ্যা আত্মসাৎ করতে বাধ্য হল, কারণ "মানুষের একদিকে বিশেষত্ব অন্যদিকে বিশ্বত্ব"— এই দুই টানে ভারতবর্ষ কাজ করে চলেছিল। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য এই, বৈদিক সাহিত্য ও মহাভারতে আর্য ও অনার্য এই দুই গোষ্ঠীর বিরোধ ও মিলনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ইতিহাসের বিবর্তন অনুসরণ করলে দেখা যায়, বিভিন্ন সামাজিক শক্তির স্বকীয়তা রক্ষা করে মিলন সাধন করার সামঞ্জস্য ভেঙে গিয়েছিল বৌদ্ধবিপ্লবে, এবং নব আর্যেতর গোষ্ঠীগুলি আশ্রয় পেয়েছিল তারই ফলে।

এরপর আবার সংরক্ষণী ব্রাহ্মণ্য-শক্তির উদয়ে দুটি কাজ শুরু হল— ১. ভারতীয় সভ্যতার ছিন্ন গ্রন্থিগুলি জোড়া দেওয়া, এবং ২. নূতনকে অঙ্গীভূত করা। আর তারই ফলস্বরূপ, মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত হল ভগবদ্গীতা—জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সমন্বয়ে।

ইতিমধ্যে ক্ষত্রিয় সৃজনী-শক্তি লুপ্ত হয়েছিল, ফলে ভারসাম্যহীন সমাজ ও জাতি সর্বতোভাবে পরাধীনতার জন্য প্রস্তুত হল।

মুসলমান শাসনকালেও ভারতীয় চিত্তে আত্মপ্রসারণের প্রয়াস ছিল, তার

প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ্য, মধ্যযুগের ভক্তি-আন্দোলন—চৈতন্য, কবীর, নানক ও তুকারাম—এঁদেরই নেতৃত্বে ঘটেছে।

(কবীর) ভারতবর্ষের সমস্ত বাহ্য আবর্জনাকে ভেদ করিয়া তাহার অন্তরের শ্রেষ্ঠ সামগ্রীকেই ভারতবর্ষের সত্যসাধনা বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন, এইজন্য তাঁহার পন্থীকে বিশেষরূপে ভারতপন্থী বলা হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের দৃঢ় বিশ্বাস, বহুবৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের এই নিরন্তর প্রয়াস এখনও ক্রিয়াশীল। বর্তমানযুগে কিন্তু সংরক্ষণীবৃত্তিই সমন্বয়-প্রবণতা অপেক্ষা প্রবল, তাই অপেক্ষিত ভারসাম্য বিচলিত হবার মুখে। এই যুগসন্ধিক্ষণে রবীন্দ্রনাথ সেইজন্যই দেশবাসীকে আহ্বান করলেন, ঐ ইতিহাস-ধারার অনুশীলন করতে।

রবীন্দ্রনাথ-ব্যাখ্যাত এই ইতিহাসকে 'পিপলস্ হিস্ট্রি' বা জনসাধারণের ইতিহাস বলে অভিহিত করা হয়েছে ; আর এমনি দৃষ্টিভঙ্গিজাত চিন্তা তখনকার কালে সম্পূর্ণ অভিনব ছিল একথাও স্বীকৃত। এখানে 'দেশের ইতিহাস' স্বদেশকে আচ্ছন্ন করে নি, তাই ভারতের রাষ্ট্রবিবর্তন নয়, ভারতীয় সমাজের ধারাবাহিক অভিব্যক্তি এবং ভারতের অন্তর্নিহিত মূল ঐক্যসূত্রটি এর মধ্যে আলোচিত হয়েছে।

জনসমাজের ইতিহাসকে আলোচনার প্রধান বিষয়রূপে গ্রহণ করলেও রবীন্দ্রনাথের মতে এই ইতিহাস বিবর্তনের মূলে প্রধান শক্তি হচ্ছে মানুষের চিত্তবৃত্তির সংঘাত ও সমন্বয়। বস্তুবাদী ইতিহাস-ভাষ্যকারবৃন্দের সঙ্গে এখানে তাঁর মৌলিক পার্থক্য।[১১]

রবীন্দ্র-বিশ্লেষণে ভারতীয় ইতিহাসের আর-একটি সূত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা হল, ভারতীয় সভ্যতায় সমাজসত্তা রাষ্ট্রসত্তা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও অধিক গুরুত্বপূর্ণ।[১২] তাঁর সিদ্ধান্ত—"আমাদের প্রকৃত ইতিহাস সামাজিক এবং ধর্মতন্ত্রমূলক।"......

আমরা পরবর্তী প্রসঙ্গে (সমাজচিন্তা) লক্ষ্য করব, বঙ্কিমচন্দ্রও ভারতীয় সমাজের প্রাধান্য ও মাহাত্ম্যের কথায় 'ধর্ম্মতত্ত্ব'-এ বুঝিয়েছেন—

সমাজকে ভক্তি করিবে।...... সমাজ আমাদের শিক্ষাদাতা, দণ্ডপ্রণেতা, ভরণপোষণ এবং রক্ষাকর্তা। সমাজই রাজা, সমাজই শিক্ষক।

কিন্তু সেখানে যেন এ-সমাজ কোঁৎবাদী আদর্শের ধারকরূপেই প্রতিভাত হয়েছে, সেই সমাজে দণ্ডভেদ নীতির পরিচালক রাজার কর্তৃত্বও স্বীকৃত। আসলে বঙ্কিমের দৃষ্টিতে পৌরাণিক যুগের ব্রাহ্মণ-শাসিত ভারতবর্ষের চিত্রই উদ্ভাসিত, সেখানে মহাভারতের যুগের রাজনীতিরই উচ্চ স্থান, রাজার শৌর্য-বীর্য, প্রবল

প্রতাপ ও শাসন ব্রাহ্মণের সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত। এদিকে ভারতীয় সভ্যতার মর্মস্থান সমাজ বলতে রবীন্দ্রনাথ যা বোঝাতে চান—তা বঙ্কিমের ভাষ্য অনুযায়ী মনে হয় না। বঙ্কিমের মতে রাষ্ট্রগঠন ও রাষ্ট্রশাসনের ক্ষেত্রেও হিন্দু-ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব ছিল, আর রবীন্দ্রনাথ বললেন, ভারতীয় সভ্যতার মৌলিক ঐক্যবোধ সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ। রাষ্ট্রের ভূমিকা এতে যে সম্প্রসারিত হয় নি তার মূলও নিহিত আছে ভারতীয় সভ্যতার অন্তঃপ্রকৃতির মধ্যে। এই রাষ্ট্রবিমুখতার কারণ স্বরূপই রবীন্দ্রনাথ বললেন—"আমরা সামাজিক স্বাধীনতা সর্বতোভাবে বাঁচাইয়া আসিয়াছি।"

আগেই বলেছি, "যে রাজা হয় হউক আমরা কাহারও জন্য অঙ্গুলি ক্ষত করিব না,"—এই স্বাতন্ত্র্যে অনাস্থায় বঙ্কিম ক্ষুব্ধ; লক্ষ্য করেছি, রবীন্দ্র-দৃষ্টিতে এটা গৌরব বা অগৌরবের কথা নয়, এটা তার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য মাত্র। রাষ্ট্রের উত্থান-পতনের উপর এখানে সংস্কৃতির উৎকর্ষ বা অপকর্ষ নির্ভর করে না, কেননা এখানে জীবনচর্যা সমাজনির্ভর, রাষ্ট্রনির্ভর নয়।

রবীন্দ্র-ইতিহাসচিন্তার এই দ্বিতীয় সূত্রটি অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং নিঃসন্দেহে অভিনব। রাষ্ট্রকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রাক্-বৃটিশ ভারতবর্ষের ইতিহাসের গতি-প্রকৃতি নিরূপণ করা বৃথা, কারণ এ-ইতিহাস আছে লোকসংস্কৃতি ও লোক-সম্পর্কের যে ঐতিহ্যগত নিদর্শন সর্বক্ষেত্রে বিক্ষিপ্ত, তার মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ইতিহাসচিন্তায় এই ভারত-ইতিহাসেরই নবদিগন্ত উন্মোচন করলেন। 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' এবং 'লোকসাহিত্য' প্রবন্ধেও এর ইঙ্গিত আছে।

'ভারত-ইতিহাস চর্চায়' সুস্পষ্ট নির্দেশ দিলেন রবীন্দ্রনাথ, জাতির সমস্যা সেখানেই যেখানে তার অসামঞ্জস্য। প্রাচীন ভারতে রাজায় রাজায় নয়, এক জাতি-সম্প্রদায়ের সঙ্গে অন্য জাতি-সম্প্রদায়ের অসামঞ্জস্য ছিল,—তাদের মধ্যেই সাধন প্রয়াস চলেছে। তাঁর বক্তব্য—

> ভারতবর্ষের নানা জাতির এই সংঘাত ও সামঞ্জস্যের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় বৈদিকযুগ বৌদ্ধযুগে, বৌদ্ধযুগ পৌরাণিক যুগে পরিণত হইয়াছে। এই সৃষ্টির উদ্যমে রাজা ও রাষ্ট্রনীতি প্রধান শক্তি নহে।

অতএব বৈদিক যুগ ও হিন্দুযুগের মধ্যবর্তী বৌদ্ধযুগের প্লাবন ও মিশ্রণকালের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার আলোচনা অতি প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

> ভারতের প্রকৃত ইতিহাসের ধারা যাঁহারা অনুসরণ করিতে চান, তাঁহাদিগকে বিশেষ করিয়া এই মহাযান বৌদ্ধ পুরাণসকলের অনুশীলন করিতে হইবে।

তাঁর নানা প্রবন্ধের বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে এবং ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত মন্তব্য

অনুধাবন করলে স্পষ্ট ধারণা হয় যে, বৌদ্ধযুগ রবীন্দ্রভাষ্যে বিশেষ গুরুত্ব ও মহত্ত্বপূর্ণ ; অথচ বঙ্কিমচন্দ্র বৌদ্ধ-প্লাবনকে সমাজ-স্থিতির সংহারকরূপে দেখেছেন ; দুজনের দৃষ্টিভঙ্গির একটি মৌল পার্থক্য এখানে। বঙ্কিমের বিচারে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য আদর্শ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা রাজা, আর রবীন্দ্রনাথের মননভূমিতে সম্রাট অশোকের স্থান সর্বোচ্চ। দুজনের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলনস্বরূপ দুটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি—

তিনি শার্লমান, ফ্রেডেরিক ও পিটরের সঙ্গে উচ্চাসনে বসিতে পারেন।
—প্রাচীন ভারতের রাজনীতি : বঙ্কিমচন্দ্র।

এই ভারতবর্ষে একদিন মহাসম্রাট অশোক তাঁহার রাজশক্তিকে ধর্মবিস্তার-কার্যে মঙ্গলসাধনকার্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।—উৎসবের দিন : রবীন্দ্রনাথ।

স্পষ্টত এখানেই দুজনের দৃষ্টিভঙ্গির অমিল। বিশ্বপ্রেমমূলক বৌদ্ধধর্মকে রবীন্দ্র-ইতিহাসদর্শনের মূলতত্ত্ব—বহুবৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য উপলব্ধির সহায়ক বলে মনে হবে। 'বুদ্ধদেব' (প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৪২)-প্রবন্ধে রবীন্দ্রচিন্তার যে পরিচয় আছে—সে হল ভারতের শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক ইতিহাসচিন্তার পরিচয়। ভারত-সংস্কৃতির স্বরূপ ও বিস্তার সম্পর্কে আলোচনা ও তার ঐতিহাসিক মূল্যনিরূপণ রবীন্দ্রনাথের 'ভারতসভার মহাভাষ্য নির্ণয়ের' আর-একটি দিক। 'পথ ও পাথেয়' প্রবন্ধেও তার এই জাতীয় বিশ্লেষণ স্মরণীয়। উক্ত প্রবন্ধটিতে আর্য ও অনার্যের মিলন, বৌদ্ধধর্মের মিলনমন্ত্র, শঙ্করাচার্য কর্তৃক অখণ্ড বৃহত্ত্বের মধ্যে ঐক্য-স্থাপন-প্রয়াস, ইসলামের প্রচণ্ড ঐক্যমন্ত্র ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে। রবীন্দ্র-বিশ্লেষণ অনুসারে এরপরই চৈতন্য, নানক, দাদূ, কবীর প্রমুখ যাঁরা "শাস্ত্রের অনৈক্যকে ভক্তির পরম ঐক্যে এক করিবার অমৃত বর্ষণ করিয়াছিলেন" তাঁদের প্রয়াস এবং বর্তমান যুগের রামমোহন, দয়ানন্দ, কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, শিবনারায়ণ-এর জীবনসাধনা পর্যন্ত সবই ভারতবর্ষের ইতিহাসের সাধনার অঙ্গীভূত। রবীন্দ্রনাথ অতঃপর স্থিরসিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়ে বললেন—

তাই আমি অনুরোধ করিতেছিলাম অন্যান্য দেশের মনুষ্যত্বের আংশিক বিকাশের দৃষ্টান্তে ভারতবর্ষের ইতিহাসকে খণ্ডিত করিয়া দেখিবেন না।

এর আগে রবীন্দ্রনাথের 'বঙ্গদর্শন' পর্বের প্রথম দিকে নানা লেখায় যে প্রভাবটি লক্ষ্য করা গিয়েছিল—সেই হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদের সংকীর্ণতার খোলস একমুহূর্তে খসিয়ে তিনি ঘোষণা করলেন,—"ইতিহাসের প্রত্যেক অধ্যায়ের চরম কথা হচ্ছে আত্মানং বিদ্ধি।"

"ইতিহাস কেবলমাত্র তথ্যের ইতিহাস নয়, মানবমনের ইতিহাস, বিশ্বাসের ইতিহাস।" এ-সত্য রবীন্দ্রনাথ নিজে দৃষ্টান্তযোগে প্রতিপাদন করেছেন। আর 'বিশ্বাসের ইতিহাস' রূপে শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত তাঁর 'তপোবন' প্রবন্ধ, যা ভারতের 'জীবধর্মী ইতিহাস', যা খাঁটি ভারতবর্ষ হয়ে ওঠার ইতিহাস, যেখানে কবির স্বজাতীয় প্রকৃতির সৃজন কর্তৃত্ব আশ্চর্য ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। তা হোক না কিছুটা আদর্শের রঙে রাঙানো—কিন্তু ভারতবর্ষের চিরন্তন সত্য সাধনার কথা তো সেখানেই উচ্চারিত।

> যে সত্যে ভারতবর্ষ আপনাকে আপনি নিশ্চিন্তভাবে লাভ করতে পারে সে সত্যটি কী। সে সত্য প্রধানত বণিগ্‌বৃত্তি নয়, স্বরাজ্য নয়, স্বাদেশিকতা নয়, সে সত্য বিশ্বজাগতিকতা। —তপোবন

বঙ্কিমচন্দ্রও এই ক্ষেত্রে পৌঁছেছেন, তবে অন্যপথে। তাঁর মতে—"দেশপ্রীতি ও সার্বলৌকিক-প্রীতি উভয়ের অনুশীলন ও পরস্পর সামঞ্জস্য চাই।" —ধর্ম্মতত্ত্ব

এবার আর-একটি প্রশ্ন থেকে যায়, রবীন্দ্রনাথ রাজবৃত্তকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন কিনা। সুধী সমালোচকের মতে—

> নেহাত তথ্যপুঞ্জের প্রতি রবীন্দ্রনাথের কোনো আগ্রহ ছিল না। তাঁর আগ্রহ ছিল ইতিহাসের তত্ত্ব ও শিক্ষার প্রতি। ইতিহাসের প্রাণরসের যোগে জাতীয় জীবনকে সব দিক্‌ থেকে উদ্‌বুদ্ধ করে তোলাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।[১৩]

আমরা লক্ষ্য করেছি অশোক, আকবর ও শিবাজি, এঁদের ইতিবৃত্ত হতে প্রাণরস নিয়েছেন কবি রবীন্দ্রনাথ, কারণ, এঁদের তিনজনের রাষ্ট্রকীর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল সাম্প্রদায়িক গণ্ডিমুক্ত উদার ধর্মের ভিত্তিতে। অশোকের মধ্যে মঙ্গলশক্তির আবির্ভাব হয়েছিল—

> ইহা যুদ্ধসজ্জা নহে, দেশজয় নহে, বাণিজ্যবিস্তার নহে; ইহা মঙ্গলশক্তির অপর্যাপ্ত প্রাচুর্য। —উৎসবের দিন, ১৯০৫।

এইজন্যই 'বুদ্ধদেব'-গ্রন্থে সংকলিত একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য ছিল—

> রাজা অশোক শিলালিপিতে প্রকাশ করলেন·······এত বড়ো রাজা কি জগতে আর কোনো দিন দেখা দিয়েছে?[১৪]

অশোকের পরই রাজা হিসাবে আকবরের স্থান।

> বৌদ্ধযুগের অশোকের মতো মোগল-সম্রাট আকবরও কেবল রাষ্ট্রসাম্রাজ্য নয়, একটি ধর্মসাম্রাজ্যের কথা চিন্তা করিয়াছিলেন। —স্বাধিকারপ্রমত্তঃ

এদিকে, কি নিয়মে কিসের প্রেরণায় জাতি গড়ে ওঠে, কিসের শক্তিতে

তার উন্নতি ঘটে—সেই তত্ত্বের আলোচনায় মারাঠা ও শিখের ইতিহাসও গ্রহণযোগ্য কারণ—

আমাদের দেশে মোগল-শাসন-কালে শিবাজীকে আশ্রয় করিয়া যখন রাষ্ট্র চেষ্টা মাথা তুলিয়াছিল তখন সে চেষ্টা ধর্মকে লক্ষ্য করিতে ভুলে নাই।
—ধম্মপদং

রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণ অনুসারে মারাঠার ধর্মান্দোলনের মন্থনজাত প্রতিভা শিবাজী সমস্ত দেশের শক্তিতে ধন্য। সেখানে একদিন সমস্ত জাতিকে এক করেছিল, আবার পরবর্তী কালে স্বার্থই তাকে বিশ্লিষ্ট করেছে।

ধর্মের উদার ঐক্য দেশের ভেদবুদ্ধিকে নিরস্ত করিয়া দিলে তবেই দেশের অন্তর্নিহিত সমস্ত শক্তি একত্র মিলিত হইয়া অভাবনীয় সফলতা লাভ করে, ইহাই মহারাষ্ট্র-ইতিহাসের শিক্ষা, —শিবাজী ও মারাঠাজাতি

নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে এ-ধর্ম কিন্তু নিত্যধর্ম বা বিশ্বজনীন ধর্ম। 'শিখগুরু ও শিখজাতি' প্রবন্ধে এইজন্যই শিবাজীর ধর্মকে তুলনামূলকভাবে অপেক্ষাকৃত উদার বলা হয়েছে। সত্যই "সমস্ত ভারতবর্ষকে এবং দূর কালকে লক্ষ্য করিয়া একটা বৃহৎ আয়োজন বিস্তার করিতেছিল,"—কিন্তু শিবাজীর এক ধর্মরাজ্যের আদর্শ আমাদের সমাজের জাতিভেদ ও বিচ্ছিন্নতার দোষে সফল হল না। কঠিনতম সত্য এই—আমাদের দেশে "এইজন্য মহৎ চেষ্টা বৃহৎ চেষ্টা হইয়া উঠে না"। কবির এই বিশ্লেষণ বর্তমান ভারতের আন্তঃরাজ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার পটভূমিতে উপলব্ধি করার প্রয়োজন আজ আরও বেশি। আমরা পূর্বেই দেখেছি, আকবর, শিবাজী ও শিখদের কথা বঙ্কিমও উল্লেখ করেছেন—"আকবরের শাসিত ভারতবর্ষকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বলি।" কারণ পরজাতিপীড়ন-শূন্যতা এবং সুখ এর মাপনী, সেক্ষেত্রে ধর্মের উদার ঐক্য বিবেচ্য নয়। বঙ্কিমের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে শিবাজী ও রণজিৎ সিংহ স্মরণযোগ্য কারণ 'ইতিহাস কীর্তির কালমধ্যে' দুইবার হিন্দুসমাজে 'জাতি-প্রতিষ্ঠার উদয় হইয়াছিল।' শিবাজীর 'মহামন্ত্র ও সিংহনাদে' জাতি জাগল—"সমুদায় ভারতবর্ষ মহারাষ্ট্রের পদাবনত হইল।" ঐ প্রবন্ধেই বঙ্কিমের বক্তব্য ছিল— দ্বিতীয়বারের ঐন্দ্রজালিক রণজিৎ সিং-এর পরাক্রমে "শতদ্রুপারে সিংহনাদ শুনিয়া নির্ভীক ইংরেজও কম্পিত হইল।" উভয়ত্রই বঙ্কিমমানসে হিন্দুর বীর্যসাধনার সিংহনাদ ধ্বনিত, হিন্দুজাতীয়তা-প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন প্রায় সফল। উদার বিশ্বজনীন ধর্মভিত্তির কথা নয়, সনাতন ধর্মপোষিত হিন্দু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যই এখানে সোচ্চার। সম্ভবত এই পরিকল্পিত সাম্রাজ্যে অন্যের মর্যাদা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে এবং পরেও উঠতে

পারে। মনে হতে পারে বঙ্কিমের ঐ বিষয়ের অনুল্লেখ একথাই ইঙ্গিত করে, মুসলমান সম্প্রদায় হয়ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়রূপে অধিকার পাবে, আশ্রয় পাবে, সমমর্যাদা পাবে না। অবশ্য এটি বঙ্কিমের চিন্তা-পারম্পর্য বিচার করে আমাদের আপাত-ধারণা হয়েছে মাত্র। পরে বিস্তৃত আলোচনায় স্পষ্ট হবে—হিন্দু-মুসলমানের সমমর্যাদাই তাঁর কাম্য।[১৫] 'রাজসিংহ' উপন্যাসে যে স্বপ্ন সার্থক করেছেন বঙ্কিম, —কিংবা 'আনন্দমঠে' তাঁর যে স্বপ্ন প্রায় সফল হয়ে উঠেছিল—সে তাঁর এই ইতিহাসচেতনারই শিল্পরূপ। এদিকে রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসচেতনার শিল্পায়িত মহাকাব্য-স্বরূপ 'গোরা' এবং নাটক 'প্রায়শ্চিত্ত'তে ঐ উদার বিশ্বজনীন ধর্মভিত্তির কথাটিই ইতিহাসরসে রসায়িত।

সম্পূর্ণ প্রসঙ্গটির মূলকথাগুলি এবার দুই-একটি তুলনামূলক ইঙ্গিতে সংকলন করা যায়—

(১) বঙ্কিমের ইতিহাসচেতনা প্রথমে কলঙ্কক্ষালনে প্রবৃত্ত,—পরে হিন্দু-পুনরুজ্জীবনজাত গৌরবস্ফীতি প্রাপ্ত। রবীন্দ্রনাথের কলঙ্কচেতনা স্পষ্ট ও সচেতনভাবে ব্যক্ত নয়, বরং ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী জীবনাদর্শের গৌরববোধে তা প্রদীপ্ত। (২) দুজনেই লোকবৃত্ত ও নৃবৃত্তে ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করেছেন, তবে রবীন্দ্রনাথ রাজবৃত্তকে কখনও কখনও লোকবৃত্তাশ্রিত সামাজিক আদর্শের প্রকাশরূপে দেখেছেন। (৩) বঙ্কিমের ইতিহাসচেতনা ভারত-প্রীতির তুলনায় বঙ্গপ্রীতিতে অধিক নিবদ্ধদৃষ্টি ;—রবীন্দ্রনাথের বঙ্গপ্রীতি ভারতপ্রীতিতে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত এবং পরিণামে এই ভারতপ্রীতি আবার বিশ্বজাগতিকতার দিকে ধাবমান। (৪) সমাজ ও ধর্মকে ভিত্তি করার আদর্শ দুজনেরই,—একজন হিন্দু অনুশীলনের পথের যাত্রী, অন্যজনের অবলম্বন 'মানুষের ধর্ম'। (৫) বঙ্কিম যে স্বরূপে ইতিহাস-দর্শনের কামনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ তার থেকে অনেকটা ভিন্নস্বরূপ দর্শনাভিলাষী। অর্থাৎ বঙ্কিম ইতিহাসের সেই অংশই আলোকিত দেখতে চান যেখানে হিন্দু শৌর্যবীর্য ও আদর্শ সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রয়াস আছে. রবীন্দ্রনাথ ভারতের ঐক্যসাধনা,—জাতিতে জাতিতে সমন্বয় সাধনা, ও বৌদ্ধপ্রভাবিত বিশ্বমৈত্রীর সাধনাকেই উজ্জ্বলভাবে তুলে ধরতে চান। (৬) রবীন্দ্রনাথ উনবিংশ শতাব্দীর আধুনিক যুগের ইতিহাস, এমন কি বিংশ শতাব্দীর সৃজ্যমান ইতিহাসের প্রতিও মনোযোগ দিয়েছেন। বঙ্কিম আধুনিক ইতিহাসের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে নীরব থেকেছেন বা থাকতে বাধ্য হয়েছেন। তবে তিনি সৃজ্যমান ইতিহাসের সংকেত দেখেছিলেন এবং সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিতে সেই সংকেত নির্দেশ করেছেন—

কাল প্রসন্ন—ইউরোপ সহায়—সুপবন বহিতেছে দেখিয়া, জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও—তাহাতে নাম লেখ 'শ্রীমধুসূদন'।

এই আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, ইতিহাসচেতনাই এই দুই মনীষীর সমগ্র স্বদেশচিন্তার প্রেরণাত্মিকা শক্তি এবং এই জাতীয় শিল্পসৃষ্টির জননী। ইতিহাস-চেতনাজাত স্বচ্ছ-দৃষ্টির আলোকে জাতির পথনির্দেশের প্রয়াস দুজনের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়। বঙ্কিমের আবেগ যেখানে জাতীয় দোষ-ত্রুটির সমালোচনার সঙ্গে সঙ্গেই—'মা যা হইবেন' সেই আশাবাদী চিত্র অঙ্কন করে জাতিকে নির্দেশ দিয়েছে, —রবীন্দ্রনাথ সেক্ষেত্রে সংগঠনমূলক রাজনৈতিক আন্দোলনের পথনির্দেশে অজস্র প্রবন্ধ রচনা করেছেন। এইগুলিই আমাদের পরবর্তী আলোচ্য বিষয়।

অধ্যায় আরম্ভে রাজনীতিমূলক স্বদেশচিন্তার তিনটি প্রকাশধারার একটি বলেছি : জাতীয় দোষত্রুটির সমালোচনা ও আত্মসমীক্ষা। ইতিপূর্বে আলোচিত প্রথম দুটি ধারার পরিপ্রেক্ষিকায় এই আত্মসমীক্ষার সংগেই সংগঠনমূলক রাজনীতির কথা এসে পড়েছে।

বঙ্কিমের 'বিবিধ প্রবন্ধ'-এ নিছক আত্মসমীক্ষা ও নিরাসক্ত সমালোচনা খুব কম, কিন্তু আত্মসমীক্ষার প্রসঙ্গে নিবিড় আবেগ-ব্যাকুল আবেদন ছিল 'কমলা-কান্তের দপ্তর'-এর বেশ কয়েকটি নিবন্ধে। আর রবীন্দ্রনাথের সংগঠন-মূলক রাজনৈতিক চিন্তা প্রকাশিত 'সাধনা'-পর্বে দু'একটিতে এবং 'বঙ্গদর্শন'-পর্বের অধিকাংশ রচনায় ; 'কালান্তর'-এ গ্রথিত তাঁর শেষ জীবনের অনেকগুলি প্রবন্ধও এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। এবার এই পর্যায়ের প্রবন্ধগুলির একটি তালিকা তুলে ধরা যেতে পারে।

বঙ্কিমরচনা

১।	বঙ্গদর্শনের পত্র সূচনা	'বঙ্গদর্শন'	বৈশাখ, ১২৭৯
২।	বাঙ্গালা ভাষা	ঐ	জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৫
৩।	বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন	প্রচার	মাঘ, ১২৯১
৪।	লোকশিক্ষা	বঙ্গদর্শন	অগ্রহায়ণ, ১২৮৫
৫।	অনুকরণ		১৮৭৬ খ্রীঃ মুদ্রিত বিবিধ সমালোচনা

৬। কমলাকান্তের দপ্তর রচনাকাল (১২৮০-১২৮২)
একটি গীত, আমার দুর্গোৎসব, পলিটিক্স, বাঙ্গালির মনুষ্যত্ব।

৭। বিজ্ঞানরহস্য বঙ্গদর্শনে জ্যৈষ্ঠ ১২৭৯ হতে প্রবন্ধ প্রকাশ শুরু

৮। ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞানসভা 'বঙ্গদর্শন' ভাদ্র, ১২৭৯

রবীন্দ্ররচনা

(ক) 'সাধনা' পর্ব— (১) শিক্ষার হেরফের (শিক্ষা) সাধনা, পৌষ, ১২৯৯
(২) ভাষা-বিচ্ছেদ (শব্দতত্ত্ব) ভারতী, শ্রাবণ, ১৩০৫

(খ) 'বঙ্গদর্শন' (নবপর্যায়) পর্ব—

১।	ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার	সমাজ, পরিশিষ্ট	বৈশাখ, ১৩০৮
২।	মা ভৈঃ	বিচিত্র প্রবন্ধ	কার্তিক, ১৩০৯
৩।	স্বদেশ	আলোচনা	পৌষ, ১৩০৯
৪।	বঙ্গবিভাগ	সমূহ, পরিশিষ্ট	জ্যৈষ্ঠ, ১৩১১
৫।	য়ুনিভার্সিটি বিল	আত্মশক্তি	আষাঢ়, ১৩১১
৬।	স্বদেশী সমাজ	ঐ	ভাদ্র, ১৩১১
৭।	স্বদেশী সমাজ প্রবন্ধের পরিশিষ্ট	ঐ	আশ্বিন, ১৩১১
৮।	সফলতার সদুপায়	ঐ	চৈত্র, ১৩১১
৯।	ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ	ঐ	বৈশাখ, ১৩১২
১০।	ব্রতধারণ	ঐ	ভাদ্র, ১৩১২
১১।	দেশীয় রাজ্য	ঐ	আশ্বিন, ১৩১২
১২।	অবস্থা ও ব্যবস্থা	ঐ	আশ্বিন, ১৩১২
১৩।	বিজয়া-সম্মেলন	ভারতবর্ষ ও স্বদেশ	কার্তিক, ১৩১২
১৪।	রাখীবন্ধনের উৎসব		কার্তিক, ১৩১২
১৫।	দেশনায়ক	সমূহ	জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৩
১৬।	শিক্ষাসমস্যা	শিক্ষা	আষাঢ়, ১৩১৩
১৭।	জাতীয় বিদ্যালয়	ঐ	ভাদ্র, ১৩১৩
১৮।	আবরণ	ঐ	ভাদ্র, ১৩১৩
১৯।	শক্তি	শান্তিনিকেতন	মাঘ, ১৩১৪
২০।	সভাপতির অভিভাষণ	সমূহ	ফাল্গুন, ১৩১৪
২১।	পথ ও পাথেয়	রাজা ও প্রজা	আষাঢ়, ১৩১৫
২২।	সমস্যা	ঐ	আষাঢ়, ১৩১৫

২৩। সদুপায়	সমূহ		শ্রাবণ, ১৩১৫
২৪। দেশহিত	সমূহ, পরিশিষ্ট		আশ্বিন, ১৩১৫

(গ) 'প্রবাসী' পর্ব—

১। যজ্ঞভঙ্গ	সমূহ, পরিশিষ্ট		মাঘ, ১৩১৪
২। ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার			শ্রাবণ, ১৩১৪

(ঘ) 'ভাণ্ডার' (১৩১২-১৩১৪) পর্ব—

১। প্রাইমারি শিক্ষা		ভাণ্ডার, বৈশাখ, ১৩১২
২। বিজ্ঞানসভা		জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২
৩। স্বাধীন শিক্ষা		ভাদ্র ও আশ্বিন, ১৩১২
৪। বঙ্গব্যবচ্ছেদ		ভাদ্র, ১৩১২
৫। শোকচিহ্ন		
৬। পার্টিশনের শিক্ষা		ভাদ্র, ১৩১২
৭। করতালি		ভাদ্র, ১৩১২
৮। স্বদেশী আন্দোলনে নিগৃহীতদের প্রতি নিবেদন		ফাল্গুন, ১৩১২
৯। স্বদেশী আন্দোলন (১)		বৈশাখ, ১৩১৩ (বিশেষ সংখ্যা)
১০। স্বদেশী আন্দোলন (২)		জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৩
১১। শিক্ষাসংস্কার	শিক্ষা	আষাঢ়, ১৩১৩

(ঙ) 'সবুজপত্র' ও 'কালান্তর' পর্ব—

১। বিবেচনা ও অবিবেচনা	কালান্তর	সবুজপত্র	বৈশাখ, ১৩২১
২। লোকহিত	ঐ	ঐ	ভাদ্র, ১৩২১
৩। শিক্ষার বাহন	ঐ	ঐ	পৌষ, ১৩২২
৪। 'সবুজ পত্র'-এর খোলা চিঠি		ঐ	বৈশাখ, ১৩২৩

'Nationalism' ও 'Personality'—speeches

৫। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম	ঐ	১১ই আগস্ট ১৯১৭ আলফ্রেড থিয়েটারে পাঠ
৬। শিক্ষার মিলন	ঐ	আশ্বিন, ১৩২৮
৭। সত্যের আহ্বান	ঐ	কার্তিক, ১৩২৮
৮। হিন্দু মুসলমান (শ্রীকালিদাস নাগকে লিখিত)		১৩২৯
৯। সমস্যা	ঐ	অগ্রহায়ণ, ১৩৩০
১০। সমাধান	ঐ	অগ্রহায়ণ, ১৩৩২
১১। শূদ্র ধর্ম	ঐ	অগ্রহায়ণ, ১৩৩২

১২। চরকা ঐ ভাদ্র, ১৩৩২
১৩। স্বরাজ সাধন ঐ আশ্বিন, ১৩৩২
১৪। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ মাঘ, ১৩৩৩
১৫। দেশনায়ক ঐ ১৯৩৯
১৬। হিন্দু মুসলমান ঐ ১৩৩৮
১৭। রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত ঐ
১৮। কংগ্রেস ঐ আষাঢ়, ১৩৪৬

(চ) 'বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থাকারে প্রকাশ, ১৩৪৪

পত্রাবলী

ইতিপূর্বে প্রথম পর্বের তৃতীয় অধ্যায়ে উল্লিখিত একটি পত্রে আমরা লক্ষ্য করেছি, বঙ্কিম তাঁর সংগঠনমূলক চিন্তায় যে কর্মপন্থা ব্যক্ত করেছিলেন তার মূল কথাগুলি ছিল—

(a) We ought to disanglicise ourselves

(b) We ought to address ourselves to the masses.

তাঁর ঐ পত্রেই আর একটি বাক্য অতি গুরুত্বপূর্ণ ছিল—

(c) **There is no hope for India** until the Bengali and the Punzabi understand and influence each other and can bring joint **influence** to bear upon the Englishman.

(14.3.1872)

আপাতত প্রথম দুটি উদ্ধৃতির প্রসঙ্গে আমরা আলোচনা করছি, তৃতীয়টি পরবর্তী প্রসঙ্গে গ্রহণ করব। 'বঙ্গদর্শন'-এর পত্রসূচনাতেও (মাঘ, ১২৭৯) প্রথম দুটি উদ্দেশ্য পুনর্ব্যক্ত হয়েছিল যাতে প্রথমে ইঙ্গবঙ্গীয় সমাজের সমালোচনা ছিল, পরে বাংলাভাষায় জনসংযোগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। দুটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি এ প্রসঙ্গে—

(ক) ইংরাজ যাহা না শুনিল, তাহা অরণ্যে রোদন; ইংরাজ যাহা না দেখিল, তাহা ভস্মে ঘৃত। (খ) প্রস্তরময়ী সুন্দরী মূর্ত্তি অপেক্ষা, কুৎসিতা বঙ্গনারী জীবনযাত্রার সুসহায়।

প্রথম উদ্ধৃতিটিতে ইঙ্গবঙ্গীয় সমাজের তৎকালীন মনোবৃত্তির প্রতি ব্যঙ্গ, দ্বিতীয়টিতে মাতৃভাষার প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন আছে। এই প্রবন্ধের আলোচনায় ইংরাজি শিক্ষার সুফল স্বীকার করেও বলা হল যে উক্ত এডুকেশন 'ফিলটর ডৌন' করবে না। আমাদের সমাজে বর্ণগত পার্থক্যের

অনিষ্ট তো আছেই, এর সঙ্গে শিক্ষাগত পার্থক্য না জন্মানই ভাল। অতএব বাংলা ভাষায় বঙ্গমধ্যে জ্ঞানের প্রচার ও নব্যসম্প্রদায়ের সঙ্গে আপামর সাধারণের সহায়তা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। বঙ্গদর্শন এই জনসংযোগ স্থাপনের ব্রতে সফল হয়েছিল। অনুরূপ প্রসঙ্গ পুনরুত্থাপিত হয়েছে 'বাঙ্গালা ভাষা' সম্বন্ধে আলোচনা কালে,—"জনসাধারণের জ্ঞানবৃদ্ধি বা চিত্তোন্নতি ভিন্ন রচনার অন্য উদ্দেশ্য নাই।"—এইসঙ্গে একটি কথা স্পষ্ট বলেছেন বঙ্কিম, লিখিত ভাষার প্রাঞ্জলতা না থাকলে—"অধিকাংশ মনুষ্যকে তাহাদের স্বত্ব হইতে বঞ্চিত" করা হয়। এখানেও জনকল্যাণ ও জনশিক্ষার কথাই উঠেছে। এই সালেই (১২৮৫) 'লোকশিক্ষা' প্রবন্ধে বঙ্কিম জাতীয় সংগঠন ও জাতীয় উন্নতির একেবারে মূলে পুনরায় হাত দিলেন।—আসলে 'পত্র সূচনা' (১২৭৯) ও 'লোকশিক্ষা' (১২৮৫)—বঙ্কিমের একই নির্দেশনামার রূপ-ভেদ মাত্র। এবং উক্ত প্রসঙ্গে প্রদত্ত নির্দেশ বঙ্কিমের একই দৃষ্টিভঙ্গি প্রসূত। বঙ্কিম লিখলেন—

> ইংরাজ হইতে এদেশের লোকের যত উপকার হইয়াছে ইংরাজি শিক্ষাই তাহার মধ্যে প্রধান।···ভারতবর্ষীয় নানা জাতি একমত, একপরামর্শী, একোদ্যোগী না হইলে, ভারতবর্ষের উন্নতি নাই। এই মতৈক্য, একপরামর্শিত্ব, একোদ্যম, কেবল ইংরাজির দ্বারা সাধনীয়; কেননা এখন সংস্কৃত লুপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গালী, মহারাষ্ট্রী, তৈলঙ্গী, পঞ্জাবী, ইহাদিগের সাধারণ মিলনভূমি ইংরাজি ভাষা।

এ সম্পর্কে বঙ্কিমের বিশ্লেষণ প্রাঞ্জল। কিন্তু এডুকেশন 'ফিলটর ডৌন' করা যাবে না—এভাবে, সেজন্য বাংলা ভাষার সাহিত্য চাই। 'লোকশিক্ষা'তে এই কথাই উঠেছে। "এ ইংরেজি শিক্ষা সত্বেও দেশে লোকশিক্ষার উপায় হ্রাস ব্যতীত বৃদ্ধি পাইতেছে না, তাহার স্থূল কারণ বলি—শিক্ষিতে অশিক্ষিতে সমবেদনা নাই।" বঙ্কিমের এই বিশ্লেষণ অত্যন্ত যুক্তি-সঙ্গত। লোকশিক্ষা ব্যতীত জাতীয়চেতনা অলীক স্বপ্নমাত্র। লৌহকে প্রস্তুত, গঠিত ও শাণিত করলে হয় ইস্পাত, মনুষ্যকে প্রস্তুত, উত্তেজিত ও শিক্ষিত করলে তবে হয় সিদ্ধিলাভ।

> বাঙ্গালার ছয় কোটি যাট লক্ষ লোকের দ্বারা যে কার্য হয় না, তাহার কারণ এই যে, বাঙ্গালায় লোকশিক্ষা নাই। যাঁহারা বাঙ্গালার নানাবিধ উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত, তাঁহারা লোকশিক্ষার কথা মনে করেন না, আপন আপন বিদ্যাবুদ্ধিপ্রকাশেই প্রমত্ত।

উপায় কি? বঙ্কিমের মতে, কথকতার সাহায্যে লোকশিক্ষার জন্য জনসংযোগ

হতে পারে। কিন্তু সর্বাধিক প্রয়োজন—"সুশিক্ষিত যাহা বুঝেন, অশিক্ষিতকে ডাকিয়া কিছু কিছু বুঝাইলেই লোক শিক্ষিত হয়।...সুশিক্ষিতে অশিক্ষিতে সমবেদনা চাই।" 'সাম্য' প্রবন্ধেও একথা সোচ্চার, "শিক্ষাই সকল প্রকার সামাজিক অমঙ্গল নিবারণের উপায়।"

রবীন্দ্রনাথের সংগঠনমূলক রাজনীতির প্রথম সূত্র উচ্চারিত হল ঠিক এর চোদ্দ বৎসর পরে (সাধনা, পৌষ, ১২৯৯) 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে। তৎকালীন শিক্ষানীতির দুর্বলতাগুলি উদ্‌ঘাটন করে স্বাধীন জাতীয় শিক্ষানীতির কথা বললেন তিনি। ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের "অত্যাবশ্যক শিক্ষার সহিত স্বাধীনপাঠ না মিশাইলে ছেলে ভালো করিয়া মানুষ হয় না। দেশের অধিকাংশ লোকের শিক্ষা মাতৃভাষার মাধ্যমেই হওয়া প্রয়োজন।" 'ন্যাশনল ফণ্ড' প্রবন্ধে যে বঙ্গ-বিদ্যালয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, "বঙ্গবিদ্যালয়ে দেশ ছাইয়া সেই সমুদয় শিক্ষা বাংলায় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ুক" এখানেও সেই কথা—

আমাদের এই শিক্ষার সহিত জীবনের সামঞ্জস্যসাধনই এখনকার দিনের সর্বপ্রধান মনোযোগের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু এ মিলন কে সাধন করিতে পারে? বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য। —'শিক্ষার হেরফের'

এ প্রস্তাবের সহর্ষ সমর্থন জানালেন স্বয়ং বঙ্কিম—"প্রতিছত্রে আপনার সঙ্গে আমার মতের ঐক্য আছে।"[১৬] অথচ জাতীয় কংগ্রেস-মঞ্চে মাতৃভাষায় শিক্ষার নীতি তখনও অনালোচিত। এমনকি নাটোরে প্রাদেশিক কংগ্রেস অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জাতীয় নেতৃবৃন্দের মতবিরোধ হয় বাংলা ভাষায় কার্যপরিচালনা নিয়ে। 'ঘরোয়া'-তে অবনীন্দ্রনাথের স্মৃতিকথায় এর বিবরণ আছে। অতঃপর 'বঙ্গমন্ত্রের উদ্‌গাতা' রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশীসমাজ' manifesto-র অন্যতম প্রধান পরিকল্পনায় জনশিক্ষা ও জনসংযোগের কথা স্মরণযোগ্য। 'বঙ্গদর্শন' (নবপর্যায়) উত্তরসূরী রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীতে জাতীয় শিক্ষার পরিকল্পনা নানাভাবে উপস্থাপিত। স্বদেশীযুগের উত্তাল আবেগের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ বললেন যে "সুর চড়িয়ে কাঁদা" এবং "রং ফলিয়ে সর্বনাশের ছবি আঁকার"-পর নিশ্চেষ্টতা ধিক্কারযোগ্য। 'য়ুনিভার্সিটি বিল' প্রসঙ্গে বলা হল—

তাই বলিয়া বাসিয়া বসিয়া আক্ষেপ করিলে চলিবে না। আমরা নিজেরা যাহা করিতে পারি তাহারই জন্য আমাদিগকে কোমর বাঁধিতে হইবে।

—য়ুনিভার্সিটি বিল, আষাঢ়, ১৩১১

অর্থাৎ বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা রাজার উপর বরাত না দিয়ে সমাজের হাতে নিতে হবে। বস্তুত স্বাধীন জাতীয় শিক্ষার পরিকল্পনা রবীন্দ্রনাথের রচনায় দেখা

গেল সর্বপ্রথম, মাদ্রাজ-কংগ্রেসে তখনও শিক্ষা-ব্যাপারে বৃটিশ সরকারের কৃপালাভের জন্ম আবেদন চলছিল।

'স্বদেশী সমাজ'-এ রবীন্দ্রনাথ জনসংযোগের জন্ম মেলার গুরুত্ব এবং জনশিক্ষার জন্ম জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা বিশদ পরিকল্পনার মাধ্যমে তুলে ধরলেন। তিনি আরও বললেন, এই সঙ্গে লোকসংস্কৃতির উজ্জীবনও আশু প্রয়োজন। বঙ্কিমচন্দ্র কথকতার মাধ্যমে লোকশিক্ষার কথা বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাই যেন পুনর্ঘোষণা করলেন; তাঁর মতে একদিকে মেলাতে লোকশিক্ষার প্রভৃত আয়োজন চাই, অন্যদিকে—

> যতদিন না আমরা নিজে স্বদেশী বিদ্যালয় স্থাপন করি ততদিন যথাসাধ্য স্বদেশচালিত বিদ্যালয়ে সন্তানদিগকে পড়াইব। —'স্বদেশী সমাজ'

এই প্রতিজ্ঞা পালন করা চাই। অতঃপর 'সফলতার সদুপায়' (২৭ ফাল্গুন, ১৩১১) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের পুনর্ঘোষণা শোনা গেল—"আমি পুনরায় বলিতেছি, দেশের বিদ্যাশিক্ষার ভার আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে।" 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণে' কলেজের বাইরে যে দেশ আছে সেখানে ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব আলোচনা এবং লোকসংস্কৃতির জাগরণের ব্রতে তিনি দেশের যুবগোষ্ঠীকে আহ্বান জানালেন।

'বঙ্গব্যবচ্ছেদ' কালে 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়' স্থাপনের পরিকল্পনায় অগ্রণী এবং সবচেয়ে উৎসাহী সমর্থক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু তৎকর্তৃক প্রস্তাবিত 'জাতীয় শিক্ষানীতি' স্বদেশী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ কর্তৃক গৃহীত হল না, তখন তিনি শান্তিনিকেতনে সেই পরিকল্পনার বাস্তব রূপদানে মনস্থ করলেন, কারণ তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ছিল, জাতীয় চিত্তের সামগ্রিক উন্মেষের জন্ম জাতীয় শিক্ষা চাই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমগ্র জীবনের কর্মসাধনায় এর রূপদান করেছেন 'শান্তিনিকেতনে'। উক্ত পরিকল্পনার মূল সূত্রগুলি লিপিবদ্ধ হয়েছিল— 'শিক্ষাসংস্কার' (আষাঢ়, ১৩১৩), 'শিক্ষা সমস্যা', 'জাতীয় বিদ্যালয়', ও 'আবরণ' (১৩১৩) প্রভৃতি প্রবন্ধাবলীতে; নিঃসন্দেহে রবীন্দ্র-শিক্ষাদর্শনের মৌলিকতায় এগুলি উজ্জ্বল। একথা সর্ববাদীসম্মত যে পরাধীন দেশের সবচেয়ে বড়ো অভিশাপ বিজেতা দ্বারা সাংস্কৃতিক বিজয়, রবীন্দ্র শিক্ষাচিন্তা এবং তার বাস্তব রূপদান উক্ত অভিশাপ হতে জাতিকে মুক্ত করেছে। এই ক্ষেত্রে স্বদেশ চিন্তার ইতিবৃত্তে এ বিষয়টি আজ কৃতজ্ঞতার স্বীকৃতি পেয়েছে। সেদিন রবীন্দ্র-নাথের সুস্পষ্ট বক্তব্য ছিল—

> চাকরির অধিকার নহে, মনুষ্যত্বের অধিকারের যোগ্য হইবার প্রতি যদি লক্ষ্য

রাখি, তবে শিক্ষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য-চেষ্টার দিন আসিয়াছে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। —'শিক্ষাসংস্কার'

উক্ত প্রয়াসের জন্ম 'শিক্ষাসমস্যা' প্রবন্ধে প্রাচীন তপোবনের আদর্শে জাতীয় শিক্ষা ও বিদ্যালয় পুনর্গঠনের প্রস্তাব ছিল। সে প্রস্তাবে ব্রহ্মচর্যপালনের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির আনুকূল্য নিরপরাধ শিশুদের মনোবিকাশের জন্য অপরিহার্য একথা বলা হয়েছিল। অনেকদিন পরে এই মনোভঙ্গিই ব্যক্ত হয়েছিল 'তোতাকাহিনী' রূপকে, নিষ্পাপ শিশুদের তোতাপাখী করে তুলবার প্রতি রবীন্দ্রনাথের তীব্র বিরূপতা সেখানে শ্লেষতিক্ত কণ্ঠে উচ্চারিত। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন কালে 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদ'-এর উদ্বোধনী ভাষণরূপে—'জাতীয় বিদ্যালয়' প্রবন্ধ পাঠ (২৯শে শ্রাবণ, ১৩১৩) করেছিলেন শিক্ষাবিদ রবীন্দ্রনাথ। ঐ প্রসঙ্গেই তাঁর শিক্ষার মূল লক্ষ্য ঘোষিত হয়েছিল—

সময় আসিয়াছে যখন ভারতবর্ষের মন লইয়া এই-সকল নানাস্থানের বিক্ষিপ্ত বিচিত্র উপকরণের উপর সাহসের সহিত গিয়া পড়িব,······আমাদের চিত্ত তাহাদিগকে একটি অপূর্ব ঐক্যদান করিবে। —'জাতীয় বিদ্যালয়'

অতঃপর 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই দৃষ্টিভঙ্গি আরও প্রসারিত হয়েছে। বস্তুত 'কালান্তর' পর্বে এসে তিনি প্রতিটি প্রবন্ধে এই শিক্ষার কথা নানাভাবে নানা সূত্রে বলেছেন। বিধিদত্ত স্বরাজলাভ করতে হলে শিক্ষা চাই, কারণ "বুদ্ধির ভীরুতাই হচ্ছে শক্তিহীনতার প্রধান আড্ডা।" এবং "আত্মবুদ্ধির প্রতি আস্থা আত্মশক্তির প্রধান অবলম্বন।" এ যুগের একই প্রত্যয়নিষ্ঠ ঘোষণা-মূলক অজস্র উক্তি উদ্ধৃত করা যেতে পারে, তার মধ্যে আমরা কয়েকটি এখানে উল্লেখ করছি—

১. সেই শক্তি দিতে গেলেই তাহাদের হাতে এমন একটি উপায় দিতে হইবে যাহাতে ক্রমে তাহারা পরস্পর সম্মিলিত হইতে পারে—সেই উপায়টিই তাহাদের সকলকেই লিখিতে পড়িতে শেখানো। —'লোকহিত' ১৩২১

২. জ্ঞানের দিকে গোড়া কাটা পড়িলেই কর্মের দিকে ডালপালা আপনি শুকাইয়া যায়। —'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম', ১৯১৭

৩. অবুদ্ধির প্রভাবে স্ববুদ্ধির প্রতি আস্থা হারিয়ে আন্তরিক স্বাধীনতার উৎসমুখে আমরা দেশজোড়া পরবশতার পাথর চাপিয়ে বসেছি। এইটেই যখন আমাদের সমস্যা তখন এর সমাধান শিক্ষা ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। —'সমাধান', ১৩৩২

স্পষ্টত সর্বত্রই এই শিক্ষা দানের মূল প্রয়োজনীয়তার কথা ঘোষিত। এই

ঘোষণা সুরু হয়েছিল 'শিক্ষার হেরফের' নিবন্ধ হতে, তিনি আজীবন নানা লেখায় যা লিখে গেছেন, 'শিক্ষার মিলন'-এ পুনরায় তার বিস্তৃত বিশ্লেষণ ও নবসংস্কার করে ঘোষণা করলেন, "স্বাতন্ত্র্যের অহমিকা থেকে মুক্তিদান করার শিক্ষাই আজকের দিনের প্রথম শিক্ষা।" (আশ্বিন, ১৩২৮)। রবীন্দ্রনাথ ইতিমধ্যে বিশ্বভারতীতে তাঁর সংকল্পকে রূপদান করেছেন, সংকীর্ণ জাতীয়তার আত্মঘাতী উন্মাদনার বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিয়ে এসেছেন তাই শিক্ষার ক্ষেত্রে এই "শুভবুদ্ধির সংযোগ"-এর কথা পুনরুচ্চারণ করেছেন। 'কর্তাভজা'—দেশে অবুদ্ধিরূপ ভূতের হাত হতে বাঁচার উপায় শিক্ষা। এ শিক্ষা কেবল যান্ত্রিক বিজ্ঞান শিক্ষা নয়, পূর্ব পশ্চিমের মিলন মন্ত্রটি চাই। রবীন্দ্রনাথের প্রার্থনা, এজন্যে পশ্চিমের বিজ্ঞান ও পূর্বের তত্ত্বজ্ঞান মিলিত হোক, যেখানে শিক্ষামন্ত্রটি হবে—

যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে

যুগের আহ্বানে তিনি জাতীয় শিক্ষাকে ভেদবুদ্ধি দূর করার ব্রতে ব্রতী করতে চেয়েছিলেন। আজ নিঃসন্দেহে বলা চলে শিক্ষার ক্ষেত্রে এই চিন্তা কেবল মনোভূমিতে নয়, বাস্তব কর্মভূমিতে রূপদান করেছেন তিনি। বিশ্বভারতী বাস্তবিকই তাঁর 'শিক্ষার মিলন' চিন্তার কায়াকল্প।

আমরা লক্ষ্য করি, বঙ্কিম 'ধর্ম্মতত্ত্ব'-এ এমনি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। যদিও তার সুর ভিন্ন, পরিবেশ সনাতনী এবং তা ছিল 'অনুশীলন' ধর্মের সাধনার অঙ্গস্বরূপ। সেখানে 'ভূত'-কে জানার উপায়স্বরূপ (উনবিংশ শতাব্দীতে কোঁৎ-এর প্রথম চাবি) বহির্বিজ্ঞান বিষয়ে পাশ্চাত্যগুরুর প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত। (রবীন্দ্রনাথের ভাষায় পাশ্চাত্য শুক্রাচার্যদের কাছে)। আর অন্তর্বিজ্ঞানে অর্থাৎ পাশ্চাত্যের Biology, Sociology-তে 'আমি'-কে জানতে হবে, এবং ঈশ্বরকে জানতে হবে "হিন্দুশাস্ত্রে, দর্শনে, পুরাণে—ইতিহাসে, প্রধানতঃ গীতায়।" এ সম্পর্কে বঙ্কিমের দৃঢ়প্রত্যয় হল এই—

> যেদিন ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও শিল্প এবং ভারতবর্ষের এই নিষ্কাম ধর্ম্ম একত্রিত হইবে সেইদিন মনুষ্য দেবতা। তখন ঐ বিজ্ঞান ও শিল্পের নিষ্কাম প্রয়োগ ভিন্ন সকাম প্রয়োগ হইবে না।

রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্যের এই স্বার্থপর বিজ্ঞানবুদ্ধির সম্বন্ধে বলেছেন—অরাজক তালের গতি আছে শান্তি নেই, উত্তেজনা আছে পরিতৃপ্তি নেই; বঙ্কিমের ভাষায় তাই হল সকাম প্রয়োগ।

এ প্রসঙ্গে একটি বিশেষ দিকে পূর্বসূরী ও উত্তরসূরীর চিন্তার অজাঙ্গী মিল দেখতে পাচ্ছি—তা হল, পশ্চিমের বিজ্ঞান ও পূর্বে তত্ত্বজ্ঞানের মিলন-কামনা। বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠ'-এর শেষতম পরিচ্ছেদে মহাপুরুষের মাধ্যমে যে পরামর্শ দিয়েছেন, 'ধর্ম্মতত্ত্ব'-এ এসেও সেই বহির্বিজ্ঞান ও অন্তর্বিজ্ঞানের সাধনার কথা পুনর্ঘোষণা করেছেন। আমরা জানি, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অবদানকে উদার-বুদ্ধিতে গ্রহণ করার আগ্রহ উনিশ শতকীয় নবজাগরণের ফলশ্রুতি। রামমোহন, অক্ষয়কুমার, রাজেন্দ্রলাল প্রভৃতি মনীষীর উত্তরাধিকার বঙ্কিমেও সুষ্ঠুরূপে প্রকাশমান। বঙ্কিমের প্রথমযুগের রচনা 'বিজ্ঞানরহস্য'—ঐ বিজ্ঞানচেতনাকে ছড়িয়ে দেবার ও বিজ্ঞানের সহজ তথ্যগুলিকে জনপ্রিয় করার প্রয়াস। বিজ্ঞান-বুদ্ধিতে ভারতীয় দেববাদের বিশ্লেষণও এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য, সে বিশ্লেষণ আছে 'ত্রিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশাস্ত্র কি বলে' প্রবন্ধে। এইসঙ্গে প্রাচীন ভারতের গণিতশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র প্রভৃতির সম্পর্কে গৌরব-বোধও ছিল। তারই ভিত্তিতে নতুন যুগের ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞানসভার প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগ ও সক্রিয় সহায়তাদান বঙ্কিমের এই বিষয়ে অপার আগ্রহের দৃষ্টান্ত। ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞানসভা'-র অনুষ্ঠান পত্রটি হতে একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি—

> ইউরোপীয়েরা বিজ্ঞানবলে এই ভারতবর্ষ জয় করিয়াছেন, বিজ্ঞানবলেই ইহা রক্ষা করিতেছেন।…বিজ্ঞানের সেবা করিলে বিজ্ঞান তোমার দাস,…
> এখন ভুক্তভোগী লোক শিক্ষাগ্রহণ কর।

এক কথায়, বঙ্কিম কেবল বিজ্ঞানসভার প্রতিষ্ঠাই সমর্থন করেছেন তাই নয়, বিজ্ঞানের যত্নে আর্থিক উপকার পাওয়ার কথাও চিন্তা করেছেন। প্রযুক্তিবিদ্যার কথাই সম্ভবত তাঁর মনে এসেছে,—"বঙ্গীয় যুবকগণ অবস্থার উন্নতিসাধন করুন, বঙ্গের শিল্পবিদ্যার পুনরুদ্ধার করুন।"

এদিকে উত্তরসূরী রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানচেতনা তাঁর শিক্ষা সংক্রান্ত প্রায় স' প্রবন্ধেই প্রকাশিত। 'শিক্ষার মিলন' তার একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত। পাশ্চাত্য দেশে ভ্রমণকালে ইউরোপ-আমেরিকার বিজ্ঞানবুদ্ধির আশ্চর্য মহত্ত্ব এবং ওদেশের প্রযুক্তি বিদ্যার ক্ষমতা রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছেন। যান্ত্রিকতা এবং লোভকে সভ্যতার অভিশাপ বলে ধিক্কার দিলেও কোটি কোটি মানুষের জীবিকার সংস্থান, স্বাস্থ্যের ও শিক্ষার ব্যবস্থা ইত্যাদির জন্য এই বিজ্ঞানবুদ্ধির জয়জয়কার তিনি ঘোষণা করেছেন অজস্র প্রবন্ধে। এমনকি বৃদ্ধবয়সেও রবীন্দ্রনাথ 'বিশ্ব পরিচয়'-গ্রন্থ রচনা করে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানরাজিকে সাধারণ মানুষের বোধের নাগালে এনে দেবার চেষ্টা করেছেন। তার ভূমিকায় তিনি বলেছেন—

বিজ্ঞানচর্চার দেশে জ্ঞানের টুকরো জিনিসগুলি কেবলই ঝরে ঝরে ছড়িয়ে পড়ছে। তাতে চিত্তভূমিতে বৈজ্ঞানিক উর্বরতার জীবধর্ম জেগে উঠতে থাকে। তারই অভাবে আমাদের মন আছে অবৈজ্ঞানিক হয়ে। এই দৈন্য কেবল বিদ্যার বিভাগে নয়, কাজের ক্ষেত্রে আমাদের অকৃতার্থ করে রাখছে।

বিজ্ঞানবুদ্ধির জাগরণ হোক, প্রযুক্তিবিদ্যা প্রচারিত হোক—এ কামনা তাঁর 'চরকা' প্রভৃতি রাজনৈতিক প্রবন্ধেও ধ্বনিত।

মোটকথা দুই মনীষীই পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও প্রাচ্য তত্ত্বজ্ঞানের মিলন কামনা করেছেন; এবং দুজনেই আশ্চর্য প্রগতিশীলতার দৃষ্টান্ত হয়ে আছেন। একথা স্পষ্ট যে বঙ্কিমের চিন্তা রবীন্দ্র-চিন্তায় আরও বিস্তৃতি পেয়ে—এককথায় উদারতর হয়ে বিশ্বমানবিকতার মিলনসাধনা করতে বসেছে। স্বভাবতই উনবিংশ শতাব্দী বিংশ শতাব্দীতে এসে অনেক বেশি আন্তর্জাতিক হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের মতে ভারতের জ্ঞানলাভের সাধনা বিশ্বগুরু হবার জন্যে নয়,—বিশ্বসভায় নিজের অংশ গ্রহণ করার কামনায়। পরবর্তী ধর্মচিন্তার ক্ষেত্রে তাঁর এ কামনাটি পুনরায় অভিব্যক্ত হয়েছে, দেখা যাবে।

গণজাগরণ ও জাতীয় উন্নতির প্রশ্নে রবীন্দ্রচিন্তার অনেকখানি অংশ জুড়ে আছে লোকশিক্ষা। 'রাশিয়ার চিঠি'-তে তাঁর এই আবেগ-ব্যাকুলতার দৃষ্টান্ত আছে—

> মানুষের সকল সমস্যা-সমাধানের মূলে হচ্ছে তার সুশিক্ষা।......আমি দেশের কাজের মধ্যে একটি কাজকেই শ্রেষ্ঠ বলে মেনে নিয়েছিলুম—জনসাধারণকে আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠা দেবার শিক্ষা দেব বলে এতকাল ধরে আমার সমস্ত সামর্থ্য দিয়েছি।

এজন্যেই ১৯৩০ সালে রাশিয়ায় ঐ লোকশিক্ষার বিপুল আয়োজন দেখে কবি মুগ্ধ হয়েছিলেন। অতঃপর 'শিক্ষার সাঙ্গীকরণ' (১৯৩৬) প্রবন্ধে তিনি আবার জোর দিয়ে বললেন, "শিক্ষার ঐক্য সাধন ন্যাশনল ঐক্যসাধনের মূলে এই সহজ কথা সুস্পষ্ট করে বুঝতে আমাদের দেরি হয়েছে।" জীবনের শেষপ্রান্তে এসেও তিনি তাঁর দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করেছিলেন এই শিক্ষাদানের মহত্তম ব্রত নিয়েই—

> আজ আমাদের অভিযান নিজের অন্তর্নিহিত আত্মশত্রুতার বিরুদ্ধে; প্রাণপণ আঘাত হানতে হবে বহুশতাব্দীনির্মিত মূঢ়তার দুর্গভিত্তি-মূলে।
>
> —'ছাত্রসম্ভাষণ', ১৩৪৩

আনুষ্ঠানিক ভাবে শিক্ষার বাহন রূপে মাতৃভাষা বাংলাকে এই দিন (৬ই

ফাল্গুন, ১৩৪৩) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্মানিত আসন দেওয়া হল, সেই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের উক্ত আনন্দ প্রকাশ ও সংকল্প গ্রহণ। এতক্ষণ আমরা কালের পরিমাপে ১২৭৯ সালের বৈশাখ হতে ১৩৪৩ সালের ফাল্গুন পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ ৬৪ বৎসরের পরিক্রমা করে এসেছি। দেখেছি, বঙ্কিমের পূর্বোল্লিখিত চিঠিতে উক্ত 'Disanglicise' করার বাসনা এতদিনে অনেকটা সফল হয়েছে, গণসংযোগের সংকল্প গৃহীত হয়েছে। পূর্বসূরী হতে উত্তরসূরীর মতে ও পথে কিঞ্চিৎ অমিল থাকলেও লক্ষ্যগত মিল নিশ্চয়ই অনেকখানি, অবশ্য লক্ষ্য বা আদর্শগত কিঞ্চিৎ সূক্ষ্ম অমিল যদি থাকে, তা শতাব্দীর অগ্রগতির ফলশ্রুতি। আর একটি কথা নিশ্চয়ই মনে রাখতে হবে, বঙ্কিমমানসে যে চিন্তাবীজ ছিল, রবীন্দ্রমানসে তা যে কেবল পুষ্পপল্লবিত হয়েছে তাই নয়, কর্মে ও বাস্তব-রূপে তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও উন্নয়ন ঘটেছে তাঁরই প্রচেষ্টায় এবং ব্যবহারিক প্রয়োগে তার বিরাট বিপুল সাধনা সফল হয়েছে। শিক্ষা-সংগঠনের ক্ষেত্রটি পর্যালোচনায় আমরা যেমনটি দেখলাম, অন্যান্য বিষয়েও ঠিক এবই প্রবণতা লক্ষ্য করব।

'বঙ্গদর্শনে' যা ছিল বীজ, তিনদশক পরে 'বঙ্গদর্শনে' (নবপর্যায়) তা পুষ্পপল্লবিত মহীরুহ। জাতীয় দোষত্রুটির তীব্র সমালোচনার জন্য বঙ্কিম কমলাকান্তকে আশ্রয় করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে আর ঐ জাতীয় ছদ্মবেশের প্রয়োজন ছিল না। আমরা জানি সম্পাদক বঙ্কিমকে কখনও সভামঞ্চে ভাষণদান করতে হয়নি (শেষজীবনে দু-একটি সভার সভাপতিত্ব করেছেন, আর রবীন্দ্রনাথ সেইসব সভার মূল বক্তা)। 'বঙ্গদর্শন' (নবপর্যায়) যুগে রবীন্দ্রনাথ জনতার দাবীতে প্রায়ই বিশিষ্ট সভাতে প্রবন্ধপাঠ বা ভাষণদান করেছেন। মোটকথা একইকালে বঙ্কিমের দুটি সামাজিক সত্তা ছিল—উচ্চ রাজকর্মচারী এবং চিন্তা-নায়ক ও ঔপন্যাসিক। আর রবীন্দ্রনাথ নানা বেশে (জমিদার কিংবা আশ্রম-প্রতিষ্ঠাতা কিংবা সম্পাদকের বেশেও) একই সমাজসত্তা সেই সভায় তিনি কবিমনীষী। এজন্যে বঙ্কিম অতি সংক্ষিপ্ত বাক্যে, ঘনীভূত আবেগে দু-একটি উক্তি যা সূত্ররূপে রেখে গেছেন,—রবীন্দ্রনাথ অনেকদিন ধরে অনেক সভায়, অনেক রচনায় সেই সূত্রগুলির ভাষ্য, মহাভাষ্য রচনা করেছেন, প্রয়োজনে নতুন সূত্রযোজনা করেছেন। বিশেষ করে প্রত্যক্ষ রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে বঙ্কিম আসেন নি বা আসতে পারেননি, ঐ সম্পর্কিত উক্তিও তাই সর্বাধিক কম এবং যা দু-একটি লভ্য, তাও ছদ্মভাষায়। তবে একথা সর্বজনস্বীকৃত বাঙালি-মানসে স্বদেশচেতনায় অপূর্ব এক আবেগ সঞ্চার করেছিলেন বঙ্কিম, আর

রবীন্দ্রনাথ সেই আবেগের জোয়ারকে চালনা করার প্রয়াস করেছিলেন— সংগঠনমূলক রাজনীতির খাতে।

আমরা লক্ষ্য করেছি, কুকুরজাতীয় পলিটিক্সে বঙ্কিমের ঘৃণা ব্যঙ্গের ছদ্মবেশেও অপ্রকাশিত থাকেনি—

> জয় রাধে কৃষ্ণ! ভিক্ষা দাও গো! ইহাই তাহাদের পলিটিক্স্! তদ্ভিন্ন অন্য পলিটিক্স্ যে গাছে ফলে তাহার বীজ এ দেশের মাটিতে ফলিবার সম্ভাবনা নাই। —"পলিটিক্স্", 'কমলাকান্তের দপ্তর'

কারণ কুকুর-জাতীয় পলিটিক্স-ওয়ালাদের পলিটিকেল এজিটেশান সফল হলে পায় উত্তমরূপে চোষিত মাছের কাঁটা—অর্থাৎ কিছু সুভাষিত 'বিল' (ইলবার্ট বিল জাতীয়—যা আইন হয় না) অথবা কিছু সরকারি চাকুরি, কিংবা কিছু স্কুল কলেজ, তৎপর আরও বেশী "bold move" করলে, ইষ্টকখণ্ড নিক্ষেপিত হয়—অর্থাৎ 'সিডিশন বিল' জাতীয় কিছু, যা কণ্ঠরোধ করে। বঙ্কিমচন্দ্র-অঙ্কিত রাজা মুচিরাম রায় বাহাদুর পর্যন্ত যারা কুকুরের দরের পলিটিশ্যন—তারা অবশ্যই ঘৃণার্হ। আর যারা নেড়াগাছে শিমূলফুল, বক্তৃতাবাগীশ, তাঁরা—"কেহ বা মনে করেন, ঘ্যান্‌ঘ্যানানির চোটে দেশোদ্ধার করিবেন—সভাতলে ছেলে বুড়া জমা করিয়া ঘ্যান্‌ঘ্যান্ করিতে থাকেন।" অর্থাৎ এ ব্যাপারে প্রায় ক্ষিপ্ত হয়েই বঙ্কিম যেন বলে উঠেছিলেন—

> তোমাদের জাতির ঘ্যানঘ্যানানি আর ভাল লাগে না।.......তোমরা না জান মধু সংগ্রহ করিতে, না জান হুল ফুটাইতে—কেবল ঘ্যান্‌ঘ্যান্ পার। একটা কাজের সঙ্গে খোঁজ নাই।

বঙ্কিম 'বাঙ্গালির মনুষ্যত্ব'-কে তীব্রভাবে সমালোচনা করে একটা কাজের দিকে মন দিতে বলেছিলেন। কি কাজ? তা স্পষ্ট করে বঙ্কিম বলেন নি, হয়ত বলতে পারেননি। "অন্যজাতীয় পলিটিক্স" বলতে তিনি কি ইঙ্গিত করেছেন, কিংবা "হুল ফুটান" অর্থে তাঁর কিছু বৈপ্লবিক নির্দেশ ছিল কিনা তা জানা গেল না। হয়ত 'আনন্দমঠ'-এ সন্তানধর্মের ইঙ্গিত (লোকশিক্ষার কথা ত আগেই বলেছেন), হয়ত 'সাম্য' প্রবন্ধের ইঙ্গিত। কিন্তু তা নিয়ে সুস্পষ্ট বিচারের প্রয়োজন আছে। আর আছে 'বাঙ্গালির বাহুবল' প্রবন্ধে একটুখানি ভরসার কথা। উদ্যম, ঐক্য, সাহস এবং অধ্যবসায় একত্রিত হলে বাহুবল হতে পারে কিন্তু একটি বৃহৎ "যদি" আছে তার পূর্বে—"অতএব যদি কখন......যে কোন সময় ঘটিতে পারে।" এই "জাতীয়-সুখের অভিলাষ" প্রবল করে তুলবার জন্যই 'কমলাকান্ত'-এর তীব্র ব্যঙ্গচাবুক বাঙালির পিঠে পড়েছে, এবং সঙ্গে সঙ্গেই

বাঙালির কানে তাঁর অনুনয় ভরা আহ্বানও এসেছে। সে অশ্রুসজল মাতৃ-বোধন মন্ত্র সন্তনিদ্রোত্থিত বাঙালি জাতিকে মাতৃপূজার অঙ্গনে সমবেত করেছে। এক অপূর্ব শিহরণ তার সর্বদেহে সঞ্চারিত হয়েছে কমলাকান্তের গদ্‌গদ্ কণ্ঠের আবৃত্তিতে—

> চিনিলাম এই আমার জননী জন্মভূমি—এই মৃন্ময়ী—মৃত্তিকারূপিনী—অনন্তরত্নভূষিতা—এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা।……কালস্রোতমধ্যে দেখিলাম এই সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা।

অতঃপর কমলাকান্তের জলদগম্ভীর কণ্ঠে সংকল্পবাক্য উচ্চারিত হয়েছে—"এসো মা গৃহে এসো···এই ছয় কোটি দেহ তোমার জন্য পতন করিব—না পারি, এই দ্বাদশ কোটি চক্ষে তোমার জন্য কাঁদিব।" কিন্তু কেবল শিশুসুলভ ক্রন্দন নয়—বীরপুত্রসুলভ প্রতিজ্ঞাও উচ্চারিত হয়েছে—"উঠ মা। এবার সুসন্তান হইব, সৎপথে চলিব, তোমার মুখ রাখিব।" এবং এরপরই একা রোদন নয়, কেবল প্রতিজ্ঞাও নয়, পৌরুষদৃপ্ত আহ্বানও শোনা গেছে—"এসো ভাই সকল। আমরা এই অন্ধকার কালস্রোতে ঝাঁপ দিই।" বস্তুত কাল-সমুদ্র তাড়িত মথিত করে মাতৃপ্রতিমা উত্তোলন করে দেশের মনোমন্দিরে প্রতিষ্ঠা করার সেই মহৎ ব্রতে বঙ্কিম ঋত্বিক, বঙ্কিম মন্ত্রদ্রষ্টা।

এদিকে, 'সাধনা' পর্বে রবীন্দ্রনাথের রচনার বৈশিষ্ট্যগুলিতে দেখেছি—১. "স্বদেশহিতৈষিতার প্রকৃত চর্চার" জন্য সংকল্প কিংবা ২. 'জাতিবৈর' প্রবন্ধে অভিব্যক্ত বঙ্কিমের ভাবানুসরণে পরিকল্পনা। অর্থাৎ রবীন্দ্রবক্তব্য এই, "আমাদের এখন আত্মনির্মাণ জাতিনির্মাণের অবস্থা এখন আমাদের অজ্ঞাত-বাসের সময়।" আমরা আগেই বলেছি, তখনও তাঁর সক্রিয় রাজনীতির অভিজ্ঞতা ছিল না, অথবা তাঁর মনে ঐ জাতীয় ইচ্ছাও জাগেনি। তখনও তাঁর আবেগ-উৎসারিত প্রবন্ধে প্রবন্ধে চলেছে ইংরেজ ও ভারতবাসীর সম্পর্ক নির্ণয়, বঙ্কিমী সূত্রের বিস্তৃত ভাষা রচনা ও সংযোজনা। 'বঙ্গদর্শনের' (নবপর্যায়) প্রথম প্রবন্ধেই রবীন্দ্রনাথ একেবারে আসল কথায় এসে পড়লেন, অবশ্য সেই পূর্বোল্লিখিত পর্যায়ক্রম অনুসারে—প্রথমে আত্মসমীক্ষা, তারপর সংকল্প। এবার প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি লক্ষ্য করা যায়—

১. আমরা দেশকে যে যতই ভালবাসি না কেন, দেশকে ঠিকমত কেহ কোনোদিন জানি না। —'ব্যাধি ও প্রতিকার'

২. আর মিথ্যাকথা বলিবার কোনো প্রয়োজন নাই। এবার আমাদিগকে

স্বীকার করিতেই হইবে হিন্দু-মুসলমানের মাঝখানে একটা বিরোধ আছে। আমরা যে কেবল স্বতন্ত্র তাহা নয় আমরা বিরুদ্ধ। —তদেব

৩. আমাদের পাপই ইংরেজদের প্রধান বল। ইংরেজ আমাদের ব্যাধির একটা লক্ষণ মাত্র। —তদেব

এ হল ব্যাধি, প্রতিকার কি?

"দেশকে আপন চেষ্টায় আপন দেশ করিয়া গড়িয়া তুলিতে হয়।" এজন্য শিক্ষিত-অশিক্ষিতের ব্যবধান, হিন্দু-মুসলমান ব্যবধান, "সুবিধার চর্চাতে" নয়, প্রেমের চর্চা ও সেবার চর্চাতে ঘুচাতে হবে।

দেশের এক-একটি জায়গায় এক-একটি মানুষ বিরলে বসিয়া নিজের সমস্ত জীবন দিয়া যে-কোনো একটি কর্মকে গড়িয়া তুলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে থাকুন—এই আমাদের সাধনা।……এমনি করিয়াই ভিতরে ভিতরে স্বদেশ গড়িয়া উঠিবে এবং স্বরাজগঠনের যথার্থ অবকাশ একদিন উপস্থিত হইবে।

বেশ বোঝা যাচ্ছে, সংকল্পগুলি এখনও ভাবাদর্শের পর্যায়ে। এজন্যেই রবীন্দ্রনাথ নিজেই পুনরায় বললেন—

এখন স্পষ্ট করিয়া বলো, কী কাজ করিতে হইবে। আচ্ছা মানিলাম স্বরাজই আমাদের শেষলক্ষ্য, কিন্তু কোথাও তো তাহার একটা শুরু আছে, সেটা একসময় তো ধরাইয়া দিতে হইবে।

দেখা যাচ্ছে, এখনও স্পষ্ট পরিকল্পনা আসেনি, তবে 'যুগোচিত কর্মপথের নির্দেশের' মুহূর্ত সমাগত। কমলাকান্তের সেই আবেগমথিত জলদমন্দ্র এখনও শোনা গেল। স্বদেশী আন্দোলনের উদগাতার ভূমিকায় কবি যখন দণ্ডায়মান—বাঙালি মানসের "মরাগাঙে বান আসবার" কল্লোলধ্বনি যখন কবির লেখনীতে, তখনই শুনা গেল 'মা ভৈঃ' (১৩০৯)। সেই প্রবন্ধে আগামী কালবৈশাখীর সূচনা ছিল—"আরামকেদারায় হেলান দিয়ে পোলিটিক্যাল সুখস্বপ্ন দেখা" কবির অসহ্য হয়ে উঠেছিল। তাই তাঁর বীণাতন্ত্রে খরতর ঝঙ্কার ঝঞ্চনায় উচ্চস্বর বেজেছিল,—"তুমি দেশকে যথার্থ ভালবাস, তাহার চরম পরীক্ষা, তুমি দেশের জন্য মরিতে পার কিনা।" রবীন্দ্রনাথ জানতেন, কার্জনীযুগের সাম্রাজ্যবাদী দাম্ভিকতার প্রতিবাদ করা যেমন প্রয়োজন, দেশের কর্মযজ্ঞে আত্মাহুতি দানও তেমনি। তাই দেশের জন্য মরার আহ্বান অর্থে তিনি বোঝালেন, দেশের কর্মযজ্ঞে তিলে তিলে আত্মাহুতির আহ্বান।

বঙ্কিমের কণ্ঠে "এসো ভাই সকল, আমরা অন্ধকার কালস্রোতে ঝাঁপ দিই" আর রবীন্দ্রকণ্ঠে "তাহার চরম পরীক্ষা দেশের জন্য মরিতে পার কিনা।"—একই

আবেগ ব্যাকুলতা। সেনাপতি যেন যাত্রার পূর্বে ভাবীজয়ের স্বপ্ন রচনা করতে বসেছেন, আদর্শ ও আবেগ নিয়ে সঞ্চার করেছেন জাতির প্রাণ-গঙ্গায় ভরা জোয়ার। বলা যায়, বঙ্কিম দিয়েছিলেন জাতির মনে উচ্ছ্বসিত আবেগ, রবীন্দ্রনাথ সে আবেগ আরও স্পষ্ট করে পুনর্বার সংযত করে দেশকে কর্মপথে দিতে চান প্রচণ্ড বেগ। সেই কর্ম—"স্বদেশকে ভিতরে ভিতরে গড়িয়া তোলার" কর্ম, 'স্বদেশী সমাজ' প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা-রূপায়ণ। সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁ-আন্দোলন বিংশ শতাব্দীর স্বদেশী-আন্দোলনে সার্থক হতে চলেছে, সমাজে শিক্ষা, শিল্প ও সংস্কৃতিতে স্বাদেশিকতা ও স্বাজাত্যবোধের উদ্দীপনায় সাহিত্য-শিল্প সংগীত-নাটক-অভিনয়ে জাতির সর্বাঙ্গীন মানস-পরিমণ্ডল নবতম উৎসাহে উচ্ছ্বসিত হয়ে চলেছে।

তৎকালে সারা বাংলা উদ্বেল হয়ে উঠেছে 'যুনিভার্সিটি বিল' ও 'বঙ্গবিভাগ বিল' (৩রা ডিসেম্বর, ১৯০৩)-এর প্রস্তাবে। সাম্রাজ্যবাদী অভিসন্ধির বিরুদ্ধে দেশ ক্ষুব্ধ, রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্গবিভাগ' প্রবন্ধে (জ্যৈষ্ঠ, ১৩১১) স্বাগত জানিয়েছেন, এই ক্ষোভকে—

> পরের কাছে সুস্পষ্ট আঘাত পাইলে পরতন্ত্রতা শিথিল হইয়া নিজেদের মধ্যে ঐক্য সুদৃঢ় হয়।.....আমরা প্রশ্রয় চাহি না, প্রতিকূলতার দ্বারাই আমাদের শক্তির উদ্‌বোধন হইবে। —'বঙ্গবিভাগ'

অতএব 'বঙ্গমন্ত্রের উদ্‌গাতা' কবির উদ্দেশ্য দুটি—ক. প্রতিকূলতার দ্বারা শক্তির উদ্বোধন, 'মা ভৈঃ' প্রবন্ধে যার প্রস্তুতি ছিল, 'বাউল' এবং 'সংকল্প ও স্বদেশ' —গ্রন্থ দুটিতে যার উদ্দীপনা। খ. উত্তাল আবেগকে সংগঠনের পথে চালিত করা, স্বদেশী সমাজ যার 'manifesto'।

রবীন্দ্রনাথ 'begging'-কে 'agitation' আখ্যা দেবার বিপক্ষে মত প্রকাশ করছিলেন এক দশক ধরেই—এখন তাই 'জাতীয়শিক্ষা' ও 'স্বদেশী সমাজ' পরিকল্পনা রূপায়ণে তিনি সংকল্পবদ্ধ হলেন। বিলাতী 'প্যাট্রিয়টিজম' বা 'ন্যাশন্যা-লিজম্' রবীন্দ্রনাথ চাননি, তাঁর ইচ্ছা—

> আমাদের চিত্তকে, আমাদের প্রতিভাকে মুক্ত করিতে হইবে; আমাদের সমাজকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও বলশালী করিতে হইবে। একার্যে স্বদেশের দিকে আমাদের সম্পূর্ণ হৃদয়, স্বদেশের প্রতি আমাদের সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা চাই।
> —দেশের কথা

এখানেই তাঁর স্বদেশীচিন্তার মৌলিকতা, যাতে আছে শ্রদ্ধা নিয়ে "ঘরের দিকে মুখ ফিরিয়ে" স্বদেশী-সমাজ গড়ার আহ্বান। এখানেই রবীন্দ্রকণ্ঠের "মা ভৈঃ"

মন্ত্র সার্থক। বস্তুত "তুমি দেশের জন্য মরিতে পার কিনা" এই 'চ্যালেঞ্জের' উদ্দিষ্ট মৃত্যু হল সেনানীর মৃত্যু, কিন্তু সেই যুদ্ধক্ষেত্র নিঃসন্দেহে সমাজের কর্মক্ষেত্র। ইতিপূর্বে এমনি শ্রদ্ধাপ্লুত দুটি স্বর 'আনন্দমঠ'-এ শোনা গিয়েছিল—

—তোমার পণ কি ?

—পণ আমার জীবনসর্ব্বস্ব।

—জীবন তুচ্ছ ; সকলেই ত্যাগ করিতে পারে।

—আর কি আছে ? আর কি দিব ?

—ভক্তি।

রবীন্দ্রনাথ উক্ত ভক্তিকেই গ্রহণ করেছেন, তাই তাঁর বক্তব্য, আজ নির্দয় আঘাতে চিত্ত ভয়শূন্য হোক, শির উচ্চ হোক, স্বদেশের প্রতি শ্রদ্ধা আসুক মনে। এই শ্রদ্ধার আলোয় উদ্ভাসিত হোক 'স্বদেশী সমাজ'।

ইংরেজশাসিত রাষ্ট্র হতে দয়ার দান প্রত্যাশা করা তৎকালীন কংগ্রেস নেতৃত্বের মূল ত্রুটি। রবীন্দ্রনাথ সেজন্য প্রথমত, একটি স্বদেশীসমাজ গঠন করে আত্মশক্তি ও জনশক্তির উপর আস্থা স্থাপন করে অগ্রসর হতে আহ্বান জানালেন। দ্বিতীয়ত, জনসংযোগকে লক্ষ্য বলে ঘোষণা করলেন, অর্থাৎ বুদ্ধিজীবী-উকীল-ব্যারিস্টার পরিচালিত 'এ্যামেচারী' দেশসেবা নয়, জনসংযোগের দ্বারা পল্লীবাসীর নাড়ীতে বৃহৎ জগতের স্পন্দন সঞ্চারিত করতে হবে এবং সেজন্য মেলা সংগঠন করা প্রয়োজন। উক্ত মেলাতে জনসংযোগ, ও হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতিরক্ষার প্রয়াস করা প্রয়োজন, আর নিষ্ফল পলিটিক্‌সের চর্চা না করে বিদ্যালয়, পথঘাট, জলাশয়, গোচর ভূমি প্রভৃতির অভাব নিরসনের চেষ্টা করাই আশু প্রয়োজন। এককথায় দ্রুত গণসংযোগ ও লোকসংস্কৃতির উজ্জীবনই রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। 'স্বদেশী সমাজ'-এর তৃতীয় লক্ষ্য অর্থনৈতিক পুনর্গঠন-কল্পে কলকারখানার প্রতিষ্ঠা, কারণ আত্মকেন্দ্রিক পল্লীসমাজের পরিধি বিস্তার করতে হলে "কল পাতিতেই হইবে এবং কলের নিয়ম যে দেশী হউক না কেন তাহা মানিয়া না লইলে সমস্তই ব্যর্থ হইবে।" এ প্রসঙ্গে পরবর্তীকালের গান্ধীদর্শনের, যন্ত্রশিল্পবিমুখতার একদেশদর্শিতার কথা স্মরণ করা যায় ; রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি যে বাস্তবতাবিমুখ নয়, তার স্পষ্ট নিদর্শন আছে এখানেই। চতুর্থ লক্ষ্য, "এক্ষণে আমাদের সমাজপতি চাই, 'তাঁহার সঙ্গে তাঁহার পার্ষদসভা থাকিবে কিন্তু তিনিই প্রত্যক্ষভাবে আমাদের সমাজের অধিপতি হইবেন।" বিশেষ করে চতুর্থ উদ্দেশ্যটি লক্ষ্য করার মত। এই অনন্যসাধারণ প্রস্তাবটি রবীন্দ্র-স্বদেশচিন্তার একটি স্থির বিশ্বাসরূপে বহুদিন ছিল। কোন

একজন দেশনায়ককে বরণ করে স্বদেশের সংগঠনকার্যে হাত দেবার জন্য একবার তিনি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের যুগে সুরেন্দ্রনাথের নাম প্রস্তাব করেছিলেন। এর অনেককাল পরে বাংলাদেশ তথা ভারতের রাজনৈতিক দুর্দিনে সুভাষচন্দ্রকে দেশনেতা বলে মেনে নেবার প্রস্তাব করেছিলেন। (দ্র. "দেশনায়ক", 'কালান্তর, ১৯৩৯)।

উপরোক্ত চারিটি লক্ষ্যসমন্বিত পরিকল্পনার এই 'স্বদেশীসমাজ' বৃটিশ রাজত্বের মধ্যেই একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সরকার স্থাপনের মতো, এ যেন পরবর্তীযুগে প্রচারিত গান্ধীজীর 'সর্বোদয় সমাজ'-পরিকল্পনার বীজ বহন করেছে। উক্ত পরিকল্পনা প্রকাশের কিছু দিন পরেই রবীন্দ্রনাথ নিজের জমিদারীতে এর বাস্তব রূপদানের চেষ্টা করেছেন। এদিকে এই পরিকল্পনা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই দেশের কাজের একটি বিস্তৃত খসড়া তালিকা প্রচারার্থে মুদ্রিত করা হয়েছিল।[১৭] একটি 'স্বদেশী সমাজ সংবিধান' রচনা করে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশীসমাজের সদস্যদের স্বাক্ষরের জন্য রচিত একটি প্রতিজ্ঞা পত্রের ভূমিকায় বলেছিলেন—

> আমরা নিজের সম্মিলিত চেষ্টায় যথাসাধ্য আমাদের অভাব মোচন ও কর্তব্য-সাধন আমরা নিজেরা করিব, আমাদের শাসনভার নিজে গ্রহণ করিব, যে সকল কর্ম আমাদের স্বদেশীদের দ্বারা সাধ্য তাহার জন্য অন্যের সাহায্য লইব না।

উক্ত সংবিধান রচনা করে রবীন্দ্রনাথ সংগঠনমূলক রাজনীতির উপর সুদৃঢ় আস্থা প্রকাশ করলেন। 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধটির প্রথমাংশে আত্মসমীক্ষায় তিনি বলেছিলেন—"পরের শরীরে নিয়তই বেলেস্ত্রা লাগাইতে থাকিলে নিজের ব্যাধির চিকিৎসা করা হয় না।" তাই প্রবন্ধ শেষে প্রদত্ত নিজের ব্যাধির পূর্বোক্ত চিকিৎসাপদ্ধতি বিজ্ঞ সমাজ-চিকিৎসকের মতই প্রকাশ করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

বাস্তবিকই রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশী সমাজ' পরিকল্পনা তৎকালে কেবলমাত্র সুবৃহৎ জনসভায় পাঠ করা হয় নি, এই সম্পর্কে একটি পুস্তিকা স্বদেশী সমাজের সামাজিক ব্যবহার, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কলাবিদ্যা, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিচার ও সাহিত্য সম্বন্ধে বিস্তারিত পরিকল্পনা নিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। 'হিন্দুমেলা'-র স্মৃতি হয়ত রবীন্দ্রমানসে ক্রিয়াশীল ছিল, কিন্তু এজাতীয় 'manifesto' প্রচার তৎকালে রীতিমতো মৌলিক ও অভিনব। অবশ্য আজকের রাজনৈতিক দলগুলির প্রচার অভিযানে এই জাতীয় প্রয়াসই প্রথম পদক্ষেপ বলে বিবেচিত হয়। রবীন্দ্রনাথ যদিও আধুনিক রাষ্ট্রনীতি-বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গিতে রাষ্ট্রের ভূমিকা বিচার করেন নি, হিন্দু আদর্শবাদীর

শ্রদ্ধাতে সমাজকেন্দ্রিক সংহত ভারতের পরিকল্পনা করেছেন, তথাপি এই পরিকল্পনার অনেকগুলি প্রস্তাব ভারতের পরবর্তী রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্বীকৃতিলাভ করেছিল। উক্ত প্রস্তাবগুলির দু-একটি লক্ষ্য করলেই একথা উপলব্ধি করা যাবে —

প্রস্তাব নং ২. ইচ্ছাপূর্বক আমরা বিলাতি পরিচ্ছদ ও বিলাতি দ্রব্য ব্যবহার করিব না।

৭. স্বদেশীয় দোকান হইতে আমাদের ব্যবহার্য্য দ্রব্য ক্রয় করিব।

এই রচনাকালের অব্যবহিত পরবর্তী বয়কট আন্দোলনের প্রথম পাঠ ছিল ২ ও ৮ নং প্রস্তাবে (প্রতিজ্ঞাপত্রে উল্লিখিত)। প্রস্তাব নং ৫—"যতদিন না আমরা নিজে স্বদেশীবিদ্যালয় স্থাপন করি ততদিন যথাসাধ্য স্বদেশচালিত বিদ্যালয়ে সন্তানদিগকে পড়াইব।" এই সংকল্পটির উল্লেখ ইতিপূর্বেই করা হয়েছে। পরবর্তী অসহযোগ আন্দোলনের কালে এটি আরও সোচ্চার হয়ে ওঠে। অতএব বলা চলে রবীন্দ্র-প্রস্তাবিত 'স্বদেশী সমাজ'-এর পরিকল্পনা 'utopia' বলে অবহেলিত তো থাকেই নি—বরং অন্য অভিধাতে নানা সময়ে রাজনৈতিক আন্দোলনে গৃহীত হয়েছিল। অবশ্য রাজনীতিবিদ নেতারা তাঁর ঋণের কথা কদাপি উল্লেখ করেন নি, অথবা রবীন্দ্রনাথও এ-সম্বন্ধে, কদাপি উচ্চবাচ্য করার প্রয়োজনবোধ করেন নি। রবীন্দ্রনাথ-লিখিত পরবর্তী নানা প্রবন্ধে সংগঠনমূলক রাজনৈতিক চেতনার যে প্রকাশ হয়েছে তাতে পূর্বোক্ত মূল সূত্রগুলিই ব্যক্ত হয়েছে, নানা ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে। আসলে 'ভাণ্ডার'-সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের অজস্র রাজনৈতিক প্রবন্ধের মূল উদ্দিষ্ট ছিল 'স্বদেশী সমাজ' প্রতিষ্ঠা। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ হিন্দু-মুসলমান-খ্রীস্টানসমাজের মিলনের কথা উল্লেখ করেছেন,—এই ইতিহাস-চেতনার কথা ইতিপূর্বেই বলেছি। হিন্দু-মুসলমান সমস্যা প্রসঙ্গে এই কথাটি পুনরালোচনা করব।

'স্বদেশী সমাজ'-এর পরিশিষ্টে রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তার ক্রমবিকাশ ও পরিণতির দিকে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত আছে। একটি সামাজিক স্বাধীনতা ও ধর্মরক্ষার স্বাধীনতার প্রসঙ্গে—"আমাদের দেশে কল্যাণশক্তি সমাজের মধ্যে। তাহা ধর্মরূপে আমাদের সমাজের সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া আছে।" সমাজচিন্তা ও ধর্মচিন্তার ক্ষেত্রে এই কথাটির বিশদ বিশ্লেষণ আসবে। অন্যটি বঙ্গপ্রীতি হতে ভারতপ্রীতিতে বিবর্তনের ইঙ্গিত—"অবশ্য এখন আমি কেবল বাংলাদেশকেই আমার চোখের সামনে রাখিয়াছি।… …ভারতবর্ষের অন্যান্য বিভাগও আমাদের

অন্তবর্তী হইবে" (স্বদেশী সমাজ)। বাংলাদেশকে চোখের সামনে রেখে কাজ করার কথা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের যুগে একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য, কিন্তু সর্বদাই এই বঙ্গদেশ ভারতবর্ষের অন্যতম একক বা ইউনিট রূপে গণ্য করা হয়েছে। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের ধারণা অতি স্পষ্ট। প্রতিটি ক্ষুদ্র স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বদেশী সমাজ-কেন্দ্র বা কর্তৃসভাগুলিকে "যোগসূত্রে এক করিয়া তুলিয়া একটি বিশ্ব-বঙ্গ-প্রতিনিধি-সভা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে।" (অবস্থা ও ব্যবস্থা)। 'বিশ্ববঙ্গ-প্রতিনিধি-সভা' নিশ্চয়ই আধুনিক রাষ্ট্রনীতির সংজ্ঞানুসারে ভারতীয় গণতান্ত্রিক ফেডারেশন। খাঁটি রাজনীতি বিজ্ঞানের বিচারে সম্পূর্ণ রূপে একথা যুক্তিসঙ্গত না হলেও, এ যেন আধুনিক সোভিয়েৎ প্রণালীর মত স্বয়ংসম্পূর্ণ এক-একটি 'ইউনিট' নিয়ে বিশাল সমাজবাদী দেশগঠন। তার থেকে তফাৎ শুধু এই, রবীন্দ্রনাথের আদর্শটি পরিকল্পিত ধর্মনীতিকে ভিত্তি করে এবং ভারতীয় সংস্কৃতির আত্মাস্বরূপ হিন্দুধর্মকে উদ্বোধিত করে। তখনও হিন্দুত্ববোধ রবীন্দ্র-মানসে 'মানুষের ধর্ম-রূপে বিকশিত হয় নি'।

এবার পূর্বপ্রসঙ্গে ফিরে আসা যেতে পারে। 'স্বদেশী সমাজ' প্রতিষ্ঠার আহ্বান 'বঙ্গদর্শন' ও 'ভাণ্ডার'-এর অজস্র প্রবন্ধে ছড়িয়ে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি প্রায় প্রতিটি রচনায় আত্মসমীক্ষা এবং সংগঠনমূলক কর্মে আত্মদানের আবেগভরা আহ্বান জানিয়েছেন এবং পরিষ্কার ভাবে কর্মসূচী প্রকাশ করেছেন। "দেশের সেবা বিদেশীর হাতে চালাইবার চাতুরী যথার্থ প্রীতির চিহ্ন নহে..."—অতএব রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী সমাজ প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানালেন, "এই দুর্ভাগ্য দেশের বিনা পুরস্কারের কর্মে দুর্গমপথে যাত্রা আরম্ভ করিতে কে কে প্রস্তুত আছ, আমি সেই বীর যুবকদিগকে অদ্য আহ্বান করিতেছি।" (সফলতার সদুপায়)। এই আবেগভরা আহ্বান বঙ্কিমের কণ্ঠে ইতিপূর্বেই আমরা শুনেছি—"এসো ভাই সকল। আমরা অন্ধকার কালস্রোতে ঝাঁপ দিই।" সেক্ষেত্রে মাতৃমূর্তি উদ্ধারের একটি রূপকে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনাটি অবশ্য আচ্ছন্ন ছিল। ঠিক তেমনি ভাবেই কবি রবীন্দ্রনাথের বঙ্গভঙ্গ যুগের স্বদেশী সংগীতের প্লাবনেও উদ্বেল আবেগ ছিল "এবার তোর মরাগাঙে বান এসেছে জয় মা বলে ভাসা তরী।" কিন্তু এই স্বদেশী সঙ্গীতের মাধ্যমে কেবলমাত্র তরী ভাসানোর আহ্বানই নেই, ওপারের বন্দরটিকে লক্ষ্য করে অভিযানের পথরেখাটি পর্যন্ত নির্দেশিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের সেযুগের অসংখ্য প্রবন্ধে।

অতঃপর বঙ্গব্যবচ্ছেদ প্রতিরোধ আন্দোলন যখন 'বয়কট আন্দোলন'-এ রূপান্তরিত হল (৭ই আগষ্ট, ১৯০৫ পণ্যবর্জন সিদ্ধান্ত), কবি তখন 'অবস্থা ও

ব্যবস্থা' (৯ই ভাদ্র, ১৩১২) প্রবন্ধে স্পষ্ট করে যা বললেন, তাতে বয়কট আন্দোলনের নীতিমূলক দিকটির সমর্থন ছিল না, "ইংরেজের প্রতি রাগের উপর নির্ভরতা তাঁর ছিল না।" তিনি লিখলেন—

দেশের প্রতি আমাদের যে-সকল কর্তব্য আজ আমরা স্থির করিয়াছি সে যদি দেশের প্রতি প্রীতির উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয় তবেই তাহার গৌরব এবং স্থায়িত্ব, ইংরেজের প্রতি রাগের উপরে যদি তাহার নির্ভর হয় তবে তাহার উপরে ভরসা রাখা বড়ো কঠিন। —অবস্থা ও ব্যবস্থা

এমনি ইঙ্গিত অন্যত্রও আছে। কবি "বয়কট" শব্দের আস্ফালনে বারংবার মাথা হেঁট করেছেন। তাঁর মতে বয়কট দুর্বলের প্রয়াস নয়, দুর্বলের কলহ। সেইজন্যই 'বয়কট' আন্দোলনের আবেগকে রবীন্দ্রনাথ সংগঠনের পথে চালাতে প্রয়াস করলেন, অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা দিলেন, যার মূল উদ্দেশ্য ছিল—

ক. দেশী জিনিষ ব্যবহারের উৎসাহকে স্থায়ী মঙ্গলকর্মে নিয়োগ করা। ইংরেজের ক্ষতি কিম্বা দেশী ব্যবসায়ীর লাভ এক্ষেত্রে বিবেচ্য নয়, "আরাম আড়ম্বর বঞ্চিত আমাদের হৃদয়ে 'স্বদেশ' প্রতিষ্ঠা করাই অভীষ্ট।"—(অবস্থা ও ব্যবস্থা) খ. "এখন হইতে আমরা হিন্দু ও মুসলমান শহরবাসী ও পল্লীবাসী পূর্ব ও পশ্চিম পরস্পরের দৃঢ়বদ্ধ করতলের বন্ধন প্রতিক্ষণে অনুভব করিতে থাকিব।"—(তদেব) গ. একটি কর্তৃসভার অধীনে দেশের কর্মশক্তি নিয়োগ করা উচিত। "অন্তত একজন হিন্দু ও একজন মুসলমানকে আমরা এই সভায় অধিনায়ক করিব।"—(তদেব)। ঘ. সবচেয়ে বড়ো কথা, ইংরেজশাসনের অভ্যন্তরেই স্বতন্ত্রভাবে জনসাধারণের 'স্বদেশী সমাজ' গঠন করা প্রয়োজন।

এই প্রস্তাবের সপক্ষে ইউরোপের রুশীয় গভর্নমেন্টের অধীনস্থ জর্জিয়া-আর্মেনিয়ায় 'ন্যাশনলিষ্ট' দলের প্রয়াস বিবৃত করে রবীন্দ্রনাথ পুনরায় ঘোষণা করলেন, "স্বদেশের কর্মভার দেশের লোকের নিজেদের গ্রহণ করিবার চেষ্টা একটা পাগলামি নহে…" (অবস্থা ও ব্যবস্থা)। তাঁর প্রস্তাবে গ্রামপঞ্চায়েৎকে স্বদেশী পঞ্চায়েৎরূপে জাগিয়ে তোলার কথা ছিল। তাঁর সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন-পরিকল্পনায় পাঠশালা, পুস্তকালয়, ব্যায়ামাগার, কো-অপারেটিভ স্টোর, ঔষধালয়, সঞ্চয়-ব্যাঙ্ক, সালিস-নিষ্পত্তি-সভা, মিলন-মন্দির ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব ছিল। আর ছিল দেশের নানা স্থানে সাহিত্য-পরিষৎ স্থাপনের প্রস্তাব। সর্বশেষে খণ্ড খণ্ড কর্তৃসভাগুলিকে একসূত্রে বেঁধে 'বিশ্ববঙ্গ-প্রতিনিধি' সভার পরিকল্পনা ব্যাখ্যাত হয়েছিল। অবস্থানুসারে এই ব্যবস্থানির্দেশে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিম-কথিত

"জাতিবৈর"-কে গ্রহণ করেছেন,—"আমরা প্রশ্রয় চাহি না—প্রতিকূলতার দ্বারাই আমাদের শক্তির উদ্‌বোধন হইবে।" ('বঙ্গবিভাগ')। কারণ ইতিপূর্বেই তিনি বঙ্কিমকথিত "কুকুরের রাজনীতি" পরিত্যাগ করেছেন এবং বঙ্কিম-সংকেতিত "কাজে মন দেবার" নীতি গ্রহণ করেছেন। তবে এক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্য এই, বঙ্কিমী সূত্রের মহাভাষ্যকার রবীন্দ্রনাথ একটি সুস্পষ্ট কর্মপন্থা নির্ধারণ করেছেন, সে পন্থা 'স্বদেশী সমাজ প্রতিষ্ঠা'-র দিকে। আসলে 'ভাণ্ডার' পর্বের সর্বরচনায় স্বদেশী আন্দোলনের আবেগকে পরিচালিত করার ইচ্ছা নানাস্থানে নানাসূত্রে ব্যক্ত। বঙ্গদেশের যাবতীয় সমস্যাকে রাজনীতির পটভূমিতে সমপ্রভাবে দেখার ও বিচার করার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তা প্রথমে প্রাণশক্তির জাগরণকে স্বাগত জানিয়েছে, তারপরই কর্মভূমিতে অবতীর্ণ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে—"এই চাঞ্চল্য আমাদের নিজের শক্তিকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে। নিজের প্রাণশক্তিকে অনুভব করাই যে একটা পরম সফলতা।" (বঙ্গবিভাগ)। অন্যত্র, "দেশ যে আমার—এই কথাটা আমাদের সাধারণ লোকের কাছে বিনা ভাষায় এক মুহূর্তে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।" ('পার্টিশনের শিক্ষা')। প্রাণশক্তির জাগরণ কেবল রাজশক্তির আঘাতেই হয় নি, কবি-মনীষীর আবেগময় উদ্বোধনী সংগীতগুলির অবদানও এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। সেযুগের স্বদেশী সংগীতের প্রাণ জাগানো সুর বাংলাদেশকে চঞ্চল করেছিল, কবি সেদিন চিন্ময়ী মাতৃমূর্তিকে স্তুতি জানিয়েছিলেন—

আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি

তুমি এই অপরূপ-রূপে বাহির হলে জননী।

বঙ্কিমের "সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং শস্যশ্যামলাং মাতরম্" বলে বন্দনা করার মন্ত্র নবভাষ্যে ছড়িয়ে গেল দেশবাসীর মনে, কবির গানের সুরে সুরে দেশবাসীও ভক্তিভরে প্রণাম জানাল, "ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা।" বস্তুবিকই 'বঙ্গমন্ত্রের উদ্‌গাতা' রূপে রবীন্দ্রনাথের এই আশ্চর্য অবদান জাতির ইতিহাসে পরম প্রাপ্তি। আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেনের মন্তব্য এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য—

> বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে ঘটেছিল বাংলার উদ্‌বোধন, আর রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বাংলার অভ্যুদয়। বঙ্কিমচন্দ্রের কণ্ঠে বাঙালি শুনেছে তার জীবনযজ্ঞের ঋক্‌মন্ত্র, রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে শুনেছে তার সামগান। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন বঙ্গমন্ত্রের ঋষি, সে মন্ত্রের সংহত রূপ বন্দে মাতরম আর রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বঙ্গমন্ত্রের উদ্‌গাতা, সে মন্ত্রের পূর্ণরূপ হচ্ছে রাখিসংগীত—বাংলার মাটি বাংলার জল। এই রাখিমন্ত্র হচ্ছে 'বন্দে মাতরম' মন্ত্রেরই কবিভাষ্য।[১৮]

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে বাংলার অভ্যুদয় ঘটেছিল, তার ইতিহাস স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হয়েছিল। যেদিন ৩০শে আশ্বিন, ১৩১২ সালে বঙ্গচ্ছেদ ঘোষিত হল, সেদিন কবিকণ্ঠের গানের সুর জনতা আপন কণ্ঠে তুলে নিল, "বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমনি শক্তিমান"। এই প্রতিরোধ সংগ্রামে ব্রতী দেশবাসীকে ভ্রাতৃভাবে মিলিত করবার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ এই সময়েই 'রাখীবন্ধন' উৎসব প্রবর্তন করলেন। রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দরের নেতৃত্বে সেদিন "বাংলার মাটি বাংলার জল" পুণ্য হয়ে উঠল। সেদিনই বিকেলে ফেডারেশন হল (মিলন মন্দির)-এর শিলান্যাস করলেন আনন্দমোহন, রবীন্দ্রনাথ তাঁর বক্তৃতার অনুবাদ শোনালেন। সেদিনের বাঙালির দৃঢ়সংকল্প উচ্চারিত হল "আমি ভয় করব না, ভয় করব না"। এই উন্মাদনার জোয়ারে দেশের তরী খুলে দেবার উদ্যোগীদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন পুরোভাগে। মহিলা-সমাজের 'ব্রতধারণ' অনুষ্ঠানে তিনি উৎসাহবাণী শোনালেন, 'কার্লাইল সার্কুলার'-এ বিক্ষুব্ধ ছাত্রসমাজকে সম্ভাষণ করলেন 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়' প্রবন্ধে, আবার 'Bengal Council of Education'-এর ট্রাস্টি গঠিত হলে রবীন্দ্রনাথ তাতেও যোগদান করলেন।

কিন্তু মাত্র দুটি মাসের মধ্যেই কবির স্বপ্নভঙ্গ হল। তৎকালীন নেতৃবৃন্দ-প্রস্তাবিত জাতীয়শিক্ষামূলক পরিকল্পনা চিরাচরিত পথ পরিত্যাগ করতে পারল না, রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পিত 'স্বদেশী সমাজ'-প্রস্তাবও সেদিনের জাতীয় কর্মসূচীতে আমল পেল না, তাই রবীন্দ্রনাথ ফিরে গেলেন শান্তিনিকেতনে ও শিলাইদহের আবর্তহীন কর্মভূমিতে। সেদিনের রামেন্দ্রসুন্দরকে লেখা একটি পত্রে কবির ক্ষোভ প্রকাশিত হয়েছিল, "আমি তাই ঠিক করিয়াছি অগ্নিকাণ্ডের আয়োজনে উন্মত্ত না হইয়া যতদিন আয়ু আছে আমার এই প্রদীপটিকে জ্বালিয়া পথের ধারে বসিয়া থাকিব।" ইতিপূর্বেও রবীন্দ্রনাথ এই আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন—

> কপালক্রমে অনেক ধোঁওয়ার পরে ভিজা কাঠ যদি ধরিয়া থাকে, তবে তাহা পুড়িয়া ছাই হওয়ার পূর্বে রান্না চড়াইতে হইবে; শুধু শুধু শূন্য চুলায় আগুনে খোঁচার উপর খোঁচা দিতে থাকিলে আমোদ হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে ছাই হওয়ার কালটাও নিকটে অগ্রসর হয় এবং অন্নের আশা সুদূরবর্তী হইতে থাকে। —'অবস্থা ও ব্যবস্থা'

বহুকাল পরে (অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬), রবীন্দ্রনাথ তাঁর এযুগের সংগঠনমূলক চিন্তার কথা স্মরণ করে বলেছিলেন—

> স্বদেশীসমাজে তাই আমি বলেছিলুম, ইংরেজ আমাদের রাজা কিংবা আর কেউ আমাদের রাজা এই কথাটি নিয়ে বকাবকি করে সময় নষ্ট না করে

সেবার দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা, নিজের দেশকে নিজে সত্যভাবে অধিকার করবার চেষ্টা সর্বাগ্রে করতে হবে। দেশের সমস্ত বুদ্ধিশক্তি ও কর্মশক্তিকে সংঘবদ্ধ আকারে কেমন করে দেশে বিস্তীর্ণ করা যেতে পারে স্বদেশীসমাজে আমি তারই আদর্শ ব্যাখ্যা করেছিলুম।

বস্তুত 'আত্মশক্তি ও সমূহ' শীর্ষক প্রবন্ধমালায় আবেগকে সংগঠনমূলক কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত করার প্রস্তাব রবীন্দ্রনাথ সহস্রবার সহস্রভাবে উত্থাপন করেছিলেন। 'ভারতী' বা তারও পূর্বে ব্যঙ্গ-কটাক্ষে যে কথা তিনি বলেছিলেন, 'বঙ্গদর্শন'-এ স্বদেশবাসীর সদ্‌বুদ্ধির কাছে সে কথাই ব্যাখ্যাসহ নিবেদনের সুরে জানিয়েছেন। এই বৈশিষ্ট্যটি দুটি পর্বের উক্তিগুলি পাশাপাশি সাজালেই লক্ষ্য করা যাবে—

অল্পে অল্পে একটু একটু করিয়া কাজ করিতে হয়। তাহাতে এক রাতের মধ্যে যশস্বী হওয়া যায় না বটে, মোটা মোটা কথা বলিবার সুবিধা হয় না বটে, কিন্তু দেশের উপকার হয়। —'ভারতী' কার্তিক, ১২৯০

অন্যত্র—

এই অ্যাজিটেশনের মধ্যে একটা ভাব লক্ষ্য হয় যে, আমাদের নিজের কিছুই করিবার নাই। কেবল পশ্চাৎ হইতে মাঝে মাঝে গবর্ণমেণ্টের কোর্তা ধরিয়া যথাসাধ্য টান দেওয়া আবশ্যক। —তদেব, আশ্বিন, ১২৯৬

এবার 'বঙ্গদর্শন'-এর কথা লক্ষ্য করা যাক—

এমন একটি স্থান করিতে হইবে, যেখানে দেশ জিনিষটা যে কী তাহা ভূরিপরিমাণে মুখের কথায় বুঝাইবার বৃথা চেষ্টা করিতে হইবে না, যেখানে সেবা-সূত্রে দেশের ছোট বড়ো, দেশের পণ্ডিত মূর্খ সকলের মিলন ঘটিবে।

—'বঙ্গদর্শন' চৈত্র, ১৩১১

মোটকথা, "স্বদেশের সেবা করিবার সুযোগ ঘটাইয়া তুলিবার" পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা ছিল 'স্বদেশী সমাজ'-এ। কিন্তু কবির আশঙ্কা সত্য হল। "বকাবকি লেখালেখি ছাড়িয়া কাজে মন দাও"—বঙ্কিমের এই ধমক সত্ত্বেও, এবং পরে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত প্রেরণা সত্ত্বেও স্বদেশী জোয়ার অনেকটা বৃথাই বয়ে গেল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং শিলাইদহে ও শান্তিনিকেতনে তাঁর পরিকল্পনাকে রূপায়িত করতে একা অগ্রসর হয়েছিলেন। বৃহত্তর রাজনীতির ক্ষেত্র হতে তাঁর আত্মাপসরণ নিয়ে পরবর্তীকালে অনেক আলোচনা হয়েছে। এইসব বিশ্লেষণের মধ্যে ড. নীহাররঞ্জন রায়-এর মন্তব্য যুক্তিসহ—

রাষ্ট্রীয়-জীবনযজ্ঞে আহুতি দিয়া আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা সেই একবারই তাহার

পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করিয়াছে, পরবর্তী জীবনে দ্বিতীয়বার আর সেই অভিজ্ঞতার প্রবাহে স্নান করিবার ইচ্ছা কবির হয় নাই,⋯তবে একথার অর্থ এই নয় যে তিনি স্বদেশ-সাধনার ক্ষেত্রই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন,⋯ সে সাধনার বিরতি জীবনে কখনও হয় নাই।[১৯]

বাস্তবিকই স্বদেশসাধনার বিরতি রবীন্দ্রজীবনে আসেনি। প্রকাশ্য রাজনৈতিক আন্দোলন হতে অন্তরালে সরে গিয়ে তিনি ১৯০৮ সাল হতেই গঠনমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করলেন। ঠিক এইকালের 'পাবনা প্রাদেশিক সম্মেলনীর অভিভাষণ'-এ (১৯০৮) রবীন্দ্রনাথের ঐ স্থির বিশ্বাসের বাণী পুনরুচ্চারিত হল, "দেশের গ্রামগুলিকে নিজের সর্বপ্রকার প্রয়োজন সাধনক্ষম করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে।" এখানে পল্লীমণ্ডলী গঠনে ও স্বায়ত্তশাসনের চর্চায় পাঠশালা, শিক্ষালয়, ধর্মগোলা, সমবেত পণ্যভাণ্ডার ব্যাঙ্ক স্থাপনের প্রয়াস সার্থক হয়ে উঠবে। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সুস্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ ছিল—"তোমরা যে পার এবং যেখানে পার একটি গ্রামের ভার গ্রহণ করিয়া সেখানে গিয়া আশ্রয় লও।" পরবর্তীকালে মহাত্মা গান্ধীর 'ব্যাক টু ভিলেজ' আন্দোলন, রবীন্দ্রনাথের "ফিরে চল মাটির টানে" স্লোগানের পতাকাবাহী হয়েছিল। আমরা পরবর্তী সমাজচিন্তা আলোচনায় লক্ষ্য করব, বঙ্কিম একদিন সক্ষোভে লিখেছিলেন—

দেশের মঙ্গল, কাহার মঙ্গল? তোমার আমার মঙ্গল দেখিতেছি, কিন্তু তুমি আমি কি দেশ? তুমি আমি দেশের কয় জন? আর এই কৃষিজীবী কয় জন? তাহাদের ত্যাগ করিলে দেশে কয় জন থাকে? ⋯যেখানে তাহাদের মঙ্গল নাই, সেখানে দেশের কোন মঙ্গল নাই।

—বঙ্গদেশের কৃষক

আর বঙ্কিমের উত্তরাধিকারী রবীন্দ্রনাথ পথনির্দেশ দিলেন সুস্পষ্টস্বরে—

যে-কোনো একটি পল্লীর মাঝখানে বসিয়া যাহাকে কেহ কোনোদিন ডাকিয়া কথা কহে নাই তাহাকে জ্ঞান দাও, আনন্দ দাও, আশা দাও, তাহার সেবা করো, তাহাকে জানিতে দাও মানুষ বলিয়া তাহার মাহাত্ম্য আছে, সে জগৎসংসারের অবজ্ঞার অধিকারী নহে। —ব্যাধি ও প্রতিকার (১৩১৪)

বঙ্কিম-কথিত 'হাসিম শেখ' ও 'রামাকৈবর্তের' দলের জন্য রবীন্দ্রনাথের এই নির্দেশনামা গুরুত্বপূর্ণ। কেবল পরিকল্পনা-জ্ঞাপনই নয়, এর কার্যকরী দৃষ্টান্ত স্থাপনও করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ—তাঁর শিলাইদহের জমিদারীতে আর শ্রীনিকেতনের গঠনমূলক কাজে। 'বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন'-পর্বের স্বদেশপ্রেমের বন্যার বেগ যেদিন কমে এল, সমাজের মধ্যে বাধিবোলের বেড়া বাঁধার দিন

যখন এল, তখনও রবীন্দ্রনাথ বাংলার সবুজপ্রাণকে অবিবেচনার পথের ডাক দিয়েছেন, স্থবিরত্বের শাসনে বাঁধেন নি।

> তারুণ্যের জয় হউক। তাহার পায়ের তলায় জঙ্গল মরিয়া যাক, জঞ্জাল সরিয়া যাক, কাঁটা দলিয়া যাক, পথ খোলসা হউক; তাহার অবিবেচনার উদ্ধত বেগে অসাধ্যসাধন হইতে থাক্। —'বিবেচনা অবিবেচনা' (১৩২১)

এই অসাধ্যসাধন দেশের সর্বক্ষেত্রে হোক, এই কামনাই ছিল রবীন্দ্রনাথের। কেবল 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' নয়, প্রাণের আকুতিতে কর্মসাধনার আহ্বান তিনি জানালেন। তাঁর ঐকান্তিক ইচ্ছা, জাতির বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির জাগরণ হোক, দেশের মানুষের মনে শিক্ষার আলো আসুক; এই কামনা 'সবুজপত্র'-এ লিখিত তাঁর প্রায় প্রত্যেক প্রবন্ধে অভিব্যক্ত হয়েছিল। অর্থাৎ দেশকে সেবার মধ্য দিয়ে গড়ে তোলার সাধনাই এ যুগের রচনার মূল সুর।

> বাহিরের দিক হইতে স্বাধীনতা পাওয়া যায় এমন ভুল যদি মনে আঁকড়িয়া ধরি তবে বড়ো দুঃখের মধ্যেই সে ভুল ভাঙিবে। ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইতে পারি নাই বলিয়াই অন্তরে বাহিরে আমাদের বন্ধন।......আপনার দেশকে আমরা অতি সামান্যই দিতেছি, সেই জন্যই আপনার দেশকে পাই নাই। —ছোটো ও বড়ো (মাঘ, ১৩২৪)

স্পষ্টত বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের যুগের রবীন্দ্র-বক্তব্যের সঙ্গে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কালের অথবা অসহযোগ-আন্দোলনের অব্যবহিত পূর্বকালের বক্তব্যের বিশেষ কিছু পার্থক্য নেই। পার্থক্য আছে সুরের বিস্তারে। প্রায় একটি দশকের মধ্যে রবীন্দ্র-জীবনের অনেকগুলি ঘটনা তাঁর চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করেছে। সেগুলির মধ্যে মূল কয়েকটি ঘটনা হল—

১.	১৯১২-১৩ খ্রীঃ	গ্রেটবৃটেন ও নিউইয়র্কে উপনিষদ সম্পর্কে বক্তৃতা, সিকাগোতে বক্তৃতা ('ভারতীয় সভ্যতার আদর্শ')।
২.	১৯১৪ খ্রীঃ	বিশ্বযুদ্ধ শুরু।
৩.	১৯১৬ খ্রীঃ	জাপানে 'ন্যাশন্যালিজম্'-শীর্ষক বক্তৃতা, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেও ঐ বক্তৃতা।
৪.	১৯১৮ খ্রীঃ	বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা (৮ই পোষ, ১৩২৫)।
৫.	১৯২০ খ্রীঃ	বৃটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, আমেরিকায় (নিউইয়র্ক, সিকাগো, টেক্সাস ইত্যাদি শহরগুলিতে) বক্তৃতা দান।

৬. ১৯২১ খ্রী: ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড, জার্মানী, প্রভৃতি দেশ,—এক কথায় য়ুরোপ পরিভ্রমণ।

১৯০৪ (১৩১১)-এ 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধ পাঠের কাল হতে ১৯০৮ (১৩১৫)-এ 'পাবনা প্রাদেশিক সম্মেলনীর অভিভাষণ'-পর্যন্ত কালটি প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত। এই কালে রবীন্দ্রমানসে ছিল সুতীব্র কর্মোদ্দীপনা এবং উক্ত আবেগকে সংগঠনের পথে চালনা করার অপরিসীম প্রয়াস। এরপরই নৈরাশ্যের আঘাতে কবি শান্তিনিকেতনে ও শিলাইদহের নীরব কর্মক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তারপর বিশ্বভ্রমণে বহির্গত রবীন্দ্রনাথ একটি বৃহত্তর পরিস্থিতি ও পটভূমিকায় এবং আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিকায় স্বদেশকে বিচার করেছেন। এর ফলে দুটি বিশেষ সুর তাঁর বাণীতে ধ্বনিত হতে দেখি—একটি আন্তর্জাতিকতাবোধ যা সংকীর্ণ ন্যাশন্যালিজম্-এর বিরোধী, অন্যটি পূর্ব ও পশ্চিমের 'শিক্ষার মিলন'। 'বিশ্বভারতী'-প্রতিষ্ঠা ও 'শ্রীনিকেতন'-স্থাপনা তাঁর পরবর্তী জীবনের শ্রেষ্ঠতম কর্মযোগ-সাধনার সিদ্ধি। সুতরাং বলা যায় এযুগে রবীন্দ্রনাথের সংগঠনমূলক চিন্তাধারাটি একই, তবে অসীম তার বিস্তৃতি। পরবর্তী সমাজচিন্তা প্রসঙ্গে, আন্তর্জাতিকতা এবং ধর্মচিন্তার ক্ষেত্রেও এই বিবর্তনের সুস্পষ্ট ধারাটি লক্ষ্য করার বিষয়।

প্রথম মহাযুদ্ধের অশান্ত অধ্যায়ের সূচনায় কয়েকটি কবিতায় কবির মানসদ্বন্দ্ব এবং সেই দ্বন্দ্ব হতে মুক্তির আকুতি ধ্বনিত হয়েছিল. 'বলাকা'-র "পাড়ি", "শঙ্খ" ও "ঝড়ের খেয়া" তার পরিচয় বহন করছে। "ঝড়ের খেয়া"-তে নতুন সমুদ্র-তীরে পাড়ি দেবার আহ্বান ছিল, এবং তখন কবির দৃষ্টিভঙ্গিতে ছিল যুদ্ধ-পরবর্তী কালের মঙ্গলের আশ্বাস। জাপানে প্রদত্ত 'ন্যাশন্যালিজম্' (১৯১৬) বক্তৃতামালায় ঐ আশ্বাসই ধ্বনিত হয়েছিল। 'বিশ্বভারতী'-তে বিশ্বকে আতিথ্য দেবার প্রয়াসে কবি পুনরায় ইউরোপ-আমেরিকা পরিভ্রমণে (১৯২০) বেরিয়েছেন। সেই সময়ে দীনবন্ধু এণ্ডরুজকে লেখা দু-একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ তৎকালীন অসহযোগ আন্দোলনের সম্পর্কে যে কথা বলেছেন, তা তাঁর ঐ কালের মনোভঙ্গির পরিচায়ক।

> সমুদ্র তরঙ্গের প্রতি লক্ষ্য না করে নিজের নৌকো যথেষ্ট মজবুত কিনা, সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। আমাদের দেশের রাজনীতি বড়োই নিম্নস্তরের।...ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের দ্বারা সর্বাগ্রে আমাদের নিজেদের জীবনে ও চিত্তে পূর্ণ সহযোগ স্থাপিত হওয়া চাই। তবেই অসহযোগ স্বতঃস্ফূর্ত হবে। প্যারিস, (৭ সেপ্টেম্বর ১৯২০)

এই হল রবীন্দ্রনাথের প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর দৃষ্টিভঙ্গিতে জাতীয় আন্দোলনের ত্রুটি-বিচ্যুতি-নির্দেশ ও আত্মসমীক্ষা। কিন্তু নিছক আত্মসমীক্ষাতেই বিশ্বভ্রমণরত আন্তর্জাতিক কবির তৃপ্তি নেই, একইকালে সংগঠনমূলক রাজনীতির জন্য কামনা আছে, নির্দেশও আছে। আবার অন্য একটি পত্রে এণ্ডরুজকে তিনি লেখেন—

> দেখছি অসহযোগ নিয়ে আমাদের দেশের লোকেরা উগ্রভাবে মেতে উঠেছে। এই আন্দোলনও বাংলাদেশে স্বদেশী আন্দোলনের মতো একটা কিছু হয়ে দাঁড়াবে। এরকম ভাবের আবেগকে যদি ভারতব্যাপী স্বাধীন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলবার কাজেই বিশেষ করে লাগান যেত তবে কত ভালো হত। মহাত্মা গান্ধীই এ কাজের সত্যিকারের অধিনায়ক হোন।... প্রীতি ও সেবায় দেশের লোকের সঙ্গে সহযোগের আদেশ যদি তিনি দেন, আমি তাঁর পায়ের কাছে বসে তাঁর কথামত কাজ করতে রাজী আছি। ক্রোধের আগুন জেলে দিয়ে তা ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দেবার কাজে আমার পৌরুষের ক্ষয় কিছুতেই করব না। প্যারিস (১৮ সেপ্টেম্বর ১৯২০)

এ প্রসঙ্গে এণ্ডরুজকে লেখা আরও একটি পত্রাংশ লক্ষ্য করা যেতে পারে—

> রাজনৈতিক ঝড়ে যে মানসিক মূঢ়তা চতুর্দিক আচ্ছন্ন করেছে তার ফলেই ভারতের বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গী সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। কোনো কোনো রাজনীতিবিদ্ সমস্যার দ্রুত সমাধানের চিন্তা করেন, এবং কাজে নামতেও দেরি করেন না। তাঁদের কাজ হল দ্রুত সাফল্য লাভের জন্য ভ্রান্ত পথেই এগিয়ে যাওয়া—সঙ্গে থাকে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান রূপ ভারী ভারী ট্যাঙ্ক। লণ্ডন (১৮ অক্টোবর ১৯২০)

উপরোক্ত তিনটি পত্রাংশ হতে দুটি বক্তব্য অতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রথমত, গান্ধীজীর নেতৃত্ব ও মাহাত্ম্য স্বীকার করেও তাঁর অসহযোগ আন্দোলনের আশু উদ্দেশ্য-সমাধানের প্রয়াস রবীন্দ্রনাথ নির্বিচারে সমর্থন করেননি। দ্বিতীয়ত, বৃহত্তর রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক জীবনের সার্থকতার জন্য প্রস্তুতিপর্বের প্রয়োজন,—তাঁর এ বিশ্বাস পুনঃপ্রতিষ্ঠিত। অসহযোগ নয়, প্রীতি ও সেবায় দেশের লোকের সঙ্গে সহযোগই রবীন্দ্রনাথের কাম্য। "জীবনে ও চিত্তে পূর্ণ সহযোগ" তাঁর অভীষ্ট। প্রথম শ্রেণীর বক্তব্যে আছে আত্মসমীক্ষা; দ্বিতীয় শ্রেণীতে, সংগঠনের আহ্বান বা সহযোগের আহ্বান।

এবার প্রথম প্রবণতাটি পর্যালোচনা করা যেতে পারে কয়েকটি প্রবন্ধের ঐজাতীয় উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে। প্রথমে বঙ্গভঙ্গ যুগের 'বয়কট' প্রসঙ্গে

'সত্যের আহ্বান'-এর একটি উক্তি শোনা যাক, "ইংরেজ দোকানদার যাকে বলে reduced price sale, সে দিন যেন ভাগ্যের হাটে বাঙালির কপালে পোলিটিকাল মালের সেইরকম সস্তা দামের মৌসুম পড়েছিল।" উক্ত পিকেটিং-এর কথায় 'ঘরে বাইরে'-তে নিখিলেশও বলেছিল, "দেশের জন্ত অত্যাচার করা দেশের উপরেই অত্যাচার করা, সে কথা তুমি বুঝতে পারবে না।" যাকে উদ্দেশ্য করে বলা, সেই বিমলা কিন্তু সেদিন বুঝতে পারে নি, বরং ক্ষোভে ফেটে পড়েছে। কেবল বয়কট প্রসঙ্গেই নয়, পরবর্তী দশকে, সারা-দেশের লোককে মনুষ্যত্বের যথার্থ শিক্ষায় বঞ্চিত রেখে সস্তায় কিস্তিমাৎ করার 'অসহযোগ আন্দোলন' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী বক্তব্য আরও স্পষ্ট—

> তামার পয়সাকে সন্ন্যাসী সোনার মোহর করে দিতে পারে এ কথায় যারা মেতে ওঠে তারা বুদ্ধি নেই বলেই যে মাতে তা নয়, লোভে পড়ে বুদ্ধি খাটাতে ইচ্ছা করে না বলেই তাদের এত উত্তেজনা। —স্বরাজসাধন

এদিকে চরকা বা খদ্দর যে রাজনৈতিক ইমোশনের রসদ জোগান ছাড়া কোন বাস্তব প্রয়োজন মেটাবে না—এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ দ্বিধাহীন মত দিয়েছেন—

> এই রকম অন্ধ সাধনায় মহাত্মার মতো লোক হয়তো কিছু দিনের মতো আমাদের দেশের একদল লোককে প্রবৃত্ত করতে পারেন, কারণ তাঁর ব্যক্তিগত মাহাত্ম্যের 'পরে তাদের শ্রদ্ধা আছে।···আমি মনে করি, এরকম মতি স্বরাজলাভের অনুকূল নয়। —স্বরাজসাধন

পরবর্তীকালেও সত্যাগ্রহ আন্দোলনে অন্তর্নিহিত তত্ত্বটির মধ্যে "চিত্তশক্তির উদ্বোধনের" প্রশ্ন ছিল, কারণ "আন্তরিক সত্যের উপর অবিচল নির্ভরতা" সত্যাগ্রহের শক্তির উৎস। এজন্যেই রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীকে মহাত্মা বলে অভিনন্দন জানিয়েছেন, কিন্তু ঐ সন্ন্যাসীর মন্ত্রশক্তিতে সোনা ফলাবার আশ্বাসে তিনি বিশ্বাস করেন নি। "চরকায় সুতা কাটার চেয়ে মনকাটা যায় অনেকখানি"—এ উক্তি ঐ প্রসঙ্গে বাস্তব দর্শন বলেই মনে হয়। তাঁর আরও একটি উক্তি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়—

> আজ আমাদের দেশে চরকালাঞ্ছন পতাকা উড়িয়েছি। এ যে সংকীর্ণ জড়-শক্তির পতাকা, অপরিণত যন্ত্রশক্তির পতাকা, স্বল্পবল পণ্যশক্তির পতাকা—এতে চিত্তশক্তির কোন আহ্বান নেই। —রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত

কোন বাহ্য প্রক্রিয়ায় সমগ্রজাতির চিত্তশক্তির উদ্বোধন হতে পারে না। ইতিপূর্বেই তাঁর ক্ষুব্ধ আক্ষেপ 'বিবেচনা অবিবেচনা' প্রবন্ধে প্রকাশ পেয়েছিল—

"মানুষকে বলিব 'তুমি শক্তিও চালাইও না, বুদ্ধিও চালাইও না তুমি কেবলমাত্র ঘানি চালাও' এ বিধান কখনোই চিরদিন চলিবে না।" এখানেও চিত্তশক্তির উদ্‌বোধনের প্রশ্ন তুলেছেন রবীন্দ্রনাথ। যান্ত্রিক অভ্যাসে দেশের "অমূল্য শক্তির অপচয়"-কে তাঁর দৃষ্টিতে দুঃখজনক পরিণতি বলে মনে হয়েছিল। একেই "সাত্ত্বিক শক্তিকে তামসিক শক্তিকে পরিণত হওয়া" বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। "রাজনৈতিক ঝড়ে মানসিক মূঢ়তা"—তাঁর কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। তাই "রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানরূপ ভারী ভারী ট্যাঙ্ক" চালিয়ে ভ্রান্ত পথে এগিয়ে গিয়ে দ্রুত সাফল্য লাভের মোহকে ও অন্ধবিশ্বাসকে বারে বারে তিনি ভেঙে দেবার চেষ্টা করেছেন। আবার রাজনৈতিক ঝড়ে মানসিক মূঢ়তা যে আরও দুটি প্রশ্নে পথ হারিয়েছে, সেই হিন্দু-মুসলমান সমস্যা এবং সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন—এ সম্পর্কে তাঁর সুস্পষ্ট সাবধান বাণীগুলির আলোচনার গুরুত্ব আছে। এ দুটি নিয়ে এরপর কালানুক্রমিক বিচার করার আগে রবীন্দ্রনাথের সংগঠনমূলক নির্দেশগুলি অনুধাবন করা প্রয়োজন। "প্রীতি ও সেবায় দেশের লোকের সঙ্গে সহযোগের আদেশ"—কামনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এ প্রসঙ্গে তাঁর কয়েকটি উক্তি উল্লেখ করা প্রয়োজন।

১. যে দেশাত্মবোধী বলে 'আগে স্বরাজ পেলে তার পরে স্বদেশের কাজ করব', তার লোভ পতাকা ওড়ানো উর্দি পরা স্বরাজের রঙকরা কাঠামো-টার পরেই। · স্বরাজ আগে আসবে, স্বদেশের সাধনা তার পরে, এমন কথাও তেমনই সত্যহীন, এবং ভিত্তিহীন এমন স্বরাজ।

—রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত

২. সমগ্র দেশ বলে একটি জিনিস সমস্ত দেশের লোকের সৃষ্টি ; এই সৃষ্টি তার সমস্ত হৃদয়বৃত্তি বুদ্ধিবৃত্তি ইচ্ছাশক্তির প্রকাশে। এ হচ্ছে যোগলব্ধ ধন। ···পোলিটিকাল যোগ বা ইকনমিক যোগ নয় সর্বশক্তির যোগ চাই।

—সত্যের আহ্বান

৩. দেশকে সৃষ্টি করার দ্বারাই দেশকে লাভ করার সাধনা আমাদের ধরিয়ে দিতে হবে।···সম্মিলিত আত্মকর্তৃত্বের চর্চা তার পরিচয়,···যে গ্রামের লোক পরস্পরের শিক্ষা-স্বাস্থ্য অন্ন-উপার্জনে আনন্দ-বিধানে সম্মিলিত হয়েছে সেই গ্রামই সমস্ত ভারতবর্ষের স্বরাজলাভের পথে প্রদীপ জ্বেলেছে। তার পরে একটা দীপের থেকে আর-একটা দীপের শিখা জ্বালানো কঠিন হবে না ; স্বরাজ নিজেই নিজেকে অগ্রসর করতে থাকবে, চরকার যান্ত্রিক প্রদক্ষিণপথে নয়, প্রাণের আত্মপ্রবৃত্ত সমগ্রবৃদ্ধির পথে।

—স্বরাজসাধন (১৩৩২)

উপরোক্ত সুদীর্ঘ উদ্ধৃতিগুলিতে স্পষ্টত দেখা গেল, রবীন্দ্রনাথ স্বরাজসাধনার কথায় পুনরায় 'স্বদেশী সমাজ' প্রতিষ্ঠার কথা বললেন। একই বক্তব্য, নতুন সংযোজন হয়েছে সমবায়মূলক তত্ত্বটি ; কেবল বিশ্লেষণ আরও গভীর, পটভূমিকা বহু বিস্তৃত ও জগৎজোড়া, দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্বমানবের জয়যাত্রার পথে। রবীন্দ্রনাথের সারাজীবনের নিষ্ঠা, শ্রদ্ধা ও সাধনা—প্রীতি ও সেবায় দেশের লোকের সঙ্গে সহযোগের প্রত্যাশায় উদগ্রীব হয়ে উঠেছে। আর ভাবের আবেগকে, সে আবেগ বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনই হোক অথবা গান্ধীজী-প্রবর্তিত অসহযোগ-আন্দোলন কিংবা সত্যাগ্রহই হোক না কেন, ভারতব্যাপী স্বাধীন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কাজে পরিচালিত করার প্রয়াস করেছে। 'কালান্তর' পর্বে এসে, আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েও ঐ কথাই বার বার স্পষ্ট উচ্চারিত হয়েছে। আর এইসঙ্গেই একটি প্রধান বক্তব্য রয়েছে—"আত্মিক শক্তিকে উদ্‌বুদ্ধ করে মুমূর্ষুর মধ্যে প্রাণসঞ্চার করবার" অভীপ্সা। "ঘোড়াটাকে আস্তাবলে রেখে আপাতত এই গড়াপেটার কাজে" ('শিক্ষার মিলন')—চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, আত্মিক্য বুদ্ধির উদ্‌বোধন চেয়েছেন এবং নানা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "শিক্ষার ঐক্যসাধন ন্যাশনাল ঐক্যসাধনের মূলে"। এই যে "নিজের শক্তিকে তামসিকতার জড়িমা থেকে উদ্ধার করার"—অভিযানের কথা, তা ইতিপূর্বেই আলোচিত হয়েছে। এখানে পুনরায় উল্লেখ করা বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না যে রবীন্দ্রনাথের সংগঠন-মূলক স্বদেশচিন্তার অনির্বাণ দীপ হল 'বিশ্বভারতী', যেখানে তাঁর চিন্তা ও সাধনা সার্থকতা লাভ করেছে।

এবার আলোচনা প্রসঙ্গে যে দুটি সমস্যা বিবেচ্য তার প্রথমটি ছিল হিন্দু-মুসলিম ঐক্যসমস্যা। প্যারিস হতে লেখা পত্রে এণ্ড্রুজকে যে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ সেটি ছিল, "সমুদ্র তরঙ্গের প্রতি লক্ষ্য না করে নিজের নৌকো যথেষ্ট মজবুত কিনা সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার।" এই উপমা ইতিপূর্বে ইতিহাস-বিশ্লেষণ প্রসঙ্গেও পেয়েছি, "কিন্তু শিবাজী সেই ভাবের আধারটিকে পাকা করিয়া তুলিতে পারেন নাই, এমন-কি চেষ্টামাত্র করেন নাই। সমাজের বড়ো বড়ো ছিদ্রগুলির দিকে না তাকাইয়া তাহাকে লইয়া ক্ষুব্ধ সমুদ্রে পাড়ি দিলেন।" অতএব শিবাজীর রাষ্ট্রতরণী ডুবে গিয়েছিল। কালান্তর পর্বের 'সমস্যা' (১৩৩০)-প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিস্তৃত আলোচনা করেছেন এসম্পর্কে—

> আমাদের আর একটি প্রধান সমস্যা হিন্দু মুসলমানের সমস্যা। এই সমস্যার সমাধান এত দুঃসাধ্য তার কারণ দুই পক্ষই মুখ্যত আপন আপন ধর্মের দ্বারাই অচলভাবে আপনাদের সীমানির্দেশ করেছে।...হিন্দুতে মুসলমানে

কেবল যে এই ধর্মগত ভেদ তা নয়, তাদের উভয়ের মধ্যে একটা সামাজিক শক্তির অসমকক্ষতা ঘটেছে।

কিন্তু এ আলোচনার প্রায় ষোল বৎসর পূর্বে 'ব্যাধি ও প্রতিকার' প্রবন্ধে এ সমস্যার বিস্তৃত ও নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ ছিল, সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিতও ছিল—

১. আমাদের পরস্পরের মধ্যে সুবিধার চর্চা নহে, প্রেমের চর্চা, নিঃস্বার্থ সেবার চর্চা যদি করি তবে সুবিধা উপস্থিত হইলে তাহা পুরা গ্রহণ করিতে পারিব এবং অসুবিধা উপস্থিত হইলেও তাহাকে বুক দিয়া ঠেকাইতে পারিব।

২. হিন্দু ও মুসলমান, ভারতবর্ষের এই দুই প্রধান ভাগকে এক রাষ্ট্র-সম্মিলনের মধ্যে বাঁধিবার জন্য যে ত্যাগ, যে সহিষ্ণুতা, যে সতর্কতা ও আত্মদমন আবশ্যক তাহা আমাদিগকে অবলম্বন করিতেই হইবে।

—সভাপতির অভিভাষণ

রাষ্ট্রীয় ঐক্যলাভের প্রবল চেষ্টায় রাখী-উৎসবের কাল হতেই হিন্দুরা মুসলমানদের এক করে নেবার প্রয়াস করেছে। কিন্তু এ কাজে অকৃতকার্য হবার কারণ রবীন্দ্রনাথের মতে—"সুবিধা হইলেই যে এক করা যায় তাহা নহে। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে একটি সত্য পার্থক্য আছে তাহা ফাঁকি দিয়া উড়াইয়া দিবার জো নাই।" অর্থাৎ প্রয়োজনের তাগিদে চাকরি অথবা সুবিধা ভাগ-বাটোয়ারার বেলায় মিলনের উচ্ছ্বাস হাস্যকর, মুসলিম সমাজ শিক্ষাক্ষেত্রে পশ্চাৎ-পদ বলেই তাদের দাবি সহসা বেশি হয়ে উঠেছে, কিন্তু হিন্দুদেরও সহিষ্ণুতা রক্ষার প্রয়োজন, "তাহাদের এই দাবিতে আমাদের আন্তরিক সম্মতি থাকাই উচিত। পদ-মান-শিক্ষায় তাহারা হিন্দুর সমান হইয়া উঠে, ইহা হিন্দুরই পক্ষে মঙ্গলকর।"—"হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়", 'পরিচয়' (১৯১১)। এর বহুকাল পরে রাজনীতির কূটচক্রান্তে দ্বিজাতিতত্ত্বের ফলস্বরূপ দেশবিভাগের অভিশাপ নেমে এসেছে। তারপরও এই পরামর্শকে এখন স্থিরমস্তিষ্কে বিবেচনা করা দুরূহ। কিন্তু একথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে আজ,—হিন্দু-সমাজের আচারসর্বস্ব স্বার্থগন্ধী আচরণ, নব্যহিন্দুত্ব পুনর্জাগরণের আগ্রাসী উচ্ছ্বাস পশ্চাৎপদ মুসলিম সমাজকে ক্রমেই সন্দেহবাদী করে তুলে জাতীয়তরণীকে ছিদ্রসংকুল করেছিল। এ ব্যাধির প্রতিকার উভয়পক্ষের হাতে থাকলেও, হিন্দু সমাজের দায়িত্ব যে বেশি ছিল, রবীন্দ্রনাথ সে কথা স্পষ্ট করে বলতে দ্বিধা করেন নি। ঠিক এই কথা, তিনি নানা রাষ্ট্রের ইতিহাস বিশ্লেষণ করে 'হিন্দু মুসলমান' (১৩৩৮) প্রবন্ধে বলেছেন এবং এসম্বন্ধে চূড়ান্ত আলোচনা করেছেন। গোলটেবিল-বৈঠক চলাকালে স্বতন্ত্র নির্বাচনরীতি নিয়ে যখন হিন্দু সমাজে অসন্তোষ ও মুসলমান

সমাজে উল্লাস ফেটে পড়ছে তখনই তাঁর অকম্প কণ্ঠস্বর শোনা গেছে, "যেখানে গোড়ায় বিচ্ছেদ সেখানে আগায় জল ঢেলে গাছকে চিরদিন তাজা রাখা অসম্ভব। আমাদের মিলতে হবে সেই গোড়ায়, নইলে কিছুতে কল্যাণ নেই।" তাঁর মতে হিন্দু ও মুসলমানের ধর্মমত ও সমাজরীতির বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও "নানা উপলক্ষে ও বিনা উপলক্ষ্যে সর্বদা আমাদের পরস্পরের সঙ্গ ও সাক্ষাৎ আলাপ চাই।" ধর্মকর্মের ভেদ একেবারে না ঘুচলেও, "মনুষ্যত্বের খাতিরে আশা করতেই হবে, আমাদের মধ্যে মিল হবে। পরস্পরকে দূরে না রাখলেই সে মিল আপনিই সহজ হ'তে পারবে।" দেশটাকে নিজের হাতে পেয়ে সমস্যা সমাধান করা যাবে না, পূর্বাহ্ণেই করা প্রয়োজন। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের ভবিষ্যৎ-বাণী অক্ষরে অক্ষরে মিলে গিয়েছিল।

এইবার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সম্মুখে আমরা দাঁড়িয়েছি, হিন্দু-মুসলিম সমস্যা সম্পর্কে পূর্বসূরী বঙ্কিমের অভিমত কি? এ প্রসঙ্গে ইতিহাসচেতনাজাত প্রবন্ধ আলোচনাকালে কিছুটা ব্যাখ্যা দিয়েছি। "হিন্দু সাতশত বৎসর পরাধীন" ইত্যাদি উক্তিতে পরবর্তীকালে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। বঙ্কিম কি মুসলমান জাতিকে বিজেতা বলেই গণ্য করেছেন? পূর্বেও আলোচনা করেছি, তাঁর প্রবন্ধে জাতি-প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গে অন্যান্য প্রাদেশিক ও সাম্প্রদায়িক শ্রেণীর সঙ্গে মুসলমানের নামও উল্লিখিত হয়েছে। আর 'effeminate hindoos'-দের কলঙ্কমোচনার্থে কেবল হিন্দু শৌর্যবীর্য ও ঐতিহ্য আলোচনায় নিবদ্ধদৃষ্টি বঙ্কিম এ সমস্যাকে আপাতত প্রয়োজনীয় মনে করেন নি, যদিও উল্লেখ করেছেন দু'একবার।

এখন ব্যাপারটি অন্য একটি দৃষ্টিকোণ হতে পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে। লক্ষ্য করা গেছে, বঙ্কিমের কালে হিন্দু-মুসলিম সমস্যাটি মোটেই মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে নি। রাজনৈতিক ইতিহাস আলোচনা করলে দেখতে পাই, হিন্দুত্ব পুণর্জাগরণের প্রতিক্রিয়াতে (১৮৯৩) অর্থাৎ পুনা কংগ্রেসের (১৮৯৬) ঠিক তিন বৎসর পূর্বে পুনাতেই 'গো-বধ-নিবারণী সভা'র জন্ম হয়। অর্থাৎ বঙ্কিম-যুগের অবসান কালেই প্রতিক্রিয়াশীলতার জন্ম হয়ে গেছে। যদিও ইতিপূর্বেই আলিগড়-আন্দোলনে (১৮৭৬) মুসলিম সমাজের স্বাতন্ত্র্য লাভের প্রয়াস জেগেছিল—কিন্তু সে প্রয়াসে বিভেদের বীজ থাকলেও, হিন্দুত্বের প্রতিক্রিয়াতেই তার পল্লবিত হওয়া ত্বরান্বিত হয়।

তারপর একেবারে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বৃটিশের 'ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল পলিসি'-র কূটচক্রে এবং প্রশ্রয়ে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত (১৯০৬) হয়। তারপরই

নানা স্থানে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা মাঝে মাঝে দেখা দিতে থাকে। এই ব্যাধি আসলে বঙ্কিম যুগে ছিল না, রাজনৈতিক কূটচক্রে পরবর্তীকালে দেখা দিয়েছে। অতএব বঙ্কিমের চিন্তায় এই ব্যাধি নিরূপণ করার প্রশ্ন ওঠে নি, প্রতিকার ত নয়ই। দ্বিতীয়ত, সচেতনভাবে বঙ্কিম কুত্রাপি হিন্দু-মুসলমানকে দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী জাতি হিসাবে দেখেন নি। আগেই বলেছি ভারতীয় জাতিগুলির একটি বৃহত্তর অংশ দুর্বল, তার দুর্বলতা মোচনের প্রয়াসেই তাঁর দৃষ্টি ছিল নিবদ্ধ। উপন্যাসের ঐতিহাসিক পটভূমিকাতে হিন্দু-মুসলমানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা যেখানে দেখাতে বাধ্য হয়েছেন, সেখানে বঙ্কিম সুস্পষ্ট যুক্তি দিয়েছেন এবং সেই যুক্তিগুলি নিঃসন্দেহে যথার্থ। 'রাজসিংহ' উপন্যাসের উপসংহার এক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যায়।

অবশ্য বঙ্কিমের শেষজীবনে হিন্দু সাম্রাজ্যসম্পর্কিত স্বপ্ন স্পষ্ট অভিব্যক্ত হয়েছিল। কিন্তু সেখানে মুসলিম-সমাজেরও স্থান ছিল, যদিও হিন্দুর সঙ্গে তাদের সমমর্যাদার কথা উল্লিখিত হয়নি। এই বৃহত্তর হিন্দুসাম্রাজ্যের স্বপ্ন 'শিবাজী উৎসব'-এ রবীন্দ্রনাথের আদর্শবোধেও কিয়ৎকালের জন্য দেখা দিয়েছিল, "একধর্মরাজ্যপাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত বেঁধে দিব আমি।" এই হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন কিন্তু রবীন্দ্রদৃষ্টিতে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার কল্পনা, যেখানে ধর্ম হবে সার্বজনীন ধর্ম, 'মানুষের ধর্ম', আর বঙ্কিমের দৃষ্টিতে ঐ ধর্ম নিশ্চয়ই 'ধর্মতত্ত্ব'-এ ব্যাখ্যাত সনাতন হিন্দুধর্ম।

সামগ্রিক দৃষ্টিতে বঙ্কিমের প্রবন্ধগুলি বিচার করলে দেখা যায়, তিনি যে বাঙালির উন্নতির কথা বলেছেন, সে বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের মিলিত গোষ্ঠী। 'জাতিবৈর' প্রবন্ধে যেখানে তিনি বলেছেন, বাঙালি ও ইংরেজ পরস্পরের প্রতি বিরক্ত থাকুন, সেই বাঙালি কেবলমাত্র হিন্দু নয়। 'বাঙ্গালীর উৎপত্তি'-র ১ম পরিচ্ছেদে বিবৃত, "চারি প্রকার বাঙালি পাই। এক আর্য্য, দ্বিতীয় অনার্য্য হিন্দু, তৃতীয় আর্য্যানার্য্য হিন্দু, আর তিনের বার এক চতুর্থ জাতি বাঙালী মুসলমান।" অর্থাৎ এরা সপ্তকোটি বাঙালির অর্ধাংশ। আবার "বহুবিবাহ" প্রবন্ধে ('বঙ্গদর্শন', আষাঢ়, ১২৮০) উল্লেখ করা হয়েছে, "আর একটি কথা এই যে এদেশে অর্ধেক হিন্দু অর্ধেক মুসলমান।" স্পষ্টত বঙ্কিম এবিষয়ে সচেতন ছিলেন। তাই যখন শুনি—

> There is no hope for India until the Bengalis end Punjabis understand and influence each other…

তখন সেখানেও এই প্রাদেশিক গোষ্ঠীগুলি হিন্দু-মুসলমানের মিলিত রূপ বলেই

বিশ্বাস করতে হয়। এছাড়া বাঙলাদেশের কৃষক বলতে হাসিম শেখ' ও 'রামা কৈবর্ত' উভয়কেই তিনি যুক্তিবাদী মন নিয়ে বিচার করেছেন। ওরা দু'জন দুই সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি বৈকি। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি উত্তীর্ণ হয়ে সমদর্শনে এসে তাঁর সিদ্ধান্ত দাঁড়িয়েছে, "যে এরূপ ভেদ-জ্ঞান করে সে বৈষ্ণব নহে।" ('গৌরদাস বাবাজীর ভিক্ষার ঝুলি')। তবে একথা ঠিক রবীন্দ্রনাথের মতো সুস্পষ্ট রূপে হিন্দু-মুসলিম মিলন সম্পর্কে বঙ্কিম কোন বিশ্লেষণ দেন নি, মূলকথা হিন্দু কলঙ্কমোচন ও হিন্দু ঐতিহ্য-স্থাপনের আগ্রহ নিশ্চয়ই বঙ্কিমের মুসলিমবিদ্বেষ নয়, এবং তা মুসলমান সমাজ সম্পর্কে তাঁর অনাহার কোন প্রমাণই দেয় না। আর হিন্দু-মুসলিম মিলনের বিষয়টি তাঁর মনে একটি আশু সমাধানযোগ্য প্রকটতর সমস্যা হয়ে দেখা দেয়নি বলে অহিন্দু সমাজের প্রতি বঙ্কিম অনাগ্রহী একথাও বলা চলে না। বরং এবিষয়ে তাঁর আগ্রহের একটি সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত রূপে একটি পুস্তক-সমালোচনা উদ্ধৃত করা যায়। মীর মশারফ হোসেন রচিত 'গোরাই ব্রিজ অথবা গৌরী সেতু' নামক কবিতা পুস্তকটির সমালোচনা প্রসঙ্গে 'বঙ্গদর্শন' (পৌষ, ১২৮০)-এ বঙ্কিম লিখেছিলেন—

> তাঁহার রচনার ন্যায়, বিশুদ্ধ বাঙ্গালা অনেক হিন্দুতে লিখিতে পারে না। ইঁহার দৃষ্টান্ত আদরণীয়। বাঙ্গালা হিন্দু মুসলমানের দেশ—একা হিন্দুর দেশ নহে। কিন্তু হিন্দু মুসলমান এক্ষণে পৃথক—পরস্পরের সহিত সহৃদয়তাশূন্য। বাঙ্গালার প্রকৃত উন্নতির জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় যে হিন্দু মুসলমানে ঐক্য জন্মে। যতদিন উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানদিগের মধ্যে এমত গর্ব্ব থাকিবে যে তাঁহারা ভিন্ন দেশীয়, বাঙ্গালা তাঁহাদের ভাষা নহে, তাঁহারা বাঙ্গালা লিখিবেন না বা বাঙ্গালা শিখিবেন না কেবল উর্দ্দু ফারসীর চালনা করিবেন, ততদিন সে ঐক্য জন্মিবে না। কেন না, জাতীয় ঐক্যের মূল ভাষার একতা।[২০]

অতঃপর বঙ্কিম সুশিক্ষিত মুসলমানদের বাংলা ভাষানুরাগিতার উপর ভরসা করেছিলেন।

বস্তুত উক্ত সমালোচনাটি বঙ্কিমের হিন্দু মুসলিম সম্পর্কিত মনোভঙ্গির ক্ষেত্রে একটি সুস্পষ্ট দিগদর্শনী। তদনুসারে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের সেতু হবে বাংলা ভাষা। আপাতত বাঙলাদেশই তখন বঙ্কিমের বিবেচ্য ছিল এবং তখনও সমগ্র ভারতের পটভূমিতে হিন্দু-মুসলমানের সমস্যা প্রকট হয় নি, যেমন হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের কালে।[২১]

অতএব দেখা গেল, অহিন্দু সমাজের প্রতি বঙ্কিমের অনাগ্রহী ছিলেন না। আসলে পরবর্তীকালের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে বিধ্বস্ত দেশের নৈরাশ্যপীড়িত দৃষ্টিভঙ্গিতে বঙ্কিম-মনোভঙ্গির প্রতি এই জাতীয় সন্দেহ জেগেছে মাত্র।

এই প্রসঙ্গে জাতীয় ঐক্য সম্পর্কে বঙ্কিমের আগ্রহের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে হিন্দু সমাজের অনৈক্য ও জাতিহিতৈষার অভাব—জাতি প্রতিষ্ঠায় বাধা দিয়েছে। এই জাতি বলতে তাঁর উক্তি অনুসারে ভারতবর্ষে বসবাসকারী জাতি। তাঁর বক্তব্যের প্রবণতা হিন্দুজাতির দিকে নির্দেশ করলেও হিন্দুজাতি গঠিত হবে—বাঙালি, পাঞ্জাবী, তৈলঙ্গী, মহারাষ্ট্রী, রাজপুত, জাঠ, হিন্দু, মুসলমান এদের সমবায়ে, বোধহয় এমনি ইঙ্গিত খুব অস্পষ্ট নয়। "সমুদয় ভারত একজাতীয় বন্ধনে বদ্ধ হইলে কি না হইতে পারিত" বঙ্কিমের এই আক্ষেপ এদেশে জাতি প্রতিষ্ঠার কর্ম অব্যাহত গতিতে সম্পন্ন হয় নি বলেই। এর কারণও বঙ্কিমের বিশ্লেষণের আগেই স্পষ্ট হয়েছে—

> ভারতবর্ষের এমনই অদৃষ্ট, যেখানে কোন প্রদেশীয় লোক সর্ব্বাংশে এক, যাহাদের এক ধর্ম্ম, এক ভাষা, এক দেশ, তাহাদের মধ্যেও জাতির একতা জ্ঞান নাই। বাঙ্গালির মধ্যে বাঙ্গালিজাতির একতাবোধ নাই, শীকের মধ্যে শীকজাতির একতাবোধ নাই। ইহারও বিশেষ কারণ আছে। বহুকাল পর্যন্ত বহুসংখ্যক ভিন্ন জাতি এক বৃহৎ সাম্রাজ্যভুক্ত হইলে ক্রমে জাতিজ্ঞান লোপ হইতে থাকে। ভিন্ন ভিন্ন নদীর মুখনির্গত জলরাশি যেমন সমুদ্রে আসিয়া পড়িলে, আর তন্মধ্যে ভেদজ্ঞান করা যায় না, বৃহৎ সাম্রাজ্যভুক্ত ভিন্ন জাতিগণের সেইরূপ ঘটে। তাহাদিগের পার্থক্য যায়, অথচ ঐক্য জন্মে না। …হিন্দুদিগেরও তাহাই ঘটিয়াছে। —'ভারতকলঙ্ক'

বঙ্কিমের ভরসা এই, ইংরেজশাসনে জাতি প্রতিষ্ঠা হবে। বঙ্কিম যে বাসস্থানের প্রভেদ, ভাষার প্রভেদ, বংশের প্রভেদ, ধর্মের প্রভেদে নানা জাতির অনৈক্য দেখে আক্ষেপ করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের চিন্তাতেও এই প্রাদেশিক বা নানা সম্প্রদায়গত অনৈক্য সম্পর্কে বার বার এমনি আশঙ্কা জেগেছে। বর্তমান স্বাধীন গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষের জাতীয় সংহতি ক্ষেত্রে যে দারুণ বিপর্যয় দেখা দিয়েছে—অঙ্গরাজ্যে অঙ্গরাজ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ভাষাগত প্রশ্নে অসহিষ্ণুতা, সম্প্রদায়গত ঈর্ষা, শ্রেণীগত বৈষম্য ইত্যাদি সর্বপ্রকার অনৈক্যের যে চরম পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে ভারতবর্ষ, তারই পটভূমিতে দাঁড়িয়ে এই দুই মনীষীপ্রদত্ত বিশ্লেষণ ও সমাধানের ইঙ্গিতগুলি পুনর্বিবেচনার আশু প্রয়োজন আছে।

বঙ্কিমের বিশ্লেষণে ভারতবর্ষের অনৈক্য সম্পর্কে দুটি ছোট উপমা এখানে উল্লেখ করা হল। প্রথমটি হল, সমস্ত ভারতভূমি "মক্ষিকাসমাকুল মধুচক্রের ন্যায় নানা জাতি, নানা সমাজে পরিপূর্ণ হইল।" অন্যটি "ভিন্ন দেশ, ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন রাজ্য, ভিন্ন ধর্ম্ম, আর একজাতীয়ত্ব কোথায় থাকে? সাগরমধ্যস্থ মীনদলবৎ

ভারতবর্ষীয়েরা একতাশূন্য হইল।" এই নৈরাশ্যব্যঞ্জক উপমা দুটির পর জাতি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে ইঙ্গিত সেখানে আছে। অন্যত্র তাঁর আর একটি ইঙ্গিত পাই, 'লর্ড রিপনের উৎসবের জমা-খরচ' উপলক্ষে, সেটি এই—"ঐতিহাসিক কালে প্রথম সমস্ত ভারতবর্ষ এক হইয়া একটা কাজ করিল। আমরা এই প্রথম বুঝিলাম যে, আমাদের মধ্যে ঐক্য ঘটিতে পারে। আমরা এই প্রথম বুঝিলাম, ভারতবর্ষীয়েরা একজাতি।" অবশ্য এখানে রাজভক্তি এবং তারও পশ্চাতে ইংরেজশাসনই এক জাতীয়ত্বের অনুপ্রেরণা। 'জাতিবৈর' প্রবন্ধেও প্রায় একই ইঙ্গিত "উন্নত শত্রু জাতীয় উন্নতির উদ্দীপক"। ইঙ্গিতগুলি কিন্তু তৎকালেও অত্যন্ত বিচক্ষণতাজাত ও ধীশক্তি-প্রসূত বলে মনে হয়। জাতি সংগঠনের পশ্চাতে অনুপ্রেরণা রূপে হয় একশাসন, নয় একশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম অত্যন্ত কার্যকরী—একথা আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূলসিদ্ধান্ত এবং ইহার সত্যতা ইতিহাসে পরীক্ষিত। বঙ্কিমের ঐ ইঙ্গিতগুলি তৎকালোচিত ছিল।

এদিকে রবীন্দ্রনাথও বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের যুগে আমাদের জাতীয় সংহতির প্রশ্নে বারবার আলোচনা-উত্থাপন করেছেন। প্রথমে হিন্দু-মুসলিম সমস্যা ও পরে নানা প্রদেশের নানা বিভেদ নিয়ে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই উক্তির অনেক স্থানে একটি বিশেষ উপমা দিয়ে তিনি আমাদের জাতীয় অনৈক্যের কথা বলেছেন। সেই উপমাটি চিত্রিত হয়েছে—আস্তাবলে-রাখা একটি পুরানো ঘোড়ার গাড়ি দিয়ে। এই উপমাটি বর্তমান পটভূমিতেও সমান যথোপযুক্ত বলে মনে হয়।

> অন্য দেশের ইতিহাস যখন লক্ষ্য করে দেখি তখন পোলিটিকাল ঘোড়াটাকে সকলের আগে দেখি, মনে মনে ঠিক করি ঐ চতুষ্পদটার টানেই সমস্ত জাত এগিয়ে চলেছে। তখন হিসাব করে দেখিনে এর পিছনে দেশ বলে যে গাড়িটা আছে সেটা চলবার যোগ্য গাড়ি, তার এক চাকার সঙ্গে আর এক চাকার সামঞ্জস্য আছে, এক অংশের সঙ্গে আর এক অংশের ভালোরকম জোড় মেলানো আছে।...কিন্তু যে জিনিষটা ঘরে বাইরে সাত টুকরো হয়ে আছে, যার মধ্যে সমগ্রতা কেবল যে নেই তা নয়, যা বিরুদ্ধতায় ভরা, তাকে উপস্থিত মত ক্রোধ হোক বা লোভ হোক কোনো একটা প্রবৃত্তির বাহু বন্ধনে বেঁধে হেঁই হেঁই শব্দে টান দিলে কিছুক্ষণের জন্য তাকে নড়ানো যায়, কিন্তু একে কি দেশদেবতার রথযাত্রা বলে? —'সত্যের আহ্বান'

অতএব ঘোড়াটা আস্তাবলে রেখে গাড়িটা গড়াপেটার নির্দেশ দিলেন রবীন্দ্রনাথ। ঐক্যহীনতা সম্বন্ধে পূর্বসূরী ও উত্তরসূরী দু'জনের চিন্তাতেই

একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়, কিন্তু সমাধানের ইঙ্গিতে পার্থক্য লক্ষ্য করার বিষয়। বঙ্কিম একশাসন অথবা শাসকজাতির বিরুদ্ধে 'জাতিবৈর' বজায় রেখে সংহতির আশা করলেন। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্গভঙ্গ'-এর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় বললেন, "আরও গোড়াতে হাত দিতে হবে",—একেবারে "সমাজনৈতিক তাঁতে চড়িয়ে বিচ্ছিন্ন সুতোয় কাপড় তৈরী" করতে হবে। অবশ্য সমাজ ও ধর্ম্মমূলক ঐক্যের কথা বঙ্কিমের 'ধর্ম্মতত্ত্ব'-এ এসেছে, কিন্তু তাতে সনাতন হিন্দুধর্মের রং লেগেছে বলে প্রস্তাবটি পরবর্তীকালে সর্বলোকগ্রাহ্য হয় নি। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধাবলী হতে আরও কয়েকটি উদ্ধৃতি দিলে এ প্রসঙ্গের অবতারণা আরও স্পষ্ট হবে।

> আমাদের রাষ্ট্রীয় ঐক্য সাধনার মূলে একটা মস্ত জাতীয় অবাস্তবতা আছে সে কথা আমরা ভিতরে ভিতরে সবাই জানি. সেইজন্যে সে দিকটাকে আমরা অগোচরে রেখে তার উপরে স্বাজাত্যের-যে জয়স্তম্ভ গড়ে তুলতে চাই তার মাল মসলাটাকেই খুব প্রচুর করে গোচর করতে ইচ্ছা করি···সেই বাহুল্যেরই গুরুভারে ভিতের দুর্বলতা ভীষণরূপে সপ্রমাণ হয়ে পড়ে।
>
> —'সমস্যা'

খিলাফতের ঠেকাদেওয়া সন্ধিবন্ধনের প্রসঙ্গে উক্ত ঐ বক্তব্যটি আজও আমাদের রাষ্ট্রীয়জীবনের সম্পর্কে প্রয়োগ করা যায়। ঠেকা দিয়ে সমাজ বা রাষ্ট্রীয় সংহতি চলে না। অর্থাৎ—

> ভাঙ্গা গাড়িকে যখন গাড়িখানায় রাখা যায় তখন কোন উপদ্রব হয় না। সেটার মধ্যে শিশুরা খেলা করতে পারে, চাইকি মধ্যাহ্নের বিশ্রামাবাসও হতে পারে। কিন্তু যখনই তাকে টানতে যাই, তখন তার জোড়ভাঙ্গা অংশে অংশে সংঘাত উপস্থিত হয়। —স্বামী শ্রদ্ধানন্দ
>
> রাষ্ট্র ব্যাপারে পরস্পরের পাশে এসে দাঁড়াবার বাধাটা কোথায়? বাধা ঐ জাজিম তোলা আসনে বহু দিনের মস্ত ফাঁকটার মধ্যে। ওটা ছোটো নয়। ওখানে অকূল অতল কালাপানি। বক্তৃতামঞ্চের উপরে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে ডাক দিলেই পার হওয়া যায় না। —স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

রবীন্দ্রনাথের জমিদারীর নায়েবের বৈঠকখানায় ঐ জাজিম তোলা জায়গাটার গল্প বহুস্থানে উল্লেখ করা হয়েছে—আমাদের জাতিগত সংকীর্ণতার প্রসঙ্গে। আর বহুস্থানে আছে ঐ আস্তাবলের গাড়ির দৃষ্টান্তটি।

ভারতবর্ষের মুক্তি যাত্রাপথের রথটিকে কংগ্রেস রাস্তায় বের করেছে পলিটিকসের দড়ি বাঁধা অবস্থায়, চলতে শুরু করলে দেখা গেল ঐ আত্মবিদ্রোহ

এর চেয়ে স্পষ্টতর বিশ্লেষণ আর হয় না। সমাধান রবীন্দ্রনাথ আগেই দিয়েছেন, জাতীয় সংহতির কাপড়টি বুনতে হবে। মোটকথা তাঁর বক্তব্য অনুসারে এই ফাটল মেরামত চলবে, অবুদ্ধির সঙ্গে লড়াই করে, 'শিক্ষার মিলন' ঘটিয়ে, কর্মে সমবায় অবলম্বন করে, আর সেবার মধ্য দিয়ে গ্রামে গ্রামে স্বরাজ গড়ে তুলে। এ প্রসঙ্গ ইতিপূর্বেই বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। এখন একথা স্পষ্ট, রবীন্দ্রনাথের প্রদত্ত সমাধান রাজনৈতিক আন্দোলনের অভিজ্ঞতাপ্রসূত, এবং তা নিঃসন্দেহে বঙ্কিমের চিন্তাজাত সমাধানের পরিপূরক।

রাজনীতিমূলক চিন্তার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের ইঙ্গিতগুলি অতি সংহত কিন্তু ভাবগর্ভ। রবীন্দ্রনাথের ঐজাতীয় চিন্তা বহু বিস্তৃত বিশ্লেষণে অজস্র প্রবন্ধে ছড়িয়ে আছে। তবু সেগুলির অন্তরতম সত্তায় অথবা বীজাকারে অনেকটা মিল দেখা যায় পূর্বসূরীর সংকেতের সঙ্গে। অবশ্য বঙ্কিমীসূত্র পরবর্তী ঐতিহাসিক আন্দোলনের বিপুল উচ্ছ্বাসে মহাভাষ্যের আকারে এসেছে রবীন্দ্র-রচনায়, তার সংযোজন হয়েছে এবং প্রয়োজনে তার নব বিবর্তনলাভও ঘটেছে। আমাদের পরবর্তী প্রসঙ্গে বিপ্লবমূলক রাজনীতি অথবা সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে এই বিবর্তনের আরও একটি দৃষ্টান্ত পাব।

ইতিপূর্বে দেখেছি রবীন্দ্রনাথের পত্রে (এণ্ডরুজকে লিখিত) "অমূল্য শক্তির অপচয়"কে দুঃখজনক বলে, সাত্ত্বিক শক্তিকে তামসিক শক্তিতে পরিণত হওয়ার বিপক্ষে এবং ভ্রান্ত পথে দ্রুত সাফল্য লাভের অবাস্তবতা সম্পর্কে সংহত বক্তব্য ছিল। দ্রুত সাফল্যলাভের জন্য সন্ত্রাসবাদের আত্মহননের পথকে রবীন্দ্রনাথ কোনদিন সমর্থন করেন নি। যদিও ঐ পথের পথিক মৃত্যুঞ্জয়ী বীরদের আত্মদানের প্রেরণাকে অগাধ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন তিনি। এদিক দিয়ে বঙ্কিমের মনোভঙ্গির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অনেকটা মিল আছে। 'আনন্দমঠ'-এর সমাপ্তিতে মাতৃমন্ত্রের ঋত্বিক বঙ্কিমচন্দ্র শান্ত ও সংহত স্বরে বলেছেন, "সময়জ-বিপ্লব, অনেক সময়েই আত্ম-পীড়ন মাত্র। বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী।"

বঙ্কিমের এই সুচিন্তিত অভিমত কেবল তৎকালোচিতই ছিল না, বঙ্কিম-পরবর্তীকালেও এর যৌক্তিকতা অস্বীকার করা চলেনি, তার প্রমাণ আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসে মিলেছে। 'সাম্য' প্রবন্ধ-রচয়িতা বঙ্কিমকে আমরা আপাত আবেগে সমাজবিপ্লবের সমর্থক রূপে আশা করেছিলাম, কিন্তু সেখানেও প্রবীণ বুদ্ধিবাদী চিন্তানায়কের দ্বিধাহীন কণ্ঠ শুনেছি, "মিল এক স্থানে বলিয়াছেন এক্ষণকার যত সুব্যবস্থা তাহা পূর্বতন কুব্যবহার-সংশোধক মাত্র। ইহা সত্য কথা কিন্তু সম্পূর্ণ সংশোধন কালসাপেক্ষ।" বঙ্কিম জানতেন শতধাবিচ্ছিন্ন

জাতির হাতে অস্ত্র তুলে দেবার অবিবেচনার ফল হবে আত্মহনন এবং তা আত্মপীড়নের নামান্তরই হবে। যদিও "কুক্কুর জাতীয় পলিটিকস্"-এ তাঁর ঘৃণা অভিব্যক্ত হয়েছিল কিন্তু তিনি এও জানতেন, "অন্য পলিটিকস যে গাছে ফলে তাহার বীজ এ দেশের মাটিতে লাগিবার সম্ভাবনা নাই।" এই অন্যজাতীয় পলিটিক্স্ কমলাকান্ত কথিত "বৃষের রাজনীতি", অথবা বিপ্লবের পন্থা কিনা সেকথা স্পষ্ট হয় নি। তবে বঙ্কিমচন্দ্র যে সমাজবিপ্লবের নির্দেশদাতা নন সেকথা সামগ্রিক বিচারে স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়; তবে নিঃসন্দেহে তিনি সমাজ বিবর্তনের পক্ষপাতী।

বঙ্কিম-পরবর্তীকালে 'আনন্দমঠ'-কে কেন্দ্র করে অগ্নিযুগের সমিধ সংগৃহীত হয়েছে। 'ভবানীমন্দির'-রচনা করে অরবিন্দ গুপ্তসমিতি সংগঠন করেছেন, 'লাল-বাল-পাল' এই তিন নেতার উদ্যোগে এবং নিবেদিতার উৎসাহে বাংলা-পাঞ্জাব-মহারাষ্ট্রে সন্ত্রাসবাদী সমিতিগুলির সৃষ্টি হয়েছে। তৎকালীন 'অনুশীলন সমিতি', 'বন্দেমাতরম পত্রিকা' ইত্যাদির পরিচালকদের হাতে গুপ্তঅস্ত্র মারণমন্ত্র উচ্চারণ করেছে। তথাপি একথা ঠিক বঙ্কিম নিশ্চয় ঐ জাতীয় বৈপ্লবিক পথের নির্দেশ দেন নি, পরবর্তী রাজনৈতিক নেতাদের অনুপ্রেরণায় এমটি মনে হয়েছে।[২২] বঙ্কিমচন্দ্র জীবানন্দ-শান্তির জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেললেও মহাপুরুষের জবানিতে "বহির্বিষয়ক জ্ঞানলাভের" পরামর্শই দিয়েছেন। এই পরামর্শ সিডিশনের ভয়ে অথবা চাকুরীর আশঙ্কায় প্রদত্ত নয়। তখনও দেশ প্রস্তুত ছিল না বললেও সবটুকু বলা হয় না, বরং বলা চলে এই পন্থা কিছুটা ভারতীয় আদর্শের বিরোধী বলে এবং প্রধানত বৃহত্তর জাতীয় মঙ্গলের পরিপন্থী বলে, উক্ত পরামর্শ দিয়েছিলেন বঙ্কিম।

এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গিও প্রায় অনুরূপ। এদিকে কবির কয়েকটি কবিতা বা ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে রচিত, বিপ্লবী যুবকদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে অনেকদিন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, নাটুভ্রাতৃদ্বয়ের গ্রেপ্তারের পর এবং তিলক কারারুদ্ধ হবার পর রাষ্ট্রীয় আকাশে যখন অসন্তোষ ও ক্ষোভের জালা কালো মেঘ ঘনিয়ে তুলেছে তখন কবিকণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল—

এবার চলিনু তবে সময় হয়েছে নিকট
এবার বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।

এ কবিতা উচ্চারণ করতে করতে সন্ত্রাসবাদীরা ফাঁসীর মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়েছে। "অস্ত্রে দীক্ষা দেহ রণগুরু" এ-জাতীয় রবীন্দ্র-বাণী বিপ্লবী কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে। আর এই সঙ্গে ছিল 'মাভৈঃ' (১৩০১) প্রবন্ধের গুরুগম্ভীর আহ্বান।

"তুমি দেশকে যথার্থ ভালবাস তাহার চরম পরীক্ষা তুমি দেশের জন্য মরিতে পার কিনা।" কিংবা "নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান, ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।" —কবির এই জলদগম্ভীর আহ্বান রুদ্রসংগীতে ধ্বনিত হয়েছিল, ওদিকে অগ্নিযুগের বাংলাদেশের যুবশক্তি বিদ্রোহের প্রস্তুতি চালাচ্ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই আত্মহননের পথ হতে সরে দাঁড়াতে বলেছেন তাদের। 'পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনী'-তে চরমপন্থীদের হৃদয়াবেগকে সংহত করে স্বদেশী সমাজ গঠনের পথে চলার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

এদিকে ১৯০৭ সালে 'বন্দেমাতরম' পত্রিকায় অরবিন্দের 'দ্য ডকট্রিন অফ প্যাসিভ রেজিসটেন্স' শীর্ষক প্রবন্ধ-সপ্তকে প্রতিরোধ আন্দোলনের আহ্বান বেজে উঠল। এরপরই অরবিন্দ অভিযুক্ত হলেন! তখন কবি লিখলেন, "অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।" এতো শুধু অরবিন্দকে বন্দনা নয় এ যেন দেশের যুবশক্তিকে আহ্বান, "ওরে ভীরু, ওরে মূঢ় তোল তোল শির।" (১৩১৪) তথাপি চরমপন্থী বিপ্লবকে তিনি সমর্থন জানান নি। যদিও বারে বারে তাদের নির্ভীকতাকে প্রণাম জানিয়েছেন অকুণ্ঠ ভাষায়। এসম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সুস্পষ্ট বক্তব্য শোনা গেল 'পথ ও পাথেয়' প্রবন্ধে "দুঃখ সহ্য করা তত কঠিন নহে কিন্তু দুর্মতিকে সম্বরণ করা অত্যন্ত দুরূহ।" অর্থাৎ ন্যায়ধর্মকে একবার ছাড়লেই বিশ্বব্যাপী ধর্মব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপন করার জন্য প্রচণ্ড সংঘাত অনিবার্য হয়। আশ্চর্য এই সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে রবীন্দ্রমানসের এই চিন্তা গান্ধীবাদের অন্তত দুটিদশক পূর্ব হতেই প্রকাশ পাচ্ছিল "শুধুমাত্র ভাঙন. নির্বিচার বিপ্লব কোনোমতেই কল্যাণকর হইতে পারে না।" রবীন্দ্রনাথের প্রত্যয় এই, জাতিভেদগ্রস্ত ভারতে মহাজাতি সংগঠনের গুরুতর সমস্যাকে অস্বীকার করে কেবল বিদ্বেষের অগ্নিশিখা জ্বাললে—"বিদ্বেষের কারণটি যখন চলিয়া যাইবে… রক্তপিপাসু বিদ্বেষ বুদ্ধির দ্বারা আমরা পরস্পরকে ক্ষতবিক্ষত করিতে থাকিব।" অধৈর্য হয়ে গুপ্তহত্যা দ্বারা, সন্ত্রাসবাদী ষড়যন্ত্র করে কার্যোদ্ধারের নীতিতে বুদ্ধি বিকৃত হয়, "প্রেমের কাজে, সৃজনের কাজে, পালনের কাজেই যথার্থভাবে আমাদের সমস্ত শক্তির বিকাশ ঘটে।"

রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সর্বদাই গঠনমূলক ও ইতিবাচক, নেতিবাচক কদাপি নয়। 'দেশহিত' প্রবন্ধে তিনি সন্ত্রাসবাদের প্রতি কঠিন নিষেধবাক্য উচ্চারণ করতে দ্বিধা করেন নি—

আজ দস্যুবৃত্তি, তস্করতা, অন্যায় পীড়ন দেশহিতের নাম ধরিয়া চারিদিকে সঞ্চরণ করিতেছে, এ কি এক মুহূর্তের জন্য তাঁহারা সহ্য করিতে পারেন

যাঁহারা জানেন আত্মহিত, দেশহিত, লোকহিত, যে কোন হিতসাধনই লক্ষ্য হউক না কেন কেবলমাত্র বীর ও ত্যাগী ও তপস্বী তাহার যথার্থ সাধক।[২৩]

"ফল লক্ষ্য নহে, ধর্মই লক্ষ্য"—রবীন্দ্রনাথের এই মনোভঙ্গি 'ঘরে বাইরে' ও 'চার অধ্যায়' উপন্যাসেও রূপায়িত। 'স্বদেশচিন্তার শিল্পরূপ' শীর্ষকে এ সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হবে। এখানে একথা খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, 'বঙ্গমন্ত্রের উদ্গাতা' বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তৎকালীন অগ্নিযুগের বাংলা এবং তার দুঃসাহসী বীরদের ভ্রান্তপথ হতে ফিরিয়ে আনার প্রয়াসে সঙ্কোচ করেন নি। ভগিনী নিবেদিতা কিম্বা ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যও তাঁকে তাঁর এই স্থির বিশ্বাস বিন্দুমাত্র টলাতে পারে নি। 'কালান্তর' যুগে রবীন্দ্রনাথের এই মনোভঙ্গি আরও জোরালো কণ্ঠস্বরে প্রকাশিত।

> সেদিনকার সেই দুঃসাহসিক যুবকেরা ভেবেছিলেন সমস্ত দেশের হয়ে তাঁরা কয়জন আত্মোৎসর্গ দ্বারা রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটাবেন, তাঁদের পক্ষে এটা সর্বনাশ কিন্তু দেশের পক্ষে এটা সস্তা। —'সত্যের আহ্বান'

অতি স্পষ্ট কথায় রবীন্দ্রনাথ এই সত্যকে বিশ্লেষণ করলেন একটি রেলগাড়ির উপমায়, রেলযানে ফার্স্টক্লাশ গাড়ি তার সৌষ্ঠব সত্ত্বেও তৎসংযুক্ত থার্ডক্লাশকে কোন মতে এগিয়ে যেতে পারে না। সন্ত্রাসবাদীরা এগিয়ে গেলে তো সমস্ত দেশ চলবে না, কারণ "সমগ্র দেশ বলে একটি জিনিস সমস্ত দেশের লোকের সৃষ্টি"। এই ভাবে নানা প্রসঙ্গে পথের ভ্রান্তিকে বার বার তুলে ধরেছেন রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু সেই সঙ্গে অসীম শ্রদ্ধা সহকারে বলেছেন—

> ইচ্ছার অগ্নিগর্ভ রূপ দেখেছি বাংলার তরুণদের চিত্তে। দেশে তারা দীপ জ্বালাবার জন্যে আলো নিয়েই জন্মেছিল—ভুল করে আগুন লাগালো, দগ্ধ করলে নিজেদের, পথকে করে দিল বিপথ। কিন্তু সেই দারুণ ভুলের সাংঘাতিক ব্যর্থতার মধ্যে বীরহৃদয়ের যে মহিমা ব্যক্ত হয়েছিল, সেদিন ভারতবর্ষের আর কোথাও তো তা দেখিনি। —'দেশনায়ক'

এইভাবে "অসহিষ্ণু তারুণ্যের" "হৃদয় বিদারক প্রমাদের" "অন্তর্নিহিত তেজস্ক্রিয়তাকে"—প্রশস্তি জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই কিন্তু এই আত্মহননের পথকে সমর্থন করেন নি কখনও। বঙ্কিমের কথা ছিল "বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী", রবীন্দ্রনাথও ঠিক সেই কথাই স্পষ্টস্বরে বললেন, "তাদের প্রাণনিবেদন আশুনিষ্ফলতায় ভস্মসাৎ হয়েছে।"

"পাপের কখনও পবিত্র ফল হয় না"—বঙ্কিমের এই বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের সারা জীবনের অভিজ্ঞতায় আরও দীপ্ত। "শুদ্ধমাত্র ভাঙন, নির্বিচার বিপ্লব

কোনমতেই কল্যাণকর হইতে পারে না।”—তাহলে কল্যাণকর পথ কোনটি? পূর্বসূরী ও উত্তরসূরীর দৃষ্টিতে আত্মহননের নেতিবাচক দিকটি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে কিন্তু ইতিবাচক পথের নির্দেশ কোথায়? সেটিই সংগঠন মূলক স্বদেশচিন্তা বলে এতক্ষণ অনুসন্ধান করেছি। এবার তার তত্ত্বের দিকটি পর্যালোচনা করব। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ দুজনেই ইতিবাচক পথটি প্রসারিত দেখেছেন সমাজব্যবস্থার সংস্কারের মধ্যে এবং এর ফলে সমাজচিন্তার দিকে তাঁদের রাষ্ট্রচিন্তা স্বাভাবিক ভাবেই অগ্রসর হয়েছে। বিশদভাবে আমরা তা পরবর্তী প্রসঙ্গে আলোচনা করব। এখানে কেবল দু'একটি সংকেত গ্রহণ করা প্রয়োজন, ঐ নেতিবাচক দিকটি উদ্‌ঘাটনের পর ইতিবাচক প্রেরণার তত্ত্বটি আমাদের আলোচ্য বলে।

বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদেশের কৃষক'-দের দুর্দশার মূলে চিরস্থায়ী কলঙ্কের কথা স্বীকার করে, জমিদারদের অসহনীয় শোষণের চিত্র অঙ্কন করেও বিদ্রোহের ধ্বজা উত্তোলন না করে জমিদারদের শুভবুদ্ধির কাছেই আবেদন করলেন—

> এই কলঙ্ক অপনীত করা জমিদারদিগেরই হাত।……যদি তাঁহারা কুচরিত্র জমিদারদিগকে শাসিত করিতে পারেন তবে দেশের যে মঙ্গল সিদ্ধ হইবে, তজ্জন্য তাঁহাদিগের মাহাত্ম্য অনন্ত কাল পর্যন্ত ইতিহাসে কীর্ত্তিত হইবে।

এমনি শুভবুদ্ধির উপর ভরসায় ধনবণ্টনের মৃদু প্রস্তাব করে তিনি বলেছেন—

> জনসাধারণের স্বচ্ছন্দাবস্থা হইলে সকলেই মনুষ্যপ্রকৃত হইত। দেশের উন্নতির সীমা থাকিত না। এখন যে জন পাঁচ ছয় বাবুতে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের ঘরে বসিয়া মৃদু মৃদু কথা কহেন, তৎপরিবর্তে তখন এই ছয় কোটি প্রজার সমুদ্রগর্জ্জনগম্ভীর মহানিনাদ শুনা যাইত।
>
> —'বঙ্গদেশের কৃষক'

আবার 'সাম্য' প্রবন্ধের সমাপ্তিতে তিনি বললেন, “শিক্ষাই সকল প্রকার সামাজিক অমঙ্গল নিবারণের উপায়”। কারণ তাঁর উদ্দেশ্য এবং কামনা—“সকলের উন্নতির পথ মুক্ত চাহি।” জনশিক্ষাই পন্থা, জমিদারদের সুবুদ্ধি উদয়ের জন্য তাঁর সাগ্রহ প্রতীক্ষা আছে আর আছে বিশ্বাস, “সম্পূর্ণ সংশোধন কাল সাপেক্ষ।” এই প্রজাপীড়কদের শুভবুদ্ধি উদয়ের প্রতীক্ষার কথায় রবীন্দ্রনাথের 'প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০১) নাটকের প্রতাপাদিত্য ও ধনঞ্জয় বৈরাগীর কথোপকথনের মাধ্যমে প্রদত্ত একটি নিগূঢ় সংকেত সহজে আমাদের মনে আসে—

প্রতাপ॥ তুমিই প্রজাদের বারণ করেছ খাজনা দিতে।

ধনঞ্জয় ॥ হাঁ মহারাজ, আমিই তো বারণ করেছি। ওরা মূর্খ, ওরা তো বোঝে না—পেয়াদার ভয়ে সমস্তই দিয়ে ফেলতে চায়। আমিই বলি, আরে আরে এমন কাজ করতে নেই—প্রাণ দিবি তাঁকে প্রাণ দিয়েছেন যিনি। তোদের রাজাকে প্রাণ হত্যার অপরাধী করিসনে।

বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথ দু'জনেরই মানস প্রবণতা এবিষয়ে সমগোত্রীয় বলে মনে হওয়া আশ্চর্য নয়। আবার রবীন্দ্রনাথের এই নাট্যচিত্রটিতে পরবর্তীকালে অবলম্বিত 'সত্যাগ্রহ'-এর আদর্শ ও রূপ পাওয়া যাচ্ছে। গান্ধীজী যে রবীন্দ্রনাথকে 'গুরুদেব' বলে মানতেন সে হয়ত বিশ্বকবি বলে, মনীষী বলে। কিন্তু আমাদের মনে হয় গান্ধীজীর রাজনৈতিক জীবনের মূলতত্ত্ব 'সত্যাগ্রহ'-এর ধারণাটির জন্যই রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীর গুরুর মর্যাদা পাবেন ভাবীকালের ঐতিহাসিক বিচারে।

এবার রবীন্দ্রনাথ কথিত ঐ ইতিসূচক পথটির নকসা এঁকে দেখা যাক—

> কেননা ইতিসূচক স্বাধীনতাই মানুষের যথার্থ স্বাধীনতা।·········রাষ্ট্রবিপ্লব সম্বন্ধভেদের বিপ্লব।···আমরা ভেদ ঘুচিয়ে দিয়ে সম্বন্ধের পরিপূর্ণতাকে চাই, তাকেই বলি মুক্তি। যখন দেশের স্বাধীনতা চাই তখন নেতিসূচক স্বাধীনতা চাই নে, তখন দেশের সকল লোকের সঙ্গে সম্বন্ধ যথাসম্ভব সত্য ও বাধামুক্ত করতে চাই। —'সমস্যা'

অতএব রবীন্দ্রমানসের প্রতিনিধি ঐ ধনঞ্জয় বৈরাগী প্রজাদের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ ভেদ ঘুচিয়ে দিয়ে রাজাকেও শরিক করে নিতে চায়। এই জন্যেই "রাজপুরুষে ও ভদ্রলোকে মিলে রাজগদি ভাগাভাগি করে নেওয়ার পলিটিক্‌সে" রবীন্দ্রনাথের বিতৃষ্ণা। তাঁর মতে—"আমাদের আধুনিক পলিটিক্‌সের গুরু থেকেই আমরা নির্গুণ দেশপ্রেমের চর্চা করছি, দেশের মানুষকে বাদ দিয়ে।" ('রায়তের কথা')। এসম্বন্ধে আরও উদ্‌ঘাটন আছে—"আমাদের মন যখন অত্যন্ত আড়ম্বরে স্বাদেশিক হয়ে ওঠে তখনো দেখা যায় সেই আড়ম্বরের সমস্ত মাল-মশলার গায়ে ছাপ মারা আছে 'Made in Europe'।" তাঁর মতে, আমরা পলিটিকাল আত্মপরিচয়ের ধারা অনুসন্ধান করি বিদেশী ইতিহাসে—

> সেই ব্যগ্রতার তাড়নায় আপনাকে স্বপ্নে গড়া ম্যাটসিনি, স্বপ্নে-গড়া গারিবালডি, কাল্পনিক ওয়াশিংটন বলে ভাবনা করতে হয়। অর্থতত্ত্বেও তাই, এখানে আমাদের কারও কারও কল্পনা বল্‌শেভিজম্‌, কারও সিণ্ডিক্যালিজ্‌ম, কারও বা সোস্যালিজ্‌ম-এর গোলক ধাঁধায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। —'বৃহত্তর ভারত'

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু ঐ গোলকধাঁধা হতে পরিত্রাণের একটি পন্থা নির্ণয় করেছেন মৌলিক ভাবেই। ('প্রায়শ্চিত্ত' নাটকেরই পরিবর্তিত রূপ ছিল 'পরিত্রাণ'— সেখানে এই তত্ত্বটি রসরূপে প্রকাশিত)।

> আসল কথা, যে মানুষ নিজেকে বাঁচাতে জানে না কোনো আইন তাকে বাঁচাতে পারে না। নিজেকে এই যে বাঁচাবার শক্তি তা জীবন যাত্রার সমগ্রতার মধ্যে কোন একটা খাপছাড়া প্রণালীতে নয়। তা বিশেষ আইনে নয়, চরকায় নয়, খদ্দরে নয়, কন্‌গ্রেসে ভোট দেবার চার আনা ক্রীত অধিকারে নয়। পল্লীর মধ্যে সমগ্রভাবে প্রাণসঞ্চার হলে তবেই সেই প্রাণের সম্পূর্ণতা নিজেকে প্রতিনিয়ত রক্ষা করবার শক্তি নিজের ভিতর থেকে উদ্ভাবন করতে পারবে। —'রায়তের কথা'

এ সিদ্ধান্ত 'রায়তের কথা' প্রসঙ্গে বিবৃত হলেও এ কিন্তু সমগ্র ভারতেরই নিরন্ন অসহায় প্রজা সাধারণের কথা। বঙ্কিম বলেছিলেন, "ছয়কোটি প্রজার সমুদ্র-গর্জ্জনগম্ভীর মহানিনাদ" শুনা যাইত। রবীন্দ্রনাথ একেবারে ত্রিশকোটির প্রাণসঞ্চার কামনা করলেন, যারা বলবে—

> আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে,
> নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কি স্বত্বে।

তিনি অনেকবার বলেছেন এমনি "আত্মউদ্বোধন" ঘটে প্রেমের স্পর্শমণির স্পর্শে— মহাত্মা গান্ধীর প্রেমের স্পর্শে অমনি ব্যাপার ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ গান্ধীকে 'মহাত্মা' বলে বরণ করেছিলেন এজন্যেই—"কেননা ভারতের এত মানুষকে আপনার আত্মীয় করে আর কে দেখেছে।" আত্মার মধ্যে যে শক্তির ভাণ্ডার আছে তা খুলে যায় সত্যের স্পর্শমাত্রে। তাই গান্ধীজীর প্রাণের—"সত্যকার প্রেম ভারতবাসীর বহুদিনের রুদ্ধদ্বারে যে মুহূর্তে এসে দাঁড়ালো অমনি তা খুলে গেল।" যে কালে এই উদ্বোধন ভারতীয় জনচিত্তে ঘটেছিল (১৯২০-২১) কবি তখন ইউরোপে। সেখান থেকেই আশা করেছিলেন—

> এইবার এই উদ্‌বোধনের দরবারে আমাদের সকলেরই ডাক পড়বে, ভারতবাসীর চিত্তে শক্তির যে বিচিত্ররূপ প্রচ্ছন্ন আছে সমস্তই প্রকাশিত হবে। কারণ, আমি একেই দেশের মুক্তি বলি, প্রকাশই হচ্ছে মুক্তি।
> —'সত্যের আহ্বান'

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যেমনটি আশা করেছিলেন তেমন আহ্বান তিনি পেলেন না। তাই গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন তিনি সমর্থন করতে পারলেন না; তিনি চাইলেন—"প্রীতি ও সেবায় দেশের লোকের সঙ্গে সহযোগ।"

আসলে রবীন্দ্রনাথ তথাকথিত রাষ্ট্রতন্ত্র-বিরোধী। তিনি এক কথায় রাষ্ট্রগৌণ সমাজে বিশ্বাসী।[২৪] তাই তিনি প্রথমত চাইলেন আত্মশক্তির উদ্বোধন। দ্বিতীয়ত, তিনি নেতিবাচক সন্ত্রাসবাদ বা চরকা-আন্দোলন সমর্থন করলেন না। তৃতীয়ত, পশ্চিমী প্যাটার্নে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করলেন। চতুর্থত, আন্তর্জাতিক সহযোগিতাতে বিশ্বাস করলেন। ফলে 'স্বরাজ-সাধনা' সম্পর্কে তাঁর ইতিবাচক পন্থা অভিনবত্বে ও মৌলিকতায় আশ্চর্য অবদান হয়ে উঠল। ইতিপূর্বেই তাঁর ঐ সংগঠমূলক সাধনার উল্লেখ করা হয়েছে, এখানে পুনর্বার স্মরণ করছি—

> সাধারণের মঙ্গল জিনিসটা অনেকগুলি ব্যাপারের সমবায়। তারা পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। তাদের একটাকে পৃথক করে নিলে ফল পাওয়া যায় না।
>
> স্বাস্থ্যের সঙ্গে, বুদ্ধির সঙ্গে, জ্ঞানের সঙ্গে, কর্মের সঙ্গে, আনন্দের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারলে তবেই মানুষের সব ভালো পূর্ণ হয়ে ওঠে। স্বদেশের সেই ভালোর রূপটিকে আমরা চোখে দেখতে চাই।...
>
> ভারতবর্ষের একটিমাত্র গ্রামের লোকও যদি আত্মশক্তির দ্বারা সমস্ত গ্রামকে সম্পূর্ণ আপন করতে পারে তা হলেই স্বদেশকে স্বদেশরূপে লাভ করবার কাজ সেইখানেই সম্ভব হবে। —'স্বরাজ সাধন'

এই গ্রামের এক-একটি ইউনিটি নিয়ে সর্বাঙ্গীন উন্নতির পথে যাত্রা সুরু করা —'স্বদেশীসমাজ'-এর বহু ব্যাখ্যাত আদর্শের মূলতত্ত্ব। এই সমাজভিত্তিক রাষ্ট্র-কল্পনাই ছিল রবীন্দ্রনাথের মনে। এর সঙ্গে বঙ্কিমের ইচ্ছার মিল আছে। বঙ্কিমের সেই যুগসমস্যার প্রশ্ন এবং উত্তর জলদমন্ত্রে ধ্বনিত হয়েছিল। "তুমি আমি দেশের কয় জন? আর এই কৃষিজীবী কয় জন?......যেখানে তাহাদের মঙ্গল নাই সেখানে দেশের মঙ্গল নাই।" আর বঙ্কিমের যে দাবী—"সকলের উন্নতির পথ মুক্ত চাহি"—তার সমর্থনে যেন রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশীসমাজ'-এর পরিকল্পনা একসুরে বাঁধা, একথা নিশ্চয়ই বলা চলে। পার্থক্য এই বহু আন্দোলনের ইতিহাসজ্ঞান ও বহুবার বিশ্বভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়ে দ্রুত পরিবর্তিত পটভূমিকায় আন্তর্জাতিক কবি-মনীষী রবীন্দ্রনাথ যতটা বিস্তৃত ও বিপুল আলোচনার মাধ্যমে তাঁর রাজনৈতিক মত এবং সংগঠনের ইতিবাচক পন্থাকে নির্দেশ করে গেছেন, ততটা সময়, সুযোগ ও অভিজ্ঞতা বঙ্কিমের ব্যক্তিগত ও সমাজগত জীবনে আসেনি। আসা সম্ভবও ছিল না। তাই বঙ্কিম দিলেন সূত্র, রবীন্দ্রনাথ দিলেন মহাভাষ্য। একজন আরেকজনের পরিপূরক।

দু'জনের সর্বপ্রধান মিল—সমাজভিত্তিক রাষ্ট্রচিন্তায়। দুই মনীষীর সমাজচিন্তায় সাদৃশ্য অক্ষরে অক্ষরে না থাকলেও সমাজভিত্তিকে দুজনেই স্বীকার করেছেন।

রাজনীতির ক্ষেত্রে, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ-চিন্তার তুলনা করতে গিয়ে আমরা তৃতীয় উপধারা হিসাবে জাতীয় দোষত্রুটির সমালোচনা, আত্মসমীক্ষা এবং সেই সূত্রে সংগঠনমূলক রাজনীতির বিষয় গ্রহণ করেছিলাম। এই প্রসঙ্গে উভয় মনীষার চিন্তায় লোকশিক্ষার প্রতি মনোযোগ এবং সেই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক শিক্ষা-দর্শন পর্যন্ত আলোচনা করে দেখা যাচ্ছে, লোকশিক্ষার ক্ষেত্রে বঙ্কিমী ইঙ্গিত রবীন্দ্রচিন্তায় আরও বিস্তৃত, এবং পরিণামে বিশ্বমুখী। সংগঠনমূলক আন্দোলন সম্পর্কে একেবারে স্বদেশের কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ার সংকল্প ছিল উভয়েরই, রবীন্দ্রনাথ স্বীয় চিন্তায় ও কর্মে ঐ আদর্শকে নানাসূত্রে পরীক্ষা করেছেন এবং স্থির সিদ্ধান্তে এসেছেন।

হিন্দু মুসলিম মিলন-সমস্যায় বঙ্কিমের চেয়ে রবীন্দ্রনাথকে—অনেক বেশী পর্যালোচনা করে সমাধানের ইঙ্গিত দিতে হয়েছে। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন সম্পর্কেও তাই। আর ইতিবাচক রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতি রবীন্দ্রনাথের নিষ্ঠা বঙ্কিমীসূত্রকে—মহাভাষ্যে পরিণত করেছে। এবং যুগ অনুসারে সে-ভাষ্য পরিশীলিত হয়েছে। এক কথায় বলা চলে, সূত্রের ভাষ্য রচনা কালে ভাষ্যকারের মননশীলতা ও বিপুল অভিজ্ঞতা নবযুগের উপযোগিতাকে অনুধাবন ও স্বীকার করে সংযোজনে ও কোথাও-বা নবরূপায়ণে ব্রতী হয়েছে। তবে একটি বিশিষ্ট ক্ষেত্রে দু'জনের মানস-পরিণতি ভিন্ন হয়ে উঠেছে, সেটিকে আমরা আপাতত একপাশে রেখে এসেছি। সেই বিষয়টি হল আন্তর্জাতিকতাবোধ। সমাজচিন্তার ক্ষেত্রটি অনুধাবন করার পর উক্ত বিষয়টি আলোচনা করতে বসলে একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির সহায়তা পাব। অতএব আমাদের পরবর্তী আলোচ্য, সমাজচিন্তার ক্ষেত্রে দু'জনের স্বদেশচিন্তার প্রবণতা, বিশ্বাস ও সিদ্ধান্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ক. বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তার তুলনা সমাজচিন্তামূলক প্রবন্ধাবলীতে

ইতিপূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ, উভয়েরই রাষ্ট্রচিন্তা ছিল সমাজভিত্তিক। বঙ্কিমের উক্তিতে, "সমাজ আমাদের শিক্ষাদাতা, দণ্ডপ্রণেতা, ভরণপোষণ এবং রক্ষাকর্ত্তা, সমাজই রাজা এবং সমাজই শিক্ষক।" ('ধর্মতত্ত্ব', ১০ম অধ্যায়) আর এদিকে রবীন্দ্রনাথের সুস্পষ্ট মন্তব্য শুনেছি "এ-কথা আমাদিগকে বুঝিতেই হইবে, আমাদের দেশে সমাজ সকলের বড়ো।" ('ভারতবর্ষীয় সমাজ') অর্থাৎ একদিকে বঙ্কিমচন্দ্র উপদেশ দিলেন, "সমাজকে ভক্তি করিবে", অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সভ্যতার মর্মকেন্দ্র আবিষ্কার করে বললেন, "আমাদের হিন্দুসভ্যতার মূলে সমাজ"। তবে একথা নিশ্চিত যে সমাজ বলতে বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথ দুজনেই সম্পূর্ণ আধুনিক অর্থই গ্রহণ করেছেন। এবার এই দুই মনীষীর স্বদেশচিন্তা সমাজ শক্তিকে যে দৃষ্টিভঙ্গিতে গ্রহণ করেছে, তার আনুপূর্বিক বিশ্লেষণ ও তুলনা করে দেখা যাক। এজন্যে প্রথমেই এঁদের সমাজ-চিন্তা-মূলক রচনার একটি তালিকা দেওয়া হল।

অবশ্য এই তালিকাতে প্রদত্ত কিছু প্রবন্ধের নাম রাজনৈতিক চিন্তামূলক প্রবন্ধ তালিকায় উল্লেখ করা হয়েছে, কারণ ঐগুলিতে রাজনৈতিক-চিন্তা ও সমাজ-চিন্তা যেন বেণীবন্ধনে বদ্ধ।

বঙ্কিমরচনা (অধিকাংশই 'যুদ্ধ-পর্বে' লিখিত)

প্রবন্ধের নাম	গ্রন্থ / পত্রিকা	প্রকাশকাল
১. বাবু, দাম্পত্য দণ্ডবিধির আইন, ইত্যাদি	লোকরহস্য / বঙ্গদর্শন	১৮৭২ খ্রীঃ
২. একা, মনুষ্য ফল, বড় বাজার; বিড়াল, ঢেঁকি	কমলাকান্তের দপ্তর/বঙ্গদর্শন	১২৮০-৮২
৩. মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত	বঙ্গদর্শন	আশ্বিন ১২৮৭
৪. আর্যজাতির সূক্ষ্ম শিল্প	বিবিধ প্রবন্ধ / বঙ্গদর্শন	
ক. অনুকরণ		১৮৭৬ খ্রীঃ
খ. বাঙ্গালির বাহুবল		১৮৭৯ খ্রীঃ

প্রবন্ধের নাম	গ্রন্থ / পত্রিকা	প্রকাশকাল
গ. প্রাচীনা এবং নবীনা	বিবিধ প্রবন্ধ / বঙ্গদর্শন	
ঘ. বঙ্গদেশের কৃষক		
(১ম থেকে ৩য়)		জ্যৈষ্ঠ, ১২৮০
ঙ. বহুবিবাহ		
চ. বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার		
(১ম ও ২য়)		১২৮০ ও ১২৮২
ছ. বাঙ্গালীর উৎপত্তি		
(১ম থেকে ৭ম প্রস্তাব)		পৌষ, ১২৮৭ থেকে জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৮
জ. বাহুবল ও বাক্যবল		জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৪
ঝ. রামধন পোদ		ভাদ্র, ১২৮৮
৫. সাম্য	বঙ্গদর্শন	১২৮০-৮২
৬. ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞানসভা	”	ভাদ্র, ১২৭৯
৭. জন স্টুয়ার্ট মিল	”	শ্রাবণ, ১২৮০

রবীন্দ্ররচনা :

ভারতী' পর্ব

প্রবন্ধের নাম	প্রকাশকাল
১. অচলিত	
(ক) বঙ্গে সমাজ বিপ্লব	মাঘ, ১২৮৪
(খ) বাঙ্গালীর আশা ও নৈরাশ্য	”
(গ) ইংরাজের আদবকায়দা	জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৫
(ঘ) পারিবারিক দাসত্ব	১২৮৭
২. নিমন্ত্রণ সভা	১২৮৮
৩. একচোখো সংস্কার	”
৪. গোলামচোর	”
৫. সমস্যা	
৬. একটি পুরাতন কথা	
৭. অনাবশ্যক	১২৯০
৮. দামু ও চামু	১২৯২

প্রবন্ধের নাম	গ্রন্থ / পত্রিকা	প্রকাশকাল
৯. আর্য ও অনার্য		১২৯২
১০. হিন্দু বিবাহ (সমাজ) ১৮৮৭		আশ্বিন, ১২৯৪

'সাধনা'পর্ব

১. আহার সম্বন্ধে চন্দ্রনাথবাবুর মত	সমাজ / সাধনা	মাঘ, ১২৯৮
২. কর্মের উমেদার	ঐ / ঐ	„
৩. স্ত্রী মজুর	ঐ / ঐ	—
৪. আদিম আর্য-নিবাস	ঐ / ঐ	১২৯৯
৫. আদিম সম্বল	ঐ / ঐ	„
৬. আচারের অত্যাচার	ঐ / ঐ	„
৭. সমুদ্রযাত্রা	ঐ / ঐ	„
৮. শোকসভা	ঐ / ঐ	১৩০১
৯. মুখুজ্জে বনাম বাড়ুজ্জে	সমূহ / ভারতী	১৩০৫
১০. অপর পক্ষের কথা	ঐ / ঐ	„
১১. আলট্রা-কন্‌সারভেটিভ	ঐ / ঐ	„
১২. হিন্দুর ঐক্য	সমাজ	„

'বঙ্গদর্শন' পর্ব

প্রবন্ধের নাম	গ্রন্থ	প্রকাশকাল
১. নকলের নাকাল	সমাজ	জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৮
২. আলোচনা— নকলের নাকাল সম্বন্ধে	ঐ	আষাঢ়, ১৩০৮
৩. বারোয়ারি মঙ্গল	ভারতবর্ষ ও স্বদেশ	চৈত্র, ১৩০৮
৪. নববর্ষ	ঐ	বৈশাখ, ১৩০৯
৫. ব্রাহ্মণ	ঐ	আষাঢ়, ১৩০৯
৬. চীনেম্যানের চিঠি	ঐ	„
৭. সমাজভেদ	ঐ (পরিশিষ্ট)	১৩০৮
৮. ভারতবর্ষীয় সমাজ	আত্মশক্তি ও সমূহ	শ্রাবণ, ১৩০৮
৯. চিঠিপত্র (নবীন ও প্রাচীনের পত্রালাপ)		

	প্রবন্ধের নাম	গ্রন্থ	প্রকাশকাল
১০.	ভারতবর্ষীয় বিবাহ	সমাজ	১৩৩২
১১.	নারীর মনুষ্যত্ব	ঐ	১৫ই বৈশাখ, ১৩৩৫
১২.	বিলাসের ফাঁস	ঐ	১৩১২
১৩.	অযোগ্য ভক্তি	ঐ	১৩১৫
১৪.	পূর্ব ও পশ্চিম	ঐ	১৩১৫
১৫.	কোট বা চাপকান	ঐ	১৩০৫
১৬.	রমাবাইয়ের বক্তৃতা উপলক্ষে	ঐ	জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৩
১৭.	মুসলমান মহিলা		
১৮.	প্রাচ্য সমাজ		
১৯.	কর্তব্যনীতি		
২০.	বিদেশীয় অতিথি এবং দেশীয় আতিথ্য		
২১.	ব্যাধি ও প্রতিকার	ঐ	১৩০৮
২২.	স্মৃতিরক্ষা	ঐ	১৩১২
২৩.	আত্মপরিচয়	পরিচয়	১৩১৯
২৪.	হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়	ঐ	১৩১৮
২৫.	ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা	ঐ	১৩১৮

‘কালান্তর’ পর্ব

	প্রবন্ধের নাম	প্রকাশকাল
১.	কর্তার ইচ্ছায় কর্ম	ভাদ্র, ১৩২৪
২.	বৃহত্তর ভারত	শ্রাবণ, ১৩৩৪
৩.	হিন্দু-মুসলমান	শ্রাবণ, ১৩৩৮
৪.	কালান্তর	শ্রাবণ, ১৩৩৮
৫.	রায়তের কথা	আশ্বিন, ১৩৩২
৬.	**‘সমবায় নীতি’ গ্রন্থ** (১৯১৮-১৯২৮ খ্রীঃ)	
ক.	সমবায় ১	শ্রাবণ, ১৩২৫
খ.	সমবায় ২	ফাল্গুন, ১৩২৯
গ.	ভারতবর্ষে সমবায়ের বিশিষ্টতা	শ্রাবণ, ১৩৩৪
ঘ.	সমবায় নীতি	১৩৩৫

৭. 'পল্লীপ্রকৃতি' গ্রন্থ (১৯১৫-১৯৪০ খ্রীঃ)

প্রবন্ধের নাম	প্রকাশকাল
ক. কর্মযজ্ঞ	ফাল্গুন, ১৩২১
খ. পল্লীর উন্নতি	বৈশাখ, ১৩২২
গ. ভূমিলক্ষ্মী	আশ্বিন, ১৩২৫
ঘ. শ্রীনিকেতন	জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪
ঙ. পল্লীসেবা	ফাল্গুন, ১৩৩৭
চ. গ্রামবাসীদের প্রতি	চৈত্র, ১৩৩৭
ছ. দেশের কাজ	৬।২।১৯৩২
জ. পল্লীপ্রকৃতি	৬।২।১৯৩৭
ঝ. উপেক্ষিত পল্লী	১৩৪০
ঞ. অরণ্যদেবতা	১৭ই ভাদ্র, ১৩৪৫
ট. অভিভাষণ	২২শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪৫
ঠ. শ্রীনিকেতনের ইতিহাস ও আদর্শ	১৩৪৬
ড. হলকর্ষণ	১২ই ভাদ্র, ১৩৪৬
ঢ. পল্লীসেবা	৬।২।১৯৪০
ণ. অভিভাষণ	
ত. সমবায়ে ম্যালেরিয়া নিবারণ	২৯।৯।১৯২৩
থ. ম্যালেরিয়া	২৩।২।১৯২৪
দ. প্রতিভাষণ	১৯২৬
ধ. বাঙালির কাপড়ের কারখানা ও হাতের তাঁত	আশ্বিন, ১৩৩৮
ন. জলোৎসর্গ	৭ই ভাদ্র, ১৩৪৩
প. সম্ভাষণ	৩০শে ফাল্গুন, ১৩৪৩
ফ. অভিভাষণ	১৮ই ফাল্গুন, ১৩৪৬
ব. পত্রাবলী	১৫ই নভেম্বর ১৯৩৪

এছাড়া রবীন্দ্রনাথ রচিত যে কোন ভ্রমণকাহিনী অথবা ডায়ারীর অংশ, যথা, 'য়ুরোপ-যাত্রীর পত্র', 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারী', 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারী' ও 'রাশিয়ার চিঠি' এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

প্রদত্ত তালিকা দুটিতে উল্লিখিত প্রবন্ধাবলীকে বিষয়বৈচিত্র্য অনুসারে শ্রেণীবিন্যস্ত না করে রচনার উদ্দেশ্য ও প্রকাশের মনোভঙ্গি অনুসারে সাজিয়ে তিনটি ধারাতে আলোচনা করা যায়—

১. মৃদুব্যঙ্গচ্ছলে অথবা উষ্মাবিহীন বিশ্লেষণে সমাজের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন, যথা—'বাবু' কিংবা 'আচারের অত্যাচার'। ২. ইতিহাসচেতনার আশ্রয়ে হিন্দু সমাজ অথবা বাঙালি সমাজের কলঙ্ক অপনোদন, অতীত গৌরবখ্যাপন কিংবা অতীতের সঙ্গে তুলনা করে বর্তমানের ক্ষয়িষ্ণুতা নিরূপণ ও আদর্শীকরণ। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'বাঙ্গালীর উৎপত্তি' কিংবা 'ভারতবর্ষীয় বিবাহ' জাতীয় নিবন্ধ উল্লেখ্য। ৩. সমাজের দোষত্রুটির তীব্র সমালোচনা, আত্মসমীক্ষা এবং সেইসূত্রে সংগঠনমূলক নির্দেশদান। উদাহরণস্বরূপ 'বাহুবল ও 'বাক্যবল', 'সাম্য' অথবা 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' ও 'সমবায় নীতি'—জাতীয় নিবন্ধ উল্লেখ্য।

এক.

মৃদু রহস্য-ব্যঙ্গচ্ছলে তৎকালীন 'anglicised'—বাঙালিসমাজের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে বঙ্কিম সর্বপ্রথম 'লোকরহস্য'-এর আশ্রয় গ্রহণ করেন। রাজনৈতিক চিন্তার আলোচনায় এ বিষয়টি প্রসঙ্গসূত্রে এসেছে এবং তখনই লক্ষ্য করা গেছে, বঙ্কিমের স্বদেশচিন্তার অন্যতম প্রধান ইচ্ছা ছিল বাঙালিসমাজকে 'dis-anglicise' করা। বাঙালিবাবু "দশ অবতারে দেশ সমাজ উদ্ধারে আবির্ভূত"—এ উক্তিতে রহস্যের সঙ্গেই সমাজচিত্রের উদ্‌ঘাটন আছে। কিংবা, 'যিনি নিজগৃহে জল খান, বন্ধুগৃহে মদ খান, বেশ্যাগৃহে গালি খান, এবং মুনিব সাহেবের গৃহে গলাধাক্কা খান তিনিই বাবু।"—এই মন্তব্যে তৎকালীন ইংরেজিশিক্ষিত সমাজের একটি বৃহদংশের সত্যচিত্র ফুটে উঠেছে। এই সামাজিক চিত্র উদ্‌ঘাটনে বঙ্কিম পূর্ববর্তীদের ধারাটিই বজায় রেখেছিলেন তাঁর নানা রচনায়। এই ক্লীবত্বপ্রাপ্ত, স্ত্রৈণ, দ্বৈভাষিকী সমাজের নিরীহ জীবগুলির সংজ্ঞা 'অনৃতসুন্দরী দেবী-'র প্রস্তাবিত 'দাম্পত্য দণ্ডবিধির-আইন'-এ নির্ধারিত হয়েছে এইভাবে—"গোরু বাছুরও স্বামী নহে, কেন না, যদিও গোরু বাছুর সচল বটে কিন্তু তাহাদের একটু স্বেচ্ছামতে কার্য্য করিবার ক্ষমতা আছে।" অর্থাৎ গোরু বাছুরের চেয়েও পরাধীন সচল অস্থাবর সম্পত্তিস্বরূপ এই স্বামীগুলি ইঙ্গবঙ্গীয় সমাজের শিরোভূষণ। এমনি মৃদু ব্যঙ্গ-চিত্রণ রবীন্দ্রনাথের 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারী'-তে আছে,—"মস্ত একটা চশমা-পরা দাড়িওয়ালা গ্রাজুয়েট পুঙ্গব এবং তারই দাড়িটা ধরে ছোটো একটি বারো-তেরো বৎসরের নোলক-পরা নববধূ, জন্তুটি

দিব্যি পোষ মেনে চড়ে বেড়াচ্ছে।" বাংলাদেশের স্ত্রী-পুরুষ অথবা স্বামী-স্ত্রীর এই সম্পর্ক নিয়ে ব্যঙ্গচ্ছলে বঙ্কিম কয়েকটি চিত্র উদ্‌ঘাটিত করেছেন 'দাম্পত্য দণ্ডবিধির আইন', 'বাংলা সাহিত্যের আদর', 'Newyear's Day'— প্রভৃতি রহস্য-সন্দর্ভগুলিতে। আর রবীন্দ্রনাথের ঐ জাতীয় উদ্‌ঘাটন আছে 'গোলাম-চোর' প্রবন্ধে কিংবা 'মানসী' পত্রিকায় 'নববঙ্গদম্পতির প্রেমালাপ' ইত্যাদি নানা রচনায় নানা প্রসঙ্গসূত্রে। তবে হিন্দুবিবাহ এবং স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক নিয়ে রবীন্দ্রনাথের কঠিন শ্লেষ আছে 'হিন্দুবিবাহ'—শীর্ষক সুদীর্ঘ নিবন্ধে, যেখানে চন্দ্রনাথবাবুর হিন্দু বিবাহরীতির জন্য গর্ববোধের প্রতিবাদে বলা হয়েছে,—"চব্বিশে এবং আটে বিবাহ হইলে হাড়ে হাড়ে কঠিন এবং গুরুতর মিশ্রণ হইতেও পারে কিন্তু সে মিশ্রণ সত্বর বিশিষ্ট হইতে আটক নাই।"……

বাল্যবিবাহের পবিত্রতা এবং সামাজিক মহত্ত্বলাভের প্রাচীন আদর্শকে নির্মম শ্লেষ করতে রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী' পর্বের রচনাতে দ্বিধাবোধ করেন নি। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃদু ব্যঙ্গে তিক্ততা ছিল না এসম্পর্কে। সভ্য বাঙালির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক বিসদৃশ, শিক্ষিত-অশিক্ষিতে ব্যবধান ঐ অসঙ্গতিতে পরিদৃশ্যমান, কমলাকান্তের ব্যঙ্গহাস্যে এদের অবস্থা চিত্রিত হয়েছে—'মনুষ্যফল', 'ঢেঁকি', 'বসন্তের কোকিল' প্রভৃতি রস-সন্দর্ভগুলিতে। অতি পরিচিত এই সন্দর্ভগুলি হতে বিস্তৃত উদ্ধৃতি দেওয়ার প্রয়োজন নেই। কেবল দু-একটি টুকরো কথা মনে করে নিলেই চলবে—"দেশী হাকিমেরা…পৃথিবীর কুষ্মাণ্ড", "বাঙ্গালিবাবু…উমেদওয়ার রূপে…ডাঁশমাছির মতো…দিনে রাত্রে…মধ্যাহ্নে সায়াহ্নে ঘ্যান ঘ্যান ঘ্যান", অথবা "বাবু ঢেঁকি বোতল গড়ে পিতৃধন"—পেষেন ইত্যাদি। কমলাকান্তের ব্যঙ্গ বর্ষিত হয়েছে বাঙালি বাবুদের প্রতি, যারা রাজ-অনুগ্রহপ্রাপ্ত হাকিম, অথবা যারা দরখাস্তধারী উমেদওয়ার অথবা ঘরের ঢেঁকি কুমীর—অশিক্ষিত সমাজ অথবা জনসাধারণের সঙ্গে যাদের ব্যবধান ক্রমবর্ধমান। অনুরূপভাবে রবীন্দ্র-কটাক্ষ বর্ষিত হয়েছে গভর্নমেণ্ট খেতাবধারী অভিজাতদের প্রতি কিংবা দেশী হাকিমদের প্রতি "ইহারা কুষ্মাণ্ডলতার ন্যায় একমাত্র গভর্ণমেণ্টের আশ্রয়-যষ্টি বাহিয়া উন্নতির পথে চড়িতে চাহেন।"

বঙ্কিমচন্দ্র দ্বারা আখ্যাত দেশী শিমুলফুলদেরও রবীন্দ্রনাথ ছাড়েন নি, জমিদারদের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনায় জননায়কদের চরিত্রের ত্রুটির প্রতি কটাক্ষ করেছেন—

ইংরাজের কৈশিকাকর্ষণ আমাদের দুই পক্ষেরই মস্তকের উপরে। ইংরাজকে বাদ দিলে আমাদের কর্তব্যে স্বাদ থাকে না, সম্মানে গৌরব থাকে

না, ...বেশভূষায় মর্যাদা থাকে না,......ইত্যাদি। —'অপরপক্ষের কথা'

বেশভূষার মর্যাদার প্রতি বঙ্কিমী-কটাক্ষও আমরা লক্ষ্য করেছি, "ইহারা সম্প্রতি মাত্র বস্ত্র পরিতে আরম্ভ করিয়াছে, কি প্রকারে বস্ত্র পরিধান করিতে হয় তাহা এখনও ঠিক করিয়া উঠিতে পারে নাই। কেউ প্যাণ্টলুন, কেউ পাজামা, কেউ বা বস্ত্রখণ্ড পরেন" (কোনস্পেশিয়ালের পত্র)। কিংবা "এরূপ পরানুকৃতবেশ গমন চাহনি অন্য কোন দেশে অসম্ভব" (হুমুমদাবুসংবাদ)। ইঙ্গ-বঙ্গীয় সমাজের বিজাতীয় বেশভূষার প্রতি রবীন্দ্রনাথের ব্যঙ্গ 'সাধনা'যুগে আরও বেশি, যথা—

১. "একাসনে গাড়ির দক্ষিণভাগে হ্যাট-কোট বামভাগে বোম্বাই শাড়ি।"
—'কোট বা চাপকান'

২. "কোট পরা কায় সঁপেছেন হায় শুধু স্বজাতির জন্য" (উন্নতির লক্ষণ, 'মানসী') অর্থাৎ এদের "বাঙ্গালি মুখের ছন্দ" থাকলেও "ধরণে ধারণে অতি অকারণে ইংরাজিতরো গন্ধ" এই নাকালের মূলে (নকলের নাকাল)। 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' হতে এমনি অজস্র উদ্ধৃত করা যায়, "ইংরাজ ও আঙ্গলো ইনডিয়ান যেমন দুই স্বতন্ত্র জাত, বাঙ্গালি ও ইঙ্গবঙ্গ দুই স্বতন্ত্র জীব।" অথবা "বাঙ্গালি সাহেব হয়ে উঠলে তিনি সাহেবের ঠাকুরদাদা হয়ে ওঠেন।" এই রচনাকে কেবলমাত্র অতিশয়োক্তি বলা চলে না, পরবর্তীকালে লেখক নিজেই বলেছিলেন, "আজ এরা লুপ্ত জীব।...সেকালের ইঙ্গবঙ্গদের অনেককে আমি প্রত্যক্ষ জানতুম।...অত্যুক্তি যদি থাকে, সে তাঁদেরই স্বকৃত।" (২৯.৮.১৯৩৬)

মোটকথা এইকালে রবীন্দ্রনাথের লেখায় স্বদেশের ঐতিহ্যের প্রতি মমতা আছে যথেষ্ট অথচ কুসংস্কার ও লোকাচারকে নির্বিচারে রক্ষা করার অন্ধতা নেই বিন্দুমাত্রও।

> অমুকের কন্যা গ্রহণ করিব না, এমন করিয়া উঠিব, অমন করিয়া বসিব, তেমন করিয়া চলিব, তিথিনক্ষত্র, দিন, ক্ষণ, লগ্ন বিচার করিয়া হাত-পা নাড়িব, এমন করিয়া কর্মহীন ক্ষুদ্র জীবনটাকে টুকরা টুকরা করিয়া কাহনকে কড়া-কড়িতে ভাঙ্গিয়া স্তূপাকার করিয়া তুলিব, এই কি আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য। হিন্দুর দেবতা এই কি তোমার বিধান যে আমরা কেবলমাত্র হিঁদু হইব, মানুষ হইব না। —'আচারের অত্যাচার'

'হিঁদু হইব মানুষ হইব না'—এই নির্মম শ্লেষ একদিন রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের মর্মে প্রচণ্ড ঘা দিয়েছিল। শিক্ষার উদ্দেশ্যেও সমুদ্রযাত্রা পাপ এমনি কুসংস্কার তৎকালে বাংলাদেশের সমাজকর্তাদের মনে ধর্মবিশ্বাসস্বরূপ ছিল। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য প্রকাশিত হল—

আমাদের সমাজে কোন প্রকার স্বাধীনতার কোন অবসর নাই, আমরা নিশ্চেষ্ট, নিশ্চল, অন্ধভাবে সমাজের অন্ধকূপে এক অবস্থায় পড়িয়া থাকিব, লোকাচারের এই বিধান। —'সমুদ্র যাত্রা'

উক্ত মন্তব্যে মৃদু ব্যঙ্গের সুর আর তেমন নেই, চিন্তাশীল বিশ্লেষণের সূচনা আছে। এদিকে ঠিক এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমের সুস্পষ্ট নির্দেশ প্রকাশিত হল কুমার বিনয়কৃষ্ণ দেবকে লেখা একটি পত্রে, "যাহা লোকহিতকর তাহাই ধর্ম···সমুদ্রযাত্রা লোকহিতকর বলিয়া ধর্মানুমোদিত।" (২৭শে জুলাই, ১৮৯২, কলিকাতা)

বঙ্কিমচন্দ্রের নির্দেশ, কোন কর্ম হিন্দু ধর্মানুমোদিত হলে অনুষ্ঠেয়, লোকাচার বা শাস্ত্রবিধি যদি তার বিরুদ্ধে, তবে লোকাচার কিংবা শাস্ত্রই পরিত্যাজ্য, কর্মটি নয়। অর্থাৎ সমাজচিন্তাকে লোকহিতকর হিন্দুধর্মের সুদৃঢ়ভিত্তির উপর স্থাপনের পক্ষপাতী ছিলেন বঙ্কিম। আর এদিকে রবীন্দ্রনাথ সমাজচিন্তাকে স্বাধীন চিন্তার উপর প্রতিষ্ঠা করতে চান। তাই ঠিক এই কালের রবীন্দ্রনাথের মনোভঙ্গি আরও কঠোর হয়ে উঠেছে অন্ধ লোকাচারের বিরুদ্ধে, "আমাদের দেশে সমাজনীতি ক্রমে সুদৃঢ় কঠিন হইয়াছে কিন্তু ধর্মনীতি শিথিল হইয়া আসিয়াছে।" ('আচারের অত্যাচার') অথবা "ভয়ে হিন্দুসমাজ কোথাও কোনো ছিদ্র রাখিতে চাহে না।" ('সমুদ্রযাত্রা')। বস্তুতঃ "জীবনহারা অচল অসার" সমাজের জীর্ণ লোকাচারে বদ্ধ ব্যক্তিত্ব এবং ব্যক্তি ও সমাজের এবম্বিধ সম্পর্কের স্বরূপ উদ্ঘাটনে দুই মনীষীর লেখনীতেই মৃদু ব্যঙ্গ এবং অন্তর্লীন যুক্তিশীলতা কার্যকরী হয়ে উঠেছে। বঙ্কিমের পরামর্শ ছিল, লোকহিতকর পরিবর্তন স্মৃতি-শাস্ত্রবিরুদ্ধ হলেও গ্রহণ যোগ্য, "হিন্দু ধর্ম অতিশয় উদার" এই আস্থা এক্ষেত্রে দৃঢ়। রবীন্দ্রনাথও ধর্মনীতির পক্ষপাতী, তবে স্বাধীন চিন্তার ফলশ্রুতি যে ধর্মনীতি সেই ধর্মনীতি,— সনাতন হিন্দুধর্ম তা নাও হতে পারে। মোটকথা মৃদু ব্যঙ্গের মাধ্যমে প্রাচীন ও অর্বাচীনের সম্পর্ক উদ্ঘাটন করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ দুজনেই। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে এ-কাজ প্রাক্-বঙ্কিম যুগেই সুরু হয়েছিল। 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ' 'অধঃপতন সঙ্গীত'-এ তারই রেশ ছিল। এই অধঃপতিত বাঙালির প্রতি ব্যঙ্গ আর একটু কড়া হয়েছে 'প্রাচীনা এবং নবীনা' রচনায়। "আমাদিগের সমাজ সংস্কারকেরা নূতন কীর্তি স্থাপনে যাদৃশ ব্যগ্র, সমাজের গতি পর্যবেক্ষণায় তাদৃশ মনোযোগী নহেন।"—বঙ্কিমচন্দ্র তৎকালীন সমাজের গতি পর্যবেক্ষণ করেছেন সূক্ষ্মদৃষ্টিতে,—তা হল এই যে বাঙালি ইংরেজিশিক্ষার—

দুই একটি ফল সুপক্ক এবং সুমধুর বটে কিন্তু অধিকাংশ তিক্ত ও বিষময়, উদাহরণ মাতালের দল এবং সাধারণ বাঙ্গালি লেখকের পাল। আবার

দিনকতক ধূম পড়িল, স্ত্রীলোকদিগের অবস্থার সংস্কার কর।...... কিন্তু পাঁচী যদি কখনও বিলাতি মেম হইতে পারে তবে আমাদিগের শালতরুও একদিন ওকবৃক্ষে পরিণত হইবে।

বলাবাহুল্য পাঁচী রামী বিলাতী মেম না হলেও তাদের রুচি যে উৎকৃষ্টতর হয়েছে একথা স্বীকার করা হয়েছে। অনুরূপ রবীন্দ্রমন্তব্য হাস্যমণ্ডিত হয়ে আছে 'সমালোচনা' গ্রন্থের "সমস্যা" প্রবন্ধে।

আমাদের সমাজ যদি গাছপাকা হইয়া উঠিত তবে আর ভাবনা থাকিত না, তাহা হইলে আঁটিতে খোসাতে এত মনান্তর, মতান্তর, অবস্থান্তর থাকিত না। কিন্তু হিন্দুসমাজের শাখা হইতে পাড়িয়া বঙ্গসমাজকে বলপূর্বক পাকানো হইতেছে।

ওদিকে এই একই প্রসঙ্গে কয়েকটি পত্রাঘাতে 'চণ্ডিকাসুন্দরী দেবী', 'লক্ষ্মীমণি দেবী, 'রসময়ী দাসী'র বেনামীতে বঙ্কিমচন্দ্র প্রাচীন ও নবীনের প্রভেদ নির্ণয় করছেন, অবশ্য মিঠে রসিকতায়—

শুন প্রাচীনে নবীনে প্রভেদ কি, বলি। প্রাচীনেরা পরোপকারী ছিলেন, তোমরা আত্মোপকারী।...সত্য বটে তাঁহারা পৌত্তলিক ছিলেন, কিন্তু তোমরা বোতলিক।......ইংরেজ বাহাদুর নাকে দড়ি দিয়া তোমাদের ঘানিগাছে ঘুরায়, বল নাই বলিয়া ঘোর। আর আমরাও নাকে দড়ি দিয়া ঘুরাই, বুদ্ধি নাই বলিয়া ঘোর। —শ্রীচণ্ডিকাসুন্দরী দেবী।

অতঃপর সবচেয়ে কড়া কথা আছে 'শ্রীরসময়ী দাসীর' পত্রশেষে—

তোমরা অন্তঃপুরে এস, আমরা আফিসে যাই। যাহারা সাতশত বৎসর পরের জুতা মাথায় বহিতেছে তাহারা আবার পুরুষ! বলিতে লজ্জা করে না?

এখানে 'চণ্ডিকাসুন্দরী'-র চণ্ডরূপটি নেই, 'রসময়ী'র শ্লেষও রসবটিকার মতই মিঠেকড়া, কিন্তু বড়োসাহেবের "পাদুকামণ্ডিত শির" বাঙালিবাবুদের প্রতি তীক্ষ্ণতম শ্লেষ বর্ষিত হয়েছে 'মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত'-এ। সেখানে বঙ্কিমের হাতে যেন চাবুক শনশনিয়ে উঠেছে এবং তা ইংরেজপদলেহী 'মুচিরাম'-দের পিঠে কেটে কেটে বসেছে—

এ সুসভ্য জগতের অধিকারীরা মুচিরাম দেখিলে বাঁকপেটাই করিয়া থাকে—মুচিরামেরা পিঠ পাতিয়া দেয়।...ঘাস জলের প্রয়োজন হইলেই তোমাদের যখন রাখাল ভিন্ন গতি নাই, তখন পাঁচনবাড়িকে প্রাতঃপ্রণাম করিয়া গোজন্ম সার্থক কর।

এই ঘাস জলের জন্যই কালেক্টরীর চাকরীর জন্য উমেদওয়ার মুচিরামের

দল, "এক ফোঁটা গুড় পড়িলে যেমন সহস্র সহস্র পিপীলিকা তাহা বেষ্টন করে" তেমনি করেই এরা "হোম সাহেব"-কে বেষ্টন করে। ইতিপূর্বেই উমেদওয়ার পিপীলিকার চিত্র 'কমলাকান্তী' তুলিতেও অঙ্কিত হয়েছিল। "উহারা পিপীলিকার ন্যায় ক্ষুদ্র বটে, দেখিতেও প্রায় পিপীলিকা কিন্তু উহারা পিপীলিকা নয়। উহাদিগকে বঙ্গজ বলে।" ('কাকাতুয়া')—ঐ পিপীলিকারূপী বঙ্গজ দল মাথা নেড়ে সেলাম করছে—আর সেলাম জলে ফেলে ঠাণ্ডা করে খোসামোদ বরফ দিয়েই ত উমেদওয়ারী করতে হয়,[১] কেবল চাকরি নয় রায় বাহাদুর, রাজবাহাদুর খেতাব পেতেও চাই সেলাম, তা "কেহ শুধু সেলামে দেড় মণ লইয়া যাইতেছে"—যশের ময়রাপটি হতে[২]। আর বাঙালি হয়ে কে ঘ্যান-ঘ্যানানি ছাড়া, বাঙালির মনুষ্যত্ব পরিমাপ করে কমলাকান্ত যে সখেদ উক্তি করেছে[৩]—মুচিরাম তারই প্রকৃত দৃষ্টান্ত। মুচিরাম গুড় অবশেষে রাজা বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত হয়েছে ঐ সেলাম বাজিয়েই, অতএব "পাঠক একবারহরি হরি বল।"

অনৃতসুন্দরী দেবীর চিঠিতে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরানোর যে কথা আছে, সেকথা মুচিরামের দলের প্রতি প্রযোজ্য। বঙ্কিমচন্দ্র এদের উপদেশ দিয়েছেন, "এবার যখন বাঁক উঠিতে দেখিবে তখন পিঠ পাতিয়া দিও।" আর রবীন্দ্রনাথ এদের জন্য "জুতাব্যবস্থা"-ই উৎকৃষ্ট ও সহজপাচ্য বলেছেন। মৃদু ব্যঙ্গ নয় তীব্র শ্লেষের মাধ্যমে বলা হয়েছে—"এতদিন হইতে আমরা জুতাহজম করিয়া আসিতেছি যে আজ উহা আমাদের নিকট গুরুপাক বলিয়া ঠেকিতেছে না।"—'জুতাব্যবস্থা' (১২৮৮)। বঙ্কিমচন্দ্র 'রসময়ী দাসী'-র জবানীতে যা বলেছেন, "যাহারা সাতশত বৎসর পরের জুতা মাথায় বহিতেছে তাহারা আবার পুরুষ"—সেই রসিকতাই 'জুতাব্যবস্থা'য় তিক্ততম হয়ে উঠেছে। প্রাচীন ও ও নবীনের তুলনাকালে বঙ্গপুঙ্গবদের প্রতি বর্ষিত সবগুলি কটাক্ষই মর্মান্তিকরূপে সত্য হয়ে উঠেছে। মোটকথা আমরা লক্ষ্য করছি বঙ্কিম-রচনায় প্রাচীন ও নবীনের তুলনাতে দোষের ভাগটিই নবীনের দিকের পাল্লাটিকে ভারী করেছে। কিন্তু এবার লক্ষ্য করব প্রাচীন ও অর্বাচীনের বক্তব্যের তুলনায় গুণের ভাগটাই ভারী করেছে অর্বাচীন নবীনকিশোরের পাল্লাটিকে। রবীন্দ্রনাথও বেনামী পত্রগুচ্ছের সহায়তায় এই প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেছেন, যাতে নবীনকিশোরের নব্যতান্ত্রিকতাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রাচীন দাদামহাশয় "ষষ্ঠীচরণ দেবশর্মণ"। আবার নবীনকিশোরও আত্মবিশ্লেষণ করেছে নির্দ্বিধায়—"আমরা না পড়িয়া পাণ্ডিত, আমরা না লড়িয়া বীর, আমরা ধাঁ করিয়া সভ্য, আমরা ফাঁকি

দিয়া পেট্রিয়ট…।" এদিকে পিতামহ ষষ্ঠীচরণের আত্মবিশ্লেষণও খাঁটি, —"আমরা এগোইব না, অনুসরণ করিব, কাজ করিব না পরামর্শ দিব…" অন্যত্র, "আমার কি ভাই সাধ যে কতকগুলো ধোঁওয়া দিয়া তোমাদের কাঁচা-মাথা একদিনে পাকাইয়া তুলি।" এই সঙ্গে সস্নেহ উপদেশও আছে,—"তোমরা নিঃসংশয়ে কাজ করো নির্ভয়ে অগ্রসর হও।…যে স্রোতে পড়িয়াছ এই স্রোতকেই অবলম্বন করিয়া উন্নতিতীর্থের দিকে ধাবমান হও…।" সত্যিই পিতামহের বিশ্লেষণে রক্ষণশীলতার মোহ অন্তত নেই। আমাদের সমাজে যে গ্রহণ ও বর্জনের প্রাণশক্তি একবারে লুপ্ত হয়ে গেছে সেকথা রবীন্দ্রনাথ অন্যত্রও বলেছেন ধীর বিশ্লেষণে, "আমরা যেন ডিম্ব হইতে ডিম্বান্তরে জন্মগ্রহণ করি। একজন মহাপুরুষ যে প্রাচীন প্রথার খোলা ভাঙ্গিয়া যে নূতন সংস্কার আনয়ন করেন, তাহাই…শক্ত হইয়া উঠিয়া আমাদিগকে রুদ্ধ করে।" ('প্রাচ্য সমাজ')। এ সম্পর্কে তীব্রতম কটাক্ষও আছে অন্যত্র, "দুর্ভাগা অক্ষম ভারতবর্ষ ব্রাহ্মণ্যহীন ব্রাহ্মণের গরুটি হইয়া তাঁহারই ঘানিগাছের চতুর্দিকে নিয়ত প্রদক্ষিণ করিয়া পবিত্র চরণতলের তৈল যোগাইতে লাগিল।" ('আহার সম্বন্ধে চন্দ্রনাথবাবুর মত')। তৎকালে হিন্দু সমাজের পবিত্র নীতির সপক্ষে এক প্রকার সদম্ভ ওকালতি চলছিল 'প্রচার' পত্রিকায়, এমন কি বঙ্কিমের পৃষ্ঠ-পোষকতায় হিন্দু উন্নাসিকতা ও আর্যামির বড়াই কিছু ফেঁপে উঠেছিল। ঠিক এই ক্ষেত্রেই পূর্বসূরী ও উত্তরসূরীর মসীযুদ্ধ সুরু হয়েছিল,—সে প্রসঙ্গ ধর্মচিন্তায় আলোচিত হবে। আপাতত এইটুকু স্মরণ করা যায়, নব্য-হিন্দুয়ানীর দাম্ভিকতাকে তীব্র কটাক্ষ করতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা ছিল না রবীন্দ্রনাথের—

> মনুষ্যের সকল প্রকার স্বাধীনতা অপহরণ করিয়া আমাদের সমাজের যে কী আশ্চর্য শৃঙ্খলা দাঁড়াইয়াছে এই কথা লইয়া যাঁহারা গৌরব করেন তাঁহারা প্রকৃত মনুষ্যত্বের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন। —'আদিম সম্বল'

কিংবা—যদি "বরাবর পবিত্র আর্যশিক্ষাই জয়ী হয় তবে আমাদের প্রপৌত্রদিগের চাকরির জন্য বোধহয় আমাদের পৌত্রদিগকে অধিক ভাবিতে হইবে না",—কারণ সমাজের ঘানিতে চোখ বাঁধা বলদের মত ঘোরবার অভ্যাস আমাদের পুরুষানুক্রমে আয়ত্ত।

এই একটি ক্ষেত্রে বঙ্কিম-রবীন্দ্র মনোভঙ্গির পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। তবে একথাও ঠিক বঙ্কিম হিন্দু-ধর্মভিত্তিক সমাজকে সমর্থন জানিয়েছেন কিন্তু রক্ষণশীল গোঁড়ামির প্রশ্রয় দেন নি, অহিতকর লোকাচারের বিরুদ্ধে ত উষ্মাই প্রকাশ করেছেন,—

> বঙ্গসমাজ বন্ধনছিন্ন করিয়া সমাজ ভঙ্গ করা, বিচলিত বিপ্লুত করারই প্রয়োজন হইয়াছে, এই থইয়ে বন্ধনে বাঙ্গালির প্রাণ গেল। এ পচা গরুর দড়ি আর আমাদের গলায় রাখিও না।…নূতন সমাজ পত্তন হউক।
>
> —বঙ্গে দেবপূজা, প্রতিবাদ (১২৮১) ভ্রমর।

আসলে বঙ্কিম-মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত লেখকবৃন্দ—চন্দ্রনাথ বসু, অক্ষয়কুমার সরকার প্রমুখ আর্যসমাজের ঢক্কানিনাদে গগন বিদীর্ণ করেছিলেন, তার প্রতিবাদ করা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে স্বাভাবিকই,—কেবল ব্যঙ্গের মাধ্যমে নয়, সুচিন্তিত প্রবন্ধেও এর প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়েছে—

> আমরা পরাধীন জাতি। আমরা পরের কাছে অপমানিত, সুতরাং ঘরে সম্মানের প্রত্যাশী, এইজন্য আমরা ইংরেজকে বলিতে চাহি—তোমাদের শস্ত্র বড়ো, কিন্তু আমাদের শাস্ত্র বড়ো ; তোমরা রাজা কিন্তু আমরা আর্য,…এইরূপ ভান করিয়া অপমান দুঃখ ভুলিয়া থাকিতে চাই।
>
> —'হিন্দু বিবাহ'

ঠিক এই কারণেই শশধর তর্কচূড়ামণির দল রবীন্দ্রনাথের ব্যঙ্গ উপহাসের পাত্র হয়েছিলেন,—আর্য আচার সমাজ ব্যবস্থার ঢক্কানিনাদ তাঁর অসহ্য হয়ে উঠেছিল। বঙ্কিম এই উন্নাসিকতাকে সমর্থন করেন নি, তবে স্পষ্ট প্রতিবাদও করেন নি। বঙ্কিমের সুস্পষ্ট সমর্থন প্রগতিশীলতার প্রতি, তবে তা সনাতন হিন্দুধর্মের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত প্রগতিশীলতা। রবীন্দ্রনাথের তীব্র ব্যঙ্গ-কটাক্ষপূর্ণ কবিতা, নাটিকা, প্রহসন প্রথম যুগে কিঞ্চিৎ উত্তাপসঞ্চারী, কিন্তু পরবর্তীকালের যুক্তিমূলক প্রবন্ধে শ্লেষের তীব্রতা বা আবেগের উত্তাপ ছিল না—কিন্তু প্রতিবাদ সেখানে সংহত কঠিন এবং আরও বেশি সোচ্চার। 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' কিংবা 'কর্তার ভূত'—এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে কিন্তু কবির পরিণত বয়সের অভিজ্ঞা-পরিশ্রুত সমাজচিন্তার কথা উল্লেখের পূর্বে এই সময়ের (সাধনা পর্বের প্রথম দু'এক বৎসর, ১৮৯১-৯৩) একটি সুদীর্ঘ রচনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। উক্ত প্রবন্ধে বাঙালি হিন্দুসমাজ তথা ভারতীয় সমাজের সঙ্গে, য়ুরোপীয় সমাজের একটি তুলনামূলক আলোচনা আছে। এটি 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারী'-র ভূমিকা রূপে লিখিত হয় এবং পঠিত হয় 'চৈতন্য লাইব্রেরী' র একটি সভাতে। এখানে স্মিতহাস্য এবং মৃদুরহস্যমণ্ডিত ভাষাচিত্রে আমাদের স্থবির সমাজের অনড় প্রাচীনতা এবং নব্য বঙ্গীয়দের হাস্যকর বাড়াবাড়ি আর তারই পাশাপাশি য়ুরোপীয় সমাজের দোষগুণ উদ্ভাসিত হয়েছে। এই প্রবন্ধের স্মিতরসে পরিবেশিত উষ্মাবিহীন আলোচনা এবং একই কালে পাশ্চাত্য সমাজের সঙ্গে

প্রাচ্য সমাজের উপভোগ্য তুলনা চিন্তাউদ্রেককারী। লেখক বলেছেন যে, বেশ ছিল নিশ্চিন্ত ভারতীয় সমাজ, এমন সময়ে "পুরাতনের মধ্যে নূতন মিশিয়ে, বিশ্বাসের মধ্যে সংশয় এনে, সন্তোষের মধ্যে দুরাশার আবেগ উৎক্ষিপ্ত করে দিয়ে সমস্ত বিপর্যস্ত করে দিলে।" এই বৃদ্ধ চিন্তাতুর উদাসীন ভারতবর্ষের 'পূর্বদিক থেকে অতীতের এবং পশ্চিম দিক থেকে ভবিষ্যতের মরীচিকা এসে পড়েছে।' অথচ বর্তমানের এই নিশ্চেষ্ট ভারতবর্ষীয় সমাজই এককালের প্রবল বেগবান সভ্যতার উৎস ছিল। আর আজ আমরা আধ্যাত্মিক আর্যজাতি বলে জপতপ দলাদলি অস্পৃশ্যতা নিয়ে সার্থকতা লাভ করতে চাইছি। বর্তমানের ভারতীয় সভ্যতা যেন ঠিক পাথুরে কয়লার মত, "আগুন নেই কেবলই ফুঁ দিচ্ছি, কাগজ নেড়ে বাতাস করছি এবং কেউ-বা তার কপালে সিঁদুর মাখিয়ে সামনে বসে ভক্তিভরে ঘণ্টা নাড়ছি।"

এখানে আমরা লক্ষ্য করছি, নব্যহিন্দুত্ব ও আর্যামির উচ্ছ্বাসকে উষ্মাবিহীন ভাষায় সমালোচনা করতে রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট ধৈর্যের এবং নিরপেক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।* ওদিকে য়ুরোপীয় সভ্যতার বিলাস স্রোতের মাঝে অসুখী নারীদের প্রসঙ্গ আলোচনাতেও তাঁর দ্বিধা নেই, এদিকে এদেশের শিক্ষাদীক্ষাহীন নারীদের কথায় তাঁর মমতা উচ্ছ্বসিত। অর্থাৎ এদেশের-ওদেশের পরিবার ও সমাজের তুলনা করে, স্ব স্ব ত্রুটি নির্দেশ করে রবীন্দ্রনাথ একদিকে আমাদের সমাজকে যেমন ব্যক্তিত্ববিকাশের প্রতিকূল বলে মন্তব্য করলেন, তেমনি ওদেশের গতিশীল সভ্যতার জঙ্গমসমাজের জড়ত্বের তলে তলে যে মরুভূমির সৃষ্টি হচ্ছে, তার প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। নব্য হিন্দুত্ব ও আর্যামির আতিশয্য এবং অত্যাধুনিক ইঙ্গবঙ্গীয় মনোবৃত্তি উভয়ই তাঁর মতে একদেশদর্শী। অবশেষে রবীন্দ্রনাথ সংগঠন মূলক সমাজ-দৃষ্টি ভঙ্গিতে বললেন, ভারতীয় প্রকৃতির অসম্পূর্ণতা দূর হবে ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে—"আমরা যদি পুরা প্রমাণসই একটা মানুষের মতো হতে পারি তাহলেই যথেষ্ট।" রবীন্দ্রনাথের সমাজচেতনার এই দৃষ্টিভঙ্গি সারাজীবনই ছিল।

ভারতীয় সমাজের 'অচলায়তন'-এর চিত্র অঙ্কন করে অবশেষে 'প্রমাণসই মানুষ' হবার কামনা যুগযন্ত্রণা হতে উত্তরণের কামনা। এমনিতর কামনা অন্ততঃ দুটি দশক পূর্বে বঙ্কিম-রচনাতেও ধ্বনিত হয়েছিল; বঙ্কিমও কুল্লক ভট্ট ও রঘুনাথ-শাসিত ন্যায়শাস্ত্র শৃঙ্খলিত বাঙালিসমাজের দুর্দশায় সক্ষোভে বলেছিলেন—

And thus unlimited expansion and development of an already ponderous system of law or rather law and

religion welded into one solid mass, tended only to multiply ad infinitum the iron-bonds under which the Bengali already groaned……"

("Bengali literature", Cal. review 1871, No. 104, p. 294)

প্রথম যৌবনে সমাজনিষ্পিষ্ট ব্যক্তি-মানুষের ঐ যন্ত্রণা বঙ্কিম অনুভব করেছিলেন এবং পরিণত বয়সেও স্পষ্টই বলেছিলেন, —লোকহিতকর হলে সামাজিক লোকাচারের বিরুদ্ধতা গ্রাহ্য নয়।[৫] বঙ্কিমের উত্তরাধিকারী—রবীন্দ্রনাথ আরও একটু এগিয়ে এসেছেন, তাই তিনি সনাতন ধর্মভিত্তির অনুসন্ধান না করে মানব-ধর্মভিত্তিকেই প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই মনোবৃত্তির যুগপ্রভাব ত ছিলই, এই সঙ্গে তাঁর বিশ্বভ্রমণের অভিজ্ঞতা এবং বিংশ শতাব্দীর বিশ্বব্যাপী সমাজ-বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর নিজস্ব অনুভূতির সংবেদনাও ছিল। 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারী', 'জাপানযাত্রী', 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারী', 'জাভা-যাত্রীর পত্র', 'রাশিয়ার চিঠি' ইত্যাদি 'ডায়ারী' কেবল উপভোগ্য রসমধুর রচনাই নয়, ভারতবর্ষীয় সমাজের বাইরে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অন্যান্য দেশের সমাজকে অন্তরঙ্গভাবে দেখার অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার সঞ্চয়। এই সব রচনার স্মিতহাস্যমণ্ডিত উষ্মাবিহীন মন্তব্যগুলির অজস্র উদ্ধৃতি দিয়ে দেখান যেতে পারে ভারতবর্ষীয় সমাজকে এমনি করে অন্য দেশের সমাজচিত্রের পাশে বসিয়ে ইতিপূর্বে আর কেউ তুলনা করেন নি। কেবল বিবেকানন্দের 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থ এর ব্যতিক্রম। বঙ্কিমচন্দ্রের এমনি সুযোগ ঘটে নি, এমনি বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় তাঁর পক্ষে সম্ভবও ছিল না, তবু বঙ্কিম-মনীষার ঐতিহাসিক দৃষ্টি-ভঙ্গি যুগোত্তীর্ণ হতে পেরেছিল, —তার প্রমাণ আমরা ইতিমধ্যেই পেয়েছি, এবং আরও সংগ্রহ করতে পারব। মোটকথা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রজ্ঞাদৃষ্টি আর রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞা একটি বিন্দুতে এসে মিলিত হয়েছে সমাজ-চিন্তায় এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের তুলনার ক্ষেত্রে,—তা হল স্বদেশের প্রতি মমত্ববোধ। বঙ্কিম আর্যামিকে সুতীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ না-ই করুন আর রবীন্দ্রনাথ নব্যহিন্দুত্বকে যতই কড়া শাসন করুন না কেন, দুজনের মর্মবীণায় স্বদেশ-মমতার একই সুর বেজে চলেছে। রবীন্দ্রনাথ বিদেশে বসে ইন্দিরা দেবীকে পত্রে যে কথাটি লিখেছিলেন, তা ঐ সুরেই ধ্বনিত—"এ দেশে এসে আমাদের সেই হতভাগ্য বেচারা ভারতভূমিকে সত্যি সত্যি আমার মা বলে মনে হয়।……আমার আজন্মকালের যা কিছু ভালবাসা, যা-কিছু সুখ, সমস্তই তার কোলের উপর আছে।" (লণ্ডন, ৩, ১০, ১৮৯০)। কেবল ইংলণ্ডে গিয়েই নয়—রবীন্দ্রনাথ আজীবন যতদেশে ভ্রমণ করেছেন, সেই সেই দেশের সঙ্গে এদেশের

সমাজের তুলনা কালে নিবিড় মমতায় যেন ভরে উঠেছেন। আগেই বলেছি ঐ নিবিড় মমতা তাঁর সমাজ-চেতনাকে স্বদেশচিন্তার মূলধারার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছে। যেমন হংকং বন্দরে কর্মিষ্ঠ চীনা মেয়েপুরুষদের দেখে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"এই ছবি দেখে আমার দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল, ভারতবর্ষে এই ছবি কবে দেখতে পাব সেখানে যে বিপুল জটিলতা এবং জড়তার সমাবেশ।" (জাপান-যাত্রী) কিংবা; জঙ্গম জাপান "এক দৌড়ে দু তিন শো বছর হু-হু করে পেরিয়ে গেল", আর আমরা 'হাজার বছর পথের ধারে বটতলায় শুয়ে কাটিয়ে' বলছি 'ওরা ভারি হালকা'। আমাদের সমাজের স্থবিরতার উপর সস্মিত কটাক্ষপাত করলেও রবীন্দ্রনাথ কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজের দুরন্ত যান্ত্রিক গতি ও লোভকে বরদাস্ত করতে পারেননি। তাই নানা স্থানে তার প্রতি তাঁর কটাক্ষ ছড়িয়ে আছে—

> সুষমাকে কল্যাণকে উপলব্ধি করার মতো শান্তি ও অবকাশ প্রতিদিন প্রতিহত হতে চলল, সিদ্ধির ঘোড়দৌড়ে জুয়োখেলার উত্তেজনা পশ্চিম দিগন্তে কেবলই ঘূর্ণি হাওয়া বইয়ে দিচ্ছে।
>
> —পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারী, ৭. ২. ১৯২০

আগেই বলেছি বিশ্বভ্রমণের অভিজ্ঞতায় রবীন্দ্রনাথ যা উপলব্ধি করেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টি বলে সে-সম্পর্কে পূর্বেই আমাদের সতর্ক করেছিলেন, অবশ্য তা কমলাকান্তী রসনিবন্ধের আশ্রয়ে—

> বাহ্য সম্পদের পূজা কর। এ পূজার তাম্রশ্মশ্রুধারী ইংরেজ নামে ঋষিগণ পুরোহিত, এডাম স্মিথ পুরাণ এবং মিলতন্ত্র হইতে এ পূজার মন্ত্র পড়িতে হয়··· —আমার মন

মোটকথা বঙ্কিমচন্দ্র ভারত-প্রবাসী ইংরেজ রাজকর্মচারীদের সংস্পর্শে এসে অনুভব করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্যের সব দেশে, বিশেষত ধনকুবের আমেরিকায় বসে তা প্রত্যক্ষ করেছিলেন—

> সেখানে ভোগের চেহারা দেখেছি, আনন্দের না। অনবচ্ছিন্ন সাতমাস আমেরিকায় ঐশ্বর্যের দানবপুরীতে ছিলেম। ···মনে মনে বলতেম লক্ষ্মী হলেন এক, আর কুবের হল আর—অনেক তফাৎ।" —শিক্ষার মিলন

অথচ রবীন্দ্রনাথ কোনদিনই বৈরাগ্যের নামে শূন্য ঝুলির সমর্থন করেননি, চেয়েছেন 'অন্নপূর্ণার সঙ্গে বৈরাগীর মিলন', ঠিক যেমন অনেকদিন আগে[৬] বঙ্কিম বাহ্যসম্পদের লেলিহান অগ্নিকুণ্ডের পাশে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, "মনুষ্যে মনুষ্যে প্রণয়বৃদ্ধির একটা কিছু কল হয় না?" নিরপেক্ষ বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথ একদিকে

আমাদের সমাজের 'অচলায়তন'-কে ভেঙে নতুন করে গড়ার কাজে হাত দিতে বলেছেন, অন্যদিকে পাশ্চাত্য সমাজের যক্ষপুরীকেও 'নন্দিনীর' স্পর্শে সজীবিত করতে চেয়েছেন ; প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক পটভূমিতে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা করেছেন—

> ভারতে আচারের বন্ধনে যেখানে মানুষকে এক করতে চেয়েছে সেখানে সেই ঐক্যে সমাজকে নির্জীব করেছে, য়ুরোপে ব্যবহারের বন্ধনে যেখানে মানুষকে এক করতে চেয়েছে, সেখানে সেই ঐক্যে সমাজকে সে বিশ্লিষ্ট করেছে।
>
> —শিক্ষার মিলন, ১৩২৮

রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তার তুলনামূলক বিচারভঙ্গির পশ্চাতে ঐতিহাসিক সমীক্ষা ছিল। পূর্বেই বলেছি, ইতিহাস চেতনায় সমাজ বিশ্লেষণ করার কাজ সুরু হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা। অতএব এবার এঁদের দুজনের ইতিহাসচেতনাজাত সমাজসমীক্ষার ফলশ্রুতি লক্ষ্য করা প্রয়োজন। সেইটিই আমাদের আলোচ্য সমাজচিন্তার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ধারা বলে উল্লেখ করেছি।

দুই.

বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিকচিন্তার ক্ষেত্রে ইতিহাসচেতনার প্রকাশ যেমন ভাবে দেখা দিয়েছিল, সমাজচিন্তার ক্ষেত্রেও তা প্রায় তেমনি ভাবেই তিনটি ভঙ্গিতে প্রকাশিত হয়েছে। সেই তিনটি ভঙ্গির ত্রিবিধ প্রেরণা হল, কলঙ্কচেতনা, গৌরব চেতনা এবং আদর্শীকরণের ঈপ্সা। কলঙ্কচেতনা কখনও মিথ্যা কলঙ্ক ক্ষালন করে, কখনও বা বাস্তব কলঙ্কের গলিত ক্ষতকে শল্য চিকিৎসকের মতো উদ্‌ঘাটন করে নিরাময়ের প্রয়াস করে ; অতঃপর গৌরব-বোধের উজ্জীবন-প্রয়াস দেখা যায় কলঙ্কক্ষালন বা উদ্‌ঘাটনের পরই ; আর আদর্শীকরণ ব্যাপারটি ঘটেছে ইতিহাস-দৃষ্টিতে ভবিষ্যতের আশ্বাসে। উল্লিখিত তিনটি প্রকাশভঙ্গি আবার মুখ্যত কয়েকটি সামাজিক সমস্যাকে আশ্রয় করেছে। এখানে আমাদের আলোচ্য বঙ্কিম ও রবীন্দ্রের সমাজচিন্তার সমস্যা ও বিষয়গুলি হল—

১. ভারতীয় অথবা হিন্দু সমাজের জাতিভেদ-প্রথা, ২. হিন্দুর বিবাহবিধি, এবং সমাজে স্ত্রীলোকের স্থান, ৩. অধিকাংশ লোকের জীবিকা ও আহার ইত্যাদি, ৪. শিল্প সংস্কৃতি।

উক্ত সমস্যা বা বিষয়গুলি ইতিহাসচেতনার পূর্বোল্লিখিত তিনটি ভঙ্গিতে বিশ্লেষিত বা উপস্থাপিত হয়েছে। ইতিপূর্বে আলোচিত ব্যঙ্গরচনা বা উষ্মাবিহীন তুলনামূলক রচনাগুলিতেও উক্ত বিষয়গুলির কোন-না-কোনটা বর্তমান ছিল।

পূর্ব আলোচনায় একটি উদ্ধৃতিতে আমরা বঙ্কিমের আক্ষেপ লক্ষ্য করেছি, যে ন্যায়শাস্ত্র-শৃঙ্খলিত বাঙালিসমাজের দুর্দশা কত শোচনীয়। বঙ্কিম-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শনের' প্রথম প্রবন্ধেও এপ্রসঙ্গের উল্লেখ ছিল, ভারতের পরাধীনতার দ্বিতীয় কারণ, "হিন্দুসমাজের অনৈক্য, সমাজমধ্যে জাতি প্রতিষ্ঠার অভাব, জাতি-হিতৈষার অভাব।" ("ভারতকলঙ্ক") এবং অন্যত্র সামাজিক সুখের মাপকাঠিতে স্বাধীনতা ও পরাধীনতার মূল্যায়নে তাঁর সুস্পষ্ট মন্তব্য ছিল, "জাতির উপর জাতির প্রাধান্য প্রাচীন ভারতে ছিল না। ছিল না বটে, কিন্তু তৎতুল্য বর্ণপীড়ন ছিল।" ("ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা")। ঐ বর্ণপীড়ন ভারতীয় সমাজের বাস্তব কলঙ্ক। বঙ্কিমচন্দ্র শুধু কয়েকটি প্রবন্ধে নয়, বিভিন্ন আলোচনা প্রসঙ্গে এই বর্ণপীড়ন ও জাতিভেদ প্রথার কলঙ্ক উন্মোচন করেছেন—এবং তা করেছেন ইতিহাসের আলোকে। এ ব্যাপারে প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধগুলিই প্রমাণ করে যে বঙ্কিম সেযুগের প্রচলিত মনোবৃত্তির তুলনায় কতটা নিরপেক্ষ এবং সাহসী বিশ্লেষক। "ব্রাহ্মণরাজ্যে শূদ্রহন্তা ব্রাহ্মণের এবং ব্রাহ্মণহন্তা শূদ্রের কত বৈষম্য,···আধুনিক ভারতবর্ষ প্রভুগণপীড়িত বটে, কিন্তু প্রাচীন ভারতও বড় ব্রাহ্মণপীড়িত ছিল।" —("ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা")। এইকালেই 'সাম্য' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্ব-ইতিহাসের নানাজাতির উত্থান-পতনের পরিপ্রেক্ষিতে বৈদিকধর্মসঞ্জাত বৈষম্য অথবা সামাজিক বৈষম্যের মূল নিরূপণ করলেন—

> পৃথিবীতে যত প্রকার সামাজিক বৈষম্যের উৎপত্তি হইয়াছে, ভারতবর্ষের পূর্বকালিক বর্ণবৈষম্যের ন্যায় গুরুতর বৈষম্য কখন কোন সমাজে প্রচলিত হয় নাই। অন্যবর্ণ অবস্থানুসারে বধ্য—কিন্তু ব্রাহ্মণ শত অপরাধেও অবধ্য। ···প্রাচীন ইউরোপের বন্দী এবং প্রভু মধ্যে যে বৈষম্য তাহাও এমন ভয়ানক নহে।···এই গুরুতর বর্ণবৈষম্যের ফলে ভারতবর্ষ অবনতির পথে দাঁড়াইল।
>
> —"সাম্য" ১ম পরিচ্ছেদ

উক্ত অপ্রাকৃত বৈষম্যের বিশ্লেষণে সমাজ-ইতিহাসের দিগ্‌দর্শনে বঙ্কিমচন্দ্র উপজীবিকানুসারে চার শ্রেণীতে বিভক্ত প্রাচীন আর্যদের ক্রমোত্থান ও পতনের বর্ণনা দিয়েছেন, সুস্পষ্ট রূপে প্রমাণ করেছেন অন্য তিন বর্ণের অনুন্নতিতে প্রথমে ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব বৃদ্ধি, পরে তাদেরও অবনতি ঘটেছে, "হিন্দুসমাজের

অবনতির অন্য যত কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছি তন্মধ্যে এইটি বোধ হয় প্রধান, অদ্যাপি জাজ্বল্যমান। ইহাতে রুদ্ধ এবং রোধকারী সমান ফলভোগী।" পরবর্তীকালে কবির ভাষায় এই কথাই আমরা শুনেছি, "পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।", বঙ্কিমের অন্য একটি প্রবন্ধেও ব্রাহ্মণত্বের মর্যাদা নিয়ে মিথ্যা গৌরব না করে "বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার" কতদিনের তার ঐতিহাসিক তথ্য বিশ্লেষণ আছে—"মনুসংহিতা সংকলন কালে বঙ্গদেশ ব্রাহ্মণবিহীন, অনার্য্য জাতির বাসস্থান ছিল।...খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পূর্বে বাঙ্গালা ব্রাহ্মণশূন্য অনার্য্য ভূমি ছিল।" বঙ্কিমের বিশ্লেষণের ফলে বাঙলার তথাকথিত গৌরব লাঘব হয়নি, "আমরা দেখিতেছি না যে কিছু অগৌরব হইল", কারণ আর্য সংস্কৃতির উত্তরাধিকার অবশ্যই বাঙালিতেও বর্তেছে। উক্ত প্রবন্ধ রচনার আরও পাঁচ বৎসর পরে সাতটি পরিচ্ছেদে বিশ্লেষিত "বাঙ্গালীর উৎপত্তি"—শীর্ষক সুদীর্ঘ নিবন্ধে বঙ্কিম যেভাবে নৃ-তাত্ত্বিক অনুসন্ধিৎসায় আর্য-অনার্য জাতি, আর্যীকরণের বিধি, বর্ণবিভাগের পর্যায় আলোচনা করেছেন তাতে একথা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয়, আর্যামির মিথ্যা বড়াই অন্তত বঙ্কিমের ছিল না এবং তিনি বর্ণবৈষম্যের কুফল সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। কেবল হিন্দুর কথাই নয়—বাঙালির অর্ধেক অংশ যে মুসলমান সে কথাটিও তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। আর "কেবল ব্রাহ্মণ কায়স্থে বাঙ্গালা পরিপূর্ণ নহে, ব্রাহ্মণ কায়স্থ বাঙ্গালীর অতি অল্পভাগ। বাঙ্গালীর মধ্যে যাহারা সংখ্যায় প্রবল, তাহাদিগেরই উৎপত্তিতত্ত্ব অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন।" এই প্রসঙ্গে বঙ্কিম সমাজের অবহেলিত অধিকাংশ মানুষের ভাষা, সংস্কৃতি, গোষ্ঠীগত উৎস এবং তাদের আর্যীকরণের ইতিহাস নির্ণয় করে আর্যীকৃত অনার্যদের সঙ্গে আর্যদের বৈষম্য সম্পর্কে আক্ষেপ করলেন, "তাহারা আগে যেমন পৃথক জাতি ছিল এখনও তেমনি পৃথক জাতি রহিল, কেবল হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার অনুকরণ গ্রহণ করিয়া হিন্দু জাতি বলিয়া খ্যাত হইল।" এই সঙ্গেই ভারতবর্ষ তথা বাঙলায় জাতিভেদপ্রথার দুর্ভেদ্য গণ্ডীবিস্তারের কারণগুলি বঙ্কিম উল্লেখ করেছেন, "আমাদিগের মতে জাতিভেদ তিন প্রকারে উৎপন্ন হইয়াছে। প্রথম আর্য্যগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যভেদ, দ্বিতীয় আর্য্য ও শূদ্রের মধ্যে বর্ণভেদ, তৃতীয় সঙ্কর জাতিগুলির উৎপত্তি।" অবশেষে বাঙালি শূদ্রদের উৎপত্তি নির্ধারণ করে বঙ্কিম সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, "বাঙ্গালী কেবল দুইভাগে বিভক্ত, ব্রাহ্মণ ও শূদ্র। ব্রাহ্মণ বিশুদ্ধ আর্য্য কিন্তু শূদ্রদিগকে বিশুদ্ধ আর্য্য কি বিশুদ্ধ অনার্য্য বিবেচনা করিব, কি মিশ্রিত বিবেচনা করিব ইহারই বিচার আমরা এতদূর বিস্তারিত করিয়াছি।

কেন না বাঙ্গালী জাতির মধ্যে সংখ্যায় শূদ্রই প্রধান।"

কিন্তু কোল বংশীয় অনার্য, দ্রাবিড় বংশীয় অনার্য ও আর্য—এই তিনে মিলে বাঙালির উৎপত্তি হলেও ইংরেজের মত একজাতিতে পরিণত হতে পারে নি, কারণ,—

> ভারতীয় আর্য্যদিগের বর্ণধর্মিত্বহেতু বাঙ্গালায় তিনটি পৃথক স্রোত মিশিয়া একটি প্রবল প্রবাহে পরিণত হয় নাই, আর্য্যসম্ভূত ব্রাহ্মণ অনার্যসম্ভূত অন্য জাতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক রহিয়াছেন।...ইংরেজেরা একজাতি, বাঙ্গালীরা বহুজাতি।

এই বহুজাতিত্বের বহুগণ্ডীবদ্ধ দুর্বল বাঙালি তথা ভারতীয় অসংলগ্ন ভাবে হিন্দু সমাজ আমাদের দুর্বলতার সবচেয়ে বড় কারণ। এই হল আমাদের ভারতীয় সমাজের সবচেয়ে বড় কলঙ্ক।

একটি বিষয় আমাদের লক্ষ্য করতে হবে, বঙ্কিমের এই দৃষ্টিভঙ্গি পরে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। বর্ণপীড়নের বিষময় বেদনার কথা 'ধর্মতত্ত্ব'—প্রচারকালে তাঁর আর মনে হয় নি। গীতা, মহাভারত ও কৃষ্ণের গৌরব-কথনে তিনি তখন নিযুক্ত; এমনকি সম্ভবত এইজন্যেই 'সাম্য' গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ প্রয়োজন মনে করেন নি। ব্যাপারটি ঘটেছে মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যে। 'সাম্য' প্রকাশিত হয় ১৮৭৩-৭৫ খ্রীঃ এর মধ্যে, আর 'ধর্মতত্ত্ব' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে—মাঝখানে পাদরী হেস্টি-র সঙ্গে লেখনীযুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় তাঁর রচনায় ঐতিহ্য-গৌরবচেতনা সোচ্চার হয়ে উঠেছে। কিন্তু তখনও "essentials of Hinduism and its Non-essential adjuncts" সম্পর্কে তাঁর মনোভঙ্গি যুক্তিবাদী।

> The Social polity is also non-essential, Caste, therefore which is the most prominent feature of that polity is non-essential. —The Statesman, 28. 10. 1882.

আবার পজিটিভিস্ট বন্ধু যোগেন্দ্রচন্দ্রের সঙ্গে পত্রালোচনাতেও এই মনোভঙ্গি লক্ষ্য করা যায়। অথচ ঠিক এই সময়ই বঙ্কিম-মানসে দ্রুত চিন্তা-বিবর্তন ঘটছিল "অনুশীলন"-ধর্ম প্রচার কালে।

> ...পৃথিবীতে যত জাতি উৎপন্ন হইয়াছে প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণদিগের মত প্রতিভাশালী, ক্ষমতাশালী জ্ঞানী ও ধার্মিক কোন জাতিই নহে।... রোমক ধর্মযাজক, বৌদ্ধভিক্ষু বা অপর কোন সম্প্রদায়ের লোক তেমন জ্ঞানী বা ধার্মিক ছিলেন না। —ধর্ম্মতত্ত্ব, ১০ম অধ্যায়

এখানেও ইতিহাসচেতনা আছে, তবে তা জাতীয় কলঙ্ককে জাতীয় গৌরব বলে নবভাষ্য রচনা করেছে। এই ব্রাহ্মণ গোষ্ঠীকেই স্বার্থপর সকল বর্ণের প্রভু বলে ইতিপূর্বে তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন,—"তাঁহারা বিদ্যাকে প্রভুত্ব রক্ষণীরূপে নিযুক্ত করিলেন। বিদ্যার যেরূপ আলোচনায় সেই প্রভুত্ব বজায় থাকে যাহাতে তাহার আরো বৃদ্ধি হয়···সেইরূপ আলোচনা করিতে লাগিলেন।" সেই ব্রাহ্মণই এবারে লোকশিক্ষা-দাতা সর্বত্যাগী বলে প্রশংসিত। উক্ত দুটি ভঙ্গিতে আকাশ-পাতাল তফাৎ; আসলে 'ধর্মতত্ত্ব' রচনাকালে বঙ্কিম নব্য-হিন্দুত্ব পুনরুজ্জীবনের পৃষ্ঠপোষক, তাই বর্ণ-বৈষম্য তাঁর দৃষ্টিতে সমাজ শান্তির মূল, শ্রেণীদ্বন্দ্ব ও শ্রেণীসমস্যার চিরন্তন সমাধান। কারণ, তাঁর মতে "সমাজ ব্রাহ্মণ্য নীতি অবলম্বন করিলে যুদ্ধের আর প্রয়োজন থাকে না।" (ধর্মতত্ত্ব, ১০ম অধ্যায়)। তাই ব্রাহ্মণ পূজা, অবশ্য তজ্জন্য একটি মাত্র সর্ত আরোপিত হয়েছে,—"যে সকল ব্যক্তিতে বৈদিক ব্যবহার লক্ষিত হয় তাহারাই ব্রাহ্মণ", অন্যথায় তারা শূদ্র। এ সম্পর্কে বঙ্কিম কিঞ্চিৎ নব্যদৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিলেন,—বর্ণাশ্রম থাকবে তবে তা হবে যুগোপযোগী। শ্রীমদ্ভগবদগীতার ২য় অধ্যায়ের "স্বধর্ম" ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণাশ্রমের কিছুটা উদার ভাষ্য পাওয়া গেল, তদনুসারে কর্মভেদ অনুসারে পাঁচটি জাতির অস্তিত্ব সর্বসমাজেই স্বীকৃত। বঙ্কিমের ভাষ্যে বলা হয়েছে, উপজীবিকার জন্য যে যে কর্ম গ্রহণ করুক তাই তার duty বা স্বধর্ম (পুরুষপরম্পরাগত নাও হতে পারে)। "ইহাই আমার বুদ্ধিতে গীতোক্ত স্বধর্মের উদার ব্যাখ্যা। যাঁহারা ইহার কেবল প্রাচীন হিন্দু সমাজের উপযোগী অর্থ নির্দেশ করেন তাঁহারা ভগবদুক্তিকে অতি সংকীর্ণার্থক বিবেচনা করেন। ভগবান কখনও সংকীর্ণবুদ্ধি নহেন।" অর্থাৎ সমাজের অবস্থাভেদে বর্ণাশ্রম-বিধির সম্প্রসারণের নির্দেশ দিলেন বঙ্কিম। এই কালোচিত ব্যাখ্যার ইচ্ছা যোগেন্দ্রচন্দ্রকে লেখা একটি পত্রে ইতিপূর্বেই ব্যক্ত হয়েছিল—

> Let us revere the past but we must...adopt new methods of interpretation and adopt the old eternal and undying truths to the necessities of that new life.
>
> —2nd letter, 'Letters on Hinduism'

'ধর্মতত্ত্ব'-রচনাকালে বঙ্কিম যেভাবে ব্রাহ্মণ্য গৌরবের কথা ঘোষণা করেছিলেন, ঠিক তেমনভাবে না হলেও ব্রাহ্মণ্যমর্যাদার আদর্শ রবীন্দ্রনাথও তুলে ধরলেন বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে। তাতে কলঙ্কচেতনা ছিল না, বরং অতীত গৌরববোধে উদ্দীপ্ত মনীষার সমাজ-বিশ্লেষণ ছিল। এটি অপ্রত্যাশিত

নয় কারণ রবীন্দ্র সাহিত্যের 'বঙ্গদর্শন' (নবপর্যায়)—যুগটি স্পষ্টতই হিন্দু-উজ্জীবনের প্রভাবযুক্ত। এই সময় শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার ব্রত এবং পাশ্চাত্য রাজনীতির প্রতি ক্ষুব্ধ অবিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতাকে প্রাচীন ভারতীয় ন্যায়ধর্মের ভিত্তিতে দাঁড় করিয়েছে। এপ্রসঙ্গে দুটি পত্রাংশ উদ্ধৃত করছি—

১. 'গুটি দশেক ছেলেকে আমাদের ভারতবর্ষের নির্মল শুচি আদর্শে মানুষ করিবার চেষ্টায় আছি।' —বিলাতে জগদীশচন্দ্রকে লিখিত, ১৭.৯.১৯০১

২. 'আমি ব্রাহ্মণ্য আদর্শকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার সংকল্প হৃদয়ে লইয়া যথাসাধ্য চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছি।'

—ত্রিপুরার মহারাজাকে লিখিত, বৈশাখ ১৩০৯

উক্ত সংকল্প-রূপায়ণে বর্ণাশ্রম-আদর্শের উগ্র সমর্থক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় তখন তাঁর সহায়ক ও উৎসাহদাতা। ভারতে তখন বিবেকানন্দের আগ্রাসী হিন্দুত্বের প্রভাব বিকীরিত এবং নিবেদিতার হিন্দু ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের প্রতি উদগ্র ভক্তি কবি-মনেও সঞ্চারিত। রবীন্দ্রনাথ তখন প্রাচীন তপোবনের আদর্শে মশগুল। সেই সময়ের লেখা "ব্রাহ্মণ" প্রবন্ধে তিনি বললেন—

"আমাদের দেশের সমাজতন্ত্র একটি সুবৃহৎ ব্যাপার; ইহাই সমস্ত দেশকে নিয়মিত করিয়া ধারণ করিয়া রাখিয়াছে।"

তাঁর মতে এই সমাজের ধারণীশক্তি রূপে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের সম্মান ছিল। কর্ম ও ধর্মের সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য বর্ণ-সমাজের প্রয়োজন হয়েছিল ভারতবর্ষে। য়ুরোপের সাম্রাজ্যবাদী ও ধনতান্ত্রিক লালসাকে সংযত করার জন্য প্রকৃত ব্রাহ্মণ নেই, বর্ণভেদ নেই, তাই এত বিচ্যুতি। রবীন্দ্রনাথ ইতিহাস বিশ্লেষণ করে দেখালেন—

প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য দ্বিজ ছিল অর্থাৎ সমস্ত আর্যসমাজই দ্বিজ ছিল, শূদ্র বলিতে যে সকল লোককে বুঝাইত তাহারা সাঁওতাল, ভিল, কোল, ধাওড়ের দল ছিল। আর্যসমাজের সহিত তাহাদের শিক্ষা রীতি-নীতি ও ধর্মের সম্পূর্ণ ঐক্যস্থাপন একেবারেই অসম্ভব ছিল। কিন্তু তাহাতে কোন ক্ষতি ছিল না কারণ সমস্ত আর্যসমাজই দ্বিজ ছিল অর্থাৎ আর্য সমাজের শিক্ষা একই রূপ ছিল, প্রভেদ ছিল কেবল কর্মে।

স্পষ্টত বর্ণাশ্রমের উপযোগিতা এখানে সমর্থিত এবং উক্ত আদর্শ হতে ভ্রষ্ট হবার কারণস্বরূপ দেখালেন, আর্যরক্ত ও অনার্যরক্তের মিশ্রণে, বৌদ্ধযুগের সামাজিক অরাজকতায় এবং জড়তাপ্রাপ্ত সমাজের "শৈথিল্যবশতঃ একসময়

ক্ষত্রিয় বৈশ্য আপন অধিকার হইতে ভ্রষ্ট হইয়া একাকার হইয়া গেছে", এবং এদের নিম্ন আকর্ষণে ব্রাহ্মণসমাজের অপ্রতিষ্ঠা হয়েছে। অতএব রবীন্দ্রনাথ আশা প্রকাশ করলেন, "আমাদের সমাজে ব্রাহ্মণের কাজ পুনরায় আরম্ভ হইবে;" আর বর্ণাশ্রম বিধির ধারকস্বরূপ ব্রাহ্মণ—"তাঁহারা দরিদ্র হইবেন, পণ্ডিত হইবেন, ধর্মনিষ্ঠ হইবেন। সর্বপ্রকার আশ্রমধর্মের আদর্শ ও আশ্রয় স্বরূপ হইবেন ও গুরু হইবেন।" আমরা লক্ষ্য করছি, এযুগে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি আর বঙ্কিমের শেষজীবনের সমাজদৃষ্টিভঙ্গি প্রায় একরূপ। সূক্ষ্ম পার্থক্য যা আছে তা এজন্যেই যে বঙ্কিমের ইতিহাসচেতনা শেষজীবনে সনাতন হিন্দুধর্মের গৌরবখ্যাপনে ব্রতী, আর রবীন্দ্রনাথের এযুগের ইতিহাস-চেতনা ঔপনিষদিক ভারতের আদর্শ-উদ্ধারে নিয়োজিত। রবীন্দ্রনাথের কবিকল্পনায় ঐ মহত্তর আদর্শচ্যুতির দুঃখ, অন্তরের সে-সম্পদ হারানোর বেদনা অভিব্যক্ত হয়েছিল—

নাহি ধ্যানবল,
শুধু জপমাত্র আছে, শুচিত্ব কেবল
চিত্তহীন অর্থহীন অভ্যস্ত আচার। —'নৈবেদ্য'

অন্যত্র রবীন্দ্রনাথ লিখলেন—

> আমাদের দেশে বর্ণাশ্রম ধর্ম যখন সেই উচ্চতর ধর্মকে আঘাত করিল তখন ধর্ম তাহাকে আঘাত করিল···একসময় আর্যসভ্যতা আত্মরক্ষার জন্য ব্রাহ্মণ শূদ্র দুর্লভ ব্যবধান রচনা করিয়াছিল, কিন্তু ক্রমে সেই ব্যবধান বর্ণাশ্রমধর্মের উচ্চতর ধর্মকে পীড়িত করিল। —প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা

অর্থাৎ আমাদের বর্ণাশ্রমধর্মের সংকীর্ণতা যখন নিত্যধর্মকে আঘাত করল তখনই এল সমাজবিকৃতি। তুলনামূলক আলোচনায় এদেশের ও ওদেশের সমাজ-ইতিহাস বিশ্লেষণ করে রবীন্দ্রনাথ বলতে চেয়েছেন—বর্তমান বিকৃতি সত্ত্বেও বর্ণাশ্রম আদর্শের পুনরুজ্জীবন প্রয়োজন। কারণ—

> আমাদের দেশে সমাজ সকলের বড়ো। অন্য দেশে নেশন নানা বিপ্লবের মধ্যে আত্মরক্ষা করিয়া জয়ী হইয়াছে। আমাদের দেশে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল সমাজ নিজেকে সকল প্রকার সংকটের মধ্যে রক্ষা করিয়াছে।
>
> —'ভারতবর্ষীয় সমাজ' ১৩০৮

বলাবাহুল্য রবীন্দ্রনাথের এইকালের মুগ্ধ দৃষ্টিভঙ্গিতে সমাজের ঐতিহ্য

> হিন্দুসভ্যতা যে এক অত্যাশ্চর্য প্রকাণ্ড সমাজ বাঁধিয়াছে, তাহার মধ্যে স্থান পায় নাই এমন জাত নাই।···উচ্চ-নীচ, সবর্ণ-অসবর্ণ সকলকেই ঘনিষ্ঠ করিয়া

বাঁধিয়াছে, সকলকেই ধর্মের আশ্রয় দিয়াছে, সকলকে কর্তব্যপথে সংযত করিয়া শৈথিল্য ও অধঃপতন হইতে টানিয়া রাখিয়াছে।

—ভারতবর্ষীয় সমাজ

এককথায় উক্ত সমাজের সজীব সত্তায় রাজা ছিলেন সমাজেরই অঙ্গ, ব্রাহ্মণ ছিলেন বিশুদ্ধ আদর্শের রক্ষক, তৎকালে সব নিয়মই ছিল সার্থক। 'এখন সেই নিয়ম আছে চেতনা নাই।' অতএব রবীন্দ্রনাথের দৃঢ় প্রত্যয় এইকালে উক্ত চেতনা সঞ্চারের আশু প্রয়োজন।

কিন্তু উক্ত প্রত্যয় নিঃশেষে বিলুপ্ত হতে দেখা গেল মাত্র একটি দশকের মধ্যেই, তখন রবীন্দ্রনাথের মোহভঙ্গ হয়েছে বর্ণাশ্রম ও হিন্দু সমাজ-আদর্শ সম্পর্কে। প্রথম বিশ্বপরিক্রমার শেষে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ক্রমেই বাস্তব হয়ে উঠেছে। তাই 'কালান্তর' পর্বে বর্ণাশ্রম ও জাতিভেদ প্রথার নিঃশ্বাসরোধী পাষাণভার সম্পর্কে, জাতির কলঙ্কচেতনায় নবতর দৃষ্টিভঙ্গিতে ইতিহাস বিশ্লেষণ করলেন রবীন্দ্রনাথ। এ সম্পর্কে কয়েকটি উদ্ধৃতি দিলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে—

> ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ যেমন বলিয়াছিল উচ্চতর জ্ঞানে ধর্মে কর্মে শূদ্রের অধিকার নাই, এও সেইরকমের কথা। কিন্তু ব্রাহ্মণ এই অধিকার ভেদের ব্যবস্থাটাকে আগাগোড়া পাকা করিয়া গাঁথিয়াছিল, যাহাকে বাহিরে পঙ্গু করিবে তাহার মনকেও পঙ্গু করিয়াছিল।...অব্রাহ্মণ যখনই জোড়হাতে অধিকারহীনতা মানিয়া লইল, ব্রাহ্মণের অধঃপতনের গর্তটা তখনই গভীর করিয়া খোঁড়া হইল। —কর্তার ইচ্ছায় কর্ম, ১৩২৪

ইংরেজের রাষ্ট্রনীতিতে শাসিতের অধিকার দান প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণ্য শাসনের কথা উঠেছে। এবং লেখকের সমালোচনায় বর্ণাশ্রমের বিকৃতি সম্পর্কে কোন প্রকার মমতাময় প্রশ্রয়ের অবকাশ থাকে নি। ইতিপূর্বে বিকৃতিকে গভীর মমতায় সংশোধনের ইঙ্গিত ছিল, বর্তমানে তার পরিবর্তে নবসমাজ গঠনের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে।

> ভারতবর্ষে এই সমস্যার (অসাম্যের অসন্তোষ) মীমাংসা করেছিল বৃত্তি ভেদকে পুরুষানুক্রমে পাকা করে দিয়ে।···পাকা হল ধর্মের শাসনে। বলা হল এক একটা জাতির এক একটা কাজ তার ধর্মেরই অঙ্গ।

বলাবাহুল্য, ঐ উক্তিতে 'বৃত্তিভেদ'-এর সমর্থন নেই বরং সূক্ষ্ম শ্লেষ অভিব্যক্ত, কারণ তারপরেই আছে—

> আমাদের দেশে বৃত্তিভেদকে ধর্মশাসনের অন্তর্গত করে দেওয়াতে এরকম অসন্তোষ ও বিপ্লবচেষ্টার গোড়া নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এতে

করে জাতিগত কর্মধারাগুলির উৎকর্ষ সাধন হয়েছে কিনা ভেবে দেখবার বিষয়। —শূদ্র ধর্ম

রবীন্দ্রনাথ ভেবে দেখলেন, কিন্তু সমর্থন না জানিয়ে সমাজের ঐ গলিত ক্ষতটিকে নিরপেক্ষ ও নির্মমভাবে উদ্ঘাটিত করে দিলেন। বঙ্গদর্শন যুগে ইতিহাসচেতনার এই নিরপেক্ষতা সন্দেহাতীত, আর তা অযথা গৌরব প্রতিষ্ঠায় মোহগ্রস্ত নয়।

"ধর্ম শাসনে পুরুষানুক্রমে যাদের চাকর বানিয়েছে তাদের মত চাকর পৃথিবীতে কোথায় পাওয়া যাবে?" 'কর্মের উমেদার' (১২৯৮) প্রবন্ধে চৌত্রিশ বৎসর আগে এমনি কঠিন শ্লেষই ছিল, আমরা তা লক্ষ্য করেছিলাম। এখানে ইতিহাসদৃষ্টি প্রজ্ঞা সংহত, এবং তাতে কলঙ্ক উন্মোচনের 'প্রবল কঠিন পিতৃস্নেহ' ধ্বনিত—

স্বধর্মরত শূদ্রের সংখ্যাই ভারতবর্ষে সবচেয়ে বেশি, তাই এক দিক থেকে দেখতে গেলে ভারতবর্ষ শূদ্রধর্মেরই দেশ। তার নানা প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া গেছে। এই অতি প্রকাণ্ড শূদ্রধর্মের জড়ত্বের ভারাকর্ষণে ভারতের সমস্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের মাথা হেঁট হয়ে আছে। —শূদ্রবর্ণ

উক্ত বর্ণাশ্রমিক মূঢ়তা কেবল হিন্দুদের অসংখ্য জাতি সম্প্রদায় উপজাতিদের মাঝখানেই নয়, হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায়ের মাঝেও যে অভেদ্য প্রাচীর খাড়া করেছে—সে কলঙ্কের কথাও এই যুগেই রবীন্দ্র প্রবন্ধাবলীতে পুনঃ পুনঃ উদ্ঘাটিত। আমরা রাজনৈতিক চিন্তা প্রসঙ্গে ইতিপূর্বেই তা আলোচনা করেছি।

বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে এসেছিলেন, 'বাঙ্গালী জাতির মধ্যে শূদ্রই প্রধান'। রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্ত, "ভারতবর্ষ শূদ্রধর্মেরই দেশ।" পূর্বসূরীর সিদ্ধান্তে ক্ষোভ মৃদু, রবীন্দ্রনাথের উক্তিতে আছে ক্ষুব্ধ বিস্ফোরণ। বঙ্কিমের প্রথম জীবনের কলঙ্কচেতনা শেষজীবনে গৌরবচেতনায় বিবর্তিত, রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের ('বঙ্গদর্শন' নবপর্যায়) ব্রাহ্মণ্যআদর্শবাদ যা ঔপনিষদিক ভিত্তিতে সমাজ-প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে মোহগ্রস্ত ছিল—তা একদশকের মধ্যেই পরিবর্তিত হয়ে সমাজ-কলঙ্ক চেতনায় পর্যবসিত। ফলে পরবর্তীকালে এই কলঙ্ক-উন্মোচন তথা কলঙ্ক-নিরাময়ের প্রয়াস তাঁর রচনায় বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

এ সম্পর্কে তাঁর সংগঠনমূলক সমাজচিন্তার নানা প্রবন্ধ হতে দু-একটি ইঙ্গিত সংগ্রহ করছি—

মূঢ়ের জন্য মূঢ়তা, দুর্বলের জন্য দুর্বলতা, অনার্যের জন্য বীভৎসতা সমাজে রক্ষা করা কর্তব্য একথা কানে শুনিতে মন্দ লাগে না, কিন্তু জাতির প্রাণ-ভাণ্ডার হইতে যখন তাহার খাদ্য যোগাইতে হয় তখন জাতির যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ প্রত্যহই তাহার ভাগ নষ্ট হয় এবং প্রত্যহই জাতির বুদ্ধি দুর্বল এবং বীর্য মৃতপ্রায় হইয়া আসে ।……ইহাই তামসিকতা ।

অতএব—"স্বজাতির মধ্য দিয়া সর্ব জাতিকে এবং সর্ব জাতির মধ্য দিয়াই স্বজাতিকে সত্যরূপে পাওয়া যায় ।" এই বিশ্বাস অনুসারে অগ্রসর হতে হবে। এখানে সমাধান কতকটা আদর্শায়িত। 'কালান্তর' পর্বে এসে এর বাস্তব সমাধানের ইঙ্গিত লক্ষ্য করা যায়,—সে অনুসারে জ্ঞানের দিকে গোড়া কাটা পড়তেই আমাদের দুর্দশা সুরু হয়েছে, তখন থেকেই "কর্তার ভূত"—ঘাড়ে চেপেছে, অতএব জনসাধারণের ঐক্যবোধ ও আত্মকর্তৃত্ব লাভের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা নির্দেশিত হল, 'শিক্ষার মিলন'। আর একটি ইঙ্গিত 'সমস্যা'—প্রবন্ধে আছে। সেখানে জাতিভেদ প্রথা এবং হিন্দু মুসলমান বিরোধের জন্য তীব্র ভেদবুদ্ধি দূর করার উপায় সম্পর্কে প্রসঙ্গসূত্রে রবীন্দ্রনাথ সুইজারল্যাণ্ডের রক্ত-মিশ্রণের দৃষ্টান্ত দিয়ে বললেন—

সকলের চেয়ে গভীর আত্মীয়তার ধারা নাড়ীতে বয়, মুখের কথায় বয় না। …জাতীয় ঐক্যের আদিম অর্থ হচ্ছে জন্মগত ঐক্য, তার চরম অর্থও তাই।

আবার হিন্দু-মুসলিম মিলন-প্রসঙ্গে বললেন—"শিক্ষার দ্বারা, সাধনার দ্বারা সেই মূলের পরিবর্তন ঘটাতে হবে…তার পরে আমাদের কল্যাণ হতে পারবে।" ঐ নির্দেশ জাতিভেদপ্রথার কলঙ্ক-নিরাময়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

রক্ত-মিশ্রণের বাধা ঘটায় যে ঐক্যবদ্ধ ইংরেজ জাতির মত বাঙালি এক-জাতি হতে পারে নি—এ ব্যাপারটি বঙ্কিমচন্দ্রও লক্ষ্য করেছিলেন কিন্তু সেখানে তিনি কোন সমাধানগত ইঙ্গিত রেখে যান নি, বরং পরবর্তীকালে বর্ণাশ্রমিক বিধিকে 'কালোচিত ব্যাখ্যা' অনুসারে রক্ষা করার কথাই তিনি ব্যক্ত করেছেন। আর রবীন্দ্রনাথ রক্তমিশ্রণের কথা কোথাও কোথাও স্পষ্ট ইঙ্গিতে ব্যক্ত করেছেন, তবে তিনি এ ব্যাপারে শিক্ষার মিলনের উপরই সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন, এবং আশা করেছেন ঐ ভেদবুদ্ধির গণ্ডী, লোকাচারের সংস্কার, জাতিভেদের সংকীর্ণতা একদিন শুভবুদ্ধির দ্বারাই ভারতের মানুষ উত্তীর্ণ হবেই। এ প্রসঙ্গে কবির শেষ পর্বের একটি উল্লেখযোগ্য নাটিকা—'রথের রশি' বা 'কবির দীক্ষা'—স্মরণ করা যেতে পারে। সেখানে কবির বক্তব্য, মহাকালের রথ চলবে সর্ব বর্ণের সম্মিলিত টানে, তার গতিতে থাকবে সমতার ছন্দ।

এদেশের সর্বাধিক দুরূহ সামাজিক বৈষম্য, লোকাচারের ভেদবুদ্ধির এবং অর্থনৈতিক অসাম্যের শিল্পায়িত সমাধান ঘটেছে এই নাটিকায়।

ইতিপূর্বে রাজনীতির ক্ষেত্রে দুই মনীষীর ইতিহাস চেতনাজাত প্রবন্ধগুলি বিশ্লেষণ কালে লক্ষ্য করা গেছে যে উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গিই সমাজকেন্দ্রিক, এমনকি সমাজের উপর আস্থা বঙ্কিমচন্দ্রের চেয়ে রবীন্দ্রনাথের দৃঢ়তর।[৭] বঙ্কিম রাষ্ট্রকে সমাজের রক্ষক ও ধর্মের পৃষ্ঠপোষক রূপেই বিশ্বাস করতেন।[৮] কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এ সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করেন। ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ এবং তুলনামূলক আলোচনায় ভারতবর্ষের সমাজ-প্রাধান্য তিনি প্রতিপাদিত করেছেন নানা প্রবন্ধে। এ প্রসঙ্গে নিচের উদ্ধৃতি উল্লেখযোগ্য।

> চিরদিন ভারতবর্ষে এবং চীনদেশে সমাজতন্ত্রই প্রবল, রাষ্ট্রতন্ত্র তার নিচে। দেশ যথার্থভাবে আত্মরক্ষা করে এসেছে সমাজের সম্মিলিত শক্তিতে। ...তার কারণ সর্বব্যাপী সমাজে তার আত্মা প্রসারিত। পাশ্চাত্য রাজার শাসনে এইখানে ভারতবর্ষ আঘাত পেয়েছে।

স্পষ্টতঃ, ভারতবর্ষের সমাজ-প্রাধান্যের উক্ত মঙ্গলময় দিকটি রবীন্দ্রনাথ সমর্থন করেছিলেন ইতিপূর্বে 'স্বদেশী সমাজ'—বিশ্লেষণে। সমাজের আত্মশক্তি অর্জনে সমাজের প্রাণকেন্দ্রগুলির পুনরুজ্জীবনে ভারতের উন্নতি হবে এবং অবশেষে "স্বরাজ" আসবে—এ বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তার মূলে। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাতেও ভারতবর্ষের এবং বঙ্গদেশের সমাজ-ব্যবস্থার নানা অবদানের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি আছে। তিনিও সমাজের এই বিপুল শক্তির অনুসন্ধান করেছেন, আমরা তা লক্ষ্য করেছি। তবে দুজনেই এদেশের সমাজব্যবস্থার নানা বৈষম্য ও বিকৃতির প্রতি সচেতন ছিলেন, তা যেন না ভুলি। এবং ঠিক এই কারণেই বঙ্কিমচন্দ্র 'লোকবৃত্ত' ও 'নৃবৃত্ত' আলোচনা করে বাংলা দেশের সমাজ-সংস্কৃতি বিশ্লেষণ করেছেন, আবার রবীন্দ্রনাথও 'peoples history' বা জনগণের ইতিহাস রচনাকালে জনসমাজের উত্থান পতনকে অভিব্যক্তিবাদের দ্বারা বিশ্লেষণ করেছেন। ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের ধারা আলোচনা কালে ভারতীয় সমাজে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র শক্তির ক্রমবিবর্তন, আর্য-অনার্য মিশ্রণ এবং ভারতীয় সমাজের মূল প্রবণতাগুলি তিনি বিস্তৃত রূপেই আলোচনা করেছেন। ঐ বিশ্লেষণগুলি (রাজনীতি-ক্ষেত্রেই আলোচিত) সমাজচিন্তার ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য, বস্তুত সেগুলি ইতিহাসচেতনাজাত সমাজচিন্তাই।

বর্ণাশ্রম ও জাতিভেদ প্রথা সম্পর্কে রবীন্দ্র-সমাজ চিন্তার প্রথমযুগের রঙ

ধুয়ে গিয়েছিল আন্তর্জাতিক সমাজ অভিজ্ঞতায়, সেকথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই ব্যাপারে পরবর্তীকালের কলঙ্ক উন্মোচন ও নিরাময়-প্রয়াস অন্য একটি সমস্যার ক্ষেত্রেও ঘটেছে একইভাবে; সেই সমস্যাটি হল হিন্দুবিবাহবিধি ও নারীর মর্যাদা। আর এবারও লক্ষ্য করা যাবে বঙ্কিম-দৃষ্টিভঙ্গির বিবর্তনের ঠিক বিপরীতমুখী রবীন্দ্র-মনোভঙ্গি।

স্ত্রী-পুরুষ সম্পর্কে সমাজের বর্তমান গতির আলোচনা বঙ্কিমচন্দ্র সর্বপ্রথম মৃদুব্যঙ্গসুরে 'প্রাচীনা ও নবীনা'-তে কিছুটা ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করেছিলেন। তাঁর মতে—

> আমাদের শুভাশুভের মূল আমাদের কর্ম্ম, কর্ম্মের মূল প্রবৃত্তি; এবং অনেকস্থানেই আমাদের প্রবৃত্তিসকলের মূল আমাদের গৃহিণীগণ।

অর্থাৎ গৃহিণীদের মূল্য স্বীকৃত হল ব্যক্তিগত জীবনে এবং সমাজ জীবনে।

> স্ত্রী পুরুষের সমান ভাগের সমষ্টিকে সমাজ বলে। উভয়ের সমান উন্নতিতে সমাজের উন্নতি।…সমাজের নিয়ন্তৃবর্গ সর্বকালে সর্বদেশেই এই ভ্রমে পতিত।…তাই পুরুষের সুখের পক্ষে স্ত্রীর সতীত্ব আবশ্যক। স্ত্রীজাতির সুখের পক্ষেও পুরুষের ইন্দ্রিয়সংযম আবশ্যক, কিন্তু পুরুষই সমাজ, স্ত্রীলোক কেহ নহে। অতএব স্ত্রীর পাতিব্রত্যচ্যুতি গুরুতর পাপ বলিয়া সমাজে বিহিত হইল, পুরুষের পক্ষে নৈতিক বন্ধন শিথিল রহিল…সকল সমাজেই স্ত্রীজাতি পুরুষাপেক্ষা অনুন্নত, পুরুষের আত্মপক্ষপাতিতাই ইহার কারণ,… একথা অন্যান্য সমাজের অপেক্ষা আমাদিগের দেশে বিশেষ সত্য। প্রাচীন কালের কথা বলিতে চাহি না, তৎকালীন স্ত্রীজাতির চিরাধীনতার বিধি, কেবল অবস্থা বিশেষ ব্যতীত স্ত্রীগণের ধনাধিকার নিষেধ, স্ত্রী ধনাধিকারিনী হইলেও দান-বিক্রয়ের ক্ষমতার অভাব; সহমরণ বিধি, বহুকাল-প্রচলিত বিধবার বিবাহ নিষেধ, বিধবার পক্ষে প্রচলিত কঠিন নিয়মসকল স্ত্রীপুরুষে গুরুতর বৈষম্যের প্রমাণ। তৎপরে মধ্যকালেও স্ত্রীজাতির অধনতি আরও গুরুতর হইয়াছিল। পুরুষ প্রভু, স্ত্রী দাসী,… বরং বেতন-ভোগিনীদাসীর কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা আছে, কিন্তু বনিতা, দুহিতা স্বসার তাহাও ছিল না।

বঙ্কিমের বিশ্লেষণ অক্ষরে অক্ষরে সত্য। ক্রমে আধুনিককালে যে পরিবর্তন ঘটে চলেছে বঙ্কিম তাকে সুলক্ষণ বলেছেন। এই নারীসমস্যার অথবা স্ত্রী-পুরুষের অসাম্য সম্পর্কে আরও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ আছে বঙ্কিমের "সাম্য" প্রবন্ধের ৫ম পরিচ্ছেদে। বঙ্কিমের ইতিহাসচেতনা এখানে

পাশ্চাত্য মতবাদ ও সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আরও নিরপেক্ষ এবং আধুনিক। উক্ত বৈষম্য প্রসঙ্গে তাঁর স্পষ্টোক্তি এই যে, "স্বভাবগত বৈষম্য থাকিলেই যে অধিকারগত বৈষম্য থাকা ন্যায়সঙ্গত, ইহা আমরা স্বীকার করি না। একথাটি সাম্যতত্ত্বের মূলোচ্ছেদক।"...

ভারতের শাস্ত্র-শাসিত সমাজে বিধানকর্তা পুরুষের কলঙ্ক বঙ্কিমের ইতিহাসদৃষ্টিতে ধরা পড়েছে যথার্থ স্বরূপে। এবং এই সঙ্গেই নব-সমাজ গঠনের ইঙ্গিতও তিনি দিয়েছেন; কিন্তু তার আলোচনার পূর্বে দেখা প্রয়োজন, এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন 'ধর্মতত্ত্ব' প্রচারের যুগে কিরূপ। 'ধর্মতত্ত্ব' হতেই বঙ্কিমের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাক—

> স্ত্রীর প্রতিপালন ও রক্ষণের ভার তোমার উপর।...স্বামীর পালন ও রক্ষণ স্ত্রীর সাধ্য নহে; কিন্তু তাঁহার সেবা ও সুখসাধন তাঁহার সাধ্য। তাহাই তাঁহার ধর্ম। অন্য ধর্ম অসম্পূর্ণ। হিন্দুধর্ম সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সম্পূর্ণ, হিন্দুধর্মে স্ত্রীকে সহধর্মিনী বলিয়াছে। —'ধর্মতত্ত্ব', ২৩ অধ্যায়

এখানে "রতির সহিত মন্মথের" আগমন রহিত করে কামবৃত্তিকে পাশববৃত্তি বলে গণ্য করে দম্পতিপ্রীতিকে সমাজ রক্ষার্থ ও প্রজা পালনার্থ নির্দেশ করা হয়েছে। ধর্মের জন্য সমাজ, সমাজের জন্য বিবাহ, অতএব বহু পুরুষ পরম্পরায় অভ্যস্ত এই বিধিপালনই কর্তব্য, কারণ, "হিন্দুদিগের দম্পতিপ্রীতি অন্য জাতির আদর্শস্থল, হিন্দুধর্মের বিবাহপ্রথা ইহার কারণ।" ('ধর্মতত্ত্ব', ২৫ অধ্যায়) উক্ত পরিচ্ছেদের এই অংশে হিন্দু-বিবাহ প্রথার সমর্থনে চন্দ্রনাথ বসু রচিত হিন্দু-বিবাহ-বিষয়ক-পত্রিকা পাঠের নির্দেশও পাদটীকায় দেওয়া আছে। অর্থাৎ বঙ্কিম এখানে হিন্দু-বিবাহের সমস্যাগুলিকে এড়িয়ে গিয়ে প্রাচীন ঐতিহ্যকে শ্রেষ্ঠ বলে সমর্থন করলেন কেবলমাত্র হিন্দু ধর্মানুমোদিত বলেই। ইতিহাস-চেতনা এখানে আদর্শায়িত, পূর্বের কলঙ্কবোধ ঐতিহ্য-গৌরবে নিঃশেষে বিলুপ্ত।

এদিকে "হিন্দু বিবাহ" (১২৯৪) শীর্ষক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠের পর রবীন্দ্রনাথ ভারতের স্ত্রী-পুরুষ সম্পর্ক নিয়ে স্মিতহাস্য-রসায়িত আলোচনা করেছিলেন 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারীতে' এবং 'পঞ্চভূত'-এর (১৩০৫) "নরনারী" প্রবন্ধে। কিন্তু ঐতিহাসিক তত্ত্বসমন্বিত আলোচনা পাওয়া গেল এর অনেককাল পরে, "ভারতবর্ষীয় বিবাহ" (১৩৩২) প্রবন্ধে। অবশ্য "হিন্দু বিবাহ" (১২৯৪) প্রবন্ধেও ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে সত্যনির্ধারণের প্রয়াস ছিল। তৎকালীন নব্য-হিন্দুত্বের আবেগে হিন্দু-বিবাহের আধ্যাত্মিকতা নিয়ে যে আস্ফালন চলছিল, রবীন্দ্রনাথ সেই আতিশয্যের বিরোধিতা করে বলেছিলেন, "দাম্পত্য

একীকরণ" কিংবা "আধ্যাত্মিকতা"—এ দুটির কোনটিই ঐতিহাসিক সমীক্ষার ধোপে টেঁকে না, হিন্দু-বিবাহ আসলে সামাজিক মঙ্গল ও সুবিধার জন্যই। সামাজিক উদ্দেশ্যকে স্বীকার করেই আধুনিক কালে প্রাচীন বিধির মূল্যায়ন করা প্রয়োজন, কারণ বাল্যবিবাহে সুস্থ সন্তান উৎপাদন সম্ভব নয়। আবার বিবাহের অন্য মহৎ উদ্দেশ্য স্বামী-স্ত্রীর মানসিক ভারসাম্য ; অন্যথা পরিণতবয়স্কা স্ত্রী একান্নবর্তী পরিবারে অ-সুখের কারণ হতে পারে। সর্বদিক বিবেচনা করে বোঝা গেল বাল্য-বিবাহ বেশিদিন চলতে পারে না। অবশ্য যুবক রবীন্দ্রনাথ সংগঠনমূলক ইঙ্গিতও দিলেন. বাল্য-বিবাহ অপ্রচলিত হওয়ার পূর্বে ভালোরকম শিক্ষা প্রচারের প্রয়োজন। বঙ্কিমচন্দ্রও বাল্য-বিবাহ সম্পর্কে যে সংগঠনমূলক ইঙ্গিত দিয়েছিলেন তা সমসাময়িক সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিত নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত ছিল। বঙ্কিমের মতে বাংলার নিরন্ন কৃষক বা শ্রমজীবীদের সামাজিক বৈষম্যের অপ্রাকৃত বিধির মূলে অন্যতম কারণ বাল্যবিবাহ। তাঁর মতে, বলহীন বাঙালিরা (রামধন পোদ—যাদের প্রতিনিধি), সন্তানের বাল্য বিবাহে অত্যন্ত আগ্রহী, অদৃষ্টের উপর ভরসা করে তারা পুত্রের গলায় পাথর বেঁধে দেয়। "বাঙ্গালা শুদ্ধ এইরূপ রামধনে পরিপূর্ণ।...যে বাঙ্গালী হইয়া ছেলের বিয়ে না দিতে পারিল তাহার বাঙ্গালীজন্মই বৃথা।...যে দেশে বাপ-মা ছেলে সাঁতার শিখিতে না শিখিতে বধূরূপ পাতর গলায় বাঁধিয়া দিয়া ছেলেকে এই সংসারসমুদ্রে ফেলিয়া দেয়, সে দেশের উন্নতি হইবে ?" —রামধন পোদ

অতএব বঙ্কিম উক্ত সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, বিদ্যাবুদ্ধিহীন 'রামধন'-দের উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে বাল্য-বিবাহের কুসংস্কার উচ্ছেদ করতে হবে। রবীন্দ্রনাথও একই সিদ্ধান্তে এসে একই নির্দেশ দিয়েছেন, একথা আগেই বলেছি। তাঁর মতে অর্থনৈতিক পরিবর্তন এবং শিক্ষাপ্রাপ্ত স্বাধীন মনই 'বাল্য বিবাহের' সংস্কার উচ্ছেদ করবে। 'আইনের জোরে' বা 'বক্তৃতার তোড়ে' তা বন্ধ হবে না। আর একটি সামাজিক সমস্যা 'বহুবিবাহ' সম্পর্কেও বঙ্কিমের নির্দেশ একই প্রকার—"বহুবিবাহ অতি কুপ্রথা। বহুবিবাহ এদেশে স্বতঃই তাহা নিবারিত হইয়া আসিতেছে,...সুশিক্ষার ফলে উহা অবশ্যই লুপ্ত হইবে। ...বহুবিবাহ নিবারণের জন্য আইনের প্রয়োজন নাই।"

উক্ত প্রবন্ধে বঙ্কিমের আর একটি মূল্যবান ইঙ্গিত উল্লেখযোগ্য—"এ দেশে অর্দ্ধেক হিন্দু, অর্দ্ধেক মুসলমান। যদি বহুবিবাহ নিবারণ জন্য আইন হওয়া উচিত হয় তবে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্বন্ধেই সে আইন হওয়া উচিত। হিন্দুর পক্ষে বহুবিবাহ মন্দ, মুসলমানের পক্ষে ভাল, এমত নহে।" বস্তুত

'বহুবিবাহ' প্রবন্ধে বিদ্যাসাগরের সমাজ-সংস্কার-আন্দোলনের প্রতিকূলতা ছিল কতটা, এ সম্পর্কে বিতর্কে প্রবেশ না করেও, বঙ্কিমের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির একটা মিল খুঁজে পাচ্ছি। দুজনেরই বিচারের নিষ্কর্ষ, শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত সামাজিক ত্রুটিগুলি দূর হয়ে যাবে।

এ পর্যন্ত লক্ষ্য করেছি, হিন্দু-বিবাহে স্বামী-স্ত্রীর অসাম্য সম্পর্কে বঙ্কিম প্রথম যুগে সোচ্চার, পরবর্তী যুগে হিন্দু আদর্শবাদী। এবার রবীন্দ্রনাথের মনোভঙ্গি এ সম্পর্কে বিবেচ্য। 'ভারতবর্ষীয় বিবাহ'-নিবন্ধে ভারতীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে গৌরববোধ আছে, আবার পাশ্চাত্যের বিবাহ বিধির সঙ্গে তুলনা করে ভারতীয় বিবাহের মূল ত্রুটি—বিশেষত নরনারীর সম্পর্কের ত্রুটি উদ্‌ঘাটনের প্রয়াসও আছে। প্রবন্ধ শেষে সংগঠনমূলক ইঙ্গিতও লক্ষণীয়।

ভারতীয় বিবাহের পটভূমিতে হিন্দু গৃহস্থাশ্রমের স্বীকৃতি ছিল, রামায়ণের আদর্শে যেখানে ধর্ম সাধনের জন্য মুক্তির সোপান স্বরূপ ছিল গৃহস্থাশ্রম। ঐ গার্হস্থ্য সমাজের প্রয়োজনে বিবাহ সম্পর্কে 'জবরদস্তি চলে,'—তা অবশ্য লেখক লক্ষ্য করেছেন। হিন্দু বিবাহে ব্যক্তি বিশেষের রুচি ও প্রবৃত্তির খর্বতা যেন য়ুরোপীয় জাতির যুদ্ধকালীন কন্‌স্ক্রিপ্‌শনের মত। হিন্দু সমাজে স্থায়ী যুদ্ধকালীন অবস্থা রয়ে গেল, তাই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের খর্বতা—"আমাদের সমাজে···সকলের চেয়ে বেশি বিবাহে, কারণ বিবাহ গৃহবন্ধনের মূলে এবং গৃহই আমাদের সমাজের মূলভূত।" সমাজের এই নিষেধ যেন আধুনিক য়ুরোপীয় 'ফ্যাসিজম্' এর প্রতিরূপ। অর্থাৎ ভারতীয় বিবাহ-বিধি সামাজিক প্রয়োজনেই ভাবাবেগবর্জিত, সৌজাত্যের (Eugenics) প্রতি নিবদ্ধদৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথ তুলনা করে দেখালেন যে য়ুরোপীয় সমাজের মূল প্রকৃতি সাম্প্রদায়িক, "অর্থাৎ শ্রেণী বিশেষের আচার-ধারাকে রক্ষা করার দ্বারা তার ধর্মকে (culture) বিশুদ্ধ রাখার ব্যবস্থাতন্ত্র।" রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্লেষণ যথার্থ। কুমারসম্ভবের সাধনার জন্যই বিবাহ, ব্যক্তিগত ইচ্ছা সম্পূর্ণ লুপ্ত, "আমাদের দেশ বলেছিল স্বেচ্ছাউদ্‌গত প্রেমের উপর ভরসা নেই, প্রেমের চাষ করতে হবে।" স্বামী বলে একটি ভাবকে বালিকারা পোষণ করে বলেই বিরোধ বাধে না, কিন্তু স্ত্রী পুরুষের অধিকারের সাম্য নিশ্চয়ই নেই। দাম্পত্য প্রেমের 'আইডিয়া' গড়ে তোলার সাধনা ভারতীয় সমাজের ছিল, কিন্তু সমস্যা থেকে গেল অন্যত্র। ভারতীয় সমাজ "বিচারকে শ্রদ্ধা করতে সাহস করে নি, আচারকেই একান্তভাবে অবলম্বন করেছে, প্রধানতঃ এর বন্ধন আভ্যন্তরিক স্নায়ুশিরায় নয়, বাহ্যিক জোড়াতাড়ায়।" তাই আজ ভারতবাসী 'পরিত্যক্ত গৃহগুহায় বন্দী', ভারতীয় সমাজের বিবাহ

প্রথার বিকৃতি সুস্পষ্ট। এই প্রথার সর্বাধিক দুর্বলতা রবীন্দ্রনাথের মতে—

"স্ত্রী পুরুষের পরস্পর মধ্যগত শক্তিক্রিয়ার অবকাশকে একেবারে বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে।" অর্থাৎ পুরুষের সৃষ্টিকার্যে নারীস্বভাবের অনির্বচনীয় মাধুর্য যোগটুকু নেই। কেবল ভারতীয় সমাজেই নয়, পৃথিবীর প্রায় সবদেশেই নারী গৃহপিঞ্জরে বন্দিনী, নারী প্রকৃতির এই দৈন্য নিখিলবিশ্বের প্রতিনিধিরূপে রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন, "বিবাহ এখনো সকল দেশেই ন্যূনাধিক পরিমাণে নারীকে বন্দী করে রাখবার পিঞ্জর। তার পাহারাওয়ালা পুরুষ প্রভুত্বের তকমা পরা।" ঠিক বঙ্কিমচন্দ্র যেমনটি বলেছিলেন, 'স্ত্রীগণ সকল দেশেই পুরুষের দাসী', আর ভারতবর্ষে? 'তুমি বিধানকর্তা পুরুষ, তোমার সুতরাং পোয়া বারো।'

তাই রবীন্দ্রনাথ 'আমাদের সর্বব্যাপী শক্তিহীনতার' প্রধান কারণ নির্দেশ প্রসঙ্গে বললেন—"নারীর মাধুর্য বিলাস সামগ্রী নয়, তা যে মানুষের সকল সাধনাতেও পরম সম্পদ একথা বোঝবার মতো সময় তার আজও হল না।" এবং তাঁর বিশ্বাস মানুষের সভ্যতা আধ্যাত্মিক অবস্থায় উত্তীর্ণ হলে নারীর মাধুর্যশক্তি মুখ্যরূপে স্বীকৃতি পাবে। অন্যত্রও ঠিক এই প্রত্যয় ধ্বনিত— "আমাদের দেশেও কৃত্রিম বন্ধন-মুক্ত মেয়েরা যখন আপন পূর্ণ মনুষ্যত্বের মহিমা লাভ করবে তখন পুরুষও পাবে আপনার পূর্ণতা।" (নারীর মনুষ্যত্ব—১৩৩৫)

এবার এই প্রসঙ্গভুক্ত সমস্যাটির সমাধানমূলক ইঙ্গিতগুলি সূত্রবদ্ধ করা চলে। বঙ্কিম সামাজিক বৈষম্য দূর করার জন্য নিম্নলিখিত পরামর্শ দিয়েছিলেন 'সাম্য' প্রবন্ধ শেষে—

ক. স্ত্রী-শিক্ষার প্রচলন হোক।

খ. বিধবা-বিবাহ ভাল কি মন্দ বিচার না করে পুরুষ ও নারীর পুনর্বিবাহের অধিকার সমভাবে স্বীকৃত হোক।

গ. গৃহপিঞ্জরে নারীকে বন্দী করে রাখার পুরুষ অধিকার লুপ্ত হোক।

ঘ. পুরুষগণের বহু বিবাহের অধিকার নীতিবিরুদ্ধ ঘোষিত হোক।

ঙ. পৈতৃক সম্পত্তিতে কন্যার অধিকার স্বীকৃত হোক।

কিন্তু সর্বাগ্রে অবশ্যই একথা স্মরণ্য—'শিক্ষাই সকল প্রকার সামাজিক অমঙ্গল নিবারণের উপায়।'

চ. হিন্দু ধর্মানুমোদিত দম্পতিপ্রীতি সকলের আদর্শ হোক।

রবীন্দ্রনাথ মেয়েদের কৃত্রিম বন্ধন মুক্তির ঘোষণা করেছিলেন—

"নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার—"

তাঁর মতে কেবলমাত্র সামাজিক ও বৈষয়িক অধিকারেই (বঙ্কিম 'সাম্য' প্রবন্ধে যেগুলি উল্লেখ করেছিলেন) নারীর মনুষ্যত্ব উন্মোচিত হবে না; তার জন্য চাই (ক) আত্মোপলব্ধির স্বীকৃতি। কারণ—

নারীর ভিতর দিয়ে বিচিত্র রসময় প্রাণের প্রবর্তনা যদি পুরুষের উদ্যমের মধ্যে সঞ্চারিত হবার বাধা পায় তা হলেই তার সৃষ্টিতে যন্ত্রের প্রাধান্য ঘটে।...এই ভাবটা আমার 'রক্তকরবী' নাটকের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। ...পুরুষের অধ্যবসায়ের কোথাও সমাপ্তি নেই, এইজন্যই সুসমাপ্তির সুধারসের জন্য তার অধ্যবসায়ের মধ্যে একটা প্রবল তৃষ্ণা আছে। মেয়েদের হৃদয়ের মাধুর্য তাকে এই রসই পান করায়। —পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারী

(খ) নারীকে বৃহৎ সংসারের দায়িত্ব স্বীকার করতে এগিয়ে আসতে হবে, কারণ—

আজ পৃথিবীর সর্বত্রই মেয়েরা ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে বিশ্বের উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে এসে দাঁড়িয়েছে। এখন এই বৃহৎ সংসারের দায়িত্ব তাদের স্বীকার করতেই হবে, নইলে তাদের লজ্জা, তাদের অকৃতার্থতা। —নারী ১৩৪৩

অর্থাৎ পৃথিবীর নতুন যুগে 'একঝোঁকা সভ্যতার' অনেকটা সম্পদ মেয়েদের হৃদয় ভাণ্ডারে ছিল, রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস—'আজ ভাণ্ডারের দ্বার খুলেছে'।

মোটকথা, রবীন্দ্র-প্রত্যয় এই, নারীশক্তির নিগূঢ় মাধুর্যের প্রবর্তনা আধুনিক সভ্যতাকে কল্যাণী মূর্তিতে প্রকাশ করবে। সমাজ-চিন্তাবিদ রবীন্দ্রনাথ নিছক কাব্য স্বরূপেই নারীকে আদর্শায়িত করেন নি, বিশ্বসংস্কৃতির সার্থক রূপায়ণে নারীর কল্যাণী রূপকে বাস্তব জীবনক্ষেত্রে আহ্বান জানিয়েছেন। বঙ্কিম দিয়েছিলেন দম্পতিপ্রীতির অনুশীলনের প্রবর্তনা, রবীন্দ্রনাথ স্বীকৃতি দিলেন নারীর মাধুর্যশক্তির উদ্বোধনকে। দুজনের মনোভঙ্গির সূক্ষ্ম পার্থক্য এখানেই।

এপর্যন্ত দুটি সমাজ সমস্যার বিশ্লেষণ ও তার প্রতিবিধানের উপায় নির্ধারণে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-চেতনার প্রকাশ লক্ষ্য করা গেল। 'জীবিকা' শীর্ষক তৃতীয় বিষয়টি সংগঠনমূলক সমাজচিন্তা প্রসঙ্গে একযোগেই আলোচনা করা সুবিধাজনক হবে। অবশিষ্ট বিষয়টি 'শিল্পসংস্কৃতি',—এবারে সে সম্পর্কেই বিচার করা যেতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তা একদিকে যেমন বাংলার তথা ভারতের লোকবৃত্ত অনুসন্ধান করেছে অন্যদিকে তেমনি লোকসংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ প্রকাশগুলির প্রতিও আমাদের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এব্যাপারে পূর্বসূরী ও উত্তরসূরী উভয়েরই দৃষ্টিভঙ্গি ইতিহাসচেতনার গৌরববোধে জাগ্রত। তাঁরা সমাজ-

ইতিহাসের সার্থকতম অভিব্যক্তিগুলিকে বর্তমানের উল্লাসিকতার দরবারে উপস্থিত করে ভারতীয় শিল্প সংস্কৃতির প্রতি আমাদের আগ্রহী করে তোলার ব্রতে একনিষ্ঠ। এই শিল্পসংস্কৃতি বলতে স্থাপত্যকলা, ভাস্কর্য, চিত্রশিল্প, নৃত্যকলা, সঙ্গীত প্রভৃতি সূক্ষ্ম শিল্পকলার সঙ্গে সাহিত্যকেও গ্রহণ করেছি। সবগুলির সম্পূর্ণাঙ্গ আলোচনা আমাদের মূল আলোচ্য স্বদেশচিন্তার একটি সংক্ষিপ্ত পরিধিতে সম্ভব নয়। শুধুমাত্র সমাজচিন্তার অন্যতম আশ্রয় রূপে উভয়ের শিল্পসংস্কৃতি বিষয়ক অভিমতগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনাই যথেষ্ট হবে।

ভারতীয় সূক্ষ্মশিল্পের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের অনুরাগ সর্বপ্রথম অভিব্যক্ত হয় 'আর্যজাতির সূক্ষ্মশিল্প' প্রবন্ধে—"সৌন্দর্য্যজনিত সুখ চির নূতন এবং চিরপ্রীতিকর।...যে বাল্মীকি, চিরকালের জন্য কোটি কোটি মনুষ্যের অক্ষয় সুখ এবং চিত্তোৎকর্ষের উপায় বিধান করিয়াছেন, তিনি যশের মন্দিরে নিউটন, হার্বি, ওয়াট বা জেনরের নিম্নে স্থান পাইবার যোগ্য নহেন।" ইতিপূর্বে লক্ষ্য করেছি, বঙ্কিম সুখের মাপকাঠিতে রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্যের মূল্যায়ন করেছেন, এখানেও দেখছি, সুখ ও আনন্দের মাপকাঠিতে সাহিত্য ও শিল্পকে বিচার করছেন। তাঁর মতে, "কাব্য সঙ্গীত, নৃত্য, ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য এবং চিত্র এই ছয়টি সৌন্দর্যজনিকা বিদ্যা।" য়ুরোপে যেগুলি সূক্ষ্মশিল্প বলে অভিহিত—"সৌন্দর্যপ্রসূতি এই ছয়টি বিদ্যায় মনুষ্যজীবন ভূষিত ও সুখময় করে। ভাগ্যহীন বাঙ্গালির কপালে এ সুখ নাই। সূক্ষ্ম শিল্পের সঙ্গে তাহার বড় বিরোধ।...বাঙ্গালি সুখী হইতে জানে না।" সৌন্দর্যজনিকা বিদ্যার প্রতি বাঙালির অনাদর ও ঘৃণার জন্য বঙ্কিমের আক্ষেপ লক্ষণীয়,—"কতকটা বাঙ্গালির সামাজিক রীতির দোষ,...শূকরশালা তুল্য কদর্য স্থানে বাস করিতে হইবে, ইহাই সামাজিক রীতি।...কতকটা হিন্দুধর্ম্মের দোষ, যে ধর্ম্মানুসারে উৎকৃষ্ট মর্মরপ্রস্তুত হর্ম্যও গোময় লেপনে পরিষ্কৃত করিতে হইবে, তাহার প্রসাদে সূক্ষ্মশিল্পের দুর্দ্দশারই সম্ভাবনা।"

"নৃত্যগীত—সে সকল বুঝি বাঙ্গালা হইতে উঠিয়া গেল। সৌন্দর্য বিচার-শক্তি, সৌন্দর্যরসাস্বাদনসুখ, বুঝি বিধাতা বাঙ্গালির কপালে লিখেন নাই।"

—আর্য্যজাতির সূক্ষ্মশিল্প

এর আগে 'জ্ঞান সম্বন্ধে দার্শনিক মত' প্রসঙ্গে বঙ্কিম ভারতীয় সাহিত্য, দর্শন, গণিত শাস্ত্র, স্থাপত্য, সঙ্গীত, ব্যবস্থাশাস্ত্র, ঐশ্বর্য ও বাহুবলে ভারতভূমিকে ভূমণ্ডলের রাজ্ঞীস্বরূপা বলে প্রশস্তি উচ্চারণ করেছিলেন। কিন্তু বাংলা দেশে সঙ্গীতের অনাদরে দুঃখ প্রকাশও তাতে ছিল, যদিও তিনি 'ন্যায়শাস্ত্রে বাঙ্গালিরা অদ্বিতীয়'—একথা সগর্বে উচ্চারণ করেছেন। একদিকে ভারতীয় শিল্প-সাহিত্য

সংস্কৃতির গৌরববোধ, অন্যদিকে বাংলায় তার অনাদরে লজ্জাবোধ—বঙ্কিমমানসে ঐ দুইই পাশাপাশি বর্তমান। 'সীতারাম' উপন্যাস হতেও এর দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করা যায়—ললিতগিরির স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের বর্ণনায় বঙ্কিম হিন্দু গৌরবে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন—

> পাথর এমন করিয়া যে পালিশ করিয়াছিল সে কি এই আমাদের মতো হিন্দু ?···তখন হিন্দুকে মনে পড়িল। তখন মনে পড়িল উপনিষদ, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, পাণিনি, কাত্যায়ন, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত, বৈশেষিক এ সকলই হিন্দুর কীর্তি—এ পুতুল কোন ছার।

ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের সঙ্গে হিন্দুর সাহিত্য দর্শন সবই স্মরণ করেছেন লেখক। পরবর্তীকালে এমনি করে ভুবনেশ্বর মন্দিরদর্শনে রবীন্দ্রনাথও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলেছিলেন—"বেশ বুঝিলাম এই পাথরগুলির মধ্যে কথা আছে।" বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দু ঐতিহ্য গৌরবে উদ্দীপ্ত, রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও হিন্দু সংস্কৃতির নিবিড় মিলনে আনন্দিত, কারণ—"বুদ্ধদেব যে অভ্রভেদী মন্দির রচনা করিলেন নবপ্রবুদ্ধ হিন্দু তাহারই মধ্যে তাহার দেবতাকে লাভ করিল।"

—মন্দির, 'বিচিত্র প্রবন্ধ'

বঙ্কিম আক্ষেপ করেছিলেন, 'নৃত্যগীত সে সকল বুঝি বাঙ্গালা হইতে উঠিয়া গেল।' বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতির অন্তর্মুখী কল্পধারাটি অনুসন্ধান করার সময় ও সুযোগ বঙ্কিমের ছিল না, অবশ্য এসম্পর্কে তিনি যে সচেতন ছিলেন সেকথা নিজেই বলেছেন। একদিন গঙ্গাতীরস্থ ভবনে বসেছিলেন, "এমন সময়ে গঙ্গাবক্ষ হইতে মধুর সঙ্গীতধ্বনি শুনা গেল। জেলে জাল বাহিতে বাহিতে গায়িতেছে—'সাধো আছে মা মনে। দুর্গা বলে প্রাণ ত্যজিব জাহ্নবী জীবনে', তখন প্রাণ জুড়াইল—মনের সুর মিলিল—বাঙ্গালা ভাষায় বাঙালির মনের আশা শুনিতে পাইলাম।" অতএব বঙ্কিম সংকল্প গ্রহণ করলেন,—"বাঙ্গালি নাম রাখিতে হইবে। জননী জন্মভূমিকে ভালবাসিতে হইবে। যাহা মার প্রসাদ তাহা যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিতে হইবে। এই দেশী জিনিষগুলি মার প্রসাদ।" (ঈশ্বরগুপ্তের কবিতাসংগ্রহ, ভূমিকা) মার প্রসাদ তুলে রাখার সংকল্প বঙ্কিমের অবশ্যই ছিল, কিন্তু জীবন মধ্যাহ্নেই তাঁর তিরোধানে উক্ত সংকল্প সিদ্ধ হতে পায়নি। সে দায়িত্ব পালন করলেন তাঁর উত্তরসূরী। বঙ্কিমের সংকল্পের বীজটি রবীন্দ্রমানসে মহীরুহের সৃষ্টি করেছিল। স্বদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস সম্যকরূপে অনুশীলন করতে হলে প্রাকৃত জনকীর্তি-ধারার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় থাকার প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সেই

প্রত্যক্ষ পরিচয় সংগ্রহ করেছেন—স্বদেশবাসীকেও সেই কর্মে আহ্বান জানিয়েছেন। লোকসাহিত্য ও লোক-সংস্কৃতির অনুসন্ধানে তাঁর অনুরাগ ছিল অপরিসীম।

'ভারতী' পত্রিকায় 'সংগীত সংগ্রহ' নামে বাউল গানের সমালোচনা তিনি প্রকাশ করেন ১২৯০ সালে। তৎকালেই তিনি জনচিত্তের গভীরে ডুব দিয়ে সংস্কৃতির মণিমাণিক্য তুলে এনেছিলেন—

"হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে
দেশবিদেশে বেড়াই ঘুরে।"

বস্তুত লালন ফকিরের এই গানটি তাঁর লোকসংস্কৃতি-অনুসন্ধানের মন্ত্রস্বরূপ (বা 'মটো') হয়ে উঠেছিল; শিলাইদহে এবং শান্তিনিকেতনে সেই অনুসন্ধানই তিনি করেছেন,—গ্রাম্যছড়া, ব্রতকথা, বাউল ভাটিয়ালি প্রভৃতি লোকসংগীত তাঁর সঞ্চয়ে সবই ঠাঁই পেয়েছে। 'দেশী জিনিষগুলি মার প্রসাদ'—বঙ্কিমের এই নির্দেশ রবীন্দ্রনাথের মত এমন করে আর কেউ অনুসরণ করেন নি; তাই 'সাধনা'-তে 'ছেলেভুলানো ছড়া' (১৩০১) সংগ্রহ হতে শুরু হয়েছিল; তারপর 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা' (১৩০১-০২), 'ভারতী' (১৩০৫), 'প্রবাসী' ('হারামনি' বিভাগ) প্রভৃতি পত্রিকায় ঐ সঞ্চয়গুলি অজস্রধাবে পরিবেশিত হয়েছিল।[১০] সত্যই, "যাহারা স্বদেশকে অন্তরের সহিত ভালবাসে তাহারা স্বদেশের সহিত সর্বতোভাবে অন্তরঙ্গরূপে পরিচিত হইতে চাহে—এবং ছড়া, রূপকথা, ব্রতকথা প্রভৃতি ব্যতিরেকে সেই পরিচয় কখনও সম্পূর্ণতা লাভ করে না।" ('মেয়েলি ব্রত' সংকলনের ভূমিকা—অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় সংকলিত)

জনকৃতির পুনরুদ্ধার ও পুনরনুশীলনে রবীন্দ্রনাথের এই আগ্রহ ও মমত্ববোধ তৎকালে অভিনব ছিল, বর্তমানেও তার মর্যাদা অপরিসীম। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে লোকসংস্কৃতির মর্যাদা কী ছিল সে সম্পর্কে একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি—

> আমরা নৃতত্ত্ব অর্থাৎ Ethnology-র বই যে পড়ি না তাহা নহে, কিন্তু যখন দেখিতে পাই, সেই বই পড়ার দরুণ আমাদের ঘরের পাশে যে হাড়ি ডোম কৈবর্ত বাগদি রহিয়াছে—তাহাদের সম্পূর্ণ পরিচয় পাইবার জন্য আমাদের লেশমাত্র ঔৎসুক্য জন্মে না, তখনই বুঝিতে পারি, পুঁথি সম্বন্ধে আমাদের কতো বড একটা কুসংস্কার জন্মিয়া গেছে···
>
> —ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ

তাই ছাত্রদের তিনি আহ্বান করলেন প্রত্যক্ষ সামাজিক অনুসন্ধানকার্যে। তিনি নিজেও লোকসংস্কৃতির কত নিদর্শন সংগ্রহ করে 'ফোক মিউজিয়াম'

করেছিলেন—তার তালিকা কবি মোহিতলাল দিয়েছেন, "সেখানে খড়ের চালাঘরের নানা নমুনা, মেয়েদের আলপনা চক্র, শিকে, কাঁথা এ সবই 'মায়ের প্রসাদ' রূপেই সংগৃহীত হয়েছিল।"[১১] আবার এ-সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রমুখ নানা জনকে উৎসাহিত করেছিলেন তিনি, তার প্রমাণ তাঁর লেখা চিঠি হতেই দিচ্ছি—"জনসাধারণের মধ্যে মাটির, কাঠের, বাঁশের বা বেতের শিল্পকাজ কি রকম চলিত আছে ভাল করে খোঁজ নেবেন। আমরা বাংলার প্রত্যেক জেলা থেকে এই সমস্ত গণশিল্প সংগ্রহ করতে ব্রতী।"

—সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে লেখা পত্র, ১লা পৌষ, ১৩২২

এ-সম্পর্কে সমালোচকের একটি মন্তব্য যথার্থ—

> লোকায়ত সংস্কৃতির বহুমুখী ধারার সঙ্গে বিজ্ঞানীর দৃষ্টি ও নিষ্ঠা নিয়ে প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভের জন্য তিনি নবীন বয়স থেকে প্রবীণত্বের প্রান্ত পর্যন্ত উন্মুখ হয়েছিলেন স্বদেশের লোকসমাজের প্রকৃত ইতিহাস জানবার জন্য।… তাঁর সমাজচিন্তা ও শিল্পচিন্তা এক হয়ে মিশে গিয়েছিল।

—'রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার লোকসংস্কৃতি'—শ্রী বিনয় ঘোষ

বাস্তবিকই 'সমাজচিন্তা ও শিল্পচিন্তা এক হয়েই'—লোকায়ত সংস্কৃতির পরিচয় সংগ্রহে রবীন্দ্রনাথকে ব্রতী করেছিল, আবার যুগ্ম চেতনাই তাঁকে প্রাচীন সাহিত্য সংস্কৃতির উৎস নিরূপণে প্রেরণা দিয়েছিল। আমরা লক্ষ্য করেছি 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা'—অনুসরণকালে রামায়ণ ও মহাভারতের মত মহাকাব্যের মধ্যে গ্রথিত সমাজ-ইতিহাসের ইঙ্গিতগুলি তিনি গ্রহণ করেছিলেন কারণ, "গোড়ায় ভারতবর্ষের দুই মহাকাব্যের মূল বিষয় ছিল সেই প্রাচীন সমাজ বিপ্লব…।" অর্থাৎ ঐ সব ইতিহাসকে ঘটনামূলক না ধরে ভাবমূলক ধরে সমাজ সত্য (তথ্য নয়) বিশ্লেষণ করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন সাহিত্যের নানা প্রবন্ধেও সমাজ ইতিহাসের সত্য উপলব্ধির প্রয়াসটি তাঁর রস-বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গেই দেখা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র আক্ষেপ করেছিলেন, "সৌন্দর্যবিচারশক্তি সৌন্দর্যরসাস্বাদন সুখ বুঝি বিধাতা বাঙ্গালীর কপালে লিখেন নাই।" তাই 'ধর্ম্মতত্ত্বে' 'চিত্তরঞ্জিনী'-বৃত্তির অনুশীলনের নির্দেশ দিয়েছিলেন বঙ্কিম এবং ইতিপূর্বে তিনি স্বয়ং এই অনুশীলনে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর আরও উদ্দেশ্য ছিল সাহিত্যের মাধ্যমে সমাজ ও কালের গতি নিরূপণ। এ-প্রসঙ্গে 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধে কাব্য সমালোচনা প্রসঙ্গটি উল্লেখ্য—"সাহিত্য দেশের অবস্থা এবং জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্ব মাত্র। যে সকল নিয়মানুসারে দেশভেদে রাজাবিপ্লবের প্রকারভেদ, সমাজ-

বিপ্লবের প্রকারভেদ, ধর্মবিপ্লবের প্রকারভেদ ঘটে, সাহিত্যের বিপ্লবের প্রকারভেদ সেইসকল কারণেই ঘটে।" অতএব বঙ্কিমচন্দ্র ভারতবর্ষীয় সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি রামায়ণ ও মহাভারত হতে নির্দেশ করে সমাজচিত্র অঙ্কন করলেন—

> প্রথম ভারতীয় আর্য্যগণ অনার্য্য আদিমবাসীদিগের সহিত বিবাদে ব্যস্ত, তখন ভারতবর্ষীয়েরা…বিজয়ী বীর জাতি সেই জাতীয় চরিত্রের ফল রামায়ণ।
>
> …ভারতবর্ষ আর্য্যগণের করস্থ…ভোগ্য…। তখন আর্য্যপৌরুষ চরমে দাঁড়াইয়াছে।…এই সময়ের কাব্য মহাভারত।

আবার ভারতবর্ষীয়েরা যখন সুখী ও কৃতী—তখন রচিত হল ভক্তিশাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্র। তারপর ধর্ম শৃঙ্খলে নিবদ্ধ ভারতবর্ষের ধর্মমোহের ফল পুরাণ। অন্যদিকে এই সময়ই, "বিলাসিতার স্রোত বহিতে লাগিল। তাহার ফল কালিদাসের কাব্যনাটকাদি।" (বিদ্যাপতি ও জয়দেব)

দেখা যাচ্ছে, জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্ব-স্বরূপ সাহিত্যের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে বঙ্কিমচন্দ্রই পথিকৃৎ। এদিক দিয়েও রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী, এ প্রসঙ্গে অসংখ্য উদ্ধৃতি না দিয়ে দু'একটি উল্লেখ করছি—

> রামায়ণ-মহাভারতকে কেবলমাত্র মহাকাব্য বলিলে চলিবে না, তাহা ইতিহাসও বটে।…ভারতবর্ষের যাহা সাধনা, যাহা আরাধনা, যাহা সংকল্প তাহারই ইতিহাস এই দুই বিপুল কাব্যহর্ম্যের মধ্যে চিরকালের সিংহাসনে বিরাজমান। —'রামায়ণ' ১৩১০
>
> ভগবদ্‌গীতায় ভারতবর্ষ যেমন আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে,…ধম্মপদেও ভারতবর্ষের চিত্তের একটি পরিচয় তেমনি ব্যক্ত হইয়াছে।…এখানে আমরা ইতিহাসের দিক হইতে বিষয়টা দেখিতেছি।
>
> মহাভারতে বর্ণিত ভারত এবং বর্তমান শতাব্দীর ভারত নানা বড়ো বড়ো বিষয়ে বিভিন্ন হইলেও উভয়ের মধ্যে নাড়ীর যোগ বিচ্ছিন্ন হয় নাই। …সেই যোগই ভারতবর্ষের পক্ষে সর্বাপেক্ষা সত্য এবং সেই যোগের ইতিহাসই ভারতবর্ষের যথার্থ ইতিহাস। —ধম্মপদং ১৩১২

উক্ত যোগের ইতিহাস বা সমাজসংস্কৃতির ভাবমূলক ইতিহাস স্বরূপ প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য— পুরাণগুলিকে রস বিশ্লেষণের মাধ্যমে পরিবেশন করাতে উত্তরসূরী রবীন্দ্রনাথের অবদান স্মরণযোগ্য। ভারতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্রে এর মূল্য অপরিসীম। অবশ্য 'প্রাচীন সাহিত্য'-এর রসবিশ্লেষণের সঙ্গে প্রাচীন সমাজ ও জনচিত্তের প্রতিবিম্বটি তুলে ধরার দৃষ্টিভঙ্গি

আদর্শায়িত। এখানে কবি রবীন্দ্রনাথ যেন নতুন করে অঙ্কন করেছেন প্রাচীন সাহিত্য-চিত্রগুলি, এবং তার ফলে কালিদাস, ভবভূতি, বাণভট্ট প্রমুখ অমর স্রষ্টারা রসজ্ঞ দ্রষ্টার চোখে নতুন রূপে উদ্ভাসিত হয়েছেন। তথাপি স্মরণ রাখতে হবে—

"প্রাচীনভারতচেতনা ও ইতিহাসবোধের সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতি চেতনাও অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। একটি আর একটির অপরিহার্য পরিণাম। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে ঐ সংস্কৃতিচেতনার অন্যতম মুখ্য উৎস কালিদাসের কাব্য।"

—'রবীন্দ্র দৃষ্টিতে কালিদাস', শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন

মন্তব্যটি যথার্থ। এবার এর সঙ্গে বঙ্কিমের দৃষ্টিভঙ্গির তুলনা করা যেতে পারে। কালিদাসের নাটক 'শকুন্তলা'কে শেক্সপীয়রের 'টেম্পেস্ট' ও 'ওথেলো' নাটকদুটির সঙ্গে তুলনা করে 'সৌন্দর্য রসাস্বাদন সুখ' অনুভব করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। এই রসবিশ্লেষণ অপূর্ব—"শকুন্তলা চিত্রকরের চিত্র, দেসদিমোনা ভাস্করের গঠিত সজীবপ্রায় গঠন। ...শকুন্তলা অর্দ্ধেক মিরন্দা, অর্দ্ধেক দেসদি-মোনা।" আর কালিদাস ও ভবভূতির তুলনায় একটি মাত্র মন্তব্যই যথেষ্ট—"মধুরে কালিদাস অদ্বিতীয়—উৎকটে ভবভূতি।" (উত্তরচরিত)। বঙ্কিমের চোখে কালিদাস শুধু মধুর,—শুধু ভোগবিলাসের যুগের ফলশ্রুতি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কালিদাসকে শুধু সৌন্দর্যসর্বস্ব কবি বলে মনে করেন নি, তাঁর প্রেরণাকে কল্যাণমুখী বলেই মনে করেছেন। তাঁর মতে—"কালিদাসকেও একই কালে সৌন্দর্যভোগের ও ভোগবিরতির কবি বলা যাইতে পারে।"

—'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা'

বঙ্কিম কালিদাসের কাব্যরাজিকে বিলাসিতার স্রোতের ফলস্বরূপ বলে মন্তব্য করেছিলেন আর রবীন্দ্রনাথের কথায় কালিদাস—

'জীবনমন্থনবিষ নিজে করি পান
অমৃত যা উঠেছিল করে গেছ দান।' —'কাব্য' চৈতালি

স্বপ্নমুগ্ধ কবির চোখে ভারতের তপোবন আদর্শায়িত হয়ে উঠেছিল যে যুগে, সেই যুগের 'চৈতালি', 'নৈবেদ্য', 'কল্পনা' কাব্যগুলির প্রাচীন ভারতীয় আদর্শের প্রেরণা শক্তি ছিলেন কালিদাস। এইখানে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ধরা পড়ে। ভারতীয় কাব্য-সংস্কৃতির যে ভাবমূর্তিটি বঙ্কিমমানসে প্রতিষ্ঠিত, তার বেদীটি ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও পৌরাণিক হিন্দু সংস্কৃতির ঐশ্বর্যে গাঁথা। আর রবীন্দ্রমানসে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির যে ভাবরূপটি সঞ্চরণ করেছে আদর্শায়িত তপোবনের স্নিগ্ধ বনভূমিতে তা ত্যাগী ব্রাহ্মণ্য

মহিমা এবং করুণাঘন বুদ্ধমহিমার ভাবরসে চিরসিঞ্চিত। ধর্মচিন্তার ক্ষেত্রে উভয়ের এই দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যটি আরও বিশ্লেষণ করা যাবে। এখানে আপাতত এটুকু লক্ষ্য করেছি,—উভয়ের মনোভঙ্গির পার্থক্য আছে—বঙ্কিমের 'উত্তরচরিত' কিংবা রবীন্দ্রনাথের 'কাদম্বরীচিত্র' সমালোচনায়, কিংবা উভয়ের চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির কাব্যের তুলনামূলক আলোচনায়।

এদিকে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের সংস্কৃতি-ইতিহাস বিশ্লেষিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' প্রবন্ধে (১৩০৯)। তাতে বৈষ্ণব-পদাবলী ও শাক্ত সাহিত্যে অঙ্কিত মধ্যযুগীয় সমাজ-চিত্রগুলি পুনরুদ্ভাসিত। বঙ্কিমচন্দ্র অনেকদিন পূর্বে দুটি ইংরাজী প্রবন্ধে এই কাজের সূত্রপাত করেছিলেন।

'A popular Literature for Bengal' (28. 2. 1870) প্রবন্ধে বঙ্কিম জয়দেবের ললিতমধুর কাব্যকে 'অলসবিলাসে নতপ্রাণ' বাঙালির জীবন-দর্পণ বলে ইঙ্গিত করেছিলেন। 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধে এবং 'মানসবিকাশ' শীর্ষক গ্রন্থ সমালোচনায় সে কথা প্রসঙ্গসূত্রে পুনরুক্ত হয়েছে।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'Bengali Literature' (1870)-এ জয়দেব হতে বিদ্যাপতি এবং তারপরে ভারতচন্দ্র পর্যন্ত মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের আলোচনার পর আধুনিক বাংলা সাহিত্যের যুগপ্রবণতার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন বঙ্কিম। এইসূত্রে তিনি বাঙালির জাতীয় সাহিত্য সম্পর্কে আশা ব্যক্ত করেছেন এই ভাবে—

"...and it is possible to imagine that the Bengalees —the Italians of Asia...are now doing a great work."

"...yet has within it what may encourage no small degree of hope for the future..." —Bengali Literature

এমনতর উচ্চাশা আজীবন পোষণ করেছেন রবীন্দ্রনাথও। নানা প্রসঙ্গে তা অভিব্যক্ত হয়েছে। এখানে কেবল 'বাঙ্গালা জাতীয় সাহিত্য' (চৈত্র, ১৩০১) প্রবন্ধ হইতে একটু তুলে দিচ্ছি,—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য "আমাদের নিজের অহংকার নহে, ভাবী বঙ্গদেশের, সম্ভবতঃ ভাবী ভারতবর্ষের অহংকার।" বাস্তবিকই "বঙ্গসাহিত্য আপন অন্তরের মধ্যে এক নূতন প্রাণশক্তি"—একথা বলার অধিকার রবীন্দ্রনাথের নিশ্চয়ই তৎকালেই ছিল, বর্তমানে তা সহস্রগুণে বেশি সত্য।

এ পর্যন্ত ভারতীয় তথা বাঙালি সমাজের ঐতিহাসিক বিবর্তন এবং সামাজিক সমস্যাগুলির নিরপেক্ষ উদ্‌ঘাটনে বঙ্কিম-রবীন্দ্রের নানা পর্যায়ের চিন্তামূলক রচনাগুলি আলোচনা করেছি। জাতিভেদ প্রথা, হিন্দু বিবাহ ও

স্ত্রীপুরুষের সম্পর্ক, এবং ভারতীয় শিল্প-সংস্কৃতি—এই তিনটি প্রসঙ্গে পূর্বসূরী ও উত্তরসূরীর সংগঠনমূলক ইঙ্গিতগুলিও তুলে ধরেছি, তুলনাও করেছি। এবার সংগঠনমূলক সমাজচিন্তার ধারাতে প্রধানত জীবিকা ও অর্থনৈতিক সমাজ কাঠামো সম্পর্কে পর্যালোচনার প্রয়োজন। আমরা জানি, ইতিহাসচেতনা একদিকে যেমন অতীত গৌরবের মহিমাকীর্তন করে, অতীত কলঙ্ক উন্মোচন করে এবং বর্তমানের সমস্যাকে আন্তর্জাতিক ইতিহাসের পটভূমিকায় বিশ্লেষণ করে, তেমনি ঐ চেতনাই মনীষীদের পরবর্তী পর্যায়ে অর্থাৎ সংগঠনমূলক চিন্তায় উপস্থিত করে। রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে যেভাবে আমরা পথপরিক্রমা করেছি সমাজ-চিন্তার তৃতীয় পর্যায়ে আমরা সেই পথই অনুসরণ করব।

তিন.

সংগঠনমূলক স্বদেশচিন্তা—তা কি রাজনীতির ক্ষেত্রে, কি সমাজচিন্তার ক্ষেত্রে—জাতীয় অথবা সামাজিক দোষত্রুটির সুষ্ঠু সমালোচনা ও আত্মসমীক্ষার পরই উপস্থাপিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই এই পর্যায়ক্রমটি অনুসরণ করেছিলেন। আগে রোগ নিরূপণ, তারপরই নিরাময়ের ব্যবস্থা—এই তো স্বাভাবিক। তবে বঙ্কিমচন্দ্র যতটা রোগ নির্ণয়ে আগ্রহী ততটা বাস্তব চিকিৎসাতে নয়, বরং স্বভাব নিরাময় (Nature-cure)-এর দিকেই তাঁর ঝোঁক বেশি। মোটকথা বঙ্কিম সংগঠনমূলক চিন্তা ও কর্মের সংক্ষিপ্ততম ইঙ্গিত দিয়েছেন দু'একটি প্রবন্ধে, আর রবীন্দ্রনাথ ইঙ্গিতের উপর ভরসা না রেখে রীতিমত পরিকল্পনা উপস্থিত করেছেন এবং তাতেও তৃপ্ত না হয়ে স্বয়ং কর্মভূমিতে অবতরণ করে যথাসাধ্য বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপন করার প্রয়াস করেছেন। এমনতর হাতে কলমে সংগঠনমূলক সমাজচিন্তাই রবীন্দ্রনাথের অবদান।

সাহিত্য-সমীক্ষায় দেখেছি বঙ্কিমের আশা, "the Bengalees...are now doing a great work"। অন্যত্রও বাঙালির উন্নতির জন্য তাঁর প্রতীক্ষা অনুভব করেছি—"সামাজিক গতির বলে এ চারিটি (অর্থাৎ উদ্যম, ঐক্য, সাহস ও অধ্যবসায়) বাঙ্গালী চরিত্রের সমবেত হওয়ার অসম্ভাবনা কিছুই নাই।" (বাঙ্গালীর বাহুবল) আর তার ফলশ্রুতি বাহুবল (শারীরিক বল নয়) এবং উন্নতির আশা। কিন্তু উক্ত আশা ধূলিসাৎ হয়ে গেছে বঙ্গদেশের কৃষকদের দুর্দশা দেখে।

এই মঙ্গল ছড়াছড়ির মধ্যে আমার একটি কথা জিজ্ঞাসার আছে, কাহার এত মঙ্গল? হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্ত দুই প্রহরের রৌদ্রে, খালি মাথায় খালি পায়ে এক হাঁটু কাদার উপর দিয়া দুইটা অস্থিচর্মবিশিষ্ট বলদে, ভোঁতা হাল ধার করিয়া আনিয়া চষিতেছে, উহাদের কি মঙ্গল হইয়াছে?… দেশের মঙ্গল কাহার মঙ্গল? তোমার আমার মঙ্গল দেখিতেছি, কিন্তু তুমি আমি কি দেশ? তুমি আমি দেশের কয়জন? আর এই কৃষিজীবী কয়জন?

—বঙ্গদেশের কৃষক

এখানে তীব্র বিদ্যুৎ ঝলকের মতো এক-একটি প্রশ্নচিহ্ন সমাজ ও স্বদেশের দিগন্তে অঙ্কিত হয়ে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে শ্রমজীবী নিরন্নসমাজের প্রতিভূরূপী বিড়ালের প্রশ্নগুলিও মনে আসে, "সমাজের ধনবৃদ্ধির অর্থ ধনীর ধনবৃদ্ধি। ধনীর ধনবৃদ্ধি না হইলে দরিদ্রের কি ক্ষতি?…আমি যদি খাইতে না পাইলাম, তবে সমাজের উন্নতি লইয়া কি করিব?" ('বিড়াল' কমলাকান্তের দপ্তর)

ঠিক তেমনি এখানেও 'বঙ্গদেশের কৃষক'-এর জীবন-মরণ সমস্যার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ দিয়েছেন বঙ্কিম, একের পর এক দুর্দশার চিত্র এঁকে দেশের অবস্থার পরিচয় দিয়েছেন। এর কিছুদিন পূর্বে লিখিত 'সাম্য' প্রবন্ধেও ঐ একই সমস্যাকে কেন্দ্র করে সারা দেশের অর্ধাশনক্লিষ্ট অসহায় শ্রমজীবীদের প্রতি কৃত অবিচার এবং সমাজের অপ্রাকৃত বৈষম্যের মূল কারণগুলি পর্যালোচনা করা হয়েছিল। 'বিড়াল' নিবন্ধে ধনী-দরিদ্রের অসাম্যের প্রতি মৃদুব্যঙ্গ ছিল, কিন্তু 'সাম্যে' তীব্র শ্লেষ ঝলসে উঠেছে—

অমুক বড় লোক, পৃথিবীর যত ক্ষীর, সর, নবনীত সকলই তাঁহাকে উপহার দাও।… আর তুমি, তুমি বড়লোক নহ—তুমি সরিয়া দাঁড়াও, এ পৃথিবীর সামগ্রী কিছুই তোমার জন্য নয়। কেবল এই তীব্রঘাতী লোলায়মান বেত্র তোমার জন্য—বড় লোকের চিত্তরঞ্জনার্থ তোমার পৃষ্ঠের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে ইহার আলাপ হইবে।

অতঃপর বঙ্কিমের সমাজ-সমস্যা-বিশ্লেষণ পাওয়া যাচ্ছে—

সমাজের উন্নতিরোধ বা অবনতির যে সকল কারণ আছে, অপ্রাকৃতিক বৈষম্যের আধিক্যই তাহার প্রধান। ভারতবর্ষের যে এতদিন হইতে এত দুর্দ্দশা, সামাজিক বৈষম্যের আধিক্যই তাহার বিশিষ্ট কারণ।

বঙ্কিম লক্ষ্য করেছেন, উক্ত সামাজিক অসাম্য দূর করার জন্য কোথাও কোথাও বিপ্লবের প্রয়োজন হয়েছে। আমেরিকার দাসপ্রথা উচ্ছেদার্থে, কিংবা ফরাসীদেশে ধনবৈসম্য উচ্ছেদার্থে দুটি বিপ্লব, কখনও বা এমনতর কঠোর

চিকিৎসার প্রয়োজন হয়নি, উপদেষ্টার উপদেশে সাম্য আদৃত হয়েছে। বঙ্কিমের মতে, প্রথম সাম্যাবতার শাক্যসিংহ, যিনি ভারতের বর্ণ-বৈষম্যের বিরুদ্ধে বাণী-প্রচার করেন, দ্বিতীয় যীশুখ্রীষ্ট, যিনি ভ্রাতৃত্বের বাণী-প্রচারক, তৃতীয় রুশো, যিনি প্রচার করেন 'Le Contrat Social' যার ফলে ঘটে রক্তাক্ত ফরাসীবিপ্লব, এই ফরাসী বিপ্লবের নতুন ফল—'কম্যুনিজম' ও 'ইন্টরন্যাশনল'। "ভূমির উপর সকলেরই সমান অধিকার থাকা কর্তব্য", এই নীতি সেদিন প্রচারিত হয়েছিল, যদিও তার নানা রূপান্তর ঘটেছে পরে। "সকলেই সমানভাবে ধনের অধিকারী ইহাই প্রকৃত কম্যুনিজম", এ মতের প্রচারকর্তা ওয়েন, লুইব্লাং, কাবো। এই সূত্রে 'ফুরীরিজম' এবং স্টুয়ার্ট মিলের মতেরও উল্লেখ করা হয়েছে। বঙ্কিম ঐ সবই সাম্যতত্ত্বের অন্তর্ভূত করেছেন। এইভাবে পাশ্চাত্য সমাজ-বিপ্লবের বিস্তৃত পটভূমিকায় বাংলাদেশের একটি নগণ্য কৃষক 'পরাণ মণ্ডলের' জীবনচিত্র অঙ্কন করে চিরস্থায়ী কলঙ্কস্বরূপ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফল এবং জমিদারদের নিষ্ঠুর অত্যাচারের কথা প্রকাশ করলেন বঙ্কিম। এই প্রসঙ্গে সামাজিক বৈষম্যের মূল কারণ রূপে ভারতের জলবায়ু, জনসাধারণের জীবিকা, খাদ্য, সমাজব্যবস্থা, বর্ণবৈষম্য, শিক্ষার অসাম্য, জনসংখ্যাবৃদ্ধি, স্ত্রী-পুরুষের বৈষম্য সবই একে একে উত্থাপিত হয়েছে। কিন্তু বৈষম্যের উচ্ছেদ কি প্রকার হবে তার কোন সুস্পষ্ট বৈপ্লবিক নির্দেশ বঙ্কিম দিলেন না। তবে তাঁর ইঙ্গিত আছে—

(ক) অস্ত্রবল অপেক্ষা বাক্যবল গুরুতর—সমরাপেক্ষা শিক্ষা অধিকতর ফলপ্রদায়িনী।

ঠিক এই কথাই 'বাহুবল ও বাক্যবল' প্রবন্ধেও বলা হয়েছে,—"সামাজিক অত্যাচার নিবারণের বাক্যবল একমাত্র উপায়।"

(খ) মিল একস্থানে বলিয়াছেন, এক্ষণকার যত সুব্যবস্থা তাহা পূর্বতন কুব্যবস্থার সংশোধক মাত্র। ইহা সত্য কথা। কিন্তু সম্পূর্ণ সংশোধন কালসাপেক্ষ।

(গ) এই কলঙ্ক অপনীত করা জমীদারদিগের হাত।··· জমীদারদের কাছেই আমাদের নালিশ।··· অপর জমীদারের নিকট ঘৃণিত, অপমানিত ও সমাজচ্যুত হইবার ভয় থাকিলে অনেক দুর্বৃত্ত জমীদার দুর্বৃত্তি ত্যাগ করিবে।

অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের মতে সদবুদ্ধি-উদ্রেকের জন্য প্রতীক্ষা করাই আপাতত সমীচীন। তৎকালীন পরতন্ত্র শাসন-ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্কিমের ঐ মনোভঙ্গি সঙ্গত বলেই মনে হবে। বরং সেইকালে যখন বলশেভিক বিপ্লব সংঘটিত

হয় নি, 'কম্যুনিজমের'-বাস্তব পরীক্ষাও বাকী, তখনই যে সুষ্ঠু ও প্রগতিশীল বিচারভঙ্গির পরিচয় বঙ্কিমচন্দ্র দিয়েছিলেন তাতে তাঁকে অত্যন্ত বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন স্বদেশচিন্তানায়ক না বলে থাকা যায় না। বঙ্কিম তাঁর প্রবন্ধ শেষে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, বুদ্ধি, মানসিক শক্তি, শিক্ষা, বল প্রভৃতির স্বাভাবিক তারতম্যে অবস্থার তারতম্য ঘটবে। "তবে অধিকারের সাম্য আবশ্যক —কাহারও শক্তি থাকিলে অধিকার নাই, বলিয়া বিমুখ না হয়। সকলের উন্নতির পথ মুক্ত চাহি।" আধুনিকতম রাষ্ট্রীয় সংবিধানের প্রথম সর্তটি অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ ও সর্বদেশস্বীকৃত অধিকারটি তাই। (ইংরাজীতে Equality of justice যাকে বলা যায়।)

'সাম্য' আর পুনঃপ্রকাশিত হয় নি, সম্ভবত রুশোকে বুদ্ধ-যীশুর সমগোত্রীয় মনে করার অসঙ্গতি সম্পর্কে বঙ্কিম সচেতন হয়ে উঠেছিলেন 'ধর্মতত্ত্বে'র যুগে। কিন্তু তদন্তর্ভূত 'বঙ্গদেশের কৃষক' পুনরায় পৃথকভাবে মুদ্রিত হয়েছিল, অর্থাৎ সামাজিক ধনবৈষম্য বিলোপের প্রয়াসে সদবুদ্ধির উদ্রেক[১২] করার মনোভঙ্গিটি তাঁর অপরিবর্তিতই ছিল। তাই বলা যায় বঙ্কিমের সংগঠনমূলক সমাজচিন্তার মূল ঘোষণা ও দাবী বা স্লোগান—

'সকলের উন্নতির পথ মুক্ত চাহি।'

অতঃপর প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে (১২৮০-১৩৩৩) বঙ্কিমের উত্তরসূরী প্রবীণ বয়সে 'রায়তের কথা' (১৩৩৩) প্রসঙ্গে প্রায় একই সমস্যার বিশ্লেষণ করেছেন এবং সমাধানের ইঙ্গিতে বলেছেন—"আসল কথা, যে মানুষ নিজেকে বাঁচাতে জানে না, কোনো আইন তাকে বাঁচাতে পারে না। নিজেকে এই যে বাঁচাবার শক্তি তা জীবনযাত্রার সমগ্রতার মধ্যে, কোনো একটা খাপছাড়া প্রণালীতে নয়।" (রায়তের কথা) কেমন করে সে প্রণালী উদ্ভাবিত হবে তার জবাব কথায় ও কাজে দিচ্ছেন এবং দিতে থাকবেন বলে রবীন্দ্রনাথ তৎকালে আশ্বাসও দিলেন।

ঠিক অর্ধশতাব্দীর পটভূমি-পরিবর্তন, প্রাচ্যের ভারতের ও পাশ্চাত্যের প্রায় সর্বত্র রাজনৈতিক, সামাজিক প্রভৃতি দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ যে সমস্যার বিচার করেছেন, তা সনাতন কিন্তু তার সমাধানের ইঙ্গিত ভিন্নতর। বঙ্কিমচন্দ্র ভরসা করেছিলেন জমিদারদের শুভবুদ্ধি উদয়ের উপর, রবীন্দ্রনাথ ভরসা করেছেন রায়তদের নিজেদের ভিতর হতে উৎসারিত প্রাণশক্তির উপর। রক্তাক্ত বিপ্লবের পন্থা তাঁরও মনঃপূত নয়, সে পন্থা রক্তপাতহীন শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের, এবং তা নিশ্চয়ই 'স্বদেশীসমাজ' এবং

সমবায় আন্দোলনের পথে। বঙ্কিমচন্দ্র ফরাসী বিপ্লবের রক্তাক্তপথকে স্বীকৃতি দেন নি, রবীন্দ্রনাথও অনুরূপ মনোভঙ্গিতে সোভিয়েট বিপ্লবের একটি দশক পরেও বলেছেন—"রাশিয়ার জার-তন্ত্র ও বলশেভিক-তন্ত্র একই দানবের পাশ মোড়া দেওয়া।"

"ইদানীং পশ্চিমে বলশেভিজম্, ফ্যাসিজম্ প্রভৃতি যে সব উদ্‌যোগ দেখা দিয়েছে আমরা যে তার কার্যকারণ তার আকারপ্রকার সুস্পষ্ট বুঝি তা নয়, কেবল মোটের উপর বুঝেছি যে, গুণ্ডাতন্ত্রের আখড়া জমল।" তাই রবীন্দ্রনাথের প্রত্যয় এই, "গোঁয়ার্তুমির দ্বারা উপর ও নিচের অসামঞ্জস্য ঘোচে না। অসামঞ্জস্যের কারণ মানুষের চিত্তবৃত্তির মধ্যে।" —'রায়তের কথা'

মানুষের চিত্তবৃত্তির উদ্বোধন না হলে অসামঞ্জস্য ঘোচে না—এ প্রত্যয় রবীন্দ্রনাথের আজীবন ছিল। কারণ রায়তরাই ক্রমে বড় রায়ত হয়ে ওঠে, তখন "রক্তপিপাসায় বড়ো জোঁকের চেয়ে ছিনে জোঁকের প্রবৃত্তির মধ্যে কোন পার্থক্য" থাকে না। নিজস্ব জমিদারী অভিজ্ঞতায় তিনি 'রায়তখাদক রায়তের সর্বনেশে ক্ষুধার' কথা জানেন, তাই তিনি জমি হস্তান্তর করার বিপক্ষে রায় দিলেন, আর খুচরো উপসর্গের চিকিৎসা না করে মূল রোগের বিনাশার্থে পরামর্শ দিলেন—পল্লীর মধ্যে সমগ্রভাবে প্রাণসঞ্চার করতে। এই তত্ত্বটি তিনি জানিয়েছেন 'সমবায় নীতি' ও 'পল্লীপ্রকৃতি' শীর্ষক নিবন্ধাবলীতে, আর কাজে তা প্রমাণের প্রয়াস করেছেন শিলাইদহে ও শান্তিনিকেতনে। অর্থাৎ এবারে ইতিপূর্বে প্রচারিত 'স্বদেশীসমাজ' পরিকল্পনার সঙ্গে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনমূলক সমবায় পরিকল্পনা সংযোজিত হল। 'স্বদেশী সমাজ' প্রতিষ্ঠার আদর্শ দেশের বৃহত্তর পটভূমিকায় গৃহীত হয় নি, শিলাইদহে কিছুটা পরীক্ষিত হয়েছিল মাত্র, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাতে নিরাশ হন নি। আমরা পূর্বেই বলেছি পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীর অভিভাষণে (১৯০৮) পল্লীউন্নয়ন কার্যের জন্য পুনরায় আহ্বান জানিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, আবার ১৯১৫ খ্রীঃ 'বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলী'-র প্রতিষ্ঠা ভাষণে এবং অন্য আরও দুটি ভাষণে তিনি একটি কর্মসূচী ঘোষণা করেছিলেন, তাতে ছিল—(১) গ্রামের নিরক্ষরদের যৎসামান্য লেখাপড়া ও অঙ্ক শেখানো (২) স্বাস্থ্য-রক্ষা সম্পর্কে শিক্ষাদান (৩) ম্যালেরিয়া যক্ষ্মা ইত্যাদির বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রয়াস (৪) শিশুমৃত্যু নিবারণ (৫) পানীয় জলের ব্যবস্থা (৬) যৌথঋণদান সমিতি প্রতিষ্ঠা (৭) দুর্ভিক্ষ ও বন্যাত্রাণ।

এই পরিকল্পনা কিছুসংখ্যক সেবাব্রতীদের সহায়তায় কার্যকরী করা হল পাতিসর, কামতা, রাতোয়াল, রাণীনগর, সান্তাহার প্রভৃতি অঞ্চলে, আর

পরিকল্পনা রূপায়ণে ব্যয়ের অর্ধেক আসত জমিদারীর আয় থেকে, অর্ধেক চাঁদায়। অর্থাৎ তৎকালে কল্যাণকামী জমিদারের এক আদর্শ দৃষ্টান্ত হয়ে উঠলেন রবীন্দ্রনাথ[১৩]। 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র এমনি উদারপ্রাণ জমিদারের কাছেই প্রতিবিধানের কামনা করেছিলেন। এদিকে ১৯২১ খ্রীঃ শ্রীনিকেতনের কর্মযজ্ঞ সুরু হল এলমহর্স্টের নেতৃত্বে; "কবি গ্রাম সংস্কারে ব্রতী করলেন একদল যুবককে সুরুল গ্রামে,...শ্রীনিকেতনের গ্রামোদ্যোগের জন্ম হল পূর্ব ও পশ্চিমের মিলনে।" বস্তুত শ্রীনিকেতনের শিল্পভবন, কৃষি বিভাগ, শিক্ষাসত্র প্রভৃতি কর্মসূচী রবীন্দ্রনাথের বহুদিনপোষিত আদর্শের বাস্তব রূপায়ণ। 'হিতসাধন মণ্ডলীর' ভাষণে ছিল—

"আমার প্রস্তাব এই যে বাংলাদেশের যেখানে হোক একটি গ্রাম আমরা হাতে নিয়ে তাকে আত্মশাসনের শক্তিতে সম্পূর্ণ উদবোধিত করে তুলি।" ('পল্লীর উন্নতি' ১৩২২) অর্থাৎ ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা নয়, আত্মশক্তির দ্বারাই অন্নদান, জলদান, বিদ্যাদান, স্বাস্থ্যদান ইত্যাদি যজ্ঞ-উদ্‌যাপন করতে হবে, আর পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য একটি মাত্র 'ইউনিট'-ই যথেষ্ট, একটি দীপ হতে আর একটি দীপ আপনিই জ্বলে ওঠে। "আমাদের সাধনাকে যদি ছোট জায়গায় সার্থক করে তুলি, তা হলে বিশ্বের বিধাতা স্বয়ং সেখানে আসেন, এই ক্ষুদ্র চেষ্টার মধ্যে তাঁর শক্তি দান করেন।" ('শ্রীনিকেতন', ১৩৩৪)

রবীন্দ্রনাথ তৎকালীন সন্দেহবাদী রাজনৈতিক নেতাদের অবিশ্বাস এবং সরকারী আশঙ্কা অগ্রাহ্য করে পল্লীসংগঠন সুরু করেছিলেন, তাতে সম্পূর্ণ সাফল্য না এলেও তিনি আস্থা হারাননি কখনও। বেশ লক্ষ্য করা যাচ্ছে, 'স্বদেশী-সমাজ' পরিকল্পনার পরবর্তী রবীন্দ্র-চিন্তাধারাই ছিল 'সমবায়'। ১৯১৮-১৯ খ্রীঃ 'ভাণ্ডার' পত্রিকায় সমবায় সম্পর্কে যে প্রবন্ধ লিখলেন রবীন্দ্রনাথ, তাতে ঋণদানের চেয়ে উৎপাদন সংহতির উপরই তিনি অধিক গুরুত্ব আরোপ করলেন।[১৪] সংক্ষেপে বলা চলে, তিনি পাশ্চাত্য সমবায় তত্ত্বের সঙ্গে নিজস্ব বিশ্বাসগুলি মিলিয়ে দেশের জনসাধারণের কাছে উপস্থিত করলেন তাঁর 'সমবায়' চিন্তাধারা। সমাজ সংগঠক সেবাব্রতী ও শিক্ষাব্রতীদের কাছে নানা ভাষণে, নানা লেখায় তিনি বললেন—"আমার কাছে মনে হয়, এই কো-অপারেটিভ প্রণালী আমাদের দেশকে দারিদ্র্য হইতে বাঁচাইবার একমাত্র উপায়। আমাদের দেশ কেন, পৃথিবীর সকল দেশেই এই প্রণালী একদিন বড়ো হইয়া উঠিবে।" তিনি বিশ্বাসভরে বললেন, দেশের দুঃখের লক্ষণগুলি ভিতর হতে দূর করার উপায় দুটি—(ক) "এক দেশের সর্বসাধারণকে শিক্ষা দিয়া পৃথিবীর সকল মানুষের মনের

সঙ্গে তাহাদের মনের যোগ ঘটাইয়া দেওয়া...।" (খ) "আর এক জীবিকার ক্ষেত্রে তাহাদিগকে পরস্পর মিলাইয়া পৃথিবীর সকল মানুষের সঙ্গে তাহাদের কাজের যোগ ঘটাইয়া দেওয়া...।" —'সমবায়-১'

এ ব্যাপারে সোভিয়েট রাশিয়ার রক্তাক্ত বিপ্লবের পন্থা তাঁর মনে সাড়া জাগায়নি, 'ধর্মের দোহাই' বা 'গায়ের জোরে' নয়,—"যথেষ্ট পরিমাণ স্বাধীনতাকে সর্বসাধারণের সম্পদ করে তোলবার মূল উপায় হচ্ছে ধন-অর্জনে সর্বসাধারণের শক্তিকে সম্মিলিত করা...।" —'সমবায়-২'

দেখা যাচ্ছে ১৯১৮ হতে ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত লিখিত কয়েকটি প্রবন্ধে সমবায় নীতির সাফল্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ সুদৃঢ় আস্থা ব্যক্ত করেছেন। তাঁর বিখ্যাত 'সমবায় নীতি'—প্রবন্ধে আধুনিক ধনতান্ত্রিক লুব্ধতা ও শোষণ নীতির একমাত্র প্রতিষেধক রূপে সমবায়-নীতিগুলি বিশ্লেষিত হয়েছে। আধুনিক সমবায় নীতিগুলি বহু মনীষীর বহুচিন্তার অবদান, রবীন্দ্রনাথ বাস্তব অভিজ্ঞতা ও উন্মুক্ত মন দিয়ে সেগুলি বিচার করে গ্রহণ করেছেন। বর্তমান সমবায়-আন্দোলনে তাঁর ঐ অবদান অসামান্য। আমরা দেখেছি, বঙ্কিমের ঐকান্তিক কামনা ছিল, "সকলের উন্নতির পথ মুক্ত চাহি", কিন্তু তৎকালে কোন সুষ্ঠু পন্থা উদ্ভাবিত বা পরীক্ষিত হয়নি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর পূর্বসূরীর ঈপ্সাকে বাস্তব রূপায়ণের মাধ্যমে স্বয়ং পরীক্ষা করলেন। সমস্যা সমাধানের জন্য দুজনের কেউই রক্তাক্ত বিপ্লবের পথ অবলম্বনের কথা কখনো প্রচার করেননি।

আরো একটি বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রনাথের সমবায়চিন্তায় লক্ষ্য করা যায়। "রবীন্দ্রনাথের চোখে সমবায় প্রণালী শুধু ব্যক্তিগত উপার্জনপদ্ধতিকে একত্রিত করে কার্যকর আকারের উৎপাদন সংস্থা গঠনের পন্থাই নয়, উল্টো দিক থেকে সমবায় বিকেন্দ্রীকরণের সহায়তা করবে এমন বিশ্বাসও তাঁর ছিল।

অতিকায় ধনের শক্তি বহুকায়ায় বিভক্ত হয়ে ক্রমে অন্তর্ধান করবে, এমন দিন এসেছে।" ('আর্থিক উন্নতি ও রবীন্দ্রনাথ', ডঃ ভবতোষ দত্ত। রবীন্দ্রায়ণ ২য়)

পূর্বোক্ত মন্তব্যটি বিদগ্ধ সমালোচকের বিস্তৃত বিশ্লেষণ হতে তুলে দিলাম। তিনি তাঁর আলোচনায় 'রাশিয়ার চিঠি'র উল্লেখ করেছেন।

বাস্তবিকই ১৯৩০ সালের রাশিয়া সফরে রবীন্দ্রনাথ যে তীর্থদর্শনের পুণ্যসঞ্চয় করেছেন বলে উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন তা দুটি কারণে,—রাশিয়ার সমবায় পদ্ধতির সুফল দেখে এবং জনশিক্ষার ঢালাও ব্যবস্থা দেখে। ইতিপূর্বেই লক্ষ্য করেছি রবীন্দ্রনাথের বহুবর্ষপোষিত আকাঙ্ক্ষা—পৃথিবীর সকল মানুষের সঙ্গে 'মনের যোগ' আর 'কাজের যোগ'-স্থাপন (সমবায় ১)—রাশিয়াতে তারই প্রস্তুতি

দেখে তাঁর আনন্দের সীমা ছিল না।

প্রতিমাদেবীর নিকট একটি পত্রে তিনি লিখেছিলেন—

"আমি বহুকাল যা ধ্যান করেছি, রাশিয়ায় দেখলুম এরা তা কাজে খাটিয়েছে ; আমি তা পারিনি বলে দুঃখ হোল। অল্পবয়সে জীবনের যা লক্ষ্য ছিল শ্রীনিকেতন, শান্তিনিকেতন তা সম্পূর্ণ সিদ্ধি না হোক সাধনার পথ অনেকখানি প্রশস্ত করেছি। প্রজাদের সম্বন্ধেও আমার অনেককালের বেদনা রয়ে গেছে। মৃত্যুর আগে সেদিনকার পথ কি খুলে যেতে পারব না?"

বস্তুত রাশিয়ার 'কলেকটিভ ফার্মিং' এর ব্যবস্থায় একদিকে তিনি যেমন খুশী হয়েছিলেন, অন্যদিকে জবরদস্তির কথা ভেবে একটু সন্দিহান হয়েছিলেন। তিনি তাই মধ্যপন্থার সমর্থন করলেন—

"ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকবে, অথচ তার ভোগের একান্ত স্বাতন্ত্র্যকে সীমাবদ্ধ করে দিতে হবে। সেই সীমার বাইরেকার উদ্বৃত্ত অংশ সর্বসাধারণের জন্য ছাপিয়ে যাওয়া চাই। তাহলেই সম্পত্তির মমত্ব লুব্ধতার প্রতারণায় বা নিষ্ঠুরতায় গিয়ে পৌছয় না।" —'রাশিয়ার চিঠি'

আশ্চর্যের কথা এই, ১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথের অনুভূতি কতটা বাস্তব ছিল, স্টালিনোত্তর আজকের রাশিয়াতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির সীমিত অধিকার স্বীকৃতি পাওয়াতে তা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ কো-অপারেটিভ ফার্মিং-এর সপক্ষে যুক্তি দিয়েছেন। সেদিন পল্লী-সমস্যার মূল সমাধান তিনি যা দিয়েছিলেন বর্তমান স্বাধীন ভারতের সমষ্টি-উন্নয়ন-পরিকল্পনাগুলি প্রায় সেই নীতিকেই কার্যকরী করে চলেছে। পুনঃ পুনঃ তিনি বলেছেন—

"সমবায়নীতি ছাড়া আমাদের উপায় নেই, আমাদের দেশে তার বাধাও অল্প। তাই একান্তমনে কামনা করি ধনের মুক্তি আমাদের দেশেই সম্পূর্ণ হোক এবং এখানে সর্বজনের চেষ্টাব পবিত্র সম্মিলনতীর্থে অন্নপূর্ণার আসন ধ্রুবপ্রতিষ্ঠা লাভ করুক।" —'সমবায় নীতি' ১৩৩৫

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রনাথ সমবায়তত্ত্বের 'আইডিয়া' 'National Being' গ্রন্থ হতে গ্রহণ করেছিলেন, এবং নিজস্ব ধ্যান ধারণায় মিলিয়ে ভারতের গ্রামীণ কৃষিজীবী ও শ্রমজীবীদের জন্য একমাত্র উন্নতির পথ বলে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই 'সমবায়'-পরিকল্পনাটি তাঁর পূর্ববর্তী 'স্বদেশীসমাজ'-পরিকল্পনার পরিপূরক বা সংযোজন বলতে পারা যায়। তৎকালে রাজনৈতিক নেতারা এই প্রস্তাবের গুরুত্ব চিন্তা করেননি, কিন্তু আজ আমরা উপলব্ধি করছি, উক্ত পরিকল্পনায় রবীন্দ্রনাথের সংগঠনমূলক স্বদেশচিন্তা কতখানি বাস্তব ও

দেশোপযোগী।[১৫] আর আমরা লক্ষ্য করছি, এই চিন্তা ঠিক বঙ্কিমী-চিন্তার পরিপূরক। বঙ্কিমের দাবী—'সকলের উন্নতির পথ মুক্ত চাহি', রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে পুনর্ঘোষিত—"বর্তমান কাল বর্তমান কালের মানুষের জন্য বিদ্যা স্বাস্থ্য ও জীবিকা নির্বাহের জন্য যে সকল সুযোগ সৃষ্টি করেছে সেগুলি যাতে অধিকাংশের পক্ষেই দুর্লভ না হয়, সর্বসাধারণের হাতে এমন উপায় থাকা চাই।" উক্ত উপায় 'সমবায়নীতি', আর তা নিঃসন্দেহে 'স্বদেশীসমাজের' দৃঢ় ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত। 'স্বদেশীসমাজ' ও 'সমবায়নীতি' এই দুটি চিন্তাধারা একই লক্ষ্যাভিমুখীন অর্থাৎ রাজনৈতিকচিন্তা ও সমাজচিন্তা একই সূত্রে গ্রথিত, সেই লক্ষ্যটি এই—

"দেশের সমস্ত গ্রামকে নিজের সর্বপ্রকার প্রয়োজন সাধনক্ষম করে গড়ে তুলতে হবে।···স্বায়ত্তশাসনের চর্চা দেশের সর্বত্র সত্য হয়ে উঠবে। নিজের পাঠশালা, শিল্পশিক্ষালয়, ধর্মগোলা, সমবেত পণ্যভাণ্ডার ও ব্যাঙ্ক স্থাপনের জন্য পল্লীবাসীদের শিক্ষা, সাহায্য ও উৎসাহদান করতে হবে।" (সমবায়—২, ১৩২৯)। আমরা জানি শিলাইদহে এবং শ্রীনিকেতনে ঐ সংকল্প কার্য রূপায়িত হয়েছিল অনেকখানি, তাতে সম্পূর্ণ সাফল্য না এলেও ঐ চিন্তার বীজটি আজ ক্রমেই মহীরুহ হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের উক্তিতেই একথা স্পষ্ট—"শিক্ষা সংস্কার এবং পল্লীসঞ্জীবনই আমার জীবনের প্রধান কাজ। এর সংকল্পের মূল্য আছে—ফলের কথা আজ কে বিচার করবে?" (১৫. ১১. ১১৩৪)। 'বিশ্বভারতী' এবং 'শ্রীনিকেতন'-এর দুটি যজ্ঞশালায় আজও সেই সাধনার দীপটি অনির্বাণ, সন্দেহ নেই, তার উজ্জ্বল বিভায় সমগ্র দেশ একদিন বিভাম্বিত হয়ে উঠবে।

এপর্যন্ত সমাজচিন্তামূলক অভিব্যক্তির প্রথম পর্যায়ের আলোচ্য ছিল ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এবং ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় (ব্যঙ্গ অথবা উষ্মা-বিহীন স্মিতহাস্যে); আর পরবর্তী দুটি পর্যায়ের আলোচিত সমস্যাগুলি ছিল (ইতিহাস চেতনায় ও সংগঠনমূলক ধারণায়) ভারতের জাতিভেদ প্রথা, হিন্দু বিবাহবিধি ও স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক, জীবিকা এবং শিল্প-সংস্কৃতি। ঐগুলির বিস্তৃত বিশ্লেষণ ও তার সমাধানের ইঙ্গিতে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির মিল ও অমিলগুলি লক্ষ্য করেছি, এবারে উক্ত মিল ও অমিলগুলি সংক্ষেপে পুনরায় স্মরণ করছি—

ক. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নানাদেশ ভ্রমণের এবং সুদীর্ঘ জীবনকালে সংঘটিত নানা সমাজ-বিবর্তনের অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথের ছিল। বঙ্কিমের সে-প্রকার অভিজ্ঞতালাভের সুযোগ আসে নি, কিন্তু আশ্চর্য প্রজ্ঞাদৃষ্টি তাঁর ছিল সদাজাগ্রত। তাই পূর্বসূরীর প্রজ্ঞা আর উত্তরসূরীর অভিজ্ঞতা একটি বিন্দুতে

এসে মিলিত—সে হল স্বদেশের প্রতি মমত্ববোধ ; অন্যত্র সূক্ষ্মভেদ যতই থাকুক।

খ. বঙ্কিম তৎকালীন আর্যামির ঢক্কানিনাদকে ব্যঙ্গ বা প্রতিবাদ না করলেও প্রগতিশীল মতকে সমর্থন জানিয়েছেন সনাতন হিন্দু ধর্মের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে। রবীন্দ্রনাথ এ ব্যাপারে তীব্র ব্যঙ্গ ও প্রচণ্ড প্রতিবাদ করেছেন। পরবর্তীকালের যুক্তিবাদী বিশ্লেষণেও তাঁর সে প্রতিবাদ সোচ্চার।

গ. ইতিহাসচেতনাজাত বিশ্লেষণে বঙ্কিম এদেশের অপ্রাকৃত সামাজিক বৈষম্যের নানা কলঙ্কের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন 'সাম্য' রচনাকালে, কিন্তু 'ধর্মতত্ত্বের'—যুগে বর্ণাশ্রমকে হিন্দুধর্মের গৌরবময় ঐতিহ্য বলে প্রচার করেছেন। হিন্দু সমাজের স্ত্রী-পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও বঙ্কিমের দৃষ্টিভঙ্গির এই জাতীয় পরিবর্তন ঘটেছে, অবশ্য ধন-বৈষম্যের প্রসঙ্গে তাঁর মনোভঙ্গির পরিবর্তনের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসচেতনায় 'বঙ্গদর্শন'-যুগে ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থা বর্ণাশ্রম ও বিবাহবিধি প্রভৃতি গৌরবময় বলে প্রতিভাত হয়েছে। তৎকালে প্রাচীন তপোবনের আদর্শে মুগ্ধ ছিলেন তিনি, কিন্তু একদশকের মধ্যেই সে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়েছে, ফলে তাঁর বাস্তববাদী তথ্যভিত্তিক সমাজবিশ্লেষণে হিন্দু-সমাজের ত্রুটি উদ্ঘাটিত হতে থাকে। আর ধনবৈষম্য—সমাধানের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রচিন্তা বাস্তব ও নানা পরীক্ষায় পরিশীলিত।

ঘ. উভয়েই ভারতীয় নারীসমাজের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে ও স্ত্রী-শিক্ষার সপক্ষে। তবে রবীন্দ্রনাথ আরও একধাপ এগিয়ে নারীকে বৃহত্তর মনুষ্যত্বের ক্ষেত্রে নবতম মর্যাদাদানের কথা ঘোষণা করেছেন।

ঙ. রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে সমাজের প্রাধান্য উভয়েই স্বীকার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে বঙ্কিমের চেয়ে আরও একধাপ এগিয়েছেন। এদিক দিয়ে তাঁকে একহিসাবে রাষ্ট্রতন্ত্র-বিরোধী বলা যায়, যদিও ক্রপটকিনের মত নৈরাশ্য-পন্থী তিনি নন।

চ. উভয়েই ভারতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতি ও শিল্পচিন্তার ক্ষেত্রে অতীত গৌরবের উপলব্ধি করেছেন এবং সেই মর্যাদার সশ্রদ্ধ বিশ্লেষণ প্রচার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন শিল্প-সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের সঙ্গে সঙ্গে লৌকিক শিল্প সংস্কৃতির অনুসন্ধানে ব্রতী হয়েছিলেন। এ ব্যাপারে বঙ্কিমেরও বিশেষ আগ্রহ ছিল, কিন্তু উপযুক্ত অনুসন্ধানের সময় ও সুযোগ তাঁর আসেনি তৎকালে। মোটকথা এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমের উত্তরাধিকার বহন করেছেন।

ছ. সংগঠনমূলক সমাজচিন্তার ক্ষেত্রে, বঙ্কিম সমস্যায় উদ্ঘাটন করেছেন,

বাস্তব সমাধানের জন্য বিস্তৃত পরিকল্পনা দেননি। তবে একথা অবশ্যস্বীকার্য, তাঁর ঐ শ্রেণীর ইঙ্গিতগুলি খুবই অনুধাবন-যোগ্য। ঐজাতীয় ইঙ্গিতগুলির মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হল—"শিক্ষাই সকল প্রকার সামাজিক অমঙ্গল নিবারণের উপায়।" রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমের এই ইঙ্গিতটি বিস্তৃত ভাষ্যযোগে অজস্র প্রবন্ধে প্রচার করেছেন। আমরা দেখেছি রবীন্দ্রনাথ সমস্যা-উদ্‌ঘাটনের সঙ্গে সঙ্গে বাস্তব পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেছেন এবং স্বয়ং হাতে কলমে ব্যবহারিক প্রয়োগের মাধ্যমে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। বঙ্কিমের পক্ষে এই প্রকার ব্যবহারিক প্রয়োগ দেখান সম্ভবপর হয় নি। আর শিক্ষা ও সমবায়—এই দুটি ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের অবদান অসামান্য।

জ. সমাজচিন্তার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান বক্তব্য শিক্ষা-সংস্কার সম্পর্কিত। এই ক্ষেত্রে বঙ্কিম ও রবীন্দ্রের মনোভঙ্গির সম্পূর্ণ মিল আছে। এইদিকে বঙ্কিমের গভীর আস্থা ও সাগ্রহ কামনার প্রতি সম্পূর্ণ নিষ্ঠা রেখে এবং পরিকল্পনার বাস্তব রূপদান করে উত্তরসূরীর কঠিনতম দায়িত্ব পালন করেছেন রবীন্দ্রনাথ। সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য এই, দুজনেই বিজ্ঞানচেতনার প্রসার, বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রচার এবং প্রযুক্তি-বিদ্যার প্রচলনের দিকে আজীবন আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

ঝ. উভয়েই সমাজসংগঠনের জন্য বৈপ্লবিক পন্থাগ্রহণের বিরোধী।

ঞ. সমাজচিন্তার ক্ষেত্রে নানা সমস্যা-বিশ্লেষণে উভয়ের মিল যথেষ্ট। অমিল যেগুলি, সেগুলি যুগপরিবর্তন এবং আন্তর্জাতিক পটভূমিতে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাফল্যহেতু প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গির ফলশ্রুতি। আগেই বলেছি, রবীন্দ্রনাথের ব্যাপক অভিজ্ঞতা কিছু সূক্ষ্ম পার্থক্যের সৃষ্টি করেছে। তবে একে নিছক পার্থক্য না বলে—উত্তরসূরী দ্বারা পূর্বসূরীর চিন্তার পরিপূরণ বলাই যুক্তিসঙ্গত।

ট. সবশেষে উভয়ের সমাজচিন্তার পার্থক্যের একটি বিশেষ কারণ রূপে উল্লেখ্য—আন্তর্জাতিকতা-বোধে বঙ্কিম-রবীন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্নতা। রাজনৈতিক চিন্তায় উভয়ের মনোভঙ্গির বিভিন্নতার ক্ষেত্রে যেমন এই হেতুটি ক্রিয়াশীল হয়েছে, সমাজচিন্তার ক্ষেত্রে, এমন কি ধর্মচিন্তার ক্ষেত্রেও এই বিশেষ হেতুটি প্রভাববিস্তার করেছে।

অতএব পরবর্তী বিষয় পর্যালোচনার পূর্বেই আমরা রাজনৈতিকচিন্তা ও সমাজচিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিকতাবোধের বিশ্লেষণ করব এবং তাতে ঐ দুটি ক্ষেত্রের আলোচনা পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠবে।

খ. আন্তর্জাতিকতা

আন্তর্জাতিকতাবোধ বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে যতটা সহজ ও স্বাভাবিক, ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ততটা ছিল না। বরং সেকালের নবপ্রবুদ্ধ জাতীয়তাবোধের সঙ্গে আন্তর্জাতিকতাবোধের সমন্বয় প্রায় অপ্রত্যাশিত বলেই মনে হতে পারে। অথচ আশ্চর্যের কথা এই, ভারতবর্ষে জাতীয়তাবোধের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় আন্তর্জাতিক চেতনার একটি অন্তর্লীন প্রবাহের সন্ধান পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের অনেক আগে রামমোহন রায়ের মনোভঙ্গিতে বেশ কিছুটা আন্তর্জাতিক চেতনার সন্ধান আমরা আগেই পেয়েছি। অবশ্য তার সঙ্গত কারণ আছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যে দুটি বিশেষ মনোভঙ্গির উন্মেষ হচ্ছিল, সেই ইতিহাসচেতনা ও বিজ্ঞানবুদ্ধি যেমন একদিকে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ করছিল, অন্যদিকে তেমনি আন্তর্জাতিকতার দিকেও আমাদের চিন্তার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, জ্ঞানযোগী অক্ষয়কুমার ও রাজেন্দ্রলালের প্রবন্ধে অথবা মধুসূদনের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে'-এর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের রচনায়ও [সামাজিক প্রবন্ধ ও বিবিধ প্রবন্ধ ১ম ও ২য়] স্বদেশবাৎসল্য ও জগৎহিত-কামনার সামঞ্জস্য লক্ষ্য করেছি। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথমযুগের নানা প্রবন্ধেও কোঁৎ, বেন্থাম, মিল, স্পেন্সার, রুশো—আদি মনীষীদের চিন্তাধারাগুলির সাঙ্গীকরণের প্রয়াস ঐ আন্তর্জাতিক মননের দিকে উন্মুখ হয়ে উঠেছে। তাই আমরা লক্ষ্য করেছি, বঙ্কিম রচিত 'সাম্য'-প্রবন্ধের কৃষিজীবী, শ্রমজীবী ও নারীর সমস্যা কেবল ভারতবর্ষেই নয়, পৃথিবীর সবদেশের মানুষের সমস্যা। ইতিপূর্বে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইতিহাসচেতনাশ্রয়ী চিন্তা-বিশ্লেষণের পর্যায়ে আমরা উল্লেখ করেছি,—বঙ্কিম ভারতচিন্তাকে চালচিত্ররূপে রেখে বঙ্গ ইতিহাসের অতীত-চিত্র অঙ্কনে নিবদ্ধদৃষ্টি, আর রবীন্দ্রনাথ ভারতচিন্তাকে কেন্দ্র করে বিশ্ব ইতিহাসের বৃত্ত-অঙ্কনে প্রবৃত্ত। সে প্রসঙ্গে বঙ্কিমের ঐ জাতীয় প্রবন্ধগুলিকে ভারতপ্রীতি ও বঙ্গপ্রীতির শ্রেণীতে বিন্যস্ত করে লক্ষ্য করেছি, তাঁর রচনায় বঙ্গপ্রীতিমূলক নিবন্ধই বেশি। এদিকে রবীন্দ্রনাথের প্রথম ইতিহাস-বিশ্লেষণমূলক 'ভারতবর্ষের ইতিহাস'-নামক প্রবন্ধটিতেই স্বদেশচিন্তার গণ্ডী-অতিক্রমী এক বৃহত্তর ইতিহাসের দিগন্ত উন্মোচিত হতে চলেছে,—সেখানে 'ভারতবর্ষ' কেবল আমাদের স্বদেশ নয়, বিশ্ব ইতিহাসের অঙ্গীভূত দেশ। তাই তাঁর মতে.—"পৃথিবীতে ভারতবর্ষের একটি মহৎ স্থান আছে।" কিংবা, "আমাদের ইতিহাসের প্রকৃতিই এই, তাহা

একজাতির ইতিহাস নয়, তাহা একটা মানব-রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ইতিহাস।" উদ্ধৃতির সংখ্যা না বাড়িয়ে বলা যায় এই ইতিহাসের ধারা নির্ণয়কালেই রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবোধকে সংকীর্ণ গণ্ডী হতে উত্তীর্ণ করে বিশ্বনাগরিকতার দিকে অগ্রসর করে দিয়েছেন। ইতিপূর্বে সংগঠনমূলক রাজনীতিক চিন্তার আলোচনায় লক্ষ্য করেছি যে, স্বদেশী আন্দোলনের যুগে 'বঙ্গমন্ত্রের উদ্গাতা' ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এবং বঙ্কিমচন্দ্রের মতই বঙ্গপ্রীতির বৃত্তে তাঁর স্বদেশচিন্তা আবর্তিত হয়েছে। কিন্তু এই বাংলাদেশ ভারতবর্ষের অন্যতম এককরূপেই যে রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় ছিল তাতে সন্দেহমাত্র নেই,—কারণ 'স্বদেশীসমাজ' কেন্দ্র বা কর্তৃসভাগুলিকে— "যোগসূত্রে এক করিয়া তুলিয়া একটি বিশ্ববঙ্গ প্রতিনিধিসভা প্রতিষ্ঠিত হইবে",— রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাবিত এই 'বিশ্ববঙ্গ প্রতিনিধিসভা' নিশ্চয়ই ভারতীয় গণতান্ত্রিক ফেডারেশন-জাতীয় সংগঠন। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি একে বর্তমানকালের সোভিয়েত শাসন প্রণালীতে প্রচলিত এক-একটি ইউনিটের মত গণ্য করা যেতে পারে। অতঃপর রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তা ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা বিশ্লেষণ করে 'ভারততীর্থে'-র প্রতিষ্ঠা করেছে—যেখানে বিশ্বের সবজাতির প্রতি উদার নিমন্ত্রণ আছে। অর্থাৎ 'বাংলাদেশের হৃদয় হতে' যে অপরূপ রূপে দেশ-জননী-মূর্তির আবির্ভাব ঘটেছে—তিনি 'ভারতমাতা', যিনি আমাদের তৎকালীন রাষ্ট্রচিন্তার প্রতীক—'জনকজননী-জননী' এবং তিনিই 'ভুবনমনোমোহিনী'। এই 'ভারতজননী'-ই 'ভারত-ভাগ্য-বিধাতা'-রূপে একদিকে যেমন 'পঞ্জাব-সিন্ধু-গুজরাট-মারাঠা-দ্রাবিড়-উৎকল-বঙ্গ'—সকলকে এক অচ্ছেদ্য ঐতিহাসিক সূত্রে গ্রথিত করেছেন অন্যদিকে তেমনি অহরহ তাঁর আহ্বান প্রচারিত হয়েছে উদার-বাণীতে, যাতে 'হিন্দু-বৌদ্ধ-শিখ-জৈন-পারসিক-মুসলমান-খ্রীষ্টানী' সকলেই এক আত্মিক সম্পর্কে আত্মীয় হয়ে উঠেছে,—'পূরব-পশ্চিম' এক প্রেমহারে গাঁথা হয়েছে। কাজেই ঠিক এর পরবর্তী স্তরে রবীন্দ্রচিন্তা উদার বিশ্বভ্রাতৃত্বের আকাশে যে মুক্তিলাভ করেছে, তা কিছু অপ্রত্যাশিত নয়।

এদিকে বঙ্কিমের ভারতচিন্তায় একজাতি গঠনের ঈপ্সাটি প্রথম হতে নানা সূত্রেই ব্যক্ত হয়েছিল—তবে বঙ্কিম তৎকালীন বাঙালিসমাজের সমস্যাগুলিতেই নিবদ্ধদৃষ্টি ছিলেন। তাই বাংলার ইতিহাসের কলঙ্কক্ষালন, গৌরবকথন এবং বাঙালি সমাজের ত্রুটি নির্দেশ করে বাঙালিকে একটি শক্তিশালী জাতিরূপে উদ্বোধিত করার কামনা তাঁর মনে স্বভাবতই প্রধান হয়ে উঠেছিল। তাঁর আশা ছিল 'Bengalees, the Italians of Asia'—ভারতের অন্যান্য খণ্ডের জাতিগুলির অগ্রগতিতে সাহায্য করবে, এবং ভবিষ্যতে বৃটিশশাসনভুক্ত ভারতবর্ষ একটি

রাষ্ট্র ও ভারতীয়গণ ঐক্যবদ্ধ একটি জাতিরূপে উন্নত হয়ে উঠবে। একে আমরা নিশ্চয়ই প্রাদেশিকতা বলতে পারি না, বরং ভারতচিন্তারই সুষ্ঠু ও সুসঙ্গত ব্যবহারিক রূপ বলতে পারি। এমনি ধারণা রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ পর্বেও লক্ষ্য করা যায় এবং তার জন্য এই আন্তর্জাতিকতার প্রবক্তার মনে কোন প্রকার চিন্তা বৈপরীত্য সৃষ্টি করে নি। তিনি নিজেই আমাদের সতর্ক করে বলেছেন—"এমন ভুল কেউ যেন না করেন যে, বাংলাদেশকে আমি প্রাদেশিকতার অভিমানে ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চাই।…ভারতবর্ষের রাষ্ট্রমিলনযজ্ঞের যে মহদনুষ্ঠান আজ প্রতিষ্ঠিত, প্রত্যেক প্রদেশকে তার জন্য উপযুক্ত আহুতির উপকরণ সাজিয়ে আনতে হবে।" ('দেশনায়ক', ১৯৩৯)। বেশ বোঝা যায়, বঙ্কিমের বঙ্গপ্রীতি যেমন ভারতপ্রীতিরই সুষ্ঠু ও সুসঙ্গত অভিব্যক্তিরূপে দেখা দিয়েছিল, তেমনি রবীন্দ্রচিন্তাতেও এই বঙ্গপ্রীতির ভাবটি অন্তর্লীন ছিল, এবং তা তাঁর আদর্শ 'ভারততীর্থ'-রচনায় বিঘ্ন ঘটায়নি।

অন্যদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশচিন্তা জাতীয়তাবাদের যে তীব্র উদ্দীপনা সঞ্চার করেছে, সে উদ্দীপনা য়ুরোপীয় Patriotism নয়, বরং তা জগৎপ্রীতিতে বিধৃত। সেকথা বঙ্কিম স্বয়ং 'ধর্মতত্ত্বের' 'স্বদেশপ্রীতি'-অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করেছেন, তদনুসারে দেশবাৎসল্য সমগ্র মানবধর্মের অঙ্গীভূত। "যখন নিখিল জন্মভূমির উপর এই প্রীতি বিস্তারিত হয় তখন ইহা সচরাচর দেশবাৎসল্য নাম প্রাপ্ত হয়।" এতেও চরমসুখ নয়, "সমস্ত জগতে যে প্রীতি তাহাই প্রীতিবৃত্তির চরমসীমা। তাহাই যথার্থ ধর্ম।" বঙ্কিম এখানে বিশ্বনাগরিক হবার পথ দেখিয়েছেন। 'ধর্মতত্ত্ব'-গ্রন্থের স্বদেশপ্রীতি অধ্যায়ে এর বিশেষ ব্যাখ্যা আছে, 'সর্বভূতের হিতের জন্য সকলেরই স্বদেশরক্ষা কর্তব্য' এবং তারপরই বঙ্কিমমানসে আন্তর্জাতিকতা-বোধের সূত্রটি স্পষ্ট পাওয়া যাচ্ছে—"আম তোমাকে যে দেশপ্রীতি বুঝাইলাম তাহা ইউরোপীয় Patriotism নহে, ইউরোপীয় Patriotism একটা ঘোরতর পৈশাচিক পাপ।…জগদীশ্বর ভারতবর্ষে যেন ভারতবর্ষীয়ের কপালে এরূপ দেশবাৎসল্য ধর্ম্ম না লিখেন।" অতএব বঙ্কিমের দৃঢ় বিশ্বাস এই ভাবী ভারতবর্ষে দেশপ্রীতি ও সার্বলৌকিক প্রীতি উভয়েরই অনুশীলন ও সামঞ্জস্য হবে,—'ভারতবর্ষ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠজাতির আসন গ্রহণ করিতে পারিবে।' স্পষ্টত বঙ্কিমচন্দ্রের জগৎপ্রীতি বা আন্তর্জাতিকতাবোধ 'অনুশীলন ধর্মে'-র প্রতিষ্ঠাভূমিকে কেন্দ্র করে বিশ্বহিতের দিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁর এই বিশ্বহিত-কামনার আন্তরিকতাতে সন্দেহ করবার কোনো কারণ নেই। কিন্তু এতে যেন এক প্রকার আদর্শায়িত ঐতিহ্য-গৌরবের এবং শ্রেষ্ঠত্বের মনোভাব অর্থাৎ বিশ্বের গুরুত্ব আসন

গ্রহণ করার মনোভাব থেকে গেছে। তৎকালীন হিন্দুত্ব পুনর্জাগরণের পট-ভূমিকায় এই ছিল প্রত্যাশিত মনোভঙ্গি; বিবেকানন্দের হিন্দুধর্মের প্রচারের মধ্যে এরই উগ্ররূপ অর্থাৎ আন্তর্জাতিকতার একটা উগ্রহিন্দু আদর্শ দেখা গিয়েছিল। এমন কি রবীন্দ্রনাথের 'বঙ্গদর্শন' (নবপর্যায়) যুগের চিন্তায়ও এর প্রতিধ্বনি শোনা গিয়েছিল, একথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি ('ব্রাহ্মণ'-প্রবন্ধ)। এদিকে রবীন্দ্রচিন্তায় আন্তর্জাতিকতাবোধের খুব সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি প্রথম[১৬] শোনা গেল জাপানে প্রদত্ত 'Nationalism' বক্তৃতামালায় (১৯১৬ খৃঃ)। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায় য়ুরোপীয় 'ন্যাশনালিজম' সম্পর্কে বিরূপতার পরিচয় রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্গদর্শন' (নবপর্যায়) যুগেই কয়েকটি প্রবন্ধে দিয়েছিলেন। অথচ এর ঠিক অব্যবহিত পূর্বেই 'নেশন কি' (১৩০৮) প্রবন্ধে "নেশন একটি সজীব সত্তা, একটি মানস পদার্থ"—এই সংজ্ঞাকে বিস্তৃত করে তিনি বলেছিলেন, "জন-সাধারণকে যে একটি একীভূত নিবিড় অভিব্যক্তি দান করে তাহাই নেশন।" তখনও রবীন্দ্রনাথের আস্থা ছিল—'নেশন সকলের ভিন্নতাই ভালো' অর্থাৎ ব্যক্তিস্বাধীনতার রক্ষক বলেই নেশনের মূল্য, কারণ নেশন বৈষয়িক স্বার্থের কোন গোষ্ঠী নয়, ভাবের বাঁধনে বাঁধা। কিন্তু ইউরোপীয় রাষ্ট্রনীতি, সাম্রাজ্যবাদী লোলুপতা এবং ঔপনিবেশিক শোষণ দিনে দিনে যতই প্রকট হয়ে উঠেছে, অথবা যেমন ঐ ত্রুটিগুলি রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণে ও অভিজ্ঞতায় ধরা পড়েছে—ততই য়ুরোপীয় ন্যাশনালিজমের প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা প্রকটতর হয়েছে! 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'ব্রাহ্মণ', 'বিরোধমূলক আদর্শ', 'রাষ্ট্রনীতি ও ধর্মনীতি', 'ধর্মবোধের দৃষ্টান্ত' প্রভৃতি প্রবন্ধে ঔপনিবেশিক উৎপীড়ন ও পলিটিক্যাল স্বার্থপরতার জঘন্য ষড়যন্ত্র উদ্‌ঘাটন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এবং সেখানেই আমরা দেখেছি 'Made in Europe' ন্যাশনালিজম-এর প্রতি তাঁর বিরূপতা ক্রমেই তীব্রতর। বঙ্কিমচন্দ্র যেমন তীব্রস্বরে একদিন উচ্চারণ করেছিলেন, "ইউরোপীয় Patriotism একটা ঘোরতর পৈশাচিক পাপ"—রবীন্দ্রনাথও ইতিপূর্বে নানা বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঐ কথাই বলতে চেয়েছিলেন, তবে তখন তুলনামূলক আলোচনা-প্রসঙ্গে কথাগুলি উঠেছিল বলে তাতে ধিক্কারের সুর তীব্রতর ছিল না। ইতিমধ্যে স্বদেশীযুগের আন্দোলনের গণ্ডী হতে রবীন্দ্রনাথ 'শান্তিনিকেতনের' ঔপনিষদিক ঔদার্যের মধ্যে সরে এসেছিলেন। অতঃপর নানা দেশের সরকারী ও বেসরকারী আমন্ত্রণে যখন, বিশ্বভ্রমণে বহির্গত হলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, তখনই তিনি নানা দেশে জাতীয়তার বাস্তব বীভৎস মূর্তি প্রত্যক্ষ করে তাকে তীব্রস্বরে ধিক্কার দিলেন। 'Nationalism' বক্তৃতামালায় তারই সূত্রপাত। ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে জাপানে

বসেই রবীন্দ্রনাথ সমগ্র মানব সমাজের পক্ষ হতে সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন : "When this organization of politics and Commerce, whose other name is the Nation, becomes all-powerful at the cost of the harmony of the higher social life, then it is an evil day for humanity"

সেদিন জাতীয়তাবাদী জাপানের বৈষয়িক উন্নতির প্রচণ্ড জয়ধ্বনির মধ্যেই তিনি অনুভব করলেন ধনতান্ত্রিক সমাজের সাম্রাজ্যবাদী বুভুক্ষা নখদন্ত বিস্তার করে চলেছে, যদিও মুখোশ এঁটেছে জাতীয়তাবাদের। তিনি বুঝতে পারলেন, "A Nation in the sense of the political and economic union of a people is that aspect which a whole population assumes when organised for a mechanical purpose."

রবীন্দ্রনাথ সেদিন পরাধীন দেশের নাগরিকরূপে ঐ পররাজ্যলোলুপ রাক্ষসস্বরূপ তথাকথিত 'জাতীয়তাবাদকে' ধিক্কার দেন নি, 'as it affects the future of all humanity'—সেজন্যেই তিনি তাঁর আন্তর্জাতিক চেতনায় সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন। লক্ষ্য করা যাবে, 'নেশন কি?' প্রবন্ধে প্রদত্ত নেশনের সংজ্ঞাতে কবির আর পূর্ণ আস্থা নেই। তাই প্রথম মহাযুদ্ধের মৃত্যুঘণ্টাধ্বনিতে তিনি সেদিন শুনেছিলেন "It is the fifth act of the tragedy of the unreal."

তাইত সেদিন যুদ্ধ, সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকতার প্রতি তাঁর তীব্র ধিক্কার ধ্বনিত হয়েছিল—'Nationalism' গ্রন্থের তিনটি প্রবন্ধে—

(a) Nationalism in the West.

(b) Nationalism in Japan.

(c) Nationalism in India.

পাশ্চাত্যের বীভৎস জাতীয়তাবাদ যে মানবতাবিরোধী, তা যে আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত নয় এবং প্রত্যেক দেশের রাষ্ট্রীয় চেতনা হতে ঐ সংকীর্ণতা পরিত্যাগ করা উচিত—এই কথাগুলিই রবীন্দ্রনাথ জাপানে ঘোষণা করেছিলেন। কয়েকমাস পরে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রদত্ত নানা ভাষণেও[১৭] রবীন্দ্রনাথ সামগ্রিক ভাবে ঐ কথাই পুনর্ঘোষণা করেছিলেন। মানুষের শুভবুদ্ধির কাছে রবীন্দ্রনাথের এই আবেদন সেদিন নানা পত্র-পত্রিকার বিরূপ সমালোচনা সত্ত্বেও বৃথা হয়নি। 'ন্যাশনালিজম'-এর প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করার প্রয়াস ছিল তাঁর প্রায় সবগুলি বক্তৃতায়। তিনি পুনঃ পুনঃ এই কথাই বলতে চেয়েছেন "Nationalism"

হচ্ছে একটা ভৌগোলিক অপদেবতা, পৃথিবী সেই ভূতের উপদ্রবে কম্পান্বিত। সেই ভূত ঝাড়বার দিন এসেছে।

একথা অবশ্য স্বীকার করতে হয়। রাজনীতি-বিজ্ঞানের সূক্ষ্মদৃষ্টিভঙ্গিতে রবীন্দ্রনাথ 'Nationalism', Nationalistic state', Capitalism', 'Imperialism'—ইত্যাদির পার্থক্য বিশ্লেষণ করার উদ্যোগ করেন নি,[১৮] মানবতা-বিরোধী ঐ পাশ্চাত্য মনোবৃত্তিকেই তিনি ধিক্কার দিয়েছেন[১৯] এবং তাঁর বিশ্লেষণ মানবতাবোধের দিক দিয়ে যুক্তিযুক্ত। এই বোধেই রবীন্দ্রনাথ আমেরিকার নিগ্রো-বিদ্বেষকেও তীব্র সমালোচনা করেছেন; (দ্রঃ 'Nationalism') আবার এশিয়াবাসীদের প্রতি ঘৃণিত আচরণের প্রতিবাদ করেছেন (দ্রঃ রবীন্দ্র-জীবনী ২য়, পৃ. ৪৪১)। মোটকথা প্রথম মহাযুদ্ধের বিধ্বংসী লীলার পরিণতির কথা চিন্তা করে রবীন্দ্রনাথ আন্তর্জাতিক মিলনের যে পথ নির্দেশদানে ব্রতী হয়েছিলেন, সেই পথ—'শিক্ষার মিলনের' পথ। তাঁর বিশ্বাস ছিল সাংস্কৃতিক আদান প্রদানের মাধ্যমেই নিখিল মানবের মিলন-যজ্ঞের আহুতিদান করা সম্ভব হবে। "ঐখানে সর্বজাতিক মনুষ্যত্বচর্চার কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে—স্বাজাতিক সংকীর্ণতার যুগ শেষ হয়ে আসছে, ভবিষ্যতের জন্যে যে বিশ্বজাতিক মহামিলন-যজ্ঞের প্রতিষ্ঠা হবে তার প্রথম আয়োজন ঐ বোলপুরের প্রান্তরেই হবে।" এই সময়েই পুত্র রথীন্দ্রনাথকে লেখা একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ জানালেন—

"দেশের গণ্ডি আমার ঘুচে গেছে। সকল দেশকেই আমার হৃদয়ের মধ্যে একদেশ করে তুলে তবে আমি ছুটি পাব।" (রবীন্দ্রজীবনী ২য়, পৃ. ৪৩৯) অর্থাৎ 'দেশে দেশে মোর দেশ আছে। আমি সেই দেশ লব বুঝিয়া।' এই কামনা আভাসে যা ছিল, তা প্রত্যয়ে পৌঁছেছে। তাই বিশ্বমানবতার প্রশ্নটিই রবীন্দ্রমানসে পরবর্তী পঁচিশ বছরের নানা রচনায় অভিব্যক্তি লাভ করে চলেছে। 'মহাবিশ্বের পথকেই আমরা দেশ বলে গ্রহণ করব,'—এই সংকল্প হতে শেষদিন পর্যন্ত তাঁর আর বিচ্যুতি আসে নি। এইকাল হতেই রবীন্দ্রনাথ প্রায় দুটি দশক (১৯১৬-১৯৩৪ খ্রীঃ) ক্রমাগত ভ্রমণ করেছেন, বিশ্বের নানাদেশে নানাজাতির নানা মানুষের দরবারে বিশ্বমানবতাবোধের প্রচার করেছেন। কোথাও বিদ্রূপ, কোথাও বিরোধিতা, কোথাও রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রজাত ঘৃণিত আচরণ, কোথাও বা আবার উচ্ছ্বসিত অভিনন্দনও তিনি লাভ করেছেন। এই বিশ্বযাত্রীর পরিক্রমার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক না হলেও এই অধ্যায়ের ক্ষুদ্র পরিসরে অসম্ভব। কিন্তু এই দুটি দশকের কয়েকটি বিশেষ ঘটনা রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিকতার আলোচনায় অপরিহার্য।

আমরা উক্ত ঘটনাপঞ্জী সংক্ষিপ্তাকারে দিচ্ছি—(বিশেষত বিখ্যাত বক্তৃতাগুলির বিষয় ও বক্তৃতা প্রদানের তারিখ উল্লেখ করছি।)

১৯১২ খ্রীঃ ইংলণ্ডে নানা মনীষীদের ব্যক্তিগত সান্নিধ্যলাভ উল্লেখযোগ্য। কবি য়েটস, এজরা পৌণ্ড, ওয়েলস্, বার্ণার্ড 'শ প্রমুখ মনীষীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় উল্লেখযোগ্য।

১৯১৩ খ্রীঃ ৩০শে জানুয়ারী, আমেরিকাতে 'Race Conflict'—শীর্ষক বক্তৃতাদান।

১৯১৬-১৭—জাপানে 'Nationalism' শীর্ষক বক্তৃতামালা সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য।

১৯১৬—আমেরিকাতে 'The cult of Nationalism' ইত্যাদি 'Nationalism' শীর্ষক বক্তৃতামালা এবং 'Personality' শীর্ষক বক্তৃতামালা।

১৯২০—ফ্রান্সে আঁরি বের্গসঁ, সিলভা লেঁভি, লে ব্রাঁ'র সঙ্গে পরিচয়। ২৮শে অক্টোবর নিউইয়র্কে "The meeting of the West and East" শীর্ষক বক্তৃতাদান।

১৯২১—লণ্ডনে ২৪শে মার্চ 'পূর্ব ও পশ্চিমের মিলন' শীর্ষক বক্তৃতাদান। ১৬ই এপ্রিল প্যারিসে মনীষী রোমাঁ রোঁলার সঙ্গে সাক্ষাৎ ও ঘনিষ্ঠ পরিচয়। জার্মানীতে কবিকর্তৃক 'The message of the forest' প্রবন্ধ-পাঠ।

১৯২৬—৩১শে মে মুসোলিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ। ফলে এক জঘন্য রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের ঘূর্ণাবর্তে কবি নিক্ষিপ্ত হন; তাঁর নাম ভাঙিয়ে ফ্যাসিস্ট ইতালী ফ্যাসীবাদের সপক্ষে ঢক্কানিনাদ সুরু করে। এর বিরুদ্ধে ৬ই জুলাই 'ম্যাঞ্চেস্টার গর্ডিয়ানে' কবির প্রতিবাদ-পত্র প্রকাশিত হয়।

১৯২৭—সিঙ্গাপুরে 'Unity of Man' শীর্ষক বক্তৃতাদান।

১৯৩০—অক্সফোর্ডে 'Religion ot Man' শীর্ষক 'হিবার্ট বক্তৃতাদান'। মস্কোতে 'VOKS' সাহিত্য সমিতিতে রবীন্দ্রনাথ অভ্যর্থিত। 'রাশিয়ার চিঠি' —এই কালের রচনা।

ঐতিহাসিক বক্তৃতাগুলি তৎকালে উল্লিখিত দেশগুলিতেই কেবল নয় —সারা বিশ্বের মনীষীমহলে এবং রাজনৈতিক মহলে একই সঙ্গে বিপরীত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। এ সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ বা বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণের সুযোগ আমাদের নেই। একটিমাত্র দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি এ সম্পর্কে। ফরাসী মনীষী রমাঁ রলাঁ যুদ্ধকালেই 'Nationalism' বক্তৃতা পাঠ করে খুব উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন। এগুজ এইভাবে তার উল্লেখ করেছেন—

He declared that a new voice had arisen in the East proclaiming peace and goodwill to mankind and called upon Europe to listen to it with humility and awe.

—Rolland and Tagore, p-13.

বাস্তবিকই সেদিন প্রাচ্যের একটি নতুন কণ্ঠস্বর শোনা গিয়েছিল যুদ্ধবিধ্বস্ত য়ুরোপের পত্র-পত্রিকায়,—সে স্বর রবীন্দ্রনাথের। এইকালে অন্য একটি প্রবন্ধেও লক্ষ্য করেছি—"মনুষ্যত্ব জিনিস একটা অখণ্ড সত্য, সেটা সকল মানুষকে লইয়াই বিরাজ করিতেছে। সেটাকে যখন কেহ স্বার্থের বা স্বজাতির খাতিরে খণ্ডিত করে তখন, শীঘ্রই হোক বিলম্বেই হোক তার আঘাত একদিন নিজের বক্ষে আসিয়া পৌঁছে।" (স্বাধিকার প্রমত্তঃ)। উক্ত অখণ্ডতাবোধে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশবোধ ও বিশ্ববোধ সমন্বিত। ঠিক এই সময়ে এণ্ড্রুজকে লেখা একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথের মর্মব্যথা অভিব্যক্ত হয়েছিল,—"আমার আত্মা এই বলে কেঁদে ওঠে স্বদেশপ্রেমিক বা নীতিবিদের কাছে সম্পূর্ণ মানুষটিকে বলি দেওয়া কিছুতেই উচিত নয়।" (নিউইয়র্ক ১৪.১.১৯২০)। প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী অধ্যায়ে য়ুরোপে বিবেকী বুদ্ধিজীবিদের 'Independence of Spirit' নামে যে আন্দোলন সুরু হয়—রঁলা, বের্গসঁ প্রমুখ তার নেতৃত্ব করেছিলেন; —সেই আন্দোলনকালে প্রচারিত রবীন্দ্র সাক্ষরযুক্ত ঘোষণাপত্রে ছিল—

We recognise the People—one and universal,—the People who suffer, who struggle, who fall and rise again......

সেইযুগে বিশ্বমানবতাকে পরম স্বীকৃতিদান করাই রবীন্দ্রনাথের মহত্তম ব্রত হয়ে উঠেছিল। একদিকে তিনি গভীর উদ্বেগের সঙ্গে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আন্দোলনের গতি লক্ষ্য করছিলেন এবং ক্ষণে ক্ষণে নানা প্রবন্ধে তাঁর আশা আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করছিলেন (দ্রঃ 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম', 'সত্যের আহ্বান'), অন্যদিকে আন্তর্জাতিক চিন্তাকেও প্রকাশ করে চলেছিলেন, এবং 'বিশ্বভারতী'-র অঙ্গনে তার সক্রিয় দৃষ্টান্ত স্থাপনের প্রয়াস করছিলেন। রবীন্দ্রমানসের এইকালের প্রবণতার দৃষ্টান্তস্বরূপ দুটি পত্রাংশ উদ্ধৃত করছি—

ক. "Swaraj is not our objective. Our fight is a spiritual fight—it is for Man. We are to emancipate Man from the meshes that he himself has woven round him—these organisations of national egoism..."

—'Letters to a friend', pp. 127-28.

খ. "The complete man must never be sacrificed to the patriotic man, or even to the merely moral man."

—Ibid, p. 115.

বহুদিন পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, "ইউরোপীয় Patriotism একটা ঘোরতর পৈশাচিক পাপ।" প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথও ঠিক একই কথা উচ্চারণ করলেন, তবে কিছু বিস্তৃততর পরিপ্রেক্ষিতে। ১৯২০-২১ খ্রীষ্টাব্দের য়ুরোপ-আমেরিকা সফরকালে প্রদত্ত বক্তৃতাবলীতে ঐ কথাই অভিব্যক্ত। তিনি বললেন, যন্ত্রযুগের দুরন্ত লোভ জাতীয় স্বার্থের রূপপরিগ্রহ করে জাতীয় উন্মাদনাকে তীব্রতর করে তুলেছে।

"The nation has thriven long upon the mutilated humanity. Men...came out of the National manufactory in huge number as war-making and money-making puppets."

-- 'Nationalism', p-43.

প্রথম মহাযুদ্ধকালে জাপানে বসেই লেখা হয়েছিল 'Nationalism', আর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালেও জাপানকে লক্ষ্য করেই রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, "ওরা শক্তির বাণ মারছে চীনকে, ভক্তির বাণ বুদ্ধকে।" (বুদ্ধভক্তি, নবজাতক)। ক্ষুব্ধ কবিচিত্তে দারুণ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়, তাই পশ্চিমের যুদ্ধবাদী হিংস্র বর্বরতার বিরুদ্ধে ধিক্কার ও সতর্কবাণী বারম্বার শোনা গিয়েছে 'প্রান্তিক', 'শেষসপ্তক', 'সেঁজুতি'—প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের নানা কবিতায়। এই দারুণ দুঃসময়ে তাঁর আবেদন ছিল বিশ্বের সব মানুষের কাছে, স্বার্থপর হিংস্র জাতীয়তাবাদ বা নিষ্প্রাণ ধোঁয়াটে আন্তর্জাতিকতা কোনটার দ্বারাই মানবজাতির কল্যাণ হবে না—

"Neither the colourless vagueness of Cosmopolitanism nor the fierce self-idolatory of national worship is the goal of human history."

তাই জাপানী কবি ইয়োন নোগুচির পত্রের উত্তরে স্পষ্ট লিখেছিলেন তিনি "humanity is greater than nationality", এমন কি তাঁর অন্তিম ভাষণ 'সভ্যতার সংকট' (১লা বৈশাখ, ১৩৪৮)-এ রবীন্দ্রনাথ সাবধান করে দিয়েছিলেন বিশ্ববাসীকে—"মানবপীড়নের মহামারী পাশ্চাত্য সভ্যতার মজ্জার ভিতর থেকে জাগ্রত হয়ে উঠে আজ মানবাত্মার অপমানে দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত বাতাস কলুষিত করে দিয়েছে।"

তা হলে মানুষের কি মুক্তি নেই? তার আদর্শ কি? সমাধান কোথায়? রবীন্দ্রনাথ এই সব প্রশ্নের উত্তর ইতিপূর্বেই দিয়েছিলেন, তা হল—"ব্যক্তির মধ্যে মহামানবের প্রাণশক্তির, বিশ্বমানবতার অনুভূতির পূর্ণ বিকাশ প্রয়োজন।" তাঁর আদর্শ—"My religion is in the reconciliation of the Super-Personal Man, the universal human spirit, in my own individual being".

স্পষ্টত রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রচিন্তা ও ধর্মচিন্তা এখানে সমন্বয় লাভ করেছে। ঐ সমন্বয়ের আদর্শবাদী সুর প্রথম মহাযুদ্ধকালের রচনা 'বলাকা'র কয়েকটি কবিতাতে ধ্বনিত হয়েছিল, যার মূল বক্তব্য ছিল এই, যুদ্ধের প্রলয়লগ্নে ইতিহাসের নেয়ে—'মত্তসাগর দিল পাড়ি গহন রাত্রিকালে', শাশ্বত মানবাত্মা তাঁর পথ চেয়ে আছে। ('পাড়ি')। আবার 'ঝড়ের খেয়া' কবিতায় আন্তর্জাতিক মনীষী কবির ব্যাকুল প্রশ্ন ও দুর্জয় বিশ্বাস একই সঙ্গে ধ্বনিত হল। সেখানে যেন মৃত্যুর গর্জনের মাঝেও বিশ্বমানবতার পূজারী জীবন সমুদ্রতীর পানে তরী নিয়ে চলেছেন। রবীন্দ্রনাথের বলিষ্ঠ কণ্ঠে তাই ধ্বনিত হয়েছিল,—"So the realisation of the great spiritual Unity of Man alone can give us peace". —'creative unity', p. 130.

এই পন্থা কিন্তু আধ্যাত্মিক ঐক্যের পন্থা; 'শিক্ষার মিলনে'—এর নির্দেশ ছিল। ব্যক্তি, জাতি ও মানবতার পূর্ণ সমন্বয়ে রবীন্দ্রনাথ ঐ মিলনের রাখী রচনা করেছেন; তাই পূর্বোক্ত সমস্যার সমাধান একমাত্র এই আধ্যাত্মিক ঐক্য। 'মানুষের ধর্ম' এবং 'Religion of Man' বক্তৃতাবলীতে সেই শ্রেয়পথের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

রাষ্ট্রচিন্তা ও ধর্মচিন্তার এই সমন্বয় সম্পর্কে আমরা পরবর্তী পর্যায়ে আলোচনা করব। আপাতত এইমাত্র বলা চলে—তৎকালে এই সমন্বয়চিন্তাটি আদর্শবাদী বিশ্বকবির স্বপ্ন বলেই রাজনৈতিক মহলে বিবেচিত হয়েছিল।[২০] (বলা বাহুল্য আজও সেই ভ্রান্তির নিরসন হয় নি)। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ স্বীয় বিশ্বাসের ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত থেকেছেন শেষদিন পর্যন্ত।

আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি, বঙ্কিমচন্দ্রের আন্তর্জাতিকতাবোধের (ঠিক বর্তমান কালের সংজ্ঞায় তৎকালীন চিন্তাকে অভিহিত করা সম্পর্কে বিতর্কে প্রবেশ না করে) ভিত্তি ছিল 'অনুশীলন ধর্মের' উপর। জগৎপ্রীতি সেখানে স্বদেশপ্রীতির অবশ্যম্ভাবী পরিণতি বলে নির্দেশিত। 'সমস্ত জগতে যে প্রীতি তাহাই প্রীতিবৃত্তির চরম সীমা।'—বঙ্কিমের উক্ত দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের

প্রতিপাদ্য 'great spiritual unity'-র মূলত পার্থক্য খুব সামান্য, কেবল সাধনার ধারাটি বিভিন্ন। বঙ্কিমের সাধনা ছিল 'অনুশীলন ধর্ম' আর রবীন্দ্রনাথের সাধ্য 'মানুষের ধর্ম'। যুদ্ধবিধ্বস্ত য়ুরোপে আন্তর্জাতিক মৈত্রীর বাণী বহন করে রবীন্দ্রনাথ ভারতের তথা প্রাচ্যের যে উদার সংস্কৃতির বাণী প্রচার করলেন তার মূলে দুটি সংগঠনমূলক পরিকল্পনা ছিল—

ক. আন্তর্জাতিক মৈত্রী প্রচার, এবং

খ. 'বিশ্বভারতী'-র অঙ্গনে পূর্ব ও পশ্চিমের সংস্কৃতি বিনিময়।

দুটি পরিকল্পনার ভিত্তিই হল আদর্শগত নৈতিকতাবোধ বা 'মানুষের ধর্ম'। আন্তর্জাতিকচিন্তায় রবীন্দ্রনাথ কিছুটা আদর্শবাদী হয়ে উঠলেও কয়েকটি মূল সিদ্ধান্তে তাঁর আস্থা বাস্তবতাবিরোধী নয়, বরং বিংশ শতাব্দীর এই ষষ্ঠদশকের পটভূমিতেও তা অনেকটা গ্রহণযোগ্য বলা যায়।

এবার পূর্বসূরী ও উত্তরসূরীর আন্তর্জাতিকতা সম্পর্কিত মনোভঙ্গির তুলনা করা যেতে পারে—

১। বঙ্কিমচন্দ্র স্বজাতি ও স্বদেশ সম্পর্কে যে মনোভাব পোষণ করেছেন তদনুসারে তিনি স্বাধীনতা এবং সাম্য-কে যথাক্রমে 'সুখ' ও 'সকলের মঙ্গল'-এই মানদণ্ডেই বিচার করেছেন।[২১] নামসর্বস্ব স্বাধীনতা অথবা নিছক সাম্যবাদ তাঁর কাম্য ছিল না। সেদিক দিয়ে জাতীয়তাবাদের গোঁড়ামি তাঁর ছিল বলে মনে হয় না।

রবীন্দ্রনাথও সামগ্রিক মঙ্গলের মূল্যবোধে পরিমাপ করেছেন স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রকে। এইগুলিকে তিনি স্পষ্টত সমর্থন করেছেন কিন্তু তথাকথিত 'জাতীয়তাবাদ'-কে তিনি সমর্থন করেন নি। অর্থাৎ দুজনেই স্বজাতি ও স্বদেশ-সম্পর্কিত রোমান্টিক কল্পনার উর্ধ্বে ছিলেন, তাই তাঁদের রচনায় আন্তর্জাতিকতাবোধের অনুকূল মনোভাব সম্পূর্ণ প্রত্যাশিত।

২। ফ্যাসিবাদ, সাম্যবাদ কিংবা সর্বহারার একনায়কত্বে রবীন্দ্রনাথের আস্থা ছিল না, আর বঙ্কিমের যুগে উক্ত বিভিন্ন বাদ (ইজম্) বা তার বিকৃতির কথা ওঠেনি বলেই ঐ জাতীয় মনোভঙ্গির প্রশ্নই ওঠে না। "সাম্য" রচনাকালে বঙ্কিম অপরীক্ষিত সাম্যবাদের ভাবটিই সমর্থন করেছিলেন। এদিকে উত্তরসূরী পরীক্ষিত সাম্যবাদের প্রয়োগক্ষেত্রটি স্বচক্ষে দেখেছিলেন এবং তার সুফল সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু এক্ষেত্রেও 'একনায়কত্বের' নীতিটিকে তিনি সমর্থন করতে পারেননি।[২২]

৩। বঙ্কিমচন্দ্রের মত রবীন্দ্রনাথও ঠিক আধুনিক অর্থে সমাজবাদী ছিলেন

না, তবে সমাজতন্ত্রের আদর্শ ও তার মহতী বাণীর সমর্থক ছিলেন। 'মুক্তধারা', 'রক্তকরবী', 'কালের যাত্রা' ইত্যাদি নাটক-নাটিকায় সমাজচেতনার পথে এবং সেই সূত্রে আন্তর্জাতিকতার পথে যে অগ্রসর হচ্ছিলেন তিনি, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। আরও উল্লেখ করা যেতে পারে, 'ঐকতান', 'আফ্রিকা', 'মানবপুত্র', 'শিশুতীর্থ' প্রভৃতি রচনা রবীন্দ্রনাথের সমাজচেতনার ভিত্তিতে উদার মানবচিন্তার সার্থক প্রকাশ।

৪। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ উভয়ের চিন্তাতেই স্বজাতিপ্রীতির সঙ্গে জগৎ-প্রীতির কোনো বিরোধ ছিল না।

রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ সংকীর্ণ দেশপ্রেমের উপরে আন্তর্জাতিকতা-বোধকে স্থান দিয়েছেন। বস্তুতঃ তাঁর মনে বিশুদ্ধ স্বদেশবোধ ও বিশ্ববোধের মধ্যে কোন বিরোধ ছিল না, সমগ্রতাবোধে উক্ত দুটি বোধই অখণ্ডসত্তায় বিবৃত বা সমন্বিত। এই সমন্বয় বঙ্কিমমানসেও ইতিপূর্বে ঘটেছিল, রবীন্দ্রমানসে তা আরও সুস্পষ্টরূপে প্রোজ্জ্বল।

৫। সর্বশেষ কথা, রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তায়—তা জাতীয়তাবোধের ক্ষেত্রেই হোক অথবা আন্তর্জাতিকতাবোধের ক্ষেত্রে, মূলত একটি বিশেষ লক্ষ্যের কথা বারম্বার ঘোষিত, সে হল 'আত্মশক্তির উদ্বোধন'। আসল কথা, রবীন্দ্র-স্বদেশচিন্তার অভীষ্ট স্বরাজের প্রধান শর্ত আত্মশক্তির উদ্বোধন। এবং আন্তর্জাতিকতার ক্ষেত্রে সে শর্ত হল, ' real freedom is of the mind and spirit". বস্তুত এই দুটি ক্ষেত্রে দুটি শর্তই প্রায় এক লক্ষ্যাভিমুখীন। আর এর ফলশ্রুতিতে আছে "realisation of the great spiritual unity of man" ; এবং এই লক্ষ্যে উপস্থিত হওয়া অসম্ভব নাও হতে পারে।

আমরা জানি, বঙ্কিমচন্দ্রও উনবিংশ শতাব্দীর অভিজ্ঞতায় 'ধর্মতত্ত্বের' বিশ্লেষণ শেষে ঐখানেই গিয়ে পৌঁছেছিলেন,—কারণ "সমস্ত জগতে যে প্রীতি, তাহাই প্রীতিবৃত্তির চরমসীমা—তাহাই যথার্থ ধর্ম।" বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্ব-ভ্রমণের সুযোগ করে উঠতে পারেননি, কিম্বা দুটি ঐতিহাসিক বিশ্বধ্বংসী লীলার পটভূমিতে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগও তাঁর জীবনকালে ঘটেনি, কিংবা স্বদেশেও রাজনৈতিক আন্দোলনের নানা প্রকাশ (অনুকূল বা প্রতিকূল—ক্রিয়া-প্রতি-ক্রিয়া) দেখে যেতে পারেননি, তাই তাঁর আন্তর্জাতিক চেতনার পরিপ্রেক্ষিকা হতে রবীন্দ্রনাথের চেতনার পরিপ্রেক্ষিকাটি স্বভাবতঃ বৃহত্তর। ফলে উত্তরসূরীর উক্ত চেতনা বহু দিন ধরে বহু ঘটনা ও পরিস্থিতির সংঘাতে পরিণততর হয়ে উঠেছে, একথা বলা চলে। তথাপি পূর্বসূরী ও উত্তরসূরীর লক্ষ্য প্রায় একই

থেকেছে,—তা হল বিশ্বপ্রীতি ও মানবতাবোধ। তবে তাঁদের দ্বারা অনুসৃত পন্থায় বিভিন্নতা আছে, তার অন্যতম বিশেষ কারণ স্ব স্ব ধর্মচিন্তায় তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্নতা। আমাদের পরবর্তী আলোচনা সেই প্রসঙ্গে।

তৃতীয় অধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তার তুলনা : ধর্মচিন্তামূলক প্রবন্ধে

এপর্যন্ত স্বদেশচিন্তার দুটি বিশালক্ষেত্র অতিক্রমণকালে আমরা লক্ষ্য করেছি যে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তা (জাতীয়তাবোধ ও আন্তর্জাতিকতাবোধ, উভয়ই) সমাজভিত্তিক। ঐ সমাজচিন্তার ভিত্তিটি আবার ধর্মচিন্তার সুদৃঢ় গ্রানিটস্তরের উপর সংস্থাপিত। এবার এই ধর্মচিন্তার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যাবে, পূর্বসূরী ও উত্তরসূরী দুজনেই ধর্মকে ধারণীশক্তিরূপে বিশ্বাস করেছেন এবং ধর্মকেই সমাজের পোষকতত্ত্বরূপে তথা ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন বিকাশ-তত্ত্বরূপে চিন্তা করেছেন। তাঁদের ঐ বিশেষ চেতনাটি নানাবিধ রচনায় ব্যক্ত বা প্রচ্ছন্নভাবে প্রায় সর্বত্র বিদ্যমান রয়েছে। উভয়ের মননে ও সৃষ্টিতে একটি পরিচ্ছন্ন ধর্মবোধের এবং তার ফলশ্রুতিরূপে সমাজবোধের অভিব্যক্তি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। এ প্রসঙ্গে আপাতত বেশি উদ্ধৃতি তুলে ধরার প্রয়োজন নেই, দুজন মনীষীর ধর্মচিন্তার দুটি 'মটো' সম্মুখে রেখে আলোচনায় প্রবেশ করা যেতে পারে—

ক. 'যদ্দ্বারা লোকরক্ষা বা লোকহিত সাধিত হয় তাহাই ধর্ম।'

—৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, কৃষ্ণচরিত্র

খ. 'প্রাচ্যসভ্যতার কলেবর ধর্ম। ধর্ম বলিতে রিলিজন নহে, সামাজিক কর্তব্যতন্ত্র, তাহার মধ্যে যথাযোগ্যভাবে রিলিজন পলিটিক্স সমস্তই আছে।'

—"সমাজভেদ", ভারতবর্ষ ও স্বদেশ

আলোচনায় দেখা যাবে, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক স্বদেশচিন্তার জগতে তাঁদের স্ব স্ব ধর্মচেতনা আলো-হাওয়ার মতই সর্বত্র-সঞ্চারী। ইতিপূর্বেই লক্ষ্য করেছি, স্বদেশচিন্তার মূলকেন্দ্রটি যে ধর্মচিন্তা তা রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সব মনীষীর চিন্তায় ও সাহিত্যকর্মে সুস্পষ্ট। "বিকৃত ধর্ম থেকে রাষ্ট্রীয় দুর্গতির সূচনা,"—রামমোহনের এই সিদ্ধান্ত পরবর্তী সমগ্র রেনেসাঁ আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছে। ধর্মসংস্কার ও সমাজ সংস্কারের কাজে

দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, এমন কি এক অর্থে ইয়ং-বেঙ্গল-গোষ্ঠীও (ভাঙনের পথ ধরেই) আত্মনিয়োগ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তায় তারই স্বাভাবিক উত্তরাধিকার লক্ষ্য করা যায়। আমরা আরও লক্ষ্য করেছি ব্রাহ্মধর্ম-আন্দোলন এবং নব্যহিন্দুত্ব-পুনরুজ্জীবনের ক্রমিক প্রয়াস উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাঙ্গালী সমাজ-মানসে প্রবল পরিবর্তনের সূচনা করেছিল। উক্ত আন্দোলন দুটির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় সমগ্র রেনেসাঁ আন্দোলনটিই একটি সমন্বয়ের পথ খুঁজে পেয়েছিল, তারই পরিচয় বঙ্কিম-রবীন্দ্রের স্বদেশচিন্তায়। এদিক দিয়ে দু'জনে দুটি ধারার প্রতিনিধিত্ব করলেও ক্রমে দু'জনেই সমন্বয়ের পথে সিদ্ধান্তের প্রয়াস করেছেন এবং তাঁদের ধর্মচিন্তা সামগ্রিকরূপে বাঙালির তথা ভারতবাসীর মানস-বিবর্তনের নিয়ামক হয়ে উঠেছে।

আমরা ইতিপূর্বেই বলেছি, রাজনৈতিকচিন্তা, সমাজচিন্তা এবং আন্তর্জাতিকতাবোধে পূর্বসূরী ও উত্তরসূরীর অনেক বিষয়ে মিল থাকলেও দুজনের মনোভঙ্গিতে নানা সূক্ষ্ম প্রভেদ, এমন কি কোথাও-বা আমূল পার্থক্য যা দেখা যায়, তার মূলে কেবলমাত্র যুগপরিবেশের পার্থক্যই নেই, ধর্ম-চেতনার মূল দৃষ্টিভঙ্গির প্রভেদও বিদ্যমান। এককথায় ধর্মচিন্তার ক্ষেত্রে এই পার্থক্যই দুজনের স্বদেশচিন্তার বৈশিষ্ট্যের মূলে ক্রিয়াশীল থেকেছে। এ-সম্পর্কে বিস্তৃত পর্যালোচনার ভূমিকা হিসাবে ইতিপূর্বে অনুসৃত রীতি অনুযায়ী তিনটি শ্রেণীতে এই জাতীয় প্রবন্ধগুলিকে বিন্যস্ত করছি—

(ক) মৃত্যুরহস্য-ব্যঙ্গচ্ছলে অথবা উষ্মাবিহীন বিশ্লেষণে ভারতে আচরিত ধর্মের স্বরূপ-উদ্ঘাটন। তীব্র তীক্ষ্ণ কটাক্ষ-বিদ্রূপে ধর্ম-সংক্রান্ত বাদ-প্রতিবাদ, পত্রযুদ্ধ এবং তৎকালীন পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠায় মসীযুদ্ধও এই শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত।

(খ) ইতিহাস-চেতনার আশ্রয়ে হিন্দুধর্ম তথা ভারতীয় ধর্মচিন্তার কলঙ্ক-অপনোদন, ঐতিহ্য-গৌরব-বিশ্লেষণ, কিংবা তুলনামূলক আলোচনায় প্রাচ্যের ধর্মচিন্তার মূল্যায়ন, আর ইতিহাসের ধ্যানে ভারতীয় ধর্মসাধনার আদর্শীকরণ ('Idealisation')।

(গ) সংগঠনমূলক ধর্মচিন্তা: অর্থাৎ যুগপ্রয়োজনে লৌকিক ধর্মাচরণের সংস্কার, নিজস্ব ধর্মচেতনা ও উপলব্ধির অভিব্যক্তি এবং চিরন্তন ধর্মবোধের প্রতিষ্ঠা-প্রয়াস।

বঙ্কিম রচনায় ঃ

(ক) ১। 'The confession of a young Bengal'
Anonymously appeared in the Mukherjee's Magazine, Dec. 1872.

২। রামায়ণের সমালোচনা (লোকরহস্য, ১৮৭২) 'বঙ্গদর্শন'

৩। বঙ্গে দেবপূজা-প্রতিবাদ, (ভ্রমর, ১২৮১)

৪। Letters in the Haste Controversy—(The Statesman, 1882)

৫। আদি ব্রাহ্মসমাজ ও নব্য হিন্দু সম্প্রদায়, (প্রচার, অগ্রহায়ণ, ১২৯১)

৬। গৌরদাস বাবাজীর ভিক্ষার ঝুলি—(প্রচার, পৌষ, ১২৯১ ; বৈশাখ, ১২৯২ ; আষাঢ়, ১২৯২)

(খ) ১। 'On the Origin of Hindu Festival'
—read in the Bengal Social Science Association on 20. 1. 1869.

২। 'Buddhism and the Sankhya Philosophy'—Cal. Review, No. 106, 1871.

৩। 'The study of Hindu Philosophy ; Mukherjee's Magazine, May 1873.

৪। দ্রৌপদী (১ম ও ২য় প্রস্তাব) বঙ্গদর্শন

৫। জ্ঞান ঐ

৬। সাংখ্যদর্শন ঐ

৭। দুর্গা জ্যৈষ্ঠ, ১২৮০ ; বঙ্গদর্শন

৮। কৃষ্ণচরিত্র (গ্রন্থ সমালোচনা) চৈত্র ১২৮১, ঐ

৯। 'ত্রিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশাস্ত্র কি বলে' (বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় ভাগ) বৈশাখ, ১২৮২

প্রথম প্রকাশ 'মিল, ডার্বিন এবং হিন্দুধর্ম'—শিরোনামায়। ঐ

১০। কৃষ্ণচরিত্র —আশ্বিন, ১২৯১ 'প্রচারে' সুরু
(১ম খণ্ড গ্রন্থাকারে ১৮৮৬ খ্রীঃ, সম্পূর্ণ ১৮৯২ খ্রীঃ)

১১। দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম 'প্রচার' ১ম ও ২য় বর্ষ, ১২৯১-৯২ সালের নানা সংখ্যায়

(গ) ১। একা — কমলাকান্তের দপ্তর, ১২৮০-৮২ সাল

২। মনুষ্যত্ব কি ? — আশ্বিন, ১২৮৪, বঙ্গদর্শন

৩। ধর্ম্ম ও সাহিত্য — পৌষ, ১২৯২, প্রচার

৪। চিত্তশুদ্ধি — ফাল্গুন, ১২৯২, প্রচার

৫। Letters on Hinduism (নানা তারিখে ১৮৮৮ খ্রীঃ এর পূর্বে লিখিত)

৬। 'ধর্ম্মতত্ত্ব' (অনুশীলন)—নবজীবন ১ম সংখ্যা ১২৯১, শ্রাবণে আরম্ভ, ১ম ভাগ ১৮৮৮ খ্রীঃ পুস্তকাকারে।

৭। শ্রীমদ্ভগবদগীতা (অসমাপ্ত) — শ্রাবণ, ১২৯৩ 'প্রচার' এ আরম্ভ

৮। 'Vedic Literature'—Presidential address: 9th Feb. 1892.
reprinted in Cal. University Magazine on 1. 3. 1892.

রবীন্দ্র রচনায়ঃ

(ক) ১। 'অদ্বৈতবাদ ও আধুনিক ইংরেজ কবি'—অগ্রহায়ণ, ১২৮৮, ভারতী

২। একটি পুরাতন কথা —অগ্রহায়ণ, ১২৯১, ঐ

৩। কৈফিয়ৎ (বঙ্কিম এর 'আদি ব্রাহ্মসমাজ…ইত্যাদি' রচনার পর) পৌষ, ১২৯১, ভারতী

৪। সমস্যা — ভারতী, ফাল্গুন, ১২৯১ ঐ
রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সং-২

৫। (ক) দামু ও চামু (কবিতা: 'কড়ি ও কোমল': ১ম সং) 'সঞ্জীবনী'তে

(খ) ধর্ম্মপ্রচার (কবিতা, মানসী)

৬। 'সাকার ও নিরাকার উপাসনা' যুগপৎ 'ভারতী' ও 'তত্ত্ববোধিনী'তে শ্রাবণ ও ভাদ্র, ১২৯২

৭। সূক্ষ্ম বিচার (হাস্য কৌতুক) — বৈশাখ, ১২৯৩

৮। গুরুবাক্য ঐ — চৈত্র, ১২৯৩

৯। নূতন অবতার (ব্যঙ্গ কৌতুক) — পৌষ, ১৩০১

১০। ধর্মবোধের দৃষ্টান্ত (ভারতবর্ষ ও স্বদেশ) — ১৩১০

(খ) ১। 'নৈবেদ্য'—অন্তর্গত প্রাসঙ্গিক কবিতাবলীতে প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য-প্রশস্তি— ১৩০৮ সাল

২। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা (ভারতবর্ষ ও স্বদেশ)
বঙ্গদর্শন (নবপর্যায়) জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৮

৩। হিন্দুত্ব বঙ্গদর্শন (নবপর্যায়) শ্রাবণ, ১৩০৮

৪। প্রাচীন ভারতের এক : (ধর্ম) ঐ ফাল্গুন ১৩০৮

৫। নববর্ষ (ভারতবর্ষ ও স্বদেশ) ঐ বৈশাখ ১৩০৯

৬। নববর্ষের দিনে (ভাষণ)

৭। 'ততঃ কিম্' (ধর্ম) অগ্রহায়ণ ১৩১৩

৮। বিশ্ববোধ (শান্তিনিকেতন)

৯। ধর্মের অধিকার (সঞ্চয়) প্রবাসী, ফাল্গুন, ১৩১৮

১০। ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা (শান্তিনিকেতন)
তত্ত্ববোধিনী, বৈশাখ ১৩১৮

১১। ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা (পরিচয়) প্রবাসী, চৈত্র ১৩১৮

১২। বুদ্ধদেব (চারিত্রপূজা) (১৩১০ থেকে ১৩৩৯ সাল পর্যন্ত রচনা)

১৩। খ্রীষ্ট ঐ (১৩১৪—১৩৪৭ সালের বিভিন্ন সময়ে)

(গ) ১। ভারতপথিক রামমোহন রায় ভারতী, মাঘ ১২৯১

২। 'সাকার ও নিরাকার' গ্রন্থ সমালোচনা „ আশ্বিন ১৩০৫

৩। 'ব্রহ্মমন্ত্র' (পরিশিষ্ট, 'মানুষের ধর্ম') —১০ মাঘোৎসব, ১৩০৭

৪। নানা চিঠিপত্রে 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম' সম্পর্কে ব্যাখ্যান—

৫। ব্রাহ্মণ (ভারতবর্ষ ও স্বদেশ) বঙ্গদর্শন (নবপর্যায়) জ্যৈষ্ঠ ১৩০৯

৬। 'ধর্ম' গ্রন্থভুক্ত উপদেশমালা (১৩০৮—১৩১৪ সাল)

৭। আত্মপরিচয় তত্ত্ববোধিনী, ১৩১১—১৩২৪ সাল

৮। 'শান্তিনিকেতন'—(১৭ খণ্ডে সংগৃহীত)
প্রথম ৮ খণ্ড, ১৩১৫-১৩১৬

৯। 'ধর্মের অর্থ' (সঞ্চয়) তত্ত্ববোধিনী, আশ্বিন, কার্তিক ১৩১৭

১০। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ঐ প্রবাসী ও তত্ত্ববোধিনী, অগ্রহায়ণ ঐ

১১। রূপ ও অরূপ ঐ প্রবাসী, পৌষ ১৩১৮

১২। ধর্মশিক্ষা ঐ তত্ত্ববোধিনী, মাঘ ১৩১৮

১৩। ধর্মের নবযুগ ঐ ভারতী ও তত্ত্ববোধিনী, ফাল্গুন ১৩১৮

১৪। আত্মপরিচয় ঐ তত্ত্ববোধিনী, বৈশাখ ১৩১৯

১৫। 'India's Prayer' (কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশনে পঠিত)
২৬।১২।১৯১৭

১৬। 'The religion of Man'—অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত হিবার্ট বক্তৃতামালা ১৯শে, ২১শে, ২৬শে মে ১৯৩০ খ্রীঃ

১৭। মানুষের ধর্ম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত কমলা বক্তৃতামালা
১৬ই, ১৮ই, ২০শে জানুয়ারী ১৯৩০ খ্রীঃ

১৮। আশ্রমের রূপ ও বিকাশ —গ্রন্থাকারে প্রকাশ ১৯৪১ খ্রীঃ

১৯। 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থ (সংকলন) ১৯৪৩ খ্রীঃ

এক.

বঙ্কিমী ব্যঙ্গ-কটাক্ষের প্রধান লক্ষ্য ছিল তৎকালীন ইঙ্গ-বঙ্গীয় সমাজ এবং ইউরোপীয় সভ্যতা; রাজনৈতিকচিন্তা ও সমাজচিন্তার মত ধর্মচিন্তার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ১৮৭২ খ্রীঃ 'মুখার্জ্জীস ম্যাগাজিনে' বেনামীতে যে 'Confession of a young Bengal'—প্রকাশিত হয়েছিল তারও উদ্দেশ্য ছদ্ম-স্বীকৃতির আশ্রয়ে কটাক্ষবর্ষণ, অর্থাৎ সমকালীন হিন্দু সমাজরীতি ও ধর্ম-চেতনার আধুনিকীকরণের প্রতি বিদ্রূপ—"...sound logic compels us to cry with one voice Hinduism must be destroyed..."

আবার এই ছদ্ম-স্বীকৃতির সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্কিমের প্রশ্ন ছিল, "where is our new code of morality?" এই 'new code of morality'-র অনুসন্ধান চলেছে বঙ্কিমের জীবনভোর। কিন্তু 'Hinduism must be destroyed', —এই শ্লোগান যারা দেয় সেই ইঙ্গ-বঙ্গীয়দের প্রতি তাঁর বিদ্রূপবর্ষণে ক্ষান্তি আসে নি, কারণ তথাকথিত reason-এর চালুনিতে হিন্দু ধর্মগ্রন্থ, শাস্ত্রসংহিতার ভস্মস্তূপ চেলে তারা কোন মূল্যবান সত্য বা নীতি খুঁজে পায় না। তাই 'রামায়ণের সমালোচনা'-য় তারা বলে,—'কাব্যগ্রন্থখানির স্থূল তাৎপর্য বানর-দিগের মাহাত্ম্যবর্ণন'। আর ইউরোপীয় সমালোচকদের দৃষ্টিতে আমাদের সব শাস্ত্র-সংহিতা, দর্শন-কাব্য বড়জোর তৃতীয় শ্রেণীর রচনা বলে স্বীকৃতিলাভ করে। বঙ্কিমের পরিণত বয়সের রচনায় এই জাতীয় কটাক্ষ তীব্রতর ও সূচীতীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে, কোথাও-বা হিন্দুত্বের শ্লাঘায় আক্রমণমুখী হয়ে উঠেছে—"হিন্দু

পুরাণেতিহাসে এমন কথা থাকিতে আমরা কিনা মেমসাহেবদের লেখা নবেল পড়িয়া দিন কাটাই, না হয় সভা করিয়া পাঁচ জনে জুটিয়া পাখির মত কিচির মিচির করি।" (৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ, ৫ম খণ্ড, কৃষ্ণচরিত্র)।

'উপলক্ষমাত্রে কলহের দৃষ্টান্ত রূপে'—এটির উল্লেখ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ('কৃষ্ণচরিত্র', আধুনিক সাহিত্য)। অন্যত্রও এ জাতীয় গায়ে পড়া কলহের ঝাঁঝ আছে—"তুমি পাশ্চাত্য পণ্ডিতে ও পাশ্চাত্য গর্দ্দভে গোল করিয়া ফেলিতেছ" (২৫শে অধ্যায়, ধর্ম্মতত্ত্ব)। আমরা জানি, য়ুরোপীয় পণ্ডিতদের কারো কারো প্রতি (যথা—মেকলে, দ্রঃ—১৯ অধ্যায়, 'ধর্ম্মতত্ত্ব') ব্যঙ্গোক্তি কেবল বঙ্কিমেরই ব্যক্তি-প্রবণতা নয়, এ সেই যুগ-প্রবণতা,—আরতা হিন্দু পুনরুজ্জীবনের শ্লাঘাজাত। অবশ্য বঙ্কিম সর্বত্রই যে কলহের সূত্রেই শ্লাঘা প্রকাশ করেছেন তা নয়, স্বদেশীয় ধর্ম-সংস্কৃতির উপর বিদেশী পাদ্রীর প্রচণ্ড আক্রমণের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েও তিনি তীব্র শ্লেষের আশ্রয় নিয়েছেন, তবে তিনি নিছক শ্লেষ বর্ষণেই কর্তব্য সমাপ্ত করেন নি, ধর্মীয় ঐতিহ্য অনুসন্ধান করে আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রয়াসেও অগ্রসর হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, পাদ্রী হেস্টির সঙ্গে 'The Statesman' পত্রিকার পৃষ্ঠায় দীর্ঘদিনব্যাপী বঙ্কিমের তর্কযুদ্ধটি। হিন্দু পৌত্তলিকতা ও আড়ম্বরকে তীব্র আক্রমণ করে রেভারেণ্ড হেস্টি উক্ত তর্কযুদ্ধের সূচনা করেন পর পর পাঁচটি পত্রে।[১] —এতে ভারতবর্ষ ও হিন্দুদের জন্য করুণাশ্রুমোচন করেছিলেন তিনি—"O Bharat-varsa...how hast thou fallen from thy throne of pride and become the mother of harlots and of the abomination of the earth."

(26.9.82, The Statesman)

এবং তার উদ্ধারের পন্থাও নির্দেশ করেছিলেন—

"It is only christianity...that can rationally take the place of the falling Brahmonism" (29.9.82, The Statesman)

এদিকে উড়িষ্যার জাজপুর হতে রামচন্দ্র ছদ্মনামে বঙ্কিম উক্ত স্পর্ধিত পত্রের প্রতিবাদ জানালেন 'The modern of St. Paul'—শীর্ষক পত্রে। হেস্টির স্পর্ধিত পুনরাক্রমণের পর বঙ্কিম দ্বিতীয় কিস্তি লিখলেন 'European Version of Hindoo Doctrines'—শীর্ষকে। তৎপর হেস্টির ১৭।১০।৮২-র জবাবে বঙ্কিমের শেষ কিস্তি 'Intellectual superiority of Europe'—শিরোনামায় মুদ্রিত হল।

বঙ্কিম তাঁর প্রথম পত্রে 'European St. Paul'-কে সুবিনীত পরামর্শ

দিয়েছিলেন কোন হিন্দু পণ্ডিতের কাছে সংস্কৃত শাস্ত্র পুরাণ, গীতা, শাণ্ডিল্য সূত্রাদি অধ্যয়ন করতে। দ্বিতীয়বারে তিনি 'European Version of Hindoo Doctrines'-এর ব্যর্থতার আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু তৃতীয় পত্রেই বঙ্কিমের তীব্র ব্যঙ্গ খরতর হয়েছিল "All coin is false coin unless it bears a stamp of European mint."

অতঃপর শ্লেষ আর এক পরদা চড়েছিল—"পশ্চিমাকাশ হতে উদ্ধারকারী দেবদূত নেমে আসছেন, তাঁর পাখায় বৈদিক শ্লোকের ছিন্ন টুকরো, পৃথিবীর অবশিষ্ট জঙ্গলী অসভ্যদের মুক্তির বাণী শোনাবেন তাঁরা…", কিংবা হিন্দুর উপাস্য পুতুলগুলি জাতির কুৎসিত রুচির নিদর্শন, তাই—"Wealthy Hindoos should get their Krisnas and Radhas made in Europe."

লক্ষণীয় এই, তর্কযুদ্ধের উত্তেজনার মধ্যেও বঙ্কিম তাঁর যুক্তি-পরম্পরা অব্যাহত রেখেছেন এবং নিম্নলিখিত কয়েকটি মূল সূত্র প্রতিপাদন করেছেন—

(ক) হিন্দু দর্শনের ন্যায়, সাংখ্য, বৈষ্ণবদর্শন উল্লেখযোগ্য।

(খ) "Hinduism...consists of—firstly, a doctrinal basis or creed, secondly a worship or rites, lastly a code of morals more or less dependent upon the doctrinal basis."

(গ) Ethics of Hindu religion-এর অন্তর্গত "The social polity is also non-essential." অর্থাৎ জাতিভেদপ্রথা বহিরঙ্গ মাত্র। তাই বঙ্কিম 'idolatry', 'caste'—সবকিছু পরিত্যাগ করে স্মিতহাস্যে বলে উঠলেন, "I leave the kernel without the husk"। এখানে স্মিত-রসিকতার আশ্রয়ে বঙ্কিম তাঁর সুদৃঢ় বিশ্বাস প্রকট করেছেন এই যে, হিন্দুধর্মের বহিরঙ্গ অনুষ্ঠানগুলি, পৌত্তলিকতা, জাতিভেদপ্রথা প্রভৃতি—সবই ছোবড়ার মত পরিত্যাজ্য। এই মনোভঙ্গি তাঁর জীবনের শেষদশকের নানা রচনাতে লক্ষ্য করা যায়, তবে একেবারে শেষধাপে ঐ পরিত্যক্ত ছোবড়াগুলি পাকিয়ে সমাজের রজ্জুতে পরিণত করার দিকে একটু ঝোঁক দেখা যায়; সে সম্পর্কে আমরা পরে আলোচনা করব।

'Husk' হতে 'Kernel' গ্রহণ করার এই জাতীয় মনোভঙ্গি এর অন্তত আট বৎসর আগের একটি প্রতিবাদমূলক প্রবন্ধে লক্ষ্য করা গিয়েছিল। ঐ একই প্রকার স্মিতহাস্য, তীক্ষ্ণব্যঙ্গ ও যুক্তিপরম্পরার আশ্রয়ে বঙ্কিম জানিয়েছিলেন গোঁড়া হিন্দু কুসংস্কারের বিরুদ্ধেও—"শ্রীঃ কি মনে করেন যে, দেবতার পূজা উঠিয়া গেলেই সমাজ খসিয়া পড়িবে, সমাজের লোকসকল গোশালাবিমুক্ত গরুর

ন্যায় বনের দিকে ছুটিবে?" (বঙ্গে দেবপূজা—প্রতিবাদ ১২৮১)

এই পরিহাসের সূত্রেই বক্তব্য ছিল, সাকার পূজা—(১) জ্ঞানোন্নতির কণ্টক, (২) স্বানুবর্তিতার বিরোধী, (৩) সমাজের গতিরোধকারী, তবে কাব্য ও সূক্ষ্ম শিল্পের পুষ্টিকারক। হেস্টির সঙ্গে মসীযুদ্ধে বঙ্কিম এই সাকার পূজাকেই হিন্দুধর্মের 'non-essential rites' বলতে সঙ্কোচ করেননি। গোঁড়া হিন্দুয়ানী ও উদ্ধত খ্রীস্টিয়ানীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের পর বঙ্কিমকে আর একটি মসীযুদ্ধ করতে হয়েছিল তাঁরই উত্তরসূরীর সঙ্গে। বাংলা সাহিত্যের আসরে প্রবীণ ও নবীনের এই লড়াই আজ সুবিদিত। এই মসীযুদ্ধ আসলে হিন্দু পুনরুজ্জীবনের একটি বিশেষ ধারার নেতা বঙ্কিমের সঙ্গে আদি ব্রাহ্মসমাজের নব নির্বাচিত সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের। এবারেও বঙ্কিমের প্রতিপক্ষই মসীযুদ্ধের সূচনা করেছিলেন।

তরুণ বয়সে একবার ভারতীয় হিন্দু সমাজব্যবস্থার প্রতি কটাক্ষ বর্ষণ করলেও ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথ মূলধর্মনীতি নিয়ে বিতণ্ডায় যোগ দেননি। এর একটি মাত্র ব্যতিক্রম—'অদ্বৈতবাদ ও আধুনিক ইংরেজ কবি' প্রবন্ধটি, যাতে ইংলণ্ডীয় কবিদের প্রতি কটাক্ষবর্ষণ ছিল। রবীন্দ্রনাথের লেখনী প্রথম রীতিমত প্রতিবাদ প্রবন্ধ রচনা করেছে 'একটি পুরাতন কথা' শীর্ষকে, এতে বঙ্কিমচন্দ্র প্রচারিত 'হিন্দুধর্ম' প্রবন্ধে (প্রচার, ১২৯১) উল্লিখিত জনৈক হিন্দুর 'লোকহিতার্থে মিথ্যা' ব্যবহারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ছিল ব্যঙ্গের আশ্রয়ে—

"যাহারা আবশ্যকমত দুই একটা মিথ্যাকথা বলে···তাহারা practical লোক।" অবশেষে বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্যে তাঁর তীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপিত হল—"কোনোখানেই মিথ্যা সত্য হয় না, শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিমবাবু বলিলেও হয় না, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিলেও হয় না।" (একটি পুরাতন কথা) এক্ষেত্রে আদি ব্রাহ্ম-সমাজের নবীন সম্পাদকের আগ্রহাতিশয্য লক্ষণীয়। পূর্বোক্ত 'হিন্দুধর্ম' শীর্ষক প্রবন্ধাবলীর সমগ্র অর্থ অনুধাবন না করেই সাত তাড়াতাড়ি একটি সমালোচনা লিখে বঙ্কিমকে মসীযুদ্ধে প্রবৃত্ত করানোর জন্য রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে লজ্জাবোধ করেছেন। (দ্রঃ—জীবন স্মৃতি)। কিন্তু বঙ্কিম উত্তর দিলেন, 'আদি ব্রাহ্ম-সমাজ ও নব্য হিন্দু সম্প্রদায়' শীর্ষক নিবন্ধে। পূর্বাহ্নেই তাঁর কৈফিয়ৎ লক্ষ্য করার মত,—"তবে যে এ কয়পাতা লিখিলাম, তাহার কারণ, এই রবির পিছনে একটা বড় ছায়া দেখিতেছি।" ছায়া অর্থে আদি ব্রাহ্মসমাজ। প্রতিপক্ষের দ্বারা পরদায় পরদায় তীব্রতর চতুর্থ আক্রমণের পরই বঙ্কিম লেখনীযুদ্ধে নামলেন, লিখলেন "তবে প্রভু-ভৃত্যের মত মেছোহাটা হইতে গালি আমদানি করেন নাই; প্রার্থনা মন্দির হইতে আনিয়াছেন" (প্রভু অর্থে রবীন্দ্রনাথ)। যাই হোক বঙ্কিম

তাঁর বয়সের গাম্ভীর্য বজায় রেখে রবীন্দ্রনাথের 'পরোক্ষ বাগ্মিতার উৎস খুলিয়া দিবার' জন্য মৃদু ক্ষোভ প্রকাশ করলেন, এবং 'আদি ব্রাহ্মসমাজ দ্বারা এদেশে ধর্ম সম্বন্ধে বিশেষ উন্নতি' হয়েছে—এ ঋণও স্বীকার করে তাঁর স্নেহাস্পদ ও বাংলার উজ্জ্বলরত্ন রবীন্দ্রনাথকে আশীর্বাদ জানালেন। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য অতঃপর 'কৈফিয়ৎ' প্রবন্ধে লিখলেন, "আমার কর্তব্যকার্য সাধন করিয়াছি···সমস্ত বঙ্গ-সমাজের হইয়া লিখিয়াছি। বিশেষ রূপে আমি ব্রাহ্মসমাজের হইয়া লিখি নাই।" বলা বাহুল্য জ্ঞানতঃ না হলেও আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক হবার শ্লাঘাতেই এ দ্বৈরথযুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। কারণ ঠিক পরের মাসেই 'ভারতী'-তে প্রকাশিত 'রামমোহন রায়' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ কিছু উচ্চকণ্ঠেই ঘোষণা করেছিলেন—"ব্রাহ্মধর্ম পৃথিবীর ধর্ম,···ব্রাহ্মধর্মের জন্য পৃথিবী ভারতবর্ষের নিকট ঋণী।" কিন্তু এরও পরবর্তী মাসিক সংখ্যায় (ফাল্গুন, ১২৯১) 'ভারতীতে' উক্ত শ্লাঘার কিছু প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়; রবীন্দ্রনাথ এবার ব্রাহ্মধর্মের সমস্যাগুলিকেই তুলে ধরে ব্রাহ্মসমাজের অত্যুৎসাহী সংস্কারকদের প্রতি কটাক্ষ করে লিখলেন, "আমাদের সমাজ যদি গাছপাকা হইয়া উঠিত তবে আর ভাবনা থাকিত না, তাহা হইলে আঁঠিতে খোসাতে এত মনান্তর, মতান্তর, অবস্থান্তর থাকিত না, কিন্তু হিন্দু সমাজের শাখা হইতে পাড়িয়া বঙ্গসমাজকে বলপূর্বক পাকানো হইতেছে।" এই 'বলপূর্বক পাকানো'-র বিরুদ্ধে মত দিলেন রবীন্দ্রনাথ,—"বাঁধন ছিঁড়িবার উপলক্ষে তুচ্ছতর সাম্প্রদায়িক বাঁধনে সমাজের পঙ্গুদেহ জড়াইও না" (সমস্যা)। মোটকথা বিশেষ কোন দলভুক্ত হয়ে পড়েছেন আশঙ্কায় রবীন্দ্রনাথ 'তথাকথিত সমর্থিত দলকে আঘাত' করলেন। এদিকে ওপক্ষেও প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র হয়ত বিগত মসীযুদ্ধের তিক্ততাকে মুছে ফেলার জন্যই রচনা করলেন—স্মিতরসসিক্ত 'গৌরদাস বাবাজীর ভিক্ষার ঝুলি' (পৌষ ১২৯১-তে প্রথম কিস্তি)। মনে হয় যেন পূর্বসূরী ও উত্তরসূরী উভয়েই মসীযুদ্ধের পর কিঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র 'ভিক্ষার ঝুলি'-হতে কেবল বৈষ্ণবীয় রসভাষ্যই বের করেননি, 'হিন্দু ধর্মের বখামিগুলো'-র কিছু নমুনা বের করে দেখিয়েছেন। আর সবচেয়ে বড় কথা, এখানে বঙ্কিমের ধর্মচিন্তার মূলসূত্র—'ঈশ্বরে ভক্তি, মনুষ্যে প্রীতি এবং হৃদয়ে শান্তি'—সহজ সুরেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তথাপি বঙ্কিমী রসিকতা বৈষ্ণবীয় নম্রতায় মধুর হয়ে উঠেছে। কণ্ঠীতে, কুঁড়োজালিতে নিরামিষে, পঞ্চসংস্কারে, এমন কি দেড়কাহন বৈষ্ণবীতেও যে বৈষ্ণব হওয়া যায় না—একথা বাবাজী স্পষ্টই জলের মতো বুঝিয়ে দিয়ে মুরগী-মাংসের উপযোগিতা তত্ত্ব এবং তার সঙ্গেই কৃষ্ণের

রূপকার্থের ব্যাখ্যা সহযোগে ভক্তিতত্ত্ব পরিবেশন করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র বিরোধের কাঁটা স্বয়ং উৎপাটিত করে মসীযুদ্ধের ক্ষেত্র হতে সরে দাঁড়ালেও, বিরোধ জিইয়ে রাখলেন বঙ্কিমশিবিরের চন্দ্রনাথ বসু। বিরোধের বিষয়বস্তু একই, তবে কিছু বৈচিত্র্য-যুক্ত। ইতিপূর্বেই রবীন্দ্র-চন্দ্রনাথ দুয়েলের ফার্স্ট রাউণ্ড হয়ে গিয়েছিল, সেটিতে 'ইতর' শব্দটিকে উভয়পক্ষই অস্ত্ররূপে ব্যবহার করেছেন। এর আগে প্রকাশিত একটি বেনামী পত্রের স্বাক্ষর রূপে 'র' আদ্যক্ষরটি রবীন্দ্রনাথেরই পরিচয়-সূচক ছিল। ইতিমধ্যে শশধর তর্কচূড়ামণিকে নব্যহিন্দুধর্ম ব্যাখ্যাতার আসনে বসিয়ে চন্দ্রনাথ বসু প্রচণ্ড উৎসাহে ব্রাহ্ম নিরাকার তত্ত্বের উপর শিং ঘষতে সুরু করে দিয়েছিলেন। অতএব রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদ প্রকাশিত হল 'সাকার ও নিরাকার উপাসনা' নামক প্রবন্ধে (১২৯২)। এর কিছু দিন আগেই বঙ্কিমের অনুরোধেই হয়ত শশধর তর্কচূড়ামণির বক্তৃতা রবীন্দ্রনাথ শুনেছিলেন এবং বলা বাহুল্য নিরাশ হয়েছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বঙ্কিমচন্দ্রও হাঁচি, টিকটিকি, ভুঁড়ির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাকে নব্য-হিন্দু-ধর্ম আন্দোলনের অভিযানের সহায়ক রূপে সমর্থন করতে পারেননি। এবং তিনি স্পষ্টই বলেছিলেন, "যদি ইহা হিন্দুধর্ম হয় তবে আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে আমরা হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন চাহি না।" ('দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম', ১২৯২) যাই হোক, বঙ্কিমের উত্তরসূরী তাঁর প্রতিপক্ষকে তীব্রভাবেই আক্রমণ করেছিলেন, কারণ তাঁরা ব্রহ্মজ্ঞানী ঋষি ও উপনিষদের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেছিলেন। অবশ্য এই প্রবন্ধেই আত্মবিশ্লেষণও ছিল, যথা—

"অতএব ব্রাহ্ম এবং হিন্দু বলিয়া দুই কাল্পনিক বিরুদ্ধ পক্ষ খাড়া করিয়া যুদ্ধ বাধাইয়া দিলে গোলাগুলির বৃথা অপব্যয় করা হয় মাত্র।" এই সময় শুধু প্রবন্ধের মাধ্যমেই নয়, কয়েকটি ব্যঙ্গ কবিতার আশ্রয়ে তৎকালীন নবতম উপসর্গ 'কল্কি অবতার' ও তার দলকে আক্রমণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ, কল্কি অবতার 'কৃষ্ণানন্দের' আর্যামির বড়াই তাঁর অসহ্য হয়ে উঠেছিল, তাই প্রিয়নাথ সেনকে লেখা কবিতা-পত্রে ছিল—

"তাঁরা বলেন, 'আমি কল্কি', গাঁজার কল্কি হবে বুঝি
অবতারে ভরে গেল যত রাজ্যের গলিঘুঁজি।" —কড়ি ও কোমল

এই সময় 'কৃষ্ণকুমার মিত্রের সঞ্জীবনী' এবং অন্যান্য কয়েকটি পত্রে সুতীব্র ব্যঙ্গের কশা হস্তে তিনি সাক্ষাৎভাবে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। বিপক্ষ দলের পত্রিকা ও সুযোগ্য লেখক চন্দ্রনাথ বসু সম্বন্ধে তাঁর সুতীব্র ব্যঙ্গ প্রথম প্রকাশ পেল 'দামু ও চামু' নামক কবিতায়। এই দামু ও চামু তখন 'লিখছে দোঁহে

হিন্দু শাস্ত্র এডিটোরিয়াল।' "এই জাতীয় রচনাগুলিতে যুক্তিতর্কের কোন বালাই নেই। তীব্র বিদ্বেষসঞ্জাত ব্যঙ্গের ছলে নিছক গালাগালিতে প্রতিপক্ষকে কোন প্রকারে কাবু করাই এগুলির উদ্দেশ্য।"[২] অতঃপর এই দ্বৈরথ সমরে 'হিন্দু বিবাহ', 'আহারতত্ত্ব' নিয়েও এক এক রাউণ্ড হয়ে গিয়েছিল (১২৯৩)। এমন কি চন্দ্রনাথ বসু উদ্ভাবিত 'লয়তত্ত্বে'র 'এন্টিডোট' রূপে প্রকাশিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের 'হিং টিং ছট' (১২৯৯)।

উক্ত মসীযুদ্ধের সমাপ্তি-পর্বে রবীন্দ্রনাথ 'হাস্যকৌতুক' ও 'ব্যঙ্গকৌতুকে'র আশ্রয়ে হিন্দুয়ানী ও নব্য আর্যধর্মের তৎকালীন আতিশয্যের সুমিষ্ট প্রতিবাদ করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য—'আর্য ও অনার্য', 'সূক্ষ্ম বিচার', 'গুরুবাক্য' 'নূতন অবতার'—ইত্যাদি। 'আর্য ও অনার্যের'—চিন্তামণি কুণ্ডু নিঃসন্দেহে শশধর তর্কচূড়ামণির ব্যঙ্গ প্রতীক, যার অহঙ্কার, 'সমস্ত বিদ্যাই তার স্বাধীন চিন্তাপ্রসূত' (তুঃ 'কল্পনা' কাব্যের 'উন্নতির লক্ষণ' কবিতাটি)। আর হিন্দুর গুরুবাদের মোহকে প্রচণ্ড বিদ্রূপ করা হয়েছে 'গুরুবাক্যে', যার শেষ বাক্যটি বদনচন্দ্রের সকরুণ প্রশ্নে ধ্বনিত—'গুরুদেব আপনার অবর্তমানে আমাদের কী দশা হবে?'

গুরুদেবের (বা কর্তার) অবর্তমানে যে 'কর্তার ভূত' স্বভাবতঃই ঘাড়ে চাপে—সেকথা পরবর্তীকালে খুব ঠাণ্ডা মেজাজেই রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন— 'লিপিকা'র সেই বিখ্যাত কথিকা—'কর্তার ভূত'-এ। আমাদের মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তা-ধর্মচিন্তা তথা রাজনৈতিক চিন্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ মনোভঙ্গি এই সহজ কথিকাটিতে অভিব্যক্ত—

> ভবিষ্যৎকে মানলেই তার জন্যে যত ভাবনা, ভূতকে মানলে কোনো ভাবনাই নেই, সকল ভাবনা ভূতের মাথায় চাপে। অথচ তার মাথা নেই, সুতরাং কারো জন্যে মাথাব্যথাও নেই। —কর্তার ভূত

'এই ভূতগ্রস্ত দেশের আদিম আভিজাত্য' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই সহজ কটাক্ষ এমন সুতীক্ষ্ণধার অস্ত্রস্বরূপ এবং তার পরিচালনা এত কৌশলে যে অস্ত্রোপচারের পরই আমরা জানতে পারি, আগে নয়। 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম'— প্রবন্ধে এই সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা সুদীর্ঘ তলোয়ার হয়ে উঠেছে, তা আমরা ইতিপূর্বেই লক্ষ্য করেছি।

এমনতরো ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, প্রহসন ও কবিতার আশ্রয়ে রবীন্দ্রনাথ যেমন একদিকে আমাদের দেশের তৎকালীন আর্যামির বড়াই এবং হিন্দু-শাস্ত্র-বিচারের নামে হিন্দুয়ানীর শ্লাঘা ও তার অসঙ্গতি সম্পর্কে বাঙালি তথা ভারতবাসীকে

সচেতন করেছেন, তেমনি অপরদিকে অন্তদেশের ধর্মবুদ্ধির মুখোসও নানা ভাবে খুলে দিয়েছেন, আন্তর্জাতিকতা প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে আমরা তা লক্ষ্য করেছি। যথা—'ওরা শক্তির বাণ মারছে চীনকে, ভক্তির বাণ বুদ্ধকে!' এমনি আরও কিছু উদাহরণ আছে 'ধর্মবোধের দৃষ্টান্ত' প্রবন্ধে। লক্ষ্য করা যায়, এই তুলনা-মূলক আলোচনার সূচনা হয়েছে 'বঙ্গদর্শন'-এর (নবপর্যায়) যুগে, যখন ইতিহাস-চেতনার আশ্রয়ে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় ধর্মচিন্তার গৌরব অনুভব করছেন এবং ব্রাহ্মমতকে আদর্শ হিন্দু মত বলে ঘোষণা করেছেন। স্বভাবতঃই ইতিহাস-চেতনাজাত প্রবন্ধাবলীতে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ দুজনেই ভারতীয় ঐতিহ্যের মর্যাদা-উদ্ধারে ব্রতী হয়েছেন। একক্ষেত্রে পূর্বসূরী ও উত্তরসূরী আর প্রতিদ্বন্দ্বী নন,—সহযোগী এবং পরস্পরের পরিপূরক। বলা বাহুল্য পরবর্তী পর্যায়ে লক্ষ্য করা যাবে যে দুজনের ইতিহাস-দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন প্রকৃতির। মোটামুটি রহস্য-ব্যঙ্গ, বিতর্ক ও মসীযুদ্ধের আলোচনায় লক্ষ্য করা গেল—

(ক) বঙ্কিমচন্দ্র নব্যহিন্দু-জাগরণের একটি ধারার নেতৃত্ব-দাতা, আর রবীন্দ্রনাথ আদি-ব্রাহ্ম-সমাজের। দুজনেই ব্যঙ্গ-রহস্যের আশ্রয়ে স্ব স্ব যুক্তি প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী।

(খ) বঙ্কিম হিন্দুধর্মের ছোবড়াগুলো পরিত্যাগের পক্ষপাতী, আর রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম-আন্দোলনের সংস্কার-আতিশয্যকে।

(গ) বঙ্কিম হিন্দুধর্মের নব্য-ব্যাখ্যা (শশধর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতি ভাষ্য-কারের) সমর্থন করেননি, আর রবীন্দ্রনাথ তো তার প্রতি খড়্গহস্ত।

(ঘ) বিশেষ লক্ষণীয় এই, উভয়ের কেউই ভারতের অপর বৃহত্তর ধর্মগোষ্ঠী মুসলিম-সম্প্রদায়ের আচরিত ইসলাম-প্রসঙ্গে বিশেষ কোন বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করেননি। এবং এই বিষয়ে দুজনেরই সযত্ন-পরিহার-প্রবণতা পরবর্তী দুটি পর্যায়েও লক্ষ্য করা যাবে।

দুই.

বঙ্কিমের ইতিহাসচেতনা ভারতীয় ধর্ম-দর্শনের বিস্মৃতপ্রায় ঐতিহ্যের লুপ্ত গৌরব উদ্ধারে ব্রতী হয়েছিল এবং ভারতীয় হিন্দুধর্মের প্রতি বিদেশী ও স্বদেশী ইঙ্গ-বঙ্গীয় সমালোচকদের দ্বারা আরোপিত নানা অপবাদ খণ্ডনে তৎপর হয়েছিল। একাজে ইতিপূর্বে রামমোহনই প্রথম হাত লাগিয়েছিলেন,

পরবর্তীকালে বঙ্কিমকেও এগিয়ে আসতে হয়েছে যুগ প্রয়োজনে। বাদ-প্রতিবাদ মূলক রচনাতে লক্ষ্য করেছি, বঙ্কিমের যুক্তি-মূলক বিশ্লেষণের পরিণামে পাওয়া গেছে—'Kernel without the husk' এবং এই পরিণামের মূলে ছিল একটি যুগজিজ্ঞাসা—'where is our new code of morality?' তাই ইতিহাসচেতনার আশ্রয়ে শাস্ত্র পুরাণ, সংহিতাদর্শন, ভাষ্যটীকার বিপুল ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে মূল বাস্তুভিটা অর্থাৎ মূল ধর্মনীতি ও দর্শনতত্ত্ব উদ্ধার করাই বঙ্কিমের উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। একাজে তাঁর 'স্বাধীন বুদ্ধি ও সচেষ্ট চিত্তবৃত্তি' (রবীন্দ্রনাথের ভাষাতে) সর্বত্র ক্রিয়াশীল ছিল। এই সচেষ্ট চিত্তবৃত্তির সাহায্যে অনুসন্ধান করে বঙ্কিম বুঝেছিলেন যে আমাদের হিন্দু উৎসবগুলির অধিকাংশেরই 'Present religious Character is owing to the later Puranic superstition' (On the origin of Hindu Festival) আবার এই যুক্তিবাদী চিত্তবৃত্তিই সাংখ্যদর্শনের মূলতত্ত্ব অনুসন্ধানে ও বিশ্লেষণে তৎপর হয়েছে। বৌদ্ধবাদ ও সাংখ্যের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করে ১৮৭১ খ্রীঃ 'ক্যালকাটা রিভ্যুয়' পত্রিকায় বঙ্কিম যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন, 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত 'সাংখ্যদর্শন' প্রবন্ধটি তারই বিস্তৃত রূপ। প্রচুর অধ্যয়ন ও অনুসন্ধানের ফলে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, 'বৈরাগ্যসাধারণতা' ও 'অদৃষ্টবাদিত্ব' ভারতবর্ষের পতনের কারণ এবং তা সাংখ্যের প্রভাবে। বঙ্কিম তাই বললেন, "যিনি বর্তমান হিন্দুসমাজের চরিত্র বুঝিতে চাহেন, তিনি সাংখ্য অধ্যয়ন করুন।"

কারণ, সাংখ্য হতেই তন্ত্রের সৃষ্টি, আর "সেই বৌদ্ধধর্মের আদি এই সাংখ্যদর্শনে। বেদে অবজ্ঞা, নির্ব্বাণ, এবং নিরীশ্বরতা, বৌদ্ধধর্মের এই তিনটি নূতন, এই তিনটিই ঐ ধর্মের কলেবর…এই তিনটিরই মূল সাংখ্যদর্শনে।" উক্ত বিস্তৃত প্রবন্ধে বঙ্কিম সাংখ্যের উৎপত্তিকাল ও মূল প্রতিপাদ্য নির্ণয় করেছেন প্রথমেই। সাংখ্যের প্রতিপাদ্য এই, দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিই পরম পুরুষার্থ, পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগই দুঃখের মূল কারণ, অতএব 'এই সংযোগের উচ্ছিত্তিই' দুঃখ নিবারণের উপায়। উক্ত মূল সূত্রগুলির বিশ্লেষণ অন্তে বঙ্কিম সাংখ্যের সিদ্ধান্তে এসেছেন 'অতএব জ্ঞানেই মুক্তি'। তারপরই তিনি তুলনা করে বলেছেন, "পাশ্চাত্য সভ্যতার মূলকথা, 'জ্ঞানেই শক্তি' (knowledge is power), হিন্দু সভ্যতার মূলকথা, 'জ্ঞানেই মুক্তি"। দুই জাতি দুটি পৃথক উদ্দেশ্যানুসন্ধানে এক পথেই যাত্রা করলেন। 'পাশ্চাত্যেরা শক্তি পাইয়াছেন আমরা কি মুক্তি পাইয়াছি?' এই জ্বলন্ত প্রশ্নটিই তো স্বদেশচিন্তাজাত যুগজিজ্ঞাসা। এজন্যেই ত অনুসন্ধান। এই সঙ্গে আরও একটি যুগজিজ্ঞাসা

ধ্বনিত, 'আমরা বেদ মানিব কেন?' প্রকৃতপক্ষে সমুদয় ভারতবর্ষ তৎকালে এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে দুটি দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং এজন্তেই বঙ্কিমের সতর্কবাণী, "ভারতবর্ষের ভাবী মঙ্গলামঙ্গল এই প্রশ্নের মীমাংসার উপর নির্ভর করে। হিন্দুগণ সকলেরই কি স্বধর্ম্মে থাকা উচিত?" আপাততঃ কোন মীমাংসা বঙ্কিম এখানে না করে বলেছিলেন, "যাঁহারা সক্ষম তাঁহারা সে মীমাংসা করিবেন।" অবশ্য পরবর্তীকালে রচিত 'ধর্মতত্ত্বে' বঙ্কিম উক্ত মীমাংসা করেছেন, আর তা ভক্তিমূলক সনাতন ধর্মকে অবলম্বন করে। অবশ্যই সেই সনাতন ধর্ম বেদমূলক।

লক্ষ্য করা যায়, বঙ্কিমের সচেষ্ট চিত্তবৃত্তিই এই জাতীয় দার্শনিক প্রবন্ধগুলিতে ধর্ম ও দর্শনচিন্তার ইতিহাসভিত্তিক বিশ্লেষণে তৎপর। পূর্বেই বলেছি, এই অনুসন্ধানকালে যেখানেই ভারতীয় গরিমার পরিচয় দৃষ্ট হয়েছে, সেখানেই তাঁর গৌরববোধ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে, যথা—"আধুনিক ইউরোপীয় দর্শন ফিরিয়া ফিরিয়া সেই প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে মিলিতেছে।...আধ্যাত্মিক তত্ত্বে, প্রাচীন আর্য্যগণ কর্তৃক সূচিত হয় নাই, এমন তত্ত্ব অল্পই ইউরোপে আবিষ্কৃত হইয়াছে।"

এদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষা-প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে ইউরোপীয় র‍্যাশনালিজম (যা increasing authority of Science এর ফলশ্রুতি) এবং বেস্থাম, কোঁৎ প্রমুখ দার্শনিকগণের চিন্তার প্রভাব খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তাই ধর্মকে যুক্তির কষ্টিপাথরে ঘষে পরখ করে নেবার প্রয়াস সুরু হয়েছিল। ইতিমধ্যে ওদেশে ডারউইনের বিবর্তনবাদ ধর্ম হতে অতিলৌকিকতাকে ছেঁটে ফেলতে সাহায্য করছিল, সমাজ বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের স্বরূপও নতুন হয়ে উঠছিল, অর্থাৎ ক্রমেই ধর্মের অর্থ 'মানবতা' বলে ধারণা হচ্ছিল। এমনতর পরিপ্রেক্ষিতে ইতিহাস চেতনা ও যুক্তিবাদিতার সহায়তায় 'হিন্দুধর্মের নৈসর্গিক ভিত্তির' অনুসন্ধান করলেন বঙ্কিম। নিঃসন্দেহে যুগ প্রবৃত্তিই এই অনুসন্ধানের প্রেরণা। উক্ত বিশ্লেষণে বঙ্কিমের বক্তব্য এই—"স্রষ্টা, পাতা এবং হর্ত্তা পৃথক্ পৃথক্ চৈতন্য, এমত বিবেচনা করা অসঙ্গত এবং প্রমাণ বিরুদ্ধ নহে—ইহাই হিন্দুধর্ম্মের নৈসর্গিক ভিত্তি এবং এই স্রষ্টা, পাতা ও হর্ত্তা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর বলিয়া পরিচিত।" বঙ্কিম কথিত লোকবিশ্বাসের নৈসর্গিক ভিত্তিটি স্পেন্সর, মিল ও ডারবিনের তত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা গ্রহণ-বর্জনের পর হিন্দু দার্শনিকদের সপক্ষে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন—

"ত্রিদেবোপাসনা বিজ্ঞানমূলক না হউক, বিজ্ঞান বিরুদ্ধ নহে।" অবশ্য

তাঁর যুক্তিতর্ক বিংশ শতাব্দীর নির্মোহ বিশ্লেষণে কতটা গ্রাহ্য হবে, সে বিচার না করেও একথা বলা যায়, হিন্দুমতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের উদ্দেশ্য তাঁর সফল হয়েছিল। আর তৎকালে উক্ত শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন-প্রবণতা খুব স্বাভাবিক ছিল। স্বয়ং রাজনারায়ণ বসুও 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা'[৪] বিষয়ক প্রসিদ্ধ বক্তৃতার দ্বারা স্বধর্মের প্রতি দেশবাসীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন এবং হীনমন্যতাবোধ হতে মুক্তিলাভের পন্থা নির্দেশ করেছিলেন। ভারতের জাতীয়তাবোধ বিকাশে এই প্রকার গৌরববোধের (কিঞ্চিৎ আত্মশ্লাঘা-মিশ্রিত) প্রয়োজন ও তার ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য। তবে একথাও মনে রাখতে হবে, শশধর তর্কচূড়ামণির বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম বিশ্লেষণের আত্মম্ভরিতা পশ্চাদপসরণী মনোবৃত্তির পরিচায়ক, আর বঙ্কিম সে কথা উল্লেখ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাই যুক্তিবাদ ও আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে ঘষে হিন্দুধর্মের উজ্জ্বলভাগ তথা সারবস্তু উদ্ধারের প্রয়াস করেছেন। প্রত্নতাত্ত্বিক চিন্তাপদ্ধতিতে হিন্দুধর্মশাস্ত্রের বিশ্লেষণের কাজ ইতিপূর্বেই বঙ্কিম সুরু করেছিলেন। হিন্দুর উপাস্য 'শ্রীকৃষ্ণ' ও 'দুর্গার' প্রত্নতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা তারই নিদর্শন। 'শ্রীকৃষ্ণ' সম্পর্কে রীতিমত অনুসন্ধানের পূর্বেই 'দুর্গার উৎপত্তি' নির্ণয় করার প্রয়াস করেছিলেন বঙ্কিম। তাঁর প্রশ্ন ছিল—'দুর্গার কথা বেদে আছে কি?' অতএব 'সকল হিন্দুরই কর্তব্য একথার অনুসন্ধান করা।' তাই বঙ্কিম কর্তব্যপালনকল্পে ঋগ্বেদসংহিতা, কেনোপনিষদ, মুণ্ডকোপনিষদ প্রভৃতির প্রাসঙ্গিক সূক্তগুলির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করে ভবিষ্যৎ সমাধানের জন্য একটি জিজ্ঞাসা রেখে দিলেন, "আমাদিগের পূজিত দুর্গা কি রাত্রি, না মহাদেবের ভগিনী। না ব্রহ্মবিদ্যা, না অগ্নিজিহ্বা?" এখানে এর উত্তর কিন্তু বঙ্কিম দেননি। তবে এর সমাধানের ইঙ্গিত পাওয়া যাবে পরবর্তী আয়াসসাধ্য প্রত্নতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে, 'দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম' শীর্ষক নিবন্ধাবলীতে।

আমরা লক্ষ্য করেছি, হেস্টির সঙ্গে মসীযুদ্ধের পরই বঙ্কিম হিন্দুধর্মের তিন উপাদান (Doctrinal basis, worship, code of morals) বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। উক্ত প্রবন্ধে প্রথম উপাদানটির ব্যাখ্যা পাওয়া গেল। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য এই, বঙ্কিম এই কয় বৎসরের মধ্যে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে একটি দৃঢ় প্রত্যয়ভূমিতে দাঁড়াতে পেরেছেন, হিন্দু-পুনরুজ্জীবনের সমন্বয়বাদী ধারাটির নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন এবং ফলে, "একদিকে যুক্তি ও তথ্য, অন্যদিকে একটি বলিষ্ঠ আদর্শকল্পনা দুইটি…একাধারে স্বীকার করে"[৫] নিয়েছেন। এখানে বঙ্কিমের ইতিহাসচেতনার আদর্শীকরণ প্রক্রিয়াটিতে কিঞ্চিৎ আত্মশ্লাঘার

প্রকাশ লক্ষ্য করা যাবে, তবে বঙ্কিমের সামগ্রিক উদ্দেশ্য সন্দেহাতীতরূপে স্বদেশ-ভাবনা-প্রসূত, কারণ তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস—"জাতীয় ধর্ম্মের পুনরুজ্জীবন ব্যতীত ভারতবর্ষের মঙ্গল নাই।" উপায়? "যেটুকু হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম, যেটুকু সারভাগ, যেটুকু প্রকৃত ধর্ম্ম সেইটুকু অনুসন্ধান করিয়া আমাদিগের স্থির করা উচিত। তাহাই জাতীয় ধর্ম্ম বলিয়া অবলম্বন করা উচিত।" বলা বাহুল্য বঙ্কিমের মতে এই গ্রহণ বর্জনের মাপকাঠি হল 'সত্য'। "যদি অসত্য মনুতে থাকে, মহাভারতে থাকে, বেদে থাকে, তবু অসত্য, অধর্ম্ম বলিয়া পরিহার্য।" হিন্দুধর্মশাস্ত্রের অগাধ সমুদ্র মন্থন করে ঐ সত্য গ্রহণ করার প্রয়াসে বঙ্কিম এগিয়ে এসেছেন। ব্যাপক অনুসন্ধিৎসা ও তুলনামূলক আলোচনার সাহায্যে বঙ্কিম ইহুদী ও গ্রীকদের ঈশ্বর-বিশ্বাসের সঙ্গে বৈদিক বিশ্বাসের মূল্য নির্ধারণ করেছেন, বৈদিক দেবদেবীর উৎপত্তিতত্ত্ব, হিন্দুধর্মের নৈসর্গিক মূল স্তর-পরম্পরায় নিরূপণ করে ভক্তি শাস্ত্রের আবির্ভাবকাল পর্যন্ত সমীক্ষা করেছেন। বঙ্কিমের মতে, বৈদিক ধর্মের তিন অবস্থার পর 'চরমাবস্থা উপনিষদে' যেখানে দেবগণ দূরীকৃত। কেবল আনন্দময় ব্রহ্মই উপাস্য। কিন্তু এ ধর্ম অসম্পূর্ণ ('ইহাই চতুর্থাবস্থা')। অবশেষে গীতার ভক্তিশাস্ত্রের সঙ্গে মিলনে, হিন্দুধর্ম সম্পূর্ণ হল। তাঁর মতে—

> ইহাই সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ ধর্ম্ম, এবং ধর্ম্মের মধ্যে জগতে শ্রেষ্ঠ। নির্গুণ ব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞান, এবং সগুণ ঈশ্বরের ভক্তিযুক্ত উপাসনা ইহাই বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম্ম।
>
> —দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম্ম

আসলে বৈদিক ধর্মের স্বরূপ-সন্ধান আর বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহ্যসন্ধান বঙ্কিমমানসের একই প্রেরণার ফলশ্রুতি। সে প্রেরণার উৎস স্বদেশভাবনা—স্বজাতিপ্রেম। এইজন্যই জাতীয় ধর্মরূপে যে হিন্দু-ধর্ম প্রতিষ্ঠার প্রয়াস করা হল—তাতে নির্গুণ ব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞান এবং সগুণ ঈশ্বরের ভক্তিযুক্ত উপাসনা, এক কথায় ব্রাহ্মমত ও সনাতন হিন্দুমত—দুইই সমন্বিত। উক্ত প্রবন্ধ রচনার প্রায় দ্বাদশবর্ষ পূর্বে রাজনারায়ণবাবু রচিত 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব'-গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র ব্রাহ্মমতের ('পরব্রহ্মের উপাসনা···সকলেরই সারভাগ') প্রশংসা করেও তাকে হিন্দুধর্মের একাংশমাত্র ('অঙ্গুরীয় মধ্যস্থ হীরকের মত') আখ্যা দিয়ে প্রস্তাব করেছিলেন, "হিন্দুধর্ম্মের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের একতা স্বীকার করায় আমাদের বিবেচনায় উভয় সম্প্রদায়ের মঙ্গল।···আমরা হিন্দু, কোনো সম্প্রদায়ভুক্ত নহি;···হিন্দু জাতির আনুকূল্যেই একথা বলিলাম।" প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই, রাজনারায়ণ বসুও তাঁর রচিত 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা' (Old Hindu's Hop'e—1881) পুস্তিকায় সাকারবাদী হিন্দু ও নিরাকারবাদী

হিন্দুর সম্মিলনে 'মহাহিন্দু সমিতি' প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেছিলেন। বঙ্কিমের উপরোক্ত প্রস্তাবে অনুরূপ যুগচিন্তাই অভিব্যক্ত।

পরবর্তীকালে হিন্দু-ঐতিহ্যের জন্য গৌরববোধ রবীন্দ্রভাবনাতেও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে 'বঙ্গদর্শন' (নবপর্যায়) যুগে এবং এক্ষেত্রে তিনি পূর্বসূরীর উত্তরাধিকারী। লক্ষ্য করা যাবে, এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসচেতনা প্রায় সম্পূর্ণ আদর্শান্বিত। ইতিমধ্যে বাঙালি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে হিন্দু-ধর্মসংস্কার-সম্পর্কিত কলঙ্কচেতনা নিঃশেষে লুপ্ত হয়েছিল এবং হিন্দুত্ব পুনর্জাগরণের ধারাটি সাফল্যলাভ করেছিল নানা ব্যক্তিত্বের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়। বঙ্কিমের যুক্তিগ্রাহ্য সমন্বয়চিন্তা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের ভাগবত সমন্বয় সাধনা, বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক বিজয়, নিবেদিতার সেবাব্রত ও নিষ্ঠা, এবং ব্রাহ্মসমাজের সম্প্রদায়গত ভাবনার ক্রম-অবলুপ্তি (রাজনারায়ণ, দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রভৃতির প্রয়াসে) আর ব্রহ্মবান্ধব, অরবিন্দ, তিলক প্রভৃতি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের দ্বারা হিন্দুধর্মকে জাতীয় ঐক্যের মূলভাব-গ্রন্থি বলে গ্রহণ—ইত্যাদি বিবিধ কার্যকারণের ফলে ভারতীয় হিন্দু-ঐতিহ্য শিক্ষিত সমাজে ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠালাভ করছিল। এমনতর যুগপরিবেশে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে ধর্ম-সংস্কৃতির ঐতিহ্য উন্মোচন করলেন তাতে ইতিহাস ভিত্তিক বুদ্ধিবাদী বিশ্লেষণের অপেক্ষা অতীতের আদর্শলোকে মানস অভিসারের লক্ষণই বেশি স্পষ্ট। এইজন্যই উপনিষদের বাণী-মন্দ্রিত তপোবনের চিত্র কবি রবীন্দ্রনাথের 'কল্পনা', 'কথা ও কাহিনী' এবং 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থগুলিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। কবির ভাবদৃষ্টিতে এই ছিল প্রত্যাশিত উন্মোচন, এই দৃষ্টিতেই ভারতীয় ধর্মসংস্কৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ প্রতিভাত। আদর্শায়িত ইতিহাসচেতনায় কবি রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন, উপনিষদের উদার অনুভূতির প্রকাশ হয়েছিল অতীত ভারতের তপোবনে। 'একদা এ ভারতের কোন বনতলে' সেই মহা-আনন্দ মন্ত্র ধ্বনিত হয়েছিল তারই অনুসন্ধান ও গৌরব উপলব্ধির প্রয়াস রবীন্দ্রচিন্তায় এই বিশিষ্ট যুগটির মূল প্রবণতা। সমালোচকের কথায়, "হিন্দু ন্যাশনালিজম ও হিন্দু সমাজকে ভারতীয় সংস্কৃতিরূপে দেখার ঈপ্সা বিবেকানন্দ, ব্রহ্মবান্ধব কিংবা রামেন্দ্রসুন্দরের মতই রবীন্দ্রনাথকে পেয়ে বসেছিল।"[৬] এই মন্তব্য যথার্থ। আমরাও লক্ষ্য করছি যে ব্রহ্মবান্ধব লিখিত 'হিন্দুজাতির একনিষ্ঠা'—প্রবন্ধে হিন্দুত্ব ব্যাখ্যান প্রকাশের সমকালেই প্রায় একই দৃষ্টিভঙ্গিতে রবীন্দ্রনাথ আরও বিস্তৃত বিশ্লেষণ করে বললেন, 'হিন্দু-জাতীয়তাই হিন্দুত্বের একনিষ্ঠতা'। ('হিন্দুত্ব')। ঠিক এই মতটি প্রতিষ্ঠার প্রয়াস দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের একালের নানা নিবন্ধে, আর সর্বত্রই আদর্শান্বিত

ইতিহাসচেতনার অভিব্যক্তি। এবার দু'একটি প্রাসঙ্গিক বক্তব্য বিবেচনা করা যেতে পারে—

> আমাদের ইতিহাস, আমাদের ধর্ম, আমাদের সমাজ, আমাদের গৃহ, কিছুই নেশন-গঠনের প্রাধান্য স্বীকার করে না। য়ুরোপে স্বাধীনতাকে যে স্থান দেয় আমরা মুক্তিকে সেই স্থান দিই। —প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা

প্রসঙ্গ তুলনায় ভারতীয় ধর্ম ও সমাজ মহত্তর বলে স্বীকৃত।

> তৃষ্ণাতুরা ভক্তি তাহার পূজার অর্ঘ্য মস্তকে লইয়া অগ্নি, সূর্য্য, বায়ু, বজ্র ও মেঘের মধ্যে কোথায় উদভ্রান্ত হইতেছিল?......এমন সময়ে......দিশেহারা পথিক শুনিতে পাইল......তপোবনে গম্ভীর মন্ত্রে এই বার্তা উদ্গীত হইতেছে বৃক্ষ ইব স্তব্ধ দিবি তিষ্ঠত্যেক স্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বম্। ...একের সত্য, একের অভয়, একের আনন্দ বিচ্ছিন্ন জগৎকে এক করিয়া অপ্রমেয় সৌন্দর্যে গাঁথিয়া তুলিল। —প্রাচীন ভারতের একঃ

কবি রবীন্দ্রনাথের এই আশ্চর্য গম্ভীর উদাত্ত চিত্রণে প্রতিফলিত হয়েছে ভারতীয় উপনিষদের ক্রম-আবির্ভাবের ভাবময় ইতিহাস। 'হিন্দুধর্ম ও দেবতত্ত্বে' বঙ্কিম যাকে চতুর্থাবস্থা বলেছেন[৭], এ হল সেই স্তরের ইতিহাস। রবীন্দ্রদৃষ্টিতে এই হল চরম সিদ্ধি।

লক্ষ্য করা যায়, ভারতীয় ঔপনিষদিক যুগের এমনি ভাবময় চিত্রণ, ধর্মচিন্তার ঐতিহাসিক ক্রম-বিকাশের এমনতরো ধ্যানময় আদর্শান্বিত বর্ণনা যেন 'ধর্ম' ও 'শান্তিনিকেতন'—শীর্ষক প্রবন্ধ-মালার 'অঙ্গনে তারায় তারায় খচিত'।

'ভারতবর্ষ মানুষকে লঙ্ঘন করিয়া কর্মকে বড়ো করিয়া তোলে নাই।' লক্ষণীয় এই ভারতীয় হিন্দু আচার, সমাজ ও ধর্ম—যতই কঠোর হোক তাকে এই যুগে নির্বিচারে মেনে নিয়েছে রবীন্দ্রনাথের আদর্শান্বিত ইতিহাসচেতনা।

রবীন্দ্রদৃষ্টিতে ভারতীয়দের পরম সম্পদ হল 'একাকিত্ব'। তাঁর মতে, "পিতামহগণ এই একাকিত্ব ভারতবর্ষকে দান করিয়া গেছেন। মহাভারত-রামায়ণের ন্যায় ইহা আমাদের জাতীয় সম্পত্তি।" এই হল 'প্রাচীন ভারতের একঃ'—যা 'শান্তির ধ্যানাসনে বিরাজমান'। এইভাবে কবির মানসদৃষ্টি শ্রদ্ধাসহকারে পুরাতনের মধ্যে সত্যদর্শন করেছে,—একে ইতিহাস-প্রেক্ষণা না বলে ধ্যানযোগে ঐতিহ্য দর্শন বলাই সঙ্গত। 'ভারতবর্ষের ইতিহাস'-এ রবীন্দ্রনাথ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, 'বহুর মধ্যে এককে নিঃসংশয়রূপে অন্তরতর-রূপে উপলব্ধি করার' চিরন্তন চেষ্টা ভারতবর্ষের।

ব্রহ্মবিদ্যালয় পরিকল্পনা, বর্ণাশ্রম পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার সংকল্প, বৈদিককালের

তপোবনকে সার্থক করার দুরাশা প্রভৃতি ব্যাপার সম্পূর্ণ একটি দশকব্যাপী রবীন্দ্রনাথের ধর্ম-দর্শন-আলোচনাতে এবং ইউরোপের সংস্কৃতির সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির তুলনামূলক বিশ্লেষণে আদর্শবাদের উজ্জল রং চড়িয়েছে। কিন্তু আদর্শবাদের এই মোহভঙ্গ হতেই ক্রমে ভারতীয় হিন্দুধর্ম ও সমাজবিধির 'অচলায়তন' তাঁর চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 'সঞ্চয়' ও 'পরিচয়'—গ্রন্থদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি তুলনামূলক সংস্কৃতি আলোচনায় তা লক্ষ্য করা যায়। তার একটি দৃষ্টান্ত 'ধর্মের অধিকার' (১৩১৮) রচনাটি —"আমাদের দেশে সকলের চেয়ে নিদারুণ দুর্ভাগ্য এই যে মানুষের দুর্বলতার মাপে ধর্মকে সুবিধামতো খাটো করিয়া ফেলা যাইতে পারে এই অদ্ভুত বিশ্বাস আমাদের পাইয়া বসিয়াছে।"

বহু শতাব্দীর বহু নিকৃষ্ট লোকাচার, বিশ্বাস, অনুষ্ঠানের চাপে সত্যধর্ম ভারতে বিকৃত হয়েছে অথচ তার সংস্কারের পথ চিরদিন বন্ধ, "পিতামহেরা এককালে সত্যের যে বীজ ছড়াইয়াছিলেন, তাহার শস্য কোথায় চাপা পড়িয়াছে সে আর দেখা যায় না,… ।" (ধর্মের অধিকার)

অতএব স্থূলতম তামসিকতা, বাহ্য অনুষ্ঠান, শ্রেণীভেদ ইত্যাদি বর্জনের জন্য বিচারের প্রয়োজন। 'বিচারই মানুষের ধর্ম' এই স্বীকৃতি রবীন্দ্রচিন্তায় এখন অসঙ্কুচিত। স্পষ্টতই নির্বিচার হিন্দুত্ব-গৌরববোধের পরিবর্তে তুলনামূলক ইতিহাস-চেতন দৃষ্টিভঙ্গিই অতঃপর রবীন্দ্র-ধর্মচিন্তায় অভিব্যক্ত হয়ে উঠেছে। এইকালে বুদ্ধদেব, যীশুখৃষ্ট, মহম্মদের সত্যধর্মও রবীন্দ্রনাথের চিন্তা-সূত্রে গ্রথিত হয়েছে। তাঁর বিশ্লেষণে ধরা পড়েছে, মুসলমান ধর্মের অভিঘাতে একদিন ভারতের অন্তরতম সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল নানক, রবিদাস, কবীর, দাদূ প্রভৃতি সাধকের সাধনায়—"ভারতবর্ষ তখন দেখিয়েছিল, মুসলমান ধর্মের যেটি সত্য সেটি ভারতবর্ষের সত্যের বিরোধী নয়।" ('ব্রাহ্ম-সমাজের সার্থকতা')। এই ধর্মবিবর্তনের ইতিহাসে আধুনিক কালে ব্রাহ্ম-সমাজের সার্থকতাও রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত। তাঁর বক্তব্য এই, পাশ্চাত্য সভ্যতার দারুণ অভিঘাতে ব্রাহ্ম-সাধনার সত্য ভারতের আপন সত্যবাণী-রূপে উদ্‌ঘোষিত হয়েছে। "কালের বহুতর আবর্জনার মধ্যে এই ব্রহ্মসাধনা একদিন আমাদের দেশে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। সে জিনিস তো একেবারে হারিয়ে যাবার নয়।" অতএব জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়ে এই ব্রহ্মসাধনাকে পুনরায় উপলব্ধি করাই ভারতের পথ।

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের প্রবক্তারূপে একথা বলেন নি, ভারতীয় ধর্ম-সমন্বয়ের কথা চিন্তা করেই একথা বলেছেন। পরবর্তী আলোচনায় তা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

পূর্বেই বলেছি, ভারতীয় ধর্মবিবর্তনের ইতিহাস—ভারতীয় সমাজ বিবর্তনের ইতিহাসের সঙ্গেই অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত। রবীন্দ্রনাথের প্রজ্ঞা-দৃষ্টিতে ঐ ইতিহাসের সার্থকতম দর্শন—'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধটি। ইতি-পূর্বেই আমরা এর বিস্তৃত আলোচনা করেছি। এখানে কেবল কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রাসঙ্গিক সংকেত গ্রহণ করব যাতে—'বহুর মধ্যে একক⋯উপলব্ধির' প্রয়াসটি অনুসরণ করা যায়—

(১) প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের আদর্শ-ভেদের মূর্তি-পরিগ্রহ স্বরূপে দুই দেবতা—"প্রাচীন বৈদিক মন্ত্রতন্ত্র ক্রিয়াকাণ্ডের দেবতা ব্রহ্মা এবং নব্যদলের দেবতা বিষ্ণু।" নব্যদল অর্থাৎ ক্ষত্রিয় সমাজ। (২) ভারতবর্ষের "ব্রহ্মবিদ্যার মধ্যে আমরা দুইটি ধারা দেখিতে পাই, নির্গুণ ব্রহ্ম ও সগুণ ব্রহ্ম, অভেদ ও ভেদাভেদ।" (৩) রামায়ণের আর্য অনার্য সংঘাতের যুগের পর বৌদ্ধধর্মের কাটা খাল দিয়ে ভারতীয় আর্যসমাজে নানাজাতির প্রবেশের পর আর্য প্রকৃতি ছিন্নবিচ্ছিন্ন সূত্রগুলিকে জোড়া দেবার ব্যবস্থা করল, বেদ সংগৃহীত হল, মহাভারত সংকলিত হল। "মহাভারতেও তেমনি একদিকে ব্যাপক জনশ্রুতিরাশি আর একদিকে তাহারই সমস্তটির একটি সংহত জ্যোতি—সেই জ্যোতিটিই ভগবদ্গীতা।" আর্যসভ্যতার সঙ্গে দ্রাবিড় ও অনার্য ধর্ম-সাধনা ও সংস্কৃতির মিলনে নানা দেবদেবীর আবির্ভাব। "আর্যসমাজে অনার্যপ্রভাবের সঙ্গে এই স্ত্রীদেবতাদের প্রাদুর্ভাব ঘটিতে লাগিল।" (৪) ভারত-ইতিহাসের মধ্যযুগটি আত্মসংকোচের অচৈতন্যের মধ্যে আত্মপ্রসারণের উদ্বোধন-চেষ্টা করেছে, নানক, কবীর প্রভৃতি সাধকের সাধনায়। (৫) "ভারতবর্ষের ইতিহাসে আমরা প্রাচীনকাল হইতেই দেখিয়াছি, জড়ত্বের বিরুদ্ধে তাহার চিত্ত বরাবরই যুদ্ধ করিয়া আসিয়াছে;—ভারতের সমস্ত শ্রেষ্ঠ সম্পদ, তাহার উপনিষদ, তাহার গীতা, তাহার বিশ্ব-প্রেমমূলক বৌদ্ধধর্ম সমস্তই এই মহাযুদ্ধে জয়লব্ধ সামগ্রী।" (৬) "সে এককে পাইতে চায় বলিয়া বাহুল্যকে একের মধ্যে সংযত করাই ভারতের সাধনা।"

বঙ্কিমচন্দ্র 'দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্মে' যেভাবে হিন্দুধর্মের নৈসর্গিক উৎপত্তির বর্ণনা করেছেন এবং বিশ্লেষণ করেছেন বৈদিক যুগকে, তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক তথ্য-সংকলন ও তার ভাবগত সত্য বিশ্লেষণের রীতিটি নিশ্চয়ই মেলে না। এই পার্থক্যের কারণ অনেকটা এই যে, পূর্বসূরী ভক্তিধর্মের প্রতি নিবদ্ধদৃষ্টি, উত্তরসূরী 'প্রাচীন ভারতের একঃ'-র প্রতি মনোযোগী। আর উত্তরসূরী ভারত-বর্ষের সামগ্রিক সমাজ ইতিহাসের বিশ্লেষণ সূত্রে ধর্মবিবর্তনকে দেখেছেন,—বঙ্কিম ততটা বিশাল পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিচার করেন নি। তাই বঙ্কিম 'কৃষ্ণচরিত্র'-কে

যুগ-প্রয়োজন সাধিত হয়েছিল। আমরা লক্ষ্য করেছি, পরবর্তী দশক হতেই শ্রীকৃষ্ণ-কথিত গীতা ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের অনুপ্রেরণা-স্বরূপ হয়ে উঠেছিল শিক্ষিত সমাজের কাছে। আর হিন্দু-আদর্শ পুনরুজ্জীবনের আন্দোলনটি আপাততঃ সুদৃঢ় তত্ত্বের ভিত্তির উপর দাঁড়াতে পেরেছিল।

তথাপি 'আধুনিক সাহিত্যে' রবীন্দ্রনাথ 'কৃষ্ণচরিত্র' সমালোচনা প্রসঙ্গে গ্রন্থের প্রধান অধিনায়করূপে ('স্বাধীনবুদ্ধি ও সচেষ্ট চিত্তবৃত্তির' মহিমা স্বীকার করেও) কৃষ্ণের ঐতিহাসিক চরিত্র যথেষ্ট তথ্যমূলক নয় বলে মন্তব্য করেছিলেন। বঙ্কিম-মানসের 'একটি মূর্তিমান থিওরি' রূপে কৃষ্ণ রবীন্দ্রমানসে আদর্শ ঐতিহাসিক মানুষরূপে প্রতিভাত হননি। তাঁর আদর্শ ছিলেন বুদ্ধদেব। জীবনের শেষ দশকে এসে গভীর শ্রদ্ধায় রবীন্দ্রনাথ এক বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে একটি ভাষণে বললেন, "আমি যাঁকে অন্তরের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বলে উপলব্ধি করি, আজ এই বৈশাখী পূর্ণিমায় তাঁর জন্মোৎসবে আমার প্রণাম নিবেদন করতে এসেছি। এ কোন বিশেষ অনুষ্ঠানের উপকরণগত অলঙ্কার নয়, একান্তে নিভৃতে যা তাঁকে বার-বার সমর্পণ করেছি সেই অর্ঘ্যই আজ এখানে উৎসর্গ করি।" (বুদ্ধদেব, ১৩৪২) একান্তে নিভৃতে তাঁকে বারবার স্মরণ করার স্বীকৃতি তাঁর নানা প্রবন্ধে, 'কথা ও কাহিনী'-র কবিতায়, ও নানা নাটকে অভিব্যক্ত হয়েছে। তা আমরা পরে স্মরণ করব। কিন্তু এই সংহত ভাষণে রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধসংস্কৃতির যে ঐতিহাসিক অবদান এবং ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের সভ্যতার ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে তার বিশ্লেষণ করলেন—তা বৌদ্ধসংস্কৃতির প্রতি রবীন্দ্রশ্রদ্ধার স্মরণীয় নিদর্শন। রবীন্দ্রনাথের এই গভীর শ্রদ্ধার কারণ স্বরূপ তাঁরই উক্তি উদ্ধৃত করছি,—"কেবল পূর্ণ মনুষ্যত্বের প্রকাশ তাঁরই, সকল দেশের সকল কালের সকল মানুষকে যিনি আপনার মধ্যে অধিকার করেছেন, যাঁর চেতনা খণ্ডিত হয়নি রাষ্ট্রগত জাতিগত দেশকালের কোনো অভ্যস্ত সীমানায়।"

আন্তর্জাতিক মৈত্রীভাবনায় যিনি কয়েকবার বিশ্ব-পরিক্রমা করেছেন সেই রবীন্দ্রমানসের শ্রদ্ধা বুদ্ধদেবের বিশ্ব-মানবিক ভূমিকার প্রতি স্বাভাবিক। শুধু এজন্যেই নয়। ভারতীয় সাধনার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ রূপে বুদ্ধদেবকে পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর ইতিহাসপ্রেক্ষণায়—"তাঁর (বুদ্ধদেবের) সেই প্রকাশের আলোকে সত্যদীপ্তিতে প্রকাশ হল ভারতবর্ষের। মানব ইতিহাসে তাঁর চিরন্তন আবির্ভাব ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে ব্যাপ্ত হল দেশে-দেশান্তরে। ভারতবর্ষ তীর্থ হয়ে উঠল।" অর্থাৎ উপনিষদের জ্ঞানসাধনা বুদ্ধের

মধ্যে কর্ম ও ভক্তির সঙ্গে সমন্বিত হয়ে ভারতের বিশ্বমৈত্রীর বাণীকে,—পরম ঐক্যের সাধনাকে যেন সার্থক করে তুলল বৌদ্ধযুগটি। ভারতের শিল্পে, স্থাপত্যে, সাহিত্যে-দর্শনে আশ্চর্য অবদান রেখে গেল বৌদ্ধযুগের সাধনা। এতদিন পরে বিংশশতাব্দীর কবি বুদ্ধের সেই মৈত্রীর সাধনায় পুনরায় দীক্ষা লাভের কামনা করলেন,—"বর্ণে বর্ণে, জাতিতে জাতিতে, অপবিত্র ভেদবুদ্ধির নিষ্ঠুর মূঢ়তা ধর্মের নামে আজ রক্তে পঙ্কিল করে তুলেছে এই ধরাতল; পরস্পর হিংসার চেয়ে সাংঘাতিক পরস্পর ঘৃণায় মানুষ এখানে পদে পদে অপমানিত। সর্বজীবে মৈত্রীকে যিনি মুক্তির পথ বলে ঘোষণা করেছিলেন সেই তাঁরই বাণীকে আজ উৎকণ্ঠিত হয়ে কামনা করি এই ভ্রাতৃবিদ্বেষকলুষিত হতভাগ্য দেশে।" তাই "এস দানবীর, দাও ত্যাগকঠিন দীক্ষা"—এ প্রার্থনা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতে ও কবিতায় পুনঃ পুনঃ অভিব্যক্ত।

বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণের মধ্যে আদর্শ মানুষ, অনুশীলন বৃত্তির চরমসিদ্ধি খুঁজে পেয়ে, তাকেই তুলে ধরেছিলেন জাতীয় ধর্মের আদর্শ রূপে। তিনি মহাভারতের যুগের পৌরাণিক কাহিনী হতে শ্রীকৃষ্ণকে ইতিহাসের পটে আঁকার প্রয়াস করেছিলেন,—আর উপনিষদের যুগের পটভূমিকাটি অঙ্কন করে ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম মানুষ বলে, মহামানব বলে, ত্যাগ-প্রেম-মৈত্রীর আদর্শ দীক্ষাদাতা বলে বুদ্ধদেবকে জাতীয় মানসে তথা সর্বজাতির মিলন-তীর্থে প্রতিষ্ঠার প্রয়াসী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বুদ্ধদেব ঐতিহাসিক মানুষ, বৌদ্ধযুগ ভারতের ঐতিহাসিক যুগ,—এর বিশ্লেষণ 'ভারত ইতিহাসচর্চা' প্রবন্ধেও ছিল, এবং তারও পূর্বে 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা'—(পরিচয়) নিবন্ধেও বিশ্লেষিত, ইতিপূর্বেই আমরা এর কথা উল্লেখ করেছি। প্রথমোক্ত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ প্রাধান্য দিয়েছিলেন বৌদ্ধযুগকে—"বৌদ্ধযুগ ভারত ইতিহাসের একটা প্রধান যুগ। ইহা আর্য-ভারতবর্ষ ও হিন্দু-ভারতবর্ষের মাঝখানকার যুগ।" এই প্রবন্ধেই রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধদর্শন ও বৌদ্ধধর্মকে পক্ষপাতহীন দৃষ্টিতে পর্যালোচনার সূত্রপাত করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে আর একটি প্রশ্ন ওঠে। রবীন্দ্রদর্শনে জগৎ আনন্দময়,—(উপনিষদের আলোকে) আর বৌদ্ধদর্শনে জীবনের হাঁ-ধর্মিতা অপেক্ষা না-ধর্মিতা বেশি,—তাহলে সমন্বয় হল কি ভাবে? তার উত্তর এই যে, বৌদ্ধধর্মের মধ্যে তিনি জ্ঞান ও কর্মের, বৈরাগ্য ও হৃদয়াবেগের সমন্বিত রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন। এইজন্য ইংরেজ ঐতিহাসিকদের একদেশদর্শী বিচার তাঁর মনঃপূত ছিল না, হীনযানের জ্ঞান ও মহাযানের প্রেম ও মৈত্রী—দুই সমন্বিত করে নিতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তাই তাঁর বক্তব্যে প্রকাশিত হল—"বৌদ্ধধর্মের বিশেষত্বই এই যে একদিকে তাহার

যেমন কঠোর ত্যাগ, অন্যদিকে তাহার তেমনি উদার প্রেম। ইহা কেবলমাত্র জ্ঞানের ধর্ম, ধ্যানের ধর্ম নহে। —বুদ্ধদেব নিজের জীবনেই তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন।" (ব্রহ্মবিহার) এই জন্যই রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে বুদ্ধদেবকে সর্বমানবের শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস করেছে। আর "অহিংসা, করুণা, ত্যাগ, বিশ্বমৈত্রী, ঐক্য, সংহতি এবং সর্বমানবের সমতা প্রধানত এই ক'টি নীতিই বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও রবীন্দ্র সংস্কৃতির মধ্যে গভীর যোগ-সূত্ররূপে কাজ করেছে।" (ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ, পৃ ৬৬) বাস্তবিকই উক্ত যোগসূত্রের পরিচয় আছে তাঁর রচিত সংগীতে, কাব্যে, নাটকের নানাসূত্রে।[১০]

চারিত্র-পূজারী রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেবের মতই আরও একজন মহামানবের প্রতিও শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়েছেন নানা ভাষণে, নানা প্রবন্ধে। তিনি মানবপুত্র যীশুখৃষ্ট। (রামমোহনের কথাও এ সূত্রে উল্লেখযোগ্য।) বস্তুত রবীন্দ্রমানসে একই শ্রদ্ধার আসনে খৃষ্টের প্রতিষ্ঠা, তাই তিনি আহ্বান করলেন, "মানব-চরিতকে যেখানে বড়ো করে দেখতে পাওয়া যায় সেই মহাপুরুষদের সামনে এসে দাঁড়াও। ওই দেখো শাক্যরাজবংশের তপস্বী, তাঁর পুণ্যচরিত আজ কত ভক্তের কণ্ঠে।……ভগবান ঈশাকে দেখো। সেই একই কথা। কত আঘাত, কত বেদনা। সমস্তকে নিয়ে তিনি কত সুন্দর।"

শান্তিনিকেতনে বড়োদিনের উৎসব প্রচলন করে যীশুখৃষ্টকে স্মরণ উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের নানা ভাষণে ঐ স্বীকৃত। প্রেম-অহিংসা ত্যাগের মধ্যে মানবপুত্র যীশু ইতিহাসের পৃষ্ঠায় উজ্জ্বল হয়ে আছেন, পৃথিবীর একটি বৃহৎ ধর্মের উৎসরূপে বরণীয় হয়ে আছেন। তাঁকে জানা ও তাঁর বাণী উপলব্ধির কথা রবীন্দ্রনাথ কতবার প্রকাশ করেছেন, কারণ নিত্যধর্মের উপলব্ধিতে উদার মানুষ—'নির্ভয়ে সকল ধর্মের মহাপুরুষদের মহাবাণী সকল গ্রহণ' করে 'পৈত্রিক ঐশ্বর্যকে বৈচিত্র্য-দান' করতে পারে। তাই রবীন্দ্রনাথ, রোম সাম্রাজ্যের অভ্রভেদী প্রতাপ ও ইহুদী সমাজের লোকাচার ও শাস্ত্রশাসনের পটভূমিতে মানবপুত্র যীশুর ঐতিহাসিক আবির্ভাবকে নিত্যধর্মের আলোতে বিশ্লেষণ করেছেন, আর যীশুর বাণীতে আধুনিক মানবধর্মের চিরন্তন সত্যগুলি অনুসন্ধান করে তুলে ধরেছেন। তাঁর নানা প্রবন্ধে ও বক্তৃতার মধ্য থেকে আমরা একটিমাত্র মন্তব্য উল্লেখ করছি,—"তিনি ডেকেছিলেন মানুষকে পরমপিতার সন্তান বলে, ভাইকে মিলতে বলেছিলেন ভাইয়ের সঙ্গে। প্রাণোৎসর্গ করলেন এই মানবসত্যের বেদীতে। চিরদিনের জন্য এই মিলনের আহ্বান রেখে গেলেন—আমাদের কাছে।"

(২৫।১২।৩২)

লক্ষ্য করা গেল, বুদ্ধের মৈত্রী ও খৃষ্টের মানবপ্রেম একই চিরন্তন সত্যের প্রকাশ। রবীন্দ্রদৃষ্টিতে তাই দুজনের আসন একই বেদীতে। আরও লক্ষ্য করা গেল, সাম্যাবতার রূপে শাক্যসিংহ ও যীশুকে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম জীবনে ঐতিহাসিক প্রাধান্য দিলেও, 'কৃষ্ণচরিত্র' ও 'ধর্মতত্ত্বে'—এসে বুদ্ধ ও যীশুকে সর্বাঙ্গীন আদর্শ বলে স্বীকার করেন নি। তিনি শ্রীকৃষ্ণকেই সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ রূপে পূজা করলেন। আর রবীন্দ্রনাথ 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারায়' কৃষ্ণকে সংস্কৃতি-মহাযুদ্ধের অধিনায়ক রূপে শ্রদ্ধা জানালেও, বুদ্ধকেই সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানবরূপে প্রণাম জানালেন।

বঙ্কিমচন্দ্র যুগের প্রয়োজনটাকেই বড়ো করে দেখেছিলেন, 'কৃষ্ণচরিত্র' উদ্ধার তারই ফলশ্রুতি, আর বিংশশতাব্দীর 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বীর' নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্বে মৈত্রী, অহিংসা ও প্রেমের বাণী-প্রচারক বুদ্ধকে এবং যীশুকে রবীন্দ্রনাথ বৃহত্তর মানবতাবোধে প্রণোদিত হয়েই মানুষের অন্তরে আহ্বান করেছিলেন।

বঙ্কিম জাতীয় ধর্মের প্রয়োজনে জাতীয় আদর্শ অনুসন্ধান করে প্রত্নতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে (তাতে যতই পক্ষপাতিত্ব ও অসম্পূর্ণতা থাকুক) পেলেন 'কৃষ্ণচরিত্র', আর রবীন্দ্রনাথ বিশ্বমৈত্রী ও মানবতাবোধের আদর্শের ঐতিহাসিক প্রতিফলন দেখলেন 'বুদ্ধচরিত্রে' এবং 'যীশুচরিত্রে', (তাঁর ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে যতই কবিদৃষ্টির উদ্ভাসন থাকুক)। একই সঙ্গে স্মরণ করা প্রয়োজন ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাস হতে সমন্বয়-সাধক কবীর, নানক, দাদুকে রবীন্দ্রনাথ যেমন পরম শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, তেমনি একেবারে আধুনিকযুগের ইতিহাসের সমন্বয়-সাধক রামমোহনকেও তিনি গণ্ডী-সংকীর্ণ বিচারের কুয়াশা হতে মুক্ত করে 'ভারত পথিক' বলে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন।

পূর্বসূরী মহাভারতের কর্মময় যুগের ইতিহাস ধ্যান করলেন তারই জাতীয় আন্দোলনের সেই যুগে যাঁর সবাধিক প্রয়োজন ছিল; আর উত্তরসূরী যুদ্ধবিধ্বস্ত বিশ্বে যার সর্বাধিক প্রয়োজন, সেই প্রেম ও মৈত্রী-ভাবনার সত্যরূপ দেখলেন উপনিষদে ও বৌদ্ধ যুগে।

বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণচরিত্রের' মূল তত্ত্বরূপটি নির্দেশ করেছেন 'ধর্মতত্ত্বে'; আর রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের আলোকে উদ্ভাসিত বুদ্ধ ও যীশুর বাণী-ভাষ্য আশ্রয় করে উপনীত হয়েছেন—'মানুষের ধর্মে'। এই প্রসঙ্গটিই অতঃপর ধর্মচিন্তার তৃতীয় পর্যায়ের আলোচ্য।

তিন

সংগঠনমূলক ধর্মচিন্তার প্রতিফলন দেখা যায় প্রচলিত ধর্মীয় অনুশাসনের যুগোপযোগী ভাষ্যরচনায়, নিজস্ব ধর্মোপলব্ধির অভিব্যক্তি দ্বারা তৎকালীন শিক্ষিত সমাজমানসের জাতীয় ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা আকর্ষণে এবং নবতর নৈতিকবোধের প্রতিষ্ঠায়। এ ব্রতে বঙ্কিম ছিলেন নব্যহিন্দুত্ব-পুনরুজ্জীবন এবং জাতীয় জাগরণের তাত্ত্বিক বা Theologian, তাঁর সেই Theology হল 'ধর্মতত্ত্ব'। এদিকে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সামগ্রিক ধর্মচেতনার প্রবক্তা ও Theologian, কারণ পরিণত জীবনে কোনো বিশেষ ধর্ম-সম্প্রদায় বা মতের গণ্ডীতে তিনি আবদ্ধ ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথের উক্ত Theology হল 'Religion of Man', যার পরিবর্তিত রূপ হচ্ছে 'মানুষের ধর্ম'। দুজনেরই স্ব স্ব Theology-র পটভূমিতে আছে সুদীর্ঘকালের আত্মচিন্তা ও অধ্যাত্ম উপলব্ধি (স্ব স্ব ধর্ম-বিশ্বাসের পটভূমিতে), যার অভিব্যক্তি আছে একজনের 'মনুষ্যত্ব কি', 'চিত্তশুদ্ধি' ইত্যাদি নিবন্ধে; অন্যজনের 'ধর্ম' ও 'শান্তিনিকেতন' শীর্ষক উপদেশমালায়। এই জাতীয় অভিব্যক্তিগুলি বঙ্কিমের ক্ষেত্রে মূলতঃ আত্মবিশ্লেষণ আর রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে অনেকটা spiritual revealation—বা অধ্যাত্ম উপলব্ধি, আমাদের আলোচনায় এ ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

পূর্বেই বলেছি হেস্টির সঙ্গে মসীযুদ্ধকালে একটি পত্রে বঙ্কিম হিন্দুধর্মের তিনটি উপাদানের তৃতীয় উপাদানরূপে উল্লেখ করেছিলেন, 'a code of morals...dependent upon the doctrinal basis', এবং এই সূত্রেই হিন্দুধর্মের সারভাগ গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছিলেন। আবার পজিটিভিস্ট বন্ধু যোগেন্দ্রচন্দ্রের সঙ্গে পত্রবিনিময়কালেও একটি পত্রে তিনি লিখেছিলেন, হিন্দুধর্মের সংস্কার প্রয়োজন। এ সম্পর্কে বঙ্কিমের মনোভঙ্গির মূল্যবান সূত্র হিসাবে তাঁর একটি পত্রাংশের উল্লেখ করছি—

> I have certainly no serious hope of progress in India except in Hinduism,—*in Hinduism reformed, regenerated and purified.* ...The great principles of Hinduism are good for all ages and all mankind...but *its non-essential adjuncts have been effate* and pernicious in an altered state of society. —2nd letter, Letters on Hinduism.

স্পষ্টতঃই যুগপ্রয়োজনে বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুধর্মের সংস্কারকামনা করেছেন, এবং

চিরন্তন মূল নীতিগুলিকে অপ্রয়োজনীয় ও অনিষ্টকর লোকাচার হতে মুক্ত করতে বলেছেন। এদিকে 'ধর্ম্মতত্ত্ব' বিশ্লেষণের দ্বারাই তিনি উক্ত সংকল্প কার্যে পরিণত করার প্রয়াস সুরু করেছিলেন ইতিমধ্যেই।

বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুধর্মের যুগোপযোগী আচরণবিধিগুলি উদ্ধার করতে গিয়ে অনুপ্রেরণাস্বরূপ একদিকে কোৎ, মিল প্রভৃতি দার্শনিকগণ রচিত জড়শাস্ত্র হতে নির্দ্বিধায় সারসংগ্রহ করেছেন, আবার অন্যদিকে হিন্দুধর্মের অনাবশ্যক প্রথা ও আচার বর্জন করে যুক্তিগ্রাহ্য তত্ত্ব নিরূপণ করেছেন। 'ধর্ম্মতত্ত্বে'-র বিস্তৃত আলোচনার পূর্বেই ভূমিপ্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছিল পূর্বরচিত কয়েকটি নিবন্ধে। আমরা দু'একটি বক্তব্য পর্যালোচনা করছি এ প্রসঙ্গে—

> কার্যকারিণী বৃত্তিগুলির অনুশীলন যেমন মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য, জ্ঞানার্জনী বৃত্তিগুলিরও সেইরূপ অনুশীলন জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। বস্তুতঃ সকল প্রকার মানসিক বৃত্তির সম্যক অনুশীলন, সম্পূর্ণ স্ফূর্তি ও যথোচিত উন্নতি ও বিশুদ্ধিই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য। —মনুষ্যত্ব কি? ১২৮৪

এখানে স্পষ্টতঃই ধন, পদ, যশঃ কিংবা পরলোকের জন্য সুখপ্রদ কার্য—এর কোনটিই উদ্দেশ্য বলে স্বীকৃত হয়নি, সম্যক অনুশীলনই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য রূপে নির্ধারিত হয়েছে। এর আরও ব্যাখ্যা পাওয়া যায় অন্যত্র, সেখানে বক্তব্য একই, তবে বিশ্লেষণ বিস্তৃততর—

> ধর্ম্ম আত্মপীড়ন নহে, আপনার উন্নতিসাধন, আপনার আনন্দবর্দ্ধনই ধর্ম্ম। ঈশ্বরে ভক্তি, মনুষ্যে প্রীতি এবং হৃদয়ে শান্তি, ইহাই ধর্ম্ম। ভক্তি, প্রীতি, শান্তি এই তিনটি শব্দে যে বস্তু চিত্রিত হইল তাহার মোহিনী মূর্ত্তির অপেক্ষা মনোহর জগতে আর কি আছে?···সাহিত্যও ধর্ম্মছাড়া নহে। কেননা সাহিত্য সত্যমূলক। যাহা সত্য, তাহা ধর্ম্ম।
>
> —ধর্ম্ম ও সাহিত্য, ১২৯২

এখানে কার্যকারিণী ও জ্ঞানার্জনী বৃত্তির সঙ্গে মনোরঞ্জিনী বৃত্তির অনুশীলনের কথাও যুক্ত হল। আর 'ঈশ্বরে ভক্তি, মনুষ্যে প্রীতি ও হৃদয়ে শান্তি'—এই সূত্রটিকে বঙ্কিম তাঁর ধর্মচিন্তার মূলভিত্তি বলে ঘোষণা করলেন। প্রসঙ্গতঃ স্মরণযোগ্য, মনুষ্যে প্রীতির কথা বহুকালপূর্বে 'কমলাকান্তে'র জবানিতে অভিব্যক্ত হয়েছিল—

> প্রীতি সংসারে সর্বব্যাপিনী—ঈশ্বরই প্রীতি।···মনুষ্য জাতির উপর যদি আমার প্রীতি থাকে তবে, আমি অন্য সুখ চাই না। —একা, ১২৮০

অতঃপর হিন্দুধর্মের সার সংকলন ক'রে বঙ্কিম পুনর্ঘোষণা করলেন—"হিন্দু-

ধর্ম্মের সার চিত্তশুদ্ধি।...যাহার চিত্তশুদ্ধি আছে, তিনি শ্রেষ্ঠ হিন্দু, শ্রেষ্ঠ খ্রীষ্টীয়ান, শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ, শ্রেষ্ঠ মুসলমান, শ্রেষ্ঠ পজিটিভিষ্ট।...চিত্তশুদ্ধিই ধর্ম্ম।" (চিত্তশুদ্ধি, ১২৯২)। বঙ্কিমের মতে চিত্তশুদ্ধির লক্ষণ : ভক্তি, প্রীতি ও শান্তি। "এই চিত্তশুদ্ধি মনুষ্যদিগের সকল বৃত্তিগুলির সম্যক স্ফূর্তি, পরিণতি ও সামঞ্জস্যের ফল।" সকল বৃত্তি বলতে পূর্বোক্ত তিনটির সঙ্গে চতুর্থ একটি শারীরিক বৃত্তি নব-সংযোজিত হয়েছে। এইখানেই বঙ্কিম-প্রচারিত 'অনুশীলন'-এর পূর্ণাঙ্গসূত্রটিতে এসে পৌঁছান গেল।

অতঃপর লক্ষ্য করা যায়, উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য দর্শন এবং মিল বেন্থাম, কোঁৎ, স্পেন্সার প্রভৃতি মনীষীদের চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত হয়েও স্বাধীন চিন্তা ও নিজস্ব উপলব্ধির শক্তিতে বঙ্কিম হিন্দু-সংস্কৃতির ভূমিতে দাঁড়াতে পেরেছেন এবং হিন্দুধর্মের সারভাগ (যা যুগের বিচারবুদ্ধিতে গ্রাহ্য হতে পারে) নিয়ে সামগ্রিক জীবনদর্শন সংকলন করেছেন। আর তাই 'ধর্মতত্ত্ব'। সমালোচকের উক্তিতে বলা যায়, "বঙ্কিমের ধর্মতত্ত্ব একটা সমন্বিত জীবনদর্শন। ব্যক্তির বিভিন্ন বৃত্তির সামঞ্জস্য, দেশ ও সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সামঞ্জস্য, আবার শিক্ষা, সাহিত্য, নীতি, ধর্ম, বিজ্ঞান প্রভৃতি মানব অভিজ্ঞতার সবগুলি দিকের আলোচনা ও সামঞ্জস্য করে 'ধর্মতত্ত্ব' কল্পিত হয়েছিল।...একটি মৌলিক জীবন-দর্শন রচনা করে বঙ্কিমচন্দ্র সমন্বিত ব্যক্তিত্বের আদর্শ স্থাপন করলেন।" (চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র, পৃ. ৩৪) বাস্তবিকই দেশীকড়চা বা গুরু-শিষ্য-সংবাদের রীতিতে রচিত এই জীবনদর্শন বঙ্কিমের নিজস্ব উপলব্ধিজাত। এটি 'মূর্তিমান থিওরি'[১১] কিনা সে বিচার না করেও বলা যায়, বঙ্কিম শেষজীবনে তাঁর স্বদেশচিন্তাকে এরই উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাই তাঁর শেষ কথা, "সকল ধর্মের উপরে স্বদেশপ্রীতি ইহা বিস্মৃত হইও না।" মোটকথা 'Non-essential adjuncts' হতে মুক্ত, 'reformed, regenerated and purified' হিন্দুধর্ম বঙ্কিমের ব্যাখ্যাতে যা দাঁড়াল তার নিত্য সত্য অংশ ('great principles of Hinduism') হল নিম্নপ্রকার—

১. মনুষ্যের কতকগুলি শক্তি আছে। আমি তাহাকে বৃত্তি নাম দিয়াছি। সেইগুলির অনুশীলন, প্রস্ফুরণ ও চরিতার্থতায় মনুষ্যত্ব।
২. তাহাই মনুষ্যের ধর্ম্ম।
৩. সেই অনুশীলনের সীমা, পরস্পরের সহিত বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্য।
৪. তাহাই সুখ। —উপক্রমণিকা, 'কৃষ্ণচরিত্র', ২য় সংস্করণ

এবার দেখা প্রয়োজন, উক্ত নিত্য সত্যগুলি অধ্যায় আরম্ভে উল্লিখিত

বঙ্কিমের 'মটো'-র সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করেছে কিনা। আমরা লক্ষ্য করেছি, উপধর্ম কুসংস্কার লোকাচার আদি হতে মুক্ত যে সারাংশ পাওয়া গেল, তা অনেকটা মিল বেন্থাম কোঁতের মানবহিতবাদের সঙ্গে হিন্দুধর্মের সমন্বয়, এবং তা রবার্ট সীলি প্রচারিত 'Natural religion'—হতে খুব বেশি ভিন্ন নয়। তবে, "The substance of religion is culture and the fruit of it higher life." —সীলির এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে বঙ্কিম সংযোজন করলেন, ব্যক্তির বৃত্তি-কর্ষণ বা কর্মাত্মক ধর্মাচরণের গুরুত্বটি। সমালোচক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন, "বঙ্কিমচন্দ্র একথাও স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে পাশ্চাত্য অনুশীলন ধর্মের লক্ষ্য সুখমাত্র। কিন্তু তিনি যে ভারতীয় অনুশীলনতত্ত্বের পুনঃপ্রচার করিয়াছেন, যাহা তাঁহার মতে হিন্দুধর্মের সারাংশ এবং জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ ভগবদ্গীতা যে অনুশীলন-তত্ত্বের উপর গঠিত সে অনুশীলন-তত্ত্বের উদ্দেশ্য মুক্তি।" ('দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র')। হীরেন্দ্রনাথ ঐ মুক্তিকে 'আত্যন্তিক সুখ' (গীতা) কিংবা 'আনন্দং নন্দনাতীতং' (উপনিষদ) বলে মন্তব্য করেছেন। হিন্দু উজ্জীবনযুগে রচিত বঙ্কিমতত্ত্বের উক্ত ভাষ্য কিঞ্চিৎ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেও মোটামুটিভাবে বঙ্কিমী মনোভঙ্গির মূল্যায়ন করেছে। এবার বঙ্কিমের 'ধর্মতত্ত্ব' হতে কয়েকটি মূল সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা করলেই একথা স্পষ্ট হবে।

ক. 'অনুশীলন প্রবৃত্তিমার্গ—সন্ন্যাস নিবৃত্তিমার্গ।… অনুশীলন কর্মাত্মক। …সুখের উপায় ধর্ম, আর মনুষ্যত্বই সুখ।' —৭ম অধ্যায়

খ. 'যদি আত্মরক্ষা এবং স্বজনরক্ষা ধর্ম্ম হয়, তবে স্বদেশরক্ষাও ধর্ম্ম। …সমাজের যে অবস্থা ধর্ম্মের অনুকূল তাহাকে স্বাধীনতা বলা যায়।' —৮ম অধ্যায়

গ. 'সকল বৃত্তির ঈশ্বরানুবর্তিতার নাম ভক্তি। এবং সেই ভক্তি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই।' —১১শ অধ্যায়

ঘ. 'যেদিন ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও শিল্প এবং ভারতবর্ষের এই নিষ্কাম ধর্ম্ম একত্রিত হইবে সেদিন মনুষ্য দেবতা হইবে।'

ঙ. 'সমস্ত জগতে যে প্রীতি, তাহাই প্রীতিবৃত্তির চরমসীমা। তাহাই যথার্থ ধর্ম্ম। —২১শ অধ্যায়

এই উদ্ধৃতিগুলিই বঙ্কিম-মনোভঙ্গির বিচারে যথেষ্ট। স্পষ্টই বোঝা গেল, উক্ত গীতোক্ত কর্মাত্মক অনুশীলন-ধর্ম ব্যক্তি-মানুষের সাধনা অর্থাৎ স্বসমাজ, স্বদেশ এবং অবশেষে জগতের উপযুক্ত হবার নিমিত্ত বৃত্তির কর্ষণা। সুতরাং বঙ্কিমী 'মটো'-তে উল্লিখিত লোকরক্ষা বা লোকহিতের সঙ্গে এর সামঞ্জস্য

বিদ্যমান।

সমগ্র 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থখানিতে লক্ষ্য করা যায়, ইতিপূর্বে কথিত সূত্রগুলিই ('চিত্তশুদ্ধি', 'মনুষ্যত্ব কি' প্রবন্ধে ব্যক্ত) এখানে বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যাত এবং উক্ত ব্যাখ্যানের পরে সূত্রসার বা সিদ্ধান্ত পাওয়া গেল যা, তদনুযায়ী চিত্তশুদ্ধির লক্ষণ হল, ঈশ্বরে ভক্তি, মনুষ্যে প্রীতি ও হৃদয়ে শান্তি; আর তার পন্থা হল চতুর্বিধ বৃত্তির সম্যক অনুশীলন।

অতঃপর ঐ সূত্রের অনুসিদ্ধান্তে প্রীতি-বৃত্তিকে সম্প্রসারিত করা হল—দেশপ্রীতি ও জগৎ-প্রীতি পর্যন্ত। অর্থাৎ অনুশীলন-প্রবক্তা বঙ্কিম জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতায় একটি সমন্বয়তত্ত্বে পৌছলেন।

আমরা আরও লক্ষ্য করেছি, হিন্দু-সংস্কৃতির এই প্রকার বিশ্লেষণ যা উদার মানবধর্মের পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়েছে, তা আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির ফলশ্রুতি। বঙ্কিম ভারতীয় ঐতিহ্যের সমর্থন নিয়ে কোঁতের নব-মানবধর্মকে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেছেন। (কৈফিয়ৎ দিয়েছেন, "যবন স্পর্শদোষ ঘটিয়াছে বলিয়া ফেলিয়া দিতে হইবে কি")। আসলে হিন্দুধর্মের সারভাগ গ্রহণ কালে বঙ্কিম মনুষ্যত্বের হিতসাধনের প্রতিই লক্ষ্য রেখেছিলেন। তাই তিনি ঘোষণা করেছিলেন, "হিন্দুধর্মের সেই মর্মভাগ অমর, চিরদিন চলিবে, মনুষ্যের হিতসাধন করিবে। কেননা মানবপ্রকৃতিতে তাহার ভিত্তি। তবে বিশেষ বিধি সকল, সকল ধর্মেই সময়োচিত হয়। তাহা কালভেদে পরিহার্য্য বা পরিবর্তনীয়।" (৫ম অধ্যায়, 'ধর্ম তত্ত্ব') বঙ্কিমের এই উদার যুগোপযোগী দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই বোধ হয় বিপিনচন্দ্র মন্তব্য করেছিলেন, "তাঁহার অনুশীলন ধর্ম ব্রাহ্মধর্মেরই নামান্তর মাত্র।" ('নবযুগের বাংলা')। তবে উক্ত মন্তব্যটি আক্ষরিক অর্থে গ্রহণযোগ্য নয়, তার প্রমাণ আছে বঙ্কিম-রচিত 'শ্রীমদ্ভগবদগীতা'-র ব্যাখ্যায়। কারণ সেখানে লক্ষ্য করা যায়, বঙ্কিমী ভক্তিবাদের সঙ্গে ব্রাহ্মধর্মের মতপার্থক্য স্পষ্ট। প্রতীকোপাসনা, অবতারবাদ এবং পূর্ণ মানবতার মূর্ত প্রতীকরূপে শ্রীকৃষ্ণকে উপাসনা ব্রাহ্ম-আদর্শের প্রতিকূল। (দ্বিজেন্দ্রনাথ পিতা দেবেন্দ্রনাথের নির্দেশে এই জন্যই 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থের প্রতিবাদ লিখেছিলেন)। তবে বঙ্কিমের অসম্পূর্ণ গীতাব্যাখ্যায় (১২৯৩, প্রচার) কর্মবাদের উপর প্রাধান্য আরোপ করা হয়েছিল; পরা ও অপরা দু'রকম জ্ঞান-চর্চা এবং কর্মানুষ্ঠানের সঙ্গেই জ্ঞানলাভ করে কর্ম ও জ্ঞানের সামঞ্জস্য ও সমন্বয়ে ভক্তিসাধনা করতে হবে,—এই ছিল বঙ্কিমের নবতম ভাষ্য।

মূলকথা, বঙ্কিমের লক্ষ্য ছিল সর্বাঙ্গীন অনুশীলনজাত চিত্তশুদ্ধি। এবার

তুলনা করলেই বোঝা যাবে, যে অন্তদিকে রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য হচ্ছে—জগতের আনন্দযজ্ঞে যোগ এবং তার আন্তর উপলব্ধি। তাই রবীন্দ্রনাথ-রচিত 'ধর্মের অধিকার' প্রবন্ধে ঘোষণা ছিল, রীতি নয় নীতি, সংস্কার নয় বুদ্ধি, অনুষ্ঠান নয় উপলব্ধিই কাম্য। দুজনের লক্ষ্যে বিশেষ অন্তর নেই (অভিব্যক্তির আক্ষরিক অর্থে ভেদ থাকলেও), সাধনায় আছে প্রভেদ। একজন স্থপতির মতো স্তরে স্তরে গড়ে তুলতে চেয়েছেন, অন্যজন ফলবান বৃক্ষের মতো হয়ে উঠতে চেয়েছেন। পূর্বজনের অনুপ্রেরণা হল গীতোক্ত ভক্তিতত্ত্ব, আর পরবর্তীর উপনিষদোক্ত আনন্দ-উপলব্ধির বাণী। লক্ষ্য করা যাবে, পূর্বসূরীর মতোই উত্তরসূরী পরিণত জীবনে এসে প্রত্যয়নিষ্ঠ হতে পেরেছেন 'মানুষের ধর্মে'। সে প্রত্যয় হল, "ধর্ম মানেই মনুষ্যত্ব যেমন আগুনের ধর্মই অগ্নিত্ব, পশুর ধর্মই পশুত্ব। তেমনি মানুষের ধর্ম মানুষের পরিপূর্ণতা।" (পত্রধারা, প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৩৯)। ঠিক এমনতর সূত্রই ছিল বঙ্কিম-রচনাতে—

গুরু—মানুষের ধর্ম্ম কি ?

শিষ্য—এক কথায় কি বলিব ?

গুরু—মনুষ্যত্ব বল না কেন ? —৩য় অধ্যায়, 'ধর্ম্মতত্ত্ব'

অর্থাৎ দুজনের লক্ষ্য বা সাধ্য একই, তা হল পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব। এবার সাধনার পার্থক্য বিচার করা যেতে পারে। রবীন্দ্র-ধর্ম-সাধনার মূল ভিত্তিতে জীবনচর্যা ও অধ্যাত্ম উপলব্ধি দুইই বিদ্যমান। আগেই বলেছি, উক্ত উপলব্ধি রবীন্দ্রনাথের ধর্মচেতনায় পুষ্পিত বৃক্ষের মতই উপনিষদের সূর্যালোকে বিকশিত। এই বিকাশের ক্রম অনুসরণ করলে দেখা যায়, ঔপনিষদিক আনন্দ-উপলব্ধিতেই 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' হয়েছে, অর্থাৎ তাঁর বাহ্য সংস্কার-বন্ধন অনায়াসে খুলে গেছে—হৃদয়বৃত্তি ও সৌন্দর্যবোধকে অবলম্বন করে। ঐ ক্রম-বিকাশের পরিচয় আছে 'সাধনা' পর্বের কাব্য, কাহিনী, নাটক, প্রবন্ধ, গান ইত্যাদিতে। অথচ ধর্ম উপলব্ধির ঐ জাতীয় শিল্পিত প্রকাশের পাশাপাশি ব্রাহ্ম-সম্প্রদায়ের সামাজিক দায়িত্বও রবীন্দ্রনাথ পালন করেছেন। কিন্তু সেক্ষেত্রেও কোন নির্দিষ্ট ধর্মাদর্শে তিনি আবদ্ধ থাকেন নি। একাধিক ভারতীয় ধর্মচিন্তার (যথা—উপনিষদ, বৌদ্ধধর্ম, বাউল, বৈষ্ণব-ধর্ম) মধ্যে মানবতার অনুকূল যা কিছু সব গ্রহণ করে রূপে রসে ফুলের মতো তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। এক্ষেত্রে তিনি ব্রাহ্ম বা বৌদ্ধ বা খ্রীষ্টান বা মুসলমান কোন পরিচয়ের গণ্ডীতেই আবদ্ধ নন। এ প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনার সুযোগ আমাদের নেই, কেবলমাত্র মানুষের ধর্মের পটভূমিকা রূপে কয়েকটি কথা স্মরণ করে নিতে চাই। কারণ 'মানুষের ধর্ম'-ই রবীন্দ্রধর্ম-

চেতনার সর্বশেষ ফলশ্রুতি।

'মানুষের ধর্মের' পটভূমিতে মানবতার অনুকূল যা কিছুকে গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিকূল প্রথা ও আচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-ঘোষণাও ছিল, দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এ বুদ্ধির বিরুদ্ধে হৃদয়ের এবং 'বিসর্জনে' প্রথা ও আচারের বিরুদ্ধে প্রেমের বিদ্রোহ। এর পরবর্তী পর্বে ধর্মের নামে বাহ্য আচার অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা এবং বৌদ্ধ মৈত্রী আদর্শকে গ্রহণ করার প্রেরণা একই সঙ্গে অভিব্যক্ত হল 'মালিনী', 'কথা ও কাহিনী' এবং 'নৈবেদ্য'র নানা কবিতায়। ('নটীর পূজা' ও 'চণ্ডালিকা' নাটকে পরবর্তীকালে)। লক্ষণীয় এই, উক্ত শিল্পিত অভিব্যক্তিগুলির সবগুলিই রবীন্দ্র-ধর্মচিন্তায় অনবচ্ছিন্ন। এগুলিতে তাঁর আনন্দবোধ, ঈশ্বরে ভক্তি এবং দেশাত্মবোধ সব মিলে একটি সামগ্রিক পরিপূর্ণতার উপলব্ধি ক্রমবিকশিত হয়ে উঠেছে। অতঃপর অধ্যাত্মচেতনা ও দেশাত্মবোধের সমন্বয়ে হিন্দু আদর্শকে গ্রহণ করার দৃষ্টিভঙ্গি (বঙ্গদর্শন-পর্বে) পরবর্তী দশকে নতুনতর পরিণতি লাভ করেছে। আরও লক্ষ্য করা যায়, বঙ্গদর্শন-পর্বে ব্যক্তিগত ধর্ম-সাধনার চেয়ে সমাজগত ধর্ম-সাধনার প্রবণতা তাঁর বেশি ছিল। পরবর্তী পর্বে এসেছে রবীন্দ্রনাথের অতীন্দ্রিয় অধ্যাত্মচেতনা এবং ব্যক্তিগত ধর্মউপলব্ধির প্রেরণা। 'খেয়া', 'গীতাঞ্জলি' প্রভৃতি কাব্যে এবং 'শান্তিনিকেতন' প্রবন্ধমালায় তারই অপূর্ব অভিব্যক্তি। তবে একই কালে আনুষ্ঠানিক পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বাণীও উচ্চারিত হয়েছে এই পর্বেরই রচিত নাটক 'অচলায়তনে' (১৯১২ খ্রীঃ)। অর্থাৎ একদিকে ব্রহ্মাভিমুখে হৃদয়ের প্রসার, অন্যদিকে জীবনের কর্তব্যে নিষ্ঠা (অচলায়তনের ভাঙনের পর গেঁথে তোলার কাজ) দুইই রবীন্দ্রচিন্তায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

কাব্য-নাটকের মন্ময় উপলব্ধিতে আধ্যাত্মিকতার ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করা গেল, এবার প্রবন্ধের যুক্তিগ্রাহ্য মতামতগুলির মাধ্যমে উক্ত বিকাশ-ক্রমটি তুলে ধরা যেতে পারে। একেবারে প্রথম যুগে (অর্থাৎ 'সাধনা' পূর্ব পর্বে) রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মাচরণকে শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করেছিলেন 'রামমোহন রায়' (১২৯১) প্রবন্ধে। হিন্দু পৌত্তলিকতাকে পরিত্যাগ করার সুস্পষ্ট নির্দেশ তাতে ছিল। এর অনেকদিন পরে 'ঔপনিষদিক ব্রহ্ম' (১৩০৭ সাল) ব্যাখ্যানে তিনি প্রচলিত মূর্তিপূজা ও ভক্তি-সাধনার একাত্মতার ধারণাটি ভুল বলে প্রতিপন্ন করেছেন এই শ্লোকটির সাহায্যে—

"তদেতদ্ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োহন্যস্মাৎ।"

অর্থাৎ তিনি (ব্রহ্ম) সর্বপ্রিয়। এবং এই প্রসঙ্গেই "যদ্ যদ্ কর্ম প্রকুর্বীত

তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ"—নির্দেশ দিয়ে ভক্তি, জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয় ব্রাহ্ম-ধর্মের লক্ষ্যস্বরূপ ঘোষণা করা হয়েছে। উক্ত প্রবন্ধে যেন বঙ্কিম-প্রচারিত 'অনুশীলন ধর্ম'-এর সমান্তরাল (প্রতিযোগীও বলা চলে) মত প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কিন্তু 'ধর্ম' ও 'শান্তিনিকেতন'—শীর্ষক প্রবন্ধমালায় রবীন্দ্র অনুভূতি ধর্মের বৃহত্তর পরিধিতে ব্যাপ্ত। আর, এক্ষেত্রে যুক্তিতর্কের জটিলতা নেই, বরং সাহিত্যের মধ্যে ঔপনিষদিক মন্ত্রের উপলব্ধি আছে। জনৈক সমালোচকের কথায়, "এই রচনাগুলিকে মন্ত্রের ধ্যান বলা অসংগত হবে না—অধ্যাত্মরসপিপাসু কবি রবীন্দ্রনাথের উপাসনা বললেও অত্যুক্তি হবে না।" (ডঃ তারকনাথ ঘোষ, 'রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা', ১৩৬৯, পৃ-৯১)। আর রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমারের মতে, "উপনিষদ-কেন্দ্রিত ধর্মবিশ্বাসকে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ না করিয়া রবীন্দ্রনাথ ধর্মের সংজ্ঞাকে বৃহত্তর পটভূমিকায় ব্যাখ্যা করিলেন।"—দুটি মন্তব্যই যথার্থ। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যয়নিষ্ঠ দুটি উক্তি লক্ষ্য করা যেতে পারে—

১। যিনি আনন্দের প্রাচুর্যে, ঐশ্বর্যে, সৌন্দর্যে বিশ্বজগতের মধ্যে অমৃত রূপে প্রকাশমান—আনন্দরূপমমৃতম্ যদ্‌বিভাতি—উৎসবের দিনে তাঁহারই উপলব্ধি দ্বারা পূর্ণ হইয়া আমাদের মনুষ্যত্ব আপন ক্ষণিক অবস্থাগত সমস্ত দৈন্য দূর করিবে। —'উৎসব', ধর্ম, ১৩১২

২। ভারতবর্ষ এই সাধনার 'পরেই সকলের চেয়ে বেশি জোর দিয়েছিল—এই বিশ্ববোধ, সর্বানুভূতি। গায়ত্রীমন্ত্রে এই বোধকেই ভারতবর্ষ প্রত্যহ ধ্যানের দ্বারা চর্চা করেছে, এই বোধের উদ্‌বোধনের জন্য উপনিষদ···উপদেশ দিয়েছেন এবং বুদ্ধদেব এই বোধকেই সম্পূর্ণ করবার জন্য—বলেছেন···। —'বিশ্ববোধ', শান্তিনিকেতন

বাস্তবিকই উপনিষদ-কেন্দ্রিত ধর্মবিশ্বাস এই জাতীয় অজস্র রচনায় প্রতিফলিত। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেছেন, দুঃখ ও ত্যাগের মধ্য দিয়ে আমাদের সাধনার চরম লক্ষ্য হবে প্রেম বা প্রেমস্বরূপ।—এই প্রেম অমৃতপ্রয়াসী,—তাই তার কথা 'যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্'। ভূমা-প্রয়াসী আমাদের অন্তরের প্রার্থনা—'তমসো মা জ্যোতির্গময়', আমাদের মন্ত্র—'আবিরাবীর্ম এধি', 'রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখম্ তেন মাং পাহি নিত্যম্।' মোটকথা বিশ্বময় ঈশ্বরের প্রকাশ ও লীলারস উপলব্ধির দ্বারা প্রেমে, জ্ঞানে, কর্মে জাগ্রত হয়ে 'মৈত্রী'-তে বা বিশ্ববোধে পরিপূর্ণতা লাভ করার সাধনাই রবীন্দ্রনাথের। এইখানেই উপনিষদের (গীতারও) জ্ঞান-কর্ম-ভক্তির সামঞ্জস্যে এসে তিনি বললেন, "কর্মকে স্বার্থের দিক থেকে পরমার্থের দিকে নিয়ে যাওয়াই মুক্তি—কর্মত্যাগ মুক্তি নয়।"

বঙ্কিম চেয়েছিলেন ভক্তি, প্রীতি ও শান্তি এবং তা গীতোক্ত অনুশীলনের দ্বারা, রবীন্দ্রনাথেরও কাম্য— জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি ('প্রেম' শব্দটিই অধিক প্রযোজ্য) এবং তা' ব্রহ্মবিহার বা শীলসাধনার দ্বারা। রবীন্দ্র উপলব্ধিতে ঈশ্বরের সঙ্গে প্রেমে মিলনের সুরটি[১২] সবচেয়ে বড়ো, আর আছে তারই সঙ্গে বিশ্ববোধে মৈত্রী। বঙ্কিমের 'অনুশীলন' হিন্দুধর্মকেই (সনাতনধর্ম) ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেছে, রবীন্দ্রনাথের মিলন-সাধনা ও বিশ্ববোধ সর্ববিধ গণ্ডি এমন কি ব্রাহ্মমতের গণ্ডি ছাড়িয়ে 'মানুষের ধর্মে' প্রসারিত হয়েছে।[১৩] শুধু 'ধর্ম' ও 'শান্তিনিকেতন'-শীর্ষক প্রবন্ধমালাতেই নয়, পরবর্তী 'সঞ্চয়' ও 'পরিচয়'-শীর্ষক রচনাবলীতেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'মানুষের ধর্ম'-এর ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন। হয়ত তার পটভূমিতে হিন্দু সমাজের বিশ্বজনীন বিকাশরূপে ব্রাহ্মসমাজ[১৪] বিদ্যমান, কিন্তু পরবর্তীকালে ('বঙ্গদর্শন' উত্তরকালে) আর তা স্পষ্ট বলার প্রয়োজন ছিল না। 'ধর্মের নবযুগ'-প্রবন্ধে (১৩১৮) রবীন্দ্রনাথ সুস্পষ্ট ঘোষণা করলেন, "চিরন্তন সর্বমানবের ধর্ম চাই।" এই প্রসঙ্গেই তাঁর বক্তব্য ছিল, হিন্দু অনুষ্ঠানবিধি নয়—ব্রহ্মসাধনার পুরাতন ধারাতে জ্ঞান, আনন্দ, কর্ম ও ভক্তিই আমাদের সাধ্য। বলাবাহুল্য সাম্প্রদায়িক ভাবনা এ নয়—বরং সর্বজনীন চেতনা। তাই জয়ধ্বনি হল—

"জয় জয় জয় হে জয় বিশ্বেশ্বর মানবভাগ্যবিধাতা।" লক্ষ্য করা যায়, একই কালে রবীন্দ্রনাথ একদিকে 'মানবভাগ্যবিধাতা'-র অন্যদিকে 'ভারততীর্থ' রচনায় 'ভারতভাগ্যবিধাতার' জয়ধ্বনি উচ্চারণ করেছেন এবং ঠিক এই মনোভঙ্গির পরবর্তী প্রতিফলন হয়েছে 'মানুষের ধর্মে'। 'সঞ্চয়' ও 'পরিচয়' গ্রন্থের দু'একটি বক্তব্যে তার সুস্পষ্ট পূর্ব-সংকেত লক্ষ্য করা যায়। দেশের লোকাচার ও সংকীর্ণ ধর্মবুদ্ধির আনুষ্ঠানিকতাকে উত্তীর্ণ হয়ে অগ্রসর হবার আহ্বান এই পর্বে আবার শোনা গেল,—"মানুষের দুর্বলতার মাপে ধর্মকে সুবিধামতো খাটো করিয়া ফেলা যাইতে পারে এই অদ্ভুত বিশ্বাস" হাস্যকর। ('ধর্মের অধিকার') তাই সার্বভৌমিক ধর্মবোধ প্রয়োজন। ('অগ্রসর হওয়ার আহ্বান' প্রবন্ধের বক্তব্যও স্মরণীয়।) এদিকে মানুষের ইতিহাসে ইতিহাস-বিধাতার আহ্বান শুনেছেন রবীন্দ্রনাথ, ('মা মা হিংসীঃ') তাই তিনি রাষ্ট্রচিন্তা ও জাতীয়তাবোধকে এক সার্বজাতিক মৈত্রী ও সর্বজনীন ধর্মের পথে প্রসারিত করে বলেছেন,—"আজ জগৎ জুড়ে যে ক্রন্দন বেজেছে তার মধ্যে সুর নেই, তার ভিতর দিয়ে ইতিহাস তৈরি হচ্ছে—তারই মধ্যে ইতিহাসবিধাতার আনন্দ।... সেই 'শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্' এর মধ্যে মৃত্যু মরেছে" ('আরো')। এই 'আরো আরো আরো দাও প্রাণের' কামনাই রবীন্দ্রনাথের 'মানুষের ধর্মের' অনুপ্রেরণা,

'Religion of Man'—তাতেই অভিব্যক্ত।

'মানুষের ধর্মের' প্রাথমিক রূপরেখা ছিল 'Rleigion of Man'-শীর্ষক বক্তৃতামালায়,—যাতে সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ বিশ্বজনীন ধর্মভাবনা ছিল। যদিও তাঁর নিজস্ব ঔপনিষদিক উপলব্ধির ('বাউল' Cult এর মিশ্রণও এতে ছিল) পটভূমিতে উক্ত আদর্শ বিশ্লেষিত, কিন্তু সর্বজনীন মানবমুক্তিই সেখানে সাধ্য বলে ঘোষিত। এই মানবমুক্তি অর্থে ব্যক্তির মধ্যে মহামানবের প্রাণ-শক্তির এবং বিশ্বদেবতার অনুভূতির পূর্ণবিকাশ বুঝিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। "My religion is in the reconciliation of the Super-Personal Man, the universal humanspirit in my own individual being."

(Appendix—'Religion of Man')

অবশ্য একথা ঠিক, রবীন্দ্রনাথের মনে যা 'flashed with a direct vision'—তাকে সুস্পষ্ট দর্শনের কোঠায় ধরা চলে না, রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাকে 'কবিচিত্তের একটা অভিজ্ঞতা' বলে ব্যাখ্যা করেছেন। তথাপি অনুভূতির সঙ্গে গভীর মনন মিলিয়ে তদ্দ্বারা নিজস্ব আধ্যাত্মিক প্রত্যয় ও বেদ-উপনিষদোক্ত বাণীগুলিকে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আলোকে বিশ্লেষণ করে যে আশ্চর্য সত্য-উপলব্ধির কথা তিনি 'মানুষের ধর্মে' বলেছেন, তাতে মানুষেরই আধ্যাত্মিক শক্তি ও স্বরূপেরই গুরুত্ব দান করা হয়েছে। এতে মানুষের অপরাজেয় সত্তার যে জীবনবেদ সংকলিত তা সর্বজনীন। এর ভূমিকাতে আছে তার ইঙ্গিত, "যা আমাদের ত্যাগের দিকে তপস্যার দিকে নিয়ে যায় তাকেই বলি মনুষ্যত্ব, মানুষের ধর্ম।...তিনি সর্বজনীন সর্বকালীন মানব আছেন। সেই মানুষের উপলব্ধিতেই মানুষ আপন জীবনসীমা অতিক্রম করে মানবসীমায় উত্তীর্ণ হয়।...সেই মানব, সেই দেবতা, য একঃ, যিনি এক, তাঁর কথাই আমার এই বক্তৃতাগুলিতে বলেছি।"

সর্বজনীন ও সর্বকালীন মানুষের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানের বিবর্তন-বাদের আলোতে মানব-মনন ও চেতনা-শক্তির ক্রমবিকাশ পর্যালোচনা করলেন, মানুষের জীবভাব ও বিশ্বভাব এই দ্বৈতসত্তার বিশ্লেষণ করলেন। অতঃপর উপনিষদের নানা মন্ত্র-ব্যাখ্যার সহায়তায় তিনি তাঁর বক্তব্যে বললেন—

> মানুষের দায় মহামানবের দায়, কোথাও তার সীমা নেই। জন্তুদের বাস ভূমণ্ডলে কিন্তু মানুষের বাস দেশে। দেশ কেবল ভৌমিক নয় দেশ মানসিক। মানুষে মানুষে মিলিয়ে এই দেশ জ্ঞানে জ্ঞানে, কর্মে কর্মে।... যে তপস্বীরা অন্তহীন ভবিষ্যতে বাস করতেন,...মানুষের সভ্যতা তাঁদেরই

রচনা।…তাঁরাই প্রমাণ করেন সব মানুষকে নিয়ে সব মানুষকে অতিক্রম করে, সীমাবদ্ধ কালকে পার হয়ে এক মানুষ বিরাজিত। সেই মানুষকেই প্রকাশ করতে হবে,…শ্রেষ্ঠ স্থান দিতে হবে বলেই মানুষের বাস দেশে।

কিন্তু মানুষের মহান আত্মস্বরূপ উপলব্ধির পূর্ণতা এখনও আসেনি।" পূর্ণপুরুষ আগন্তুক। তাঁর রথ ধাবমান, কিন্তু তিনি এখনও এসে পৌছননি।" ঐ মহামানবের প্রতিষ্ঠার জন্যেই ভূমাকাঙ্ক্ষী মানুষ—"আপন চৈতন্যকে প্রসারিত করেছে আপন অসীমের দিকে জ্ঞানে, প্রেমে, কর্মে, বৃহত্তর ঐক্যকে আয়ত্ত করতে চলেছে… ।"

এই হল 'মানুষের ধর্মে'র মূল জীবন-দর্শন, যা রবীন্দ্রনাথের বোধি ও বোধের উৎস ধ্যানক্ষেত্র হতে প্রবাহিত,—জীবনদেবতা ও বিশ্বদেবতা যাতে বিশ্বাত্মায় মিলিত। এই জন্যই তিনি 'সোঽহং'-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা, সেই ব্যাখ্যা কিন্তু আধ্যাত্মিক তুরীয়তা নয়, সর্বাত্মক সাধন-সংগ্রাম। এই সাধন সংগ্রামে ব্যক্তি স্বাধীনতার সঙ্গে রাষ্ট্রীয় মুক্তিও অনাবশ্যক নয়। অথর্ববেদের বাণী বিশ্লেষণ করে তিনি তাই বললেন, "জনসংঘের শ্রেষ্ঠরূপ প্রকাশ করবার জন্য তার রাষ্ট্র।…আপনার মধ্যে যে ভূমাকে প্রমাণ করবার দায়িত্ব মানুষের, সমস্ত জাতি বৃহৎ জীবনযাত্রায় তার থেকে বঞ্চিত হলে ইতিহাস ধিক্কৃত হয়।" অতএব এশিয়া আফ্রিকার পরাধীনতার শৃঙ্খলে টান পড়েছে। দেখা যাচ্ছে, 'সোঽহং'-তত্ত্বের নৈষ্কর্ম্য ও অস্বীকৃতি নয়—বিদ্যা ও অবিদ্যা দুইই লাভ করে অমৃতের পথ সন্ধানই রবীন্দ্রনির্দেশিত সাধনা। (কারণ, "মানুষকে বিলুপ্ত করে যদি মানুষের মুক্তি তবে মানুষ হলুম কেন ?")

স্পষ্টতঃ রবীন্দ্রনাথের এই মানব-ধর্মবোধ অখণ্ডতাবোধ বা বিশ্ববোধের অঙ্গীভূত। নিছক আন্তর্জাতিকতা এ নয়,—এই বিশ্ববোধ তাঁর অন্তরসত্তার সৃজন-ক্রিয়ার ফলশ্রুতি। এই অখণ্ডতাবোধজাত 'মানুষের ধর্মে' কর্মের স্থান স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যাত না হলেও এর পরিপূরক চিন্তারূপে 'creative unity'-শীর্ষক প্রবন্ধে তার সম্পর্কে বলা হয়েছে। আসলে তাত্ত্বিকতা, যুক্তিহীন অনুষ্ঠান-আদি পরিত্যাগ করে সংস্কারমুক্ত ধর্মচিন্তাকে আধুনিক মানুষের উপযোগী করেই বিশ্লেষণ করলেন রবীন্দ্রনাথ, আর তাই তাঁর 'মানুষের ধর্ম'। মোটকথা, "রবীন্দ্রনাথ সেই ধর্মকেই চেয়েছিলেন যাতে জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম মিলিত হয়েছে, যাতে উপনিষদের সত্যসাধনা, বৌদ্ধধর্মের মৈত্রীকরুণা এবং বৈষ্ণব ও খ্রীষ্টধর্মের প্রেমভক্তি একত্র সমন্বিত হয়েছে, অথচ যা সর্বতোভাবেই আধুনিক শিক্ষিত মনের উপযোগী। সে মন একান্তভাবেই সাম্প্রদায়িক ভেদ-বিভেদ, আচারপদ্ধতি

ও আনুষ্ঠানিকতার বিরোধী।"[১৫] সুধী সমালোচকের উক্ত পর্যালোচনা যথার্থ। আমরাও লক্ষ্য করেছি, বিশ্ববোধ ও শ্রেয়লাভের সাধনায় রবীন্দ্রনাথ যেন বুদ্ধদেবের কথাই ঘোষণা করেছিলেন, "সমস্ত মানবসংসারে যতক্ষণ দুঃখ আছে অভাব আছে…ততক্ষণ কোনো একটিমাত্র মানুষ নিষ্কৃতি পেতে পারে না।" বস্তুত এক মহামানবের সমুদ্রে মিলিত হওয়ায় ধর্মই 'মানুষের ধর্ম', অপরাজেয় মানুষের মাহাত্ম্য তাতে স্বীকৃত। এই ধর্মই (বর্তমানে) বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানযুগেও বলিষ্ঠ জীবনদর্শনরূপে স্বীকৃত হতে পারে।

এবার বঙ্কিম প্রচারিত 'ধর্ম্মতত্ত্ব' বা অনুশীলন ধর্মের সঙ্গে রবীন্দ্র-আদর্শ 'মানুষের ধর্মে'র সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যগুলি একযোগে অনুধাবন করা যেতে পারে।

(ক) ধর্ম-সাধনার লক্ষ্যে দু'জনের চিন্তায় অনেকটা সাদৃশ্য আছে, বঙ্কিমের লক্ষ্য হচ্ছে অনুশীলনজাত চিত্তশুদ্ধি এবং ব্যষ্টির সঙ্গে সমষ্টির হিতসাধন, আর দেশ ও সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সামঞ্জস্যসাধন। এদিকে রবীন্দ্রনাথের 'মানুষের ধর্মে'-র লক্ষ্য জীবনসীমাকে অতিক্রম করে মানবসীমায় উত্তীর্ণ হওয়া, আপন চৈতন্যকে প্রসারিত করে জ্ঞানে, প্রেমে ও কর্মে বৃহত্তর ঐক্যকে উপলব্ধি করা।

(খ) দেশপ্রীতি হতে জগৎপ্রীতিতে উত্তীর্ণ হবার নির্দেশ আছে 'ধর্ম্মতত্ত্বে'; আর 'মানুষের ধর্মে' প্রদত্ত 'সোঽহং'-তত্ত্বের নবতরভাষ্যে সম্মিলিত অভিব্যক্তির কথা সংযোজিত—যার উদ্দেশ্য সব মানুষকে মিলিয়ে সীমাবদ্ধকালকে পার হয়ে এক মানুষে যিনি বিরাজিত তাঁকেই উপলব্ধি করা।

(গ) পূর্বসূরী ও উত্তরসূরী উভয়েই এক বিশেষ সামঞ্জস্যের প্রবক্তা। 'ধর্ম্মতত্ত্বে'—'ভক্তি, প্রীতি ও শান্তি'-র উদ্দেশ্যে চাতুর্বিধ বৃত্তির অনুশীলনের দ্বারা গীতোক্ত জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সামঞ্জস্যের সাধনার নির্দেশ আছে।

রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধের মূলকথা—চিন্তায় কর্মে ও হৃদয়বোধে জীবনের সর্ব-বিভাগের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা। "এই সামঞ্জস্য রক্ষাই রবীন্দ্রনাথের ধর্মের প্রধান কথা। জ্ঞান, প্রেম ও কর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য।"[১৬]

(ঘ) ব্যক্তিতান্ত্রিক অধ্যাত্মসাধনার আতিশয্য দু'জনের কেউই যুগোপযোগী বলে স্বীকার করেন নি। বহিরঙ্গ আচার-বিচার পরিত্যাগের পক্ষপাতী ছিলেন বঙ্কিম, "সন্ন্যাসবাদ তাঁর মতে গ্রহণযোগ্য নয়, ভোগলিপ্ত স্বার্থপর জীবনকে তিনি ধিক্কার দিয়েছেন।"[১৭] অর্থাৎ ত্যাগ ও ভোগের সামঞ্জস্য যা ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের মর্মবাণী—তাই বঙ্কিমের কাম্য।

রবীন্দ্রনাথও সারাজীবন ধরেই কাব্যে-গানে-নাটকে একই তত্ত্বকে বারবার রূপায়িত করেছেন। 'মানুষের ধর্মে' এসেও তিনি ধিক্কার দিয়েছেন 'সোঽহং

তত্ত্ব'-আওড়ানো পলায়নী মনোবৃত্তিকে এবং নৈষ্কর্ম্যের আধ্যাত্মিক তামসিকতাকে। বৈসাদৃশ্য এই—

(ক) বঙ্কিমচন্দ্র গীতোক্ত অনুশীলন ধর্মের সঙ্গে বেন্থাম মিল কোঁতের মানব-হিতবাদের সমন্বয় করে হিন্দুধর্মের অমর সারভাগকে প্রচার করলেন এবং হিন্দু ধর্মকেই শ্রেষ্ঠধর্ম বলে ঘোষণা করলেন।

আর রবীন্দ্রনাথ প্রত্যেক ধর্মমতের (বা আদর্শের) সাম্প্রদায়িক দিকটি উপেক্ষা করে সর্বজনীন সুরগুলির সামঞ্জস্যে বিশ্বমানবের উপযোগী একটি সর্বজনীন ধর্মের আদর্শ ঐকতান-সঙ্গীত সৃষ্টি করলেন।

(খ) বঙ্কিমের 'ধর্মতত্ত্বে' জগৎপ্রীতির দিগন্ত দেখা গেলেও ভারতের জাতীয় ধর্ম ও জাতীয়তা সৃষ্টির মহৎ উদ্দেশ্যই সেখানে প্রধান হয়ে উঠেছে। অন্ততঃ একথা ঠিক, পরবর্তীকালের জাতীয় আন্দোলনে এই গীতোক্ত অনুশীলন ধর্মের প্রভাব স্পষ্ট অনুভব করা গেছে।

আর রবীন্দ্রনাথের 'মানুষের ধর্মে' জাতীয় স্বাধীনতা ও জাতীয় রাষ্ট্র কোন বিশেষ জনসংঘের শ্রেষ্ঠরূপ প্রকাশের অনুকূল সত্তারূপে স্বীকৃত হলেও এর প্রধান ইঙ্গিত বিশ্ববোধ ও বিশ্বসত্তার দিকেই। এদিক থেকে আন্তর্জাতিক মৈত্রী-চেতনার বা 'Universal human spirit'-এর দিকেই তার নির্দেশ, বর্তমান-কালে এর প্রভাব যথোচিত উপলব্ধ না হলেও অদূর ভবিষ্যতে সম্ভাব্য বিশ্বরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠায় এই উপলব্ধি ও চেতনা অবশ্যই স্বীকৃতি পাবে।

(গ) বঙ্কিমচন্দ্র অনুশীলন ধর্মের সর্বাঙ্গীন সামঞ্জস্যের শ্রেষ্ঠতম প্রকাশরূপে শ্রীকৃষ্ণকে প্রতিষ্ঠা করেছেন, আর রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেব, যীশুখ্রীষ্টপ্রভৃতিকে মহামানব বলে শ্রদ্ধা জানিয়েও 'মানুষের ধর্মে' বলেছেন,—'পূর্ণ মানুষ আগন্তুক'। তিনি ভবিষ্যতে আসছেন।

(ঘ) বঙ্কিম বৈদিকসাহিত্য ও উপনিষদ-কে তাঁর ভক্তি-প্রত্যয়ের পটভূমি বলে শ্রদ্ধা করেছেন, আর রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের আনন্দলোকের প্রাণবায়ু গ্রহণ করে নিজস্ব জীবনদর্শন-কে পুষ্পিত করে তুলেছেন। তিনি যে বঙ্কিমচন্দ্রের মতো পরবর্তী পৌরাণিকপর্বকে স্বীকার করেন নি,—তা কেবলমাত্র ব্রাহ্মধর্মের প্রতিকূল বলে নয়, সর্বজনীন ধর্মের প্রতিকূল বলেই তাঁর ঐ অস্বীকৃতি।

(ঙ) আরও একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য এই, বঙ্কিমের 'ধর্মতত্ত্ব' ভারতীয় হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম মিলনের সম্পর্কে নীরবতা পালন করেছে, এ বিষয়ে প্রতিকূলতা না থাকলেও সুস্পষ্ট আনুকূল্যেরও কোনো দৃষ্টান্ত নেই।

অপরপক্ষে, রবীন্দ্রনাথের 'মানুষের ধর্ম' একটি সার্বজনীন রূপ নিয়েছে বলে

তা ভারতীয় ধর্ম-সমন্বয়ের বিশেষত 'হিন্দু-মুসলিম' যৌথধর্ম সৃষ্টির সম্পূর্ণ অনুকূল।

সামগ্রিক স্বদেশচিন্তার ক্রমবিকাশে দু'জনের ধর্মচিন্তাই স্ব স্ব ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণাস্বরূপ একথা আমরা পূর্ববর্তী দুটি ক্ষেত্রেই (রাজনৈতিক চিন্তা ও সমাজচিন্তা) ইঙ্গিত করেছি। তাঁদের স্ব স্ব ধর্মচিন্তার তথা সামগ্রিক স্বদেশ-চিন্তার শিল্পিতরূপ প্রকাশ পেয়েছে দু'জনের সৃজনধর্মী রচনায়। বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ' আর রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাস স্ব স্ব ক্ষেত্রে এই জাতীয় রচনা-ধারার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি। ধর্মচিন্তাই এগুলিতে সামগ্রিক স্বদেশচিন্তার ভিত্তিভূমি রচনা করেছে, আমাদের পরবর্তী প্রসঙ্গের আলোচনায় একথা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

চতুর্থ অধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তার তুলনা : অন্যান্য শিল্পিত প্রকাশে

বঙ্কিমের সাহিত্যজীবনের প্রথম পর্বের প্রত্যয় ছিল এই, "The popular literature of a nation act and react on each other"—

এবং শেষ পর্বের প্রতীতি ছিল, "কাব্যই এ বিষয়ে প্রধান সহায়। তদ্দ্বারাই চিত্ত বিশুদ্ধ এবং অন্তঃপ্রকৃতির সৌন্দর্য্যে প্রেমিক হয়।" ('এ বিষয়ে'—অর্থাৎ চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তির অনুশীলনে)। উক্ত দুটি প্রত্যয়ই এক প্রতিষ্ঠাভূমিতে স্থাপিত, তা হল স্বজাতি, স্বদেশ ও স্বধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা। তাই বঙ্কিমের নির্দেশ ছিল, "যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন অথবা সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন।" বস্তুতঃ সাহিত্যরথী বঙ্কিমের শিল্পলোকে সৌন্দর্য ও মঙ্গলের হরগৌরী মিলন ঘটেছে। উক্ত শিল্পলোকের কয়েকটি অপূর্ব বস্তু আমাদের আলোচ্য স্বদেশচিন্তার শ্রেষ্ঠ প্রকাশরূপে উপলব্ধি করা যাবে।

এ বিষয়ে রবীন্দ্র-প্রত্যয়ও অনুরূপ, "চিত্তের মধ্যে যে মানুষ বন্দী বাহিরের কোন প্রক্রিয়ার দ্বারা সে কখনোই মুক্ত হইতে পারে না। আমাদের নব সাহিত্য সকল দিক হইতে আমাদের মনের নাগপাশবন্ধন মোচন করুক, জ্ঞানের ক্ষেত্রে, ভাবের ক্ষেত্রে, শক্তির স্বাতন্ত্র্যকে সাহস দিক। তাহা হইলেই একদা কর্মের ক্ষেত্রেও সে সত্যের বলে স্বাধীন হইতে পারিবে।" (সাহিত্য সম্মিলন, ১৩৩৩)। অর্থাৎ সাহিত্যে জ্ঞানের ক্ষেত্রের মত ভাবের ক্ষেত্রেও মানুষের চিত্তের মুক্তি আসে। কবির ভাষায় অন্তরের উৎসকে উদ্‌বারিত করে জাতির মানবমরুতে প্রাণগঙ্গার ধারা বহিয়ে দিতে পারে সাহিত্যের রসোৎসারণ।[১] তাই স্বদেশ-চিন্তার শিল্পিত প্রকাশের মাধ্যমে যে জাতীয় জাগৃতির সূচনা ও বিকাশ—তা কেবল শিক্ষিত সমাজ-মানসেই নয়, বৃহত্তর সমাজ-মানসে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। রবীন্দ্রনাথ তা লক্ষ্য করেই বলেছিলেন, "বাঙালির অন্তরের মধ্যে বাংলাসাহিত্য অনেকদিন হইতে অগ্নিসঞ্চয় করিতেছে—তাহার চিত্তের ভিতরে চিন্তার সাহস আনিয়াছে।" (সাহিত্য সম্মিলন, ১৩৩৩)

রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ও সমাজক্ষেত্রে তাই সর্বপ্রথম বাঙালিই মুক্তির সংগ্রামে ব্রতী হয়েছে। নবযুগের বাঙালির উক্ত আন্দোলন যে সমগ্র ভারতে ক্রমে ছড়িয়ে পড়ছিল, তার পশ্চাতে বাংলা সাহিত্যের অবদান অসামান্য।

বাস্তবিকই একথা আজ নিঃসংশয়ে বলা চলে, বঙ্কিম-রবীন্দ্রের অপূর্ব শিল্প-সৃষ্টিগুলি ভারতের জাতি-জাগৃতির প্রয়াসে মহাকাব্যিক ভূমিকা গ্রহণ করে এসেছে, 'আনন্দমঠ' ও 'গোরার' মত শিল্পবস্তুর মূল্যায়ণ করলেই তা অনুধাবন করা যেতে পারে। যুক্তিগ্রাহ্য বিশ্লেষণ ও মননশীল রচনার চেয়ে ঐ জাতীয় শৈল্পিক প্রকাশ যে অনেক বেশি কার্যকরী একথা অনস্বীকার্য। কার্ল মার্ক্সের 'Das Capital'-এর তত্ত্বের চেয়ে গোর্কীর উপন্যাস 'Mother' যে অনেকগুণে বেশি অগ্নিসঞ্চয় করেছিল—সোভিয়েত বিপ্লবের ইতিহাসে তার সাক্ষ্য আছে। এই দৃষ্টান্তের সঙ্গে 'আনন্দমঠ' বা 'গোরা'-র কোন প্রকার তুলনা করা সমীচীন নয়, তবু একথা বলা চলে, ঐ জাতীয় শিল্পিত অভিব্যক্তি ভারতের জাতীয় জাগরণে অনেক বেশি উদ্দীপনার সঞ্চার করেছে। এইজন্যই স্বদেশচিন্তার শৈল্পিক প্রকাশ—যা প্রবন্ধ ব্যতীত অন্যান্য রচনায় অভিব্যক্ত—তার মূল্যায়ন ও তুলনা করাই আমাদের সর্বশেষ প্রসঙ্গ এবং বোধহয় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ।

ইতিপূর্বে অনুসৃত পরম্পরা অনুযায়ী প্রাসঙ্গিক শিল্পসৃষ্টিগুলিকেও তিনটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা সম্ভব, যথা—(১) রাজনীতি, সমাজ, ও ধর্মের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন-মূলক শৈল্পিক প্রকাশ যা ব্যঙ্গকটাক্ষের আশ্রয়ে ঘটেছে, (২) স্বদেশ ও স্বজাতির ঐতিহ্যের কলঙ্কক্ষালন, গৌরব-কথন ও আদর্শীকরণের প্রয়াসজাত ঐতিহাসিক উপন্যাস, নাটক ইত্যাদি এবং (৩) রাজনীতি, সমাজ, ও ধর্মের ক্ষেত্রে সংস্কার ও সংগঠনমূলক উপন্যাস, নাটক, কাব্য, সঙ্গীত ইত্যাদি। কিন্তু উক্ত বিন্যাসপদ্ধতি যথাযথ অনুসরণের প্রয়োজন আর নেই, কারণ প্রথম শ্রেণীর রচনা ইতিপূর্বেই তিনটি ক্ষেত্রে আলোচিত হয়েছে, কাব্য, নাটক ও ছোটগল্প আমাদের আলোচনার পরিধিবহির্ভূত। অতএব কেবলমাত্র উপন্যাস এবং এক বিশেষ শ্রেণীর সঙ্গীতই আমাদের আলোচ্য। উপন্যাসের ক্ষেত্রেও আবার প্রধানতঃ ঐতিহাসিক এবং রাজনৈতিক উপন্যাসই আমাদের প্রয়োজন; অবশ্য সমাজ-সমস্যা বিশ্লেষণ-মূলক কিছু সামাজিক উপন্যাসকেও এড়িয়ে যাওয়া চলবে না,—কিন্তু সেগুলি আমাদের মুখ্য আলোচ্য বিষয় নয়। অতএব মোটামুটি দুটি পর্যায়ে দুই সাহিত্যরথীর প্রাসঙ্গিক শিল্পসৃষ্টিগুলি সাজিয়ে নেওয়া যেতে পারে। প্রথম পর্যায়ে—

ক। ঐতিহাসিক বা ইতিহাস-চেতনাসমৃদ্ধ উপন্যাস এবং রাজনৈতিক অথবা

রাষ্ট্র ও সমাজচেতনা-মূলক উপন্যাস। এই পর্যায়ে বঙ্কিমের সৃষ্টিগুলি হল—

১।	মৃণালিনী	গ্রন্থাকারে প্রকাশকাল	১০, ১১, ১৮৬৯ খ্রীঃ
২।	চন্দ্রশেখর	„ „	১, ৬, ১৮৭৫ „
৩।	আনন্দমঠ	„ „	১৪, ১২, ১৮৮২ „
৪।	দেবী চৌধুরাণী	„ „	২০, ৫, ১৮৮৪ „
৫।	সীতারাম	„ „	৪, ৩, ১৮৮৭ „
৬।	রাজসিংহ	প্রথম প্রকাশ	৪, ২, ১৮৮২ „
			৪র্থ সং ১৮৯৩ „

'কমলাকান্তের দপ্তর'—এটিও একটি বিশেষ উপন্যাসরূপে আলোচিত হতে পারে।

এক্ষেত্রে রবীন্দ্র-সৃষ্টিগুলির তালিকা এই—

১।	গোরা	প্রকাশকাল (১৩১৬ সাল)	১৯০৯-১০ খ্রীঃ
২।	ঘরে বাইরে	„ (১৩২৩ সাল)	১৯১৬ „
৩।	চার অধ্যায়	„ (১৩৪১ সাল)	১৯৩৪-৩৫ „

'বউ ঠাকুরাণীর হাট' (১৮৮৩-৮৪ খ্রীঃ)—যার নাট্যরূপ 'প্রায়শ্চিত্ত' ও 'পরিত্রাণ'—এই সূত্রে আলোচনা করা চলে।

(খ) সমাজ-সমস্যা-মূলক উপন্যাস—বঙ্কিমের 'বিষবৃক্ষ' (১. ৬. ১৮৭৩) ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (২৯. ৮. ১৮৭৮) এবং রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' (১৯০৩ খ্রীঃ), 'চতুরঙ্গ' (১৯১৬) ও 'যোগাযোগ' (১৯২৯-৩০)।

দ্বিতীয় পর্যায়ে—

(ক) জাতীয় জাগরণ-মূলক সঙ্গীত—এক্ষেত্রে বঙ্কিমের 'বন্দেমাতরম'—সঙ্গীত ও রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন-অধিনায়ক'—সঙ্গীত মুখ্যতঃ আলোচ্য।

এক.

স্বদেশচিন্তার প্রধান উপাদানরূপে ইতিহাসচেতনা সম্পর্কে ইতিপূর্বে তিনটি ক্ষেত্রেই আলোচনা করেছি। এখানে দেখা যাবে স্বদেশচিন্তামূলক উপন্যাসগুলির মূল উদ্দীপক ইতিহাস-চেতনা। আর কলঙ্কক্ষালন, গৌরবকথন এবং আদর্শীকরণ—এই তিনটি প্রক্রিয়া এক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যাবে। বঙ্কিমের ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসগুলিতে উক্ত প্রক্রিয়াগুলি এককভাবে, যুগ্মভাবে বা একত্রে

চলেছে। এদিকে রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'—উপন্যাসে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের বিশাল পটভূমিটি বিদ্যমান, একে ইতিহাস-ভাবনা-মূলক উপন্যাস আখ্যা দেওয়া চলে কিনা সে কূটতর্কে প্রবেশ না করেও এটিকে অন্ততঃ আদর্শান্বিত ইতিহাস-চেতনার ফলশ্রুতি-রূপে বিচার করা চলে।

বাঙালির ইতিহাসের গুরুতর কলঙ্করূপে 'সপ্তদশ অশ্বারোহী-কর্তৃক' বঙ্গ বিজয়ের কাহিনীটি বঙ্কিমমানসে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছিল, একথা উদ্ধৃতিসহ ইতিপূর্বেই আলোচনা করে এসেছি। এই কলঙ্কচেতনার প্রথম আক্ষেপ শোনা গিয়েছিল বঙ্কিমের ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস 'মৃণালিনী'-তে। মিনহাজ্‌উদ্দীন প্রচারিত মিথ্যা কলঙ্কক্ষালনের উদ্দেশ্যে তৎকালীন রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র, লোভ ও শাঠ্য এবং লক্ষ্মণসেনের ক্লীবত্বের পরিপ্রেক্ষিতে যে ঐতিহাসিক পটভূমি বঙ্কিমচন্দ্র অঙ্কন করলেন, তাতে বঙ্গ-বিজয়ের প্রবাদকে অমূলক বলে অনায়াসেই বিশ্বাস হয়। এই প্রসঙ্গে পলাশীর যুদ্ধপ্রহসনের প্রতি একটুখানি ইঙ্গিত খুব তাৎপর্য-পূর্ণ।[২] উক্ত কলঙ্কক্ষালন-প্রয়াসের পরই জাতীয় গৌরবরবির পুনরভ্যুদয়ের আশা অভিব্যক্ত হয়েছে।

আমরা জানি শিল্পী বঙ্কিমের প্রথমপর্বের রচনার মটো ছিল,—"সৌন্দর্য্যসৃষ্টিই কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য"। 'দুর্গেশনন্দিনী' ও 'কপালকুণ্ডলা'—উপন্যাসে বিশুদ্ধ রোমান্সসৃষ্টির পর 'মৃণালিনী'-তে গল্পের স্রোত সহসা একটি স্বতন্ত্র খাতে এসে পড়েছে। সৌন্দর্য সৃষ্টির সঙ্গে ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসা পেয়ে বসেছিল বলেই গল্পের স্রোতে ভেসে লেখক একসময় নবদ্বীপের শ্মশানভূমিতে এসে পৌঁছেছেন, এবং তাঁর লেখনী ক্ষণকালের জন্য দেশপ্রেমের আবেগে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে। সমালোচকের কথায়, "মাধবাচার্য ও হেমচন্দ্রের দেশোদ্ধার আকাঙ্ক্ষাও একটি নূতন প্রেরণারূপে দেখা দিয়েছে—যে প্রেরণা পুষ্টতর দেহে ও বর্ধিততর বেগে 'ত্রয়ী'-হয়ে 'রাজসিংহে' গিয়ে স্পৃহনীয় পরিসমাপ্তি লাভ করেছে। …পিছনে রয়েছে 'বঙ্গদর্শন' ও 'প্রচার'—প্রভৃতিতে প্রকাশিত ঐতিহাসিক প্রবন্ধের ছায়া।"[৩] বাস্তবিকই উক্ত নতুন প্রেরণার পশ্চাতে কারণ হল বঙ্কিম-মানসে সঞ্চিত কয়েকটি বিশেষ ঘটনার স্মৃতি এবং তৎকালীন বিশেষ ভাবধারার প্রভাব। এছাড়া তৎকালে শিক্ষিত বাঙালির মনে দেশাত্মবোধের অনতিস্ফুট বেদনাবোধ (বিদেশী শাসনের গ্লানিজনিত) জেগে উঠেছিল, চিত্তদাহ জুড়াবার ঠাঁই ছিল অতীতের ইতিহাসে, রাজপুত মারাঠাজাতির বীরগাথায়, বিশেষতঃ 'টডে'-র 'রাজস্থানে'। অথচ 'ইংরেজ ভারতের শত্রু'—একথা স্পষ্ট করে বলবার সময়ও তখন আসে নি, "তাই মোগল সম্রাট ও পাঠান সর্দারদের গায়ে দেশশত্রুর সাজ

চড়ানো হয়েছিল। এ রীতি অনেককাল ধরেই চলে এসেছে। ···গোড়ার দিক থেকেই তাই স্বদেশ-ভাবনা বলতে বিশেষ করে হিন্দুসমাজের প্রথমে দোষ পরে গুণ-চিন্তাই ছিল।"[৪]

অর্থাৎ তৎকালীন 'ন্যাশনালিজম্'-এর প্রস্ফুট প্রকাশ" বঙ্কিমকে উদ্দীপ্ত করেছিল। ওদিকে ভূদেবের 'ঐতিহাসিক উপন্যাসে'-র (১৮৫৭) শিবাজীর কাহিনীতে সর্বপ্রথম উপন্যাসক্ষেত্রে জন্মভূমিকে জননীর সঙ্গে একাত্ম করে দেখা হয়েছিল।[৬] উক্ত কাহিনীতে বিশ্বাসঘাতক সেনাপতিকে দেবী ভবানী স্বয়ং স্বপ্নদর্শনে বলেছেন,—"তুই নিজে জন্মভূমির প্রতিও স্নেহবিবর্জিত হইয়া তাহা বিধর্মীশত্রুর হস্তগত করিলি, —জানিস না, গর্ভধারিণী মাতা, আর পয়স্বিনী গো এবং সর্ব্বদ্রব্যপ্রসবা জন্মভূমি তিনই সমান।" ভূদেবের প্রভাব বঙ্কিম-উপন্যাসে অকিঞ্চিৎকর হলেও, এই বিশ্বাসঘাতক সেনাপতির ছায়া 'মৃণালিনী'-র পশুপতি চরিত্রের উপর কিয়ৎপরিমাণে প্রক্ষিপ্ত বলে মনে হয়। আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি বক্তিয়ার খিলিজী কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের কাহিনীর অলীকতা পরবর্তীকালে বঙ্কিমের নানা প্রবন্ধে প্রমাণিত হয়েছে। 'মৃণালিনী'-তেই তার সূত্রপাত। এইকালে বঙ্কিমমানসে এই কলঙ্ক সম্পর্কে একটা কার্য-কারণগত বিশ্বাসমাত্র ছিল, —অতএব তিনি ইতিহাসের পটে ভাবকল্পনার তুলি বুলিয়ে বঙ্গজয়ের একটি সম্ভবপর ও সহনীয় চিত্র-ফলক অঙ্কন করেছেন। এই চিত্রে সপ্তদশ অশ্বারোহীর অভিযানের পশ্চাতে পঁচিশ হাজার পাঠান সৈন্য (মহাবনে লুক্কায়িত) এবং পশুপতির বিশ্বাসঘাতকতা মূল শক্তিরূপে দেখান হয়েছে। আর পশুপতির বিশ্বাসঘাতকতাও সম্ভব হতে পেরেছিল অসমর্থ গৌড়-রাজ এবং শাস্ত্রতাড়িত হীনবল দেশের জন্যই। বঙ্কিমচন্দ্র এই effeminate—জাতি ও শাস্ত্রতাড়িত দেশের কথা 'Bengali literature'—প্রবন্ধে আলোচনা করে তীব্র কশাঘাত করেছিলেন আমাদের স্থবিরত্বকে। তথাপি অতীতের কলঙ্কক্ষালনের প্রয়োজন বোধ এবং সমসাময়িক সমাজ-মানুষের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ও অস্বীকৃত বর্তমানের পটভূমিটি অতীত-মহিমায় উজ্জ্বল করার প্রেরণাও বঙ্কিমমানসে বিদ্যমান ছিল। "সেজন্য তাঁহার ঐতিহাসিক নায়ক-নায়িকা ও অন্যান্য পাত্র-পাত্রী খাঁটি ঐতিহাসিক মানুষ নয়, তাহারা উনবিংশ শতাব্দীর নূতন মানুষের ভাবসমৃদ্ধ ও অতিরঞ্জিত প্রতিরূপ মাত্র।"[৭] বাস্তবিকই ১৯শ শতকের ঈপ্সার প্রতিফলন হয়েছে বঙ্কিমের ঐতিহাসিক রোমান্সের নানা চরিত্রে। কারণ কল্পনা-রসে ইতিহাস সৃষ্টি করে জাতীয় কলঙ্কক্ষালন করার ব্রত নিয়েছিলেন লেখক। কিন্তু বাস্তবচেতনার অভিঘাতে তাঁর হিন্দু-রাজ্য প্রতিষ্ঠার ঈপ্সা সার্থক হতে পারে নি,

পশুপতির ধাতুমূর্তির বিসর্জনের সঙ্গে বঙ্কিমকল্পনার মাতৃমূর্তিও বিসর্জিত হয়েছে। একদিকে বঙ্কিমের আশাবাদ, অন্যদিকে বাস্তব ইতিহাসের সাক্ষ্য এ দুই-এর দ্বন্দ্বে তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসের নায়কের মুখে যেন একই উক্তি ফিরে ফিরে ধ্বনিত হয়েছে, "হায় মা, তোমার উদ্ধার করিতে পারিলাম না।" এ যেন শিল্পী বঙ্কিমের কান্না, নিষ্ঠুর ইতিহাসের ঘূর্ণাবর্ত হতে মাতৃমূর্তিকে উদ্ধার করতে না পেরে যেন তিনি বলেছেন,—"একা রোদন করিতেছি, কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষু গেল মা।" ('আমার দুর্গোৎসব')।

বঙ্কিম-সৃষ্ট প্রথম স্বদেশব্রতী নায়ক হেমচন্দ্র নবদ্বীপ অধিকারের বিরুদ্ধে কোন প্রতিরোধ আন্দোলন করেন নি। এ সম্পর্কে ইতিহাসের নিষেধ মেনেছেন বঙ্কিম, কারণ তিনি হিন্দু প্রজার স্বভাব জানতেন, হিন্দু সমাজের স্বাতন্ত্র্যের প্রতি অনীহার ভাবটি তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। অতএব ঐতিহাসিক সত্যের শৃঙ্খলে আবদ্ধ শিল্পী ইতিহাসকে আদর্শান্বিত করতে পারেন নি, তথাপি এই শৈল্পিক প্রয়াসে একটি বিশেষ লাভ হয়েছে, তা হল সে যুগের "স্বাধীনতার যে আকাঙ্ক্ষা ধীরে ধীরে উন্মোচিত হচ্ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনার আতসকাঁচে ঘনীভূত হয়ে তা দেখা দিয়েছিল একটি প্রজ্বলন্ত শিখারূপে—হেমচন্দ্র সেই মানসাগ্নির শিখা।"[৩৮]

সৌন্দর্য সৃষ্টির উপাদানের সঙ্গে স্বদেশচেতনার মিশ্রণ আর একটু বেশি পরিমাণে হয়েছে 'চন্দ্রশেখরে', কারণও ছিল। বঙ্গদর্শন পর্বের বঙ্কিমমানসের জীবনাচরণের সংকট ও চিন্তার সংকট 'চন্দ্রশেখর' এবং 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এ চরম অভিব্যক্তি লাভ[৯] করেছে। তৎকালীন সমাজ-জীবনের ব্যঞ্জনা অর্থাৎ রাজনৈতিক আবর্তে ব্যক্তি-জীবনের তলিয়ে যাওয়ার ব্যর্থতা—'চন্দ্রশেখরের' ঐতিহাসিক প্রতিভাসে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে। এখানে ঐতিহাসিক রোমান্সের স্বপ্নময় ক্ষেত্রে যতটুকু ইতিহাস আছে তার মূলকথাটা হল বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব মীরকাশেমের পরাজয়, মৃণালিনীর পশুপতি চরিত্রের অনুরূপ চরিত্র গুরগুণ খাঁ এখানে বিশ্বাসঘাতকের ভূমিকা গ্রহণ করেছে। লক্ষ্মণসেনের জন্য বঙ্কিমের শ্রদ্ধা ছিল না। কিন্তু এখানে মীরকাশেমের জন্য তাঁর শ্রদ্ধাটুকু লক্ষ্য করা যায়। আবার বাংলার 'শেষ রাজা' মীরকাশেমের প্রতি ব্যক্ত গভীর সহানুভূতির পাশাপাশি 'সাম্রাজ্য সংস্থাপনে সক্ষম' হেস্টিংসের প্রতি উচ্চারিত প্রশংসাটুকু আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না। সম্ভবতঃ বঙ্কিমের এই দ্বৈতসত্তার পরিচয় তৎকালীন শিক্ষিত বাঙালিমানসেরই পরিচয়। আসলে ইংরেজের সদ্গুণের প্রতি শ্রদ্ধা বঙ্কিমমানসে বরাবর ছিল, 'আনন্দমঠ' ও 'দেবী চৌধুরাণী'র ইতস্ততঃ ছড়ান মন্তব্যে তার দৃষ্টান্ত আছে। এই প্রসঙ্গের উপর

বঙ্কিমের ব্যক্তিগত জীবনের দুটি ঘটনা আলোকপাত করতে পারে, প্রথমটি ১৮৭৩ খ্রীঃ ক্যাম্বেলকে সমর্থন করে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে বঙ্কিমের মত-প্রকাশ,[১০] দ্বিতীয়টি ১৮৭৪ খ্রীঃ বঙ্কিমের দ্বারা কর্নেল ডাফিনের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা উত্থাপন।[১১] একই ব্যক্তিমানসের দুটি দিকের প্রতিক্রিয়ায় উক্ত দুটি ঘটনা ঘটেছিল। 'বড় ইংরেজ' ও 'ছোট ইংরেজ' সম্পর্কে ঐ জাতীয় দুটি মনোবৃত্তি—সে যুগের পরিবেশেই সৃষ্ট হচ্ছিল। তাই একদিকে মীরকাশেমের স্বাধীন রাজত্বের পতনে বঙ্কিম যেমন বিমর্ষ, অন্যদিকে ইংরেজ রাজত্বের প্রতিষ্ঠায় ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য তিনি আশান্বিত।

এই প্রকার মানস-দ্বন্দ্ব 'আনন্দমঠের' শেষ পরিচ্ছেদে আরও স্পষ্ট হয়েছে, তা আমরা লক্ষ্য করব। এদিকে বুদ্ধি, আদর্শ ও বাস্তবজীবনের সংকট হতে উত্তীর্ণ হবার প্রয়াসে বঙ্কিমচন্দ্র 'চন্দ্রশেখরের' শেষ পরিচ্ছেদে এসে কবি হয়ে উঠেছেন,—'রামানন্দ' ও 'প্রতাপের' ত্যাগধর্মের বর্ণনায় তা লক্ষ্য করা যায়। সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই জন্যই বলেছেন, "'চন্দ্রশেখর', 'আনন্দমঠের' বাস্তব সম্পর্কহীন আদর্শবাদের ও 'দেবী চৌধুরাণীর' তত্ত্বপ্রিয়তার অগ্রদূত।"[১২] শিল্প বিচারে উক্ত আদর্শবাদ ও তত্ত্বপ্রিয়তার যেভাবেই মূল্যায়ন করা যাক, আমাদের আলোচনায় দেখা যাবে স্বদেশচিন্তার বিকাশে আদর্শবাদী কবি বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ'-ই জাতীয় কুরুক্ষেত্রের 'গীতা'-রূপে অনুসৃত হয়েছে। এক্ষেত্রে শিল্পমূল্য বিচারের প্রয়োজন আমাদের নেই; আমাদের বিবেচ্য এই, উপন্যাসের ঐতিহাসিক রোমান্সে বাঙালি তথা ভারতীয় মানস-সত্তার প্রতিভাস কতখানি। কবি হেমচন্দ্র 'বীরবাহু' কাব্যের কাল্পনিক কাহিনীতে শত্রুজয়ের মহিমা ঘোষণা করেছিলেন, বঙ্কিম তাঁর ঐতিহাসিক রোমান্সে শত্রুজয়ের মহিমা ঘোষণার সুযোগ পেলেন। কিন্তু স্বদেশরক্ষার জন্য মৃত্যুবরণের মহান আদর্শ অঙ্কন করার সময় তাঁর কবিহৃদয়ের সব আবেগ-আগ্রহ আনন্দ-বেদনা ঢেলে দিয়েছিলেন, আনন্দমঠের চরিত্রগুলি বিচার করলে একথা স্পষ্ট হবে।

কিন্তু তৎপূর্বে রবীন্দ্রনাথের দু'খানি ঐতিহাসিক উপন্যাসে ('বউঠাকুরাণীর হাট', ও 'রাজর্ষি') ঐ জাতীয় প্রতিভাস আছে কিনা দেখা যাক। ঐ দুটি উপন্যাসের, "ঘটনাবিন্যাস ইতিহাসের কাঠামোর মধ্যে বিধৃত।···কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই ইতিহাস একটা অর্থহীন আশ্রয় মাত্র।"[১৩] অথচ দুটি উপন্যাসই বঙ্কিমচন্দ্রের চক্রবর্তী-ছায়ায় বসে লেখা। আসলে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি ও ইতিহাসচেতনা প্রথম হতেই ভিন্ন পথ নিয়েছে। যুবক রবীন্দ্রনাথ তৎকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতিভাস রচনা করার সুযোগ করে নেননি। বঙ্কিম

যে পথ দেখিয়েছিলেন, সে পথে অতীতের অস্পষ্ট ইতিহাসের মধ্যে গোষ্ঠী-স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও শৌর্য-বীর্যের উদ্বেল প্রকাশে আধুনিক আশার প্রক্ষেপ করাই স্বাভাবিক ছিল, ফর্ণাণ্ডিজ অথবা পাঠান দস্যুদের দ্বারা রামগড়রাজ বসন্তরায়ের হত্যা কিংবা 'রাজর্ষি'-তে মোঘল বাহিনীর আক্রমণকে উপলক্ষ করে স্বাধীনতার জন্য আত্মবলিদানের মহিমাকীর্তনের সুযোগ ছিল। কিন্তু রবীন্দ্র-ঐতিহাসিক-উপন্যাস "আধ্যাত্মিকরসে ভরপুর হইয়া তাহার কঠিন বস্তুতন্ত্রতা হারাইয়া ফেলিয়াছে।"[১৪] পরবর্তীকালে এই কবি-মানসে উদ্ভাসিত হয়েছে, "সনাতন বৃহৎ ভারতবর্ষ···ধূসর প্রান্তরের মধ্যে কৌপীনবস্ত্র পরিয়া তৃণাসনে একাকী মৌন বসিয়া আছে।" (দ্রঃ—'নববর্ষ')। এই ভারতবর্ষকে যিনি আদর্শায়িত করে শিল্প-সৃষ্টিতে সার্থক করে তুলবেন—তাঁর প্রথম জীবনের ঐতিহাসিক উপন্যাসেও তাই "রক্তবর্ণে রঞ্জিত পরিবর্তমান স্বপ্নদৃশ্যপট"-কে অস্বীকার করেছেন তিনি। তাই 'প্রতাপাদিত্য' অথবা 'উদয়াদিত্য' কিংবা 'গোবিন্দমাণিক্য'-কে 'ন্যাশনাল হিরো' করে তোলার প্রতি রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ ছিল না। তাঁর এই মানস-প্রবণতার সার্থকতম শিল্পসৃষ্টি 'গোরা'-র আলোচনা-কালে ঐ ব্যাপারটি আরও স্পষ্ট উপলব্ধি করা যাবে। কিন্তু 'গোরা' সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে বঙ্কিমের স্বদেশচিন্তার শ্রেষ্ঠতম শিল্পসৃষ্টি 'আনন্দমঠের' আলোচনা করা প্রয়োজন।

বঙ্কিমের আদর্শায়িত ইতিহাসচেতনার শিল্পরূপ হল 'আনন্দমঠ'; ইতিহাসের উপাদান দ্বারা দেশমাতৃকার আদর্শ-মূর্তি রচনাই তার লক্ষ্য। 'মৃণালিনী'-র কলঙ্কচেতনার পরবর্তী প্রতিক্রিয়াতেই বঙ্কিমমানসে আদর্শীকরণের মনোবৃত্তিটি সজাগ হয়ে উঠেছে। কলঙ্কক্ষালনের পর গৌরব প্রতিষ্ঠাই তাঁর কাম্য। এ ব্যাপারের প্রথম সূচনা 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর অন্তর্গত 'একটি গীত' ও 'আমার দুর্গোৎসব'—নিবন্ধ দুটি একত্রে পর্যালোচনা করলেই একথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে শিল্পী বঙ্কিমের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি 'কমলাকান্তের দপ্তর'-টি সামগ্রিক দৃষ্টিতে দেখার প্রয়োজন আছে।

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কমলাকান্তকে জীবনের বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিপূর্ণ রক্ত-মাংসের মানুষরূপে প্রিয়বন্ধুর আসন দিয়েছেন। অন্য এক সমালোচকের উক্তিতে—"কমলাকান্ত লোকবাৎসল্যের কবি। কখনও কখনও লোকবাৎসল্য দেশবাৎসল্যের রূপ ধরিয়া তাহার মন আলোড়িত করিয়াছে।" (ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত)। আর সমালোচক প্রমথনাথ বিশী বলেন যে নতুন যুগের ও নতুন জীবনের 'প্রফেট' বঙ্কিম কমলাকান্তের দপ্তরে দিয়েছেন জাগৃতির

বাণী। "আমার দুর্গোৎসব তো একাধারে বীজাকারে 'আনন্দমঠ' তথা 'বন্দেমাতরম্' সংগীত।" (বঙ্কিমসরণী, পৃ ১৬৩)। বাস্তবিকই কবি কমলাকান্তের ভাবসিদ্ধি 'আমার দুর্গোৎসবে'। এখানে হিন্দুর দেবীকে দেশমাতৃকার প্রতীক হিসাবে কল্পনা করেছে কমলাকান্ত। "এই মূর্তিতে দেবী শুধু হিন্দুর দেবী নহেন তিনি সকল বাঙ্গালীর মাতা, তিনি নববলধারিণী, নবদর্পেদর্পিনী, নবস্বপ্নদর্শিনী।" তাই কমলাকান্তের সংকল্প গ্রহণ, "এবার সুসন্তান হইব, সৎপথে চলিব।" এযেন জাতিজাগরণের পরবর্তী অধ্যায়ে উচ্চারিত 'নব স্বদেশের দীক্ষা' সংকল্পের পূর্ব-ভূমিকা। তবে সেখানে থাকবে ভারতজননীকে সম্বোধন করে প্রতিজ্ঞা, "তব আশ্রমে তোমার চরণে হে ভারত নব শিক্ষা।" আর এখানে আছে সুবর্ণময়ী বঙ্গ প্রতিমাকে উদ্ধার করার কামনা। এটুকুই যুগপরিবেশগত পার্থক্য।

আবার 'একটি গীতে' বৈষ্ণব কবির গান অসাধারণ বিস্তৃতিলাভ করেছে, যেন স্বদেশপ্রীতিই বিরহিনী নায়িকার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে একাত্ম হয়ে আবেগময়ী হয়ে উঠেছে। এই আবেগই কান্নাতে ভেঙে পড়েছে 'আমার দুর্গোৎসব'-এ। এখানে কমলাকান্ত শুধু একা রোদন করেন নি, সমগ্র বাঙালি-জাতিকে রোদন করিয়েছেন, শুধু একা সংকল্পবাক্য উচ্চারণ করেন নি, 'ছয় কোটি কণ্ঠে' ঐ নাম ধরে হুঙ্কার করেছেন এবং বলেছেন, "এস আমরা দ্বাদশ কোটি ভুজে ঐ প্রতিমা তুলিয়া, ছয়কোটি মাথায় বহিয়া ঘরে আনি।" স্পষ্টতঃ কমলাকান্তের ইতিহাসচেতনা জাতীয় কলঙ্কের জন্য অশ্রুপাত করার পরই ভাবী ইতিহাসের আদর্শীকরণ-প্রয়াসে কাব্যসৃষ্টি করেছে। 'দ্রষ্টা ও জাতিসংগঠক' বঙ্কিম এখানে জাতীয় মন্ত্রদর্শন করেছেন। আর দ্রষ্টার এই মন্ত্র, স্রষ্টার শিল্পপ্রতিমা 'আনন্দমঠের' মাতৃমূর্তির বোধনলগ্নে পুনরুচ্চারিত হয়েছে। সেখানেও 'সন্তানদল' মাতৃমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেছে। তবে তারা অতীত ইতিহাসের সজীবমূর্তিতে রূপায়িত সন্তান। সেইখানেই 'আনন্দমঠ' সৃষ্টির সার্থকতা। ভাববিভোর কমলাকান্ত আহ্বান করেছিলেন, "অসংখ্য বাহুর প্রক্ষেপে এই কাল-সমুদ্র তাড়িত মথিত ব্যস্ত করিয়া আমরা সন্তরণ করি—সেই স্বর্ণপ্রতিমা মাথায় করিয়া আনি।" ঐ একই জলদগম্ভীর কণ্ঠে আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে 'আনন্দমঠে' যেখানে 'সপ্তকোটিকণ্ঠের' কল কল নিনাদ উত্থিত হয়েছে। 'আনন্দমঠের' উপক্রমণিকায় যে প্রশ্ন ধ্বনিত—("আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না ?") সে প্রশ্ন যুগের কণ্ঠেই ছিল, তারই আদর্শায়িত সমাধান 'আনন্দমঠ'। এখানে বঙ্কিম যেন ইতিহাসের বিস্মৃত অন্ধকারে বসে স্বপ্ন দেখছেন এবং সে স্বপ্ন সার্থক হয়ে উঠেছে সৃষ্টিতে। তাই তৎকালীন জাতীয় মনস্কামনার প্রতিরূপ হয়ে

সন্তানেরা কখনও বা জয়ী হয়েছে, কখনও পরাজিত, অবশেষে নৈরাশ্যের অন্ধকারে তারা বুঝি বলে উঠেছে,—"হায় মা তোমার উদ্ধার করিতে পারিলাম না।"

বঙ্কিমের মনস্কামনার স্ফুরণ ও অভিব্যক্তিস্বরূপ 'আনন্দমঠ' তৎকালীন রাজনীতিতে এবং জাতিমানসে বিপুল আলোড়ন এনেছিল, কারণ "অস্বীকৃত বর্তমানকে···ইহা স্বপ্নময় ভবিষ্যতের রং দিয়া রাঙাইতে পারিয়াছিল।" (দ্রঃ বঙ্কিমমানস)। অন্য একজন সমালোচকের কথায়, "One of the grandest conceptions in this novel...is the idealisation of the country as the Mother. The song 'Bande Mataram'...is Bankim Chandra's call to nationalism through literature."[১৫] সত্যিই স্বদেশচিন্তার গীতা স্বরূপ এই 'আনন্দমঠ' বাংলার অগ্নিযুগের 'Le contrat Social', বা রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনের প্রথম 'manifesto'।[১৬] এই উপন্যাসের পটভূমিতে আছে বাঙালি হিন্দুসমাজের পুনরুজ্জীবন প্রয়াস, ভারতের বৃহত্তর ক্ষেত্রে বলবন্ত ফাদ্‌কের রাজদ্রোহের সংবাদ এবং ইলবার্ট বিল সংক্রান্ত আন্দোলন। সম্প্রতি ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত তাঁর 'বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জী'-শীর্ষক ইংরাজী গ্রন্থে (সাহিত্য আকাদেমি ১৯৭৭) বঙ্কিমচন্দ্র-সৃষ্ট মাতৃমূর্তির সঙ্গে ইতালীয় 'Delphic Society'-র আরাধ্য মাতৃমূর্তির সাদৃশ্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন—

> The only parallel...is to be found in the motto and creed of a secret society called the Delphic Priesthood, which strove for the independence and unification of Italy in early nineteenth century.

এবং এই প্রসঙ্গে ডঃ সেনগুপ্ত একটি সম্ভাবনার আভাস দিয়ে প্রশ্ন রেখেছেন—

> Did he by any chance come to know of the Delphic Society ?

হয়ত ঐ সবগুলি মনোভঙ্গিরই প্রক্ষেপ ঘটেছে 'আনন্দমঠে', বঙ্কিমের সৃষ্টিতে অতীত ও বর্তমানের আদর্শায়িত রূপান্তরে ভবিষ্যতের সংকেত উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

বঙ্কিম ইতিমধ্যে সমন্বয়ের আলোকে অতীত সৃষ্টি করে নৈতিকতত্ত্বের প্রচারে উদ্যোগী হয়েছিলেন, সংশোধিত আকারে হিন্দুধর্ম প্রচারের কামনাও যে তাঁর জেগে উঠেছিল—ধর্মচিন্তার অধ্যায়ে তা আমরা লক্ষ্য করেছি। এর সঙ্গে প্রচ্ছন্নরূপে ছিল হিন্দু রাজ্য স্থাপনের সংকল্প যা 'মৃণালিনী' ও 'কমলাকান্তের

দপ্তরে' প্রকাশ পেয়েছিল।[১৭]

অতঃপর ঐ আকাঙ্ক্ষার পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণ সুরু হয়েছে 'আনন্দমঠ' ও 'দেবী চৌধুরাণী'-তে। 'ধর্ম্মতত্ত্ব' রচনার পর 'সীতারাম' ও 'রাজসিংহ' পর্যন্ত ঐ অভীপ্সা শিল্পসৃষ্টির মধ্যে বিদ্যমান ছিল।

এবার তৎকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে 'আনন্দমঠের' ঐতিহাসিক মূল্য বিচার করা প্রয়োজন। আগেই বলেছি, সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলনের খসড়া হিসাবে এবং ভাবী জাতীয় আন্দোলনের ইশারা হিসাবে 'আনন্দমঠ' পরিকল্পনাটি বৃথা হয়নি। অগ্নিযুগের হোতা অরবিন্দ ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে বরোদাতে বসে যে 'ভবানীমন্দির' পুস্তিকাটি রচনা করে প্রচার করলেন, তার বৈপ্লবিক সংকেত সম্পূর্ণরূপে 'আনন্দমঠের' আদর্শে রচিত হয়েছিল। রাওলাট কমিটির রিপোর্টে তার সাক্ষ্য আছে—

"...the pamphlet Bhawani Mandir...set out the aims and objects of the revolutionaries...The Central idea as to a given religious order is taken from...Anandamath..."

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য আছে তৎকালীন বৃটিশ 'সেক্রেটারী অফ স্টেট ফর ইণ্ডিয়া' লর্ড রোনাল্ডসের উক্তিতে—

"The secret societies modelled themselves closely upon the society of the children of Anandamath."

('The heart of Aryavarta' p. 114)

এ সম্পর্কে অরবিন্দের মন্তব্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ—

"He bade us leave the canine methods of agitation for the leonine. The Mother of his vision held trenchant steel in her twice seventy million hands and not the bowl of the medicant...In 'Anandamath' this idea is the keynote of the whole book."

('Bankim-Tilak-Dayanand'—by Aurobindo p. 106
3rd Edu, 1955

ভাবীকালের ইশারা আর অবরুদ্ধ জাতিমানসের আবেগোৎসার ছিল বলেই মাত্র তিনটি দশকের মধ্যেই 'আনন্দমঠ' বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের প্রেরণা হয়ে উঠেছিল। সর্বভারতীয় রাজনৈতিক পটভূমিতে এর অবদান এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল যে ১৯০৮ খ্রীঃ-এর মধ্যে পাঁচটি ভারতীয়

ভাষায় এর অনুবাদ প্রচারিত হয়েছিল। 'বন্দেমাতরম্' জাতীয় সঙ্গীতরূপে গীত হয়েছিল প্রথম ১৮৯৬ খ্রীঃ কলকাতা কংগ্রেসে, গায়ক ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। যদিও বঙ্কিম তৎকালীন সমাজ-মানসের বিভ্রান্তিকে একটি স্থিতিশীল ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতেই প্রয়াস করেছিলেন ('ত্রয়ী' উপন্যাসে), কিন্তু বিপ্লবী দেশনায়কদের ভাষ্যে ও যুগের দাবীতে আনন্দমঠের নবরূপান্তর ঘটে গিয়েছিল। আমরা বলেছি, বঙ্কিমের আদর্শায়িত ইতিহাসচেতনাই 'আনন্দমঠের' প্রেরণা। বঙ্কিম নিজেই বলেছিলেন, "ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না, সুতরাং ঐতিহাসিকতার ভান করি নাই।" বাস্তবিকই এটি ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়, কেবল ইতিহাসের একটি কাঠামো অবলম্বনে সৃষ্ট জাতির ভাবী মহাকাব্য। অতএব সেই মহাকাব্যে পরবর্তী জাতীয়চিন্তার প্রক্ষেপ ঘটা স্বাভাবিক (অরবিন্দ প্রভৃতির দ্বারা যা ঘটেছিল)। আচার্য যদুনাথ সরকারের কথায় বঙ্কিম স্বয়ং কল্পনায় উক্ত প্রক্ষেপের সূচনা করেছিলেন—এরূপ "সত্যের চিত্রের উপর বঙ্কিম ইচ্ছা করিয়া এক অলোক আলোকের রং ফলাইয়াছেন।" এই অলোক আলোকের রং-ই বঙ্কিমের স্বদেশচিন্তার গাঢ় আবেগের রং ইতিহাসের বর্ণহীন ধূসর কঙ্কালে যা জীবনের রক্তিমছটা প্রক্ষেপ করেছে। এখানে, "ভবিষ্যৎকে সৃষ্টি করার আনন্দে এবং ইহার স্বপ্নময় আবেশে চঞ্চল বঙ্কিম-মানস অ-সত্য ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত। অ-সত্য বলিতেছি··· এইজন্য যে বঙ্কিম ঐতিহাসিক ঘটনা ও কাহিনীর প্রতি আক্ষরিক আনুগত্য প্রদর্শন করেন নাই।" (বঙ্কিম-মানস, পৃ ১০৭)। আমরা বলতে পারি, উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে বাঙালির তথা ভারতীয়ের আশা আকাঙ্ক্ষার এই প্রতিফলন সর্বাধিক সত্য, 'সেই সত্য, যা রচিবে তুমি'।

এবার লক্ষ্য করা প্রয়োজন উক্ত আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন 'আনন্দমঠে' কতখানি। 'আনন্দমঠে'-র ১ম সংস্করণে সম্মিলিত ইংরেজ ও ফৌজদারী সেনাদলের উপর সন্তানদলের বিজয় এবং স্বাধীনরাজ্য প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা ছিল সুস্পষ্ট। ২য় সংস্করণে ঐ সম্ভাবনাকে কিছুটা ম্লান করে তোলা হয়েছে (এজন্যে 'ইংরেজ'-শব্দের সংখ্যাধিক্য কমিয়ে 'যবন' ও 'নেড়ে' শব্দ দুটি ব্যবহার করা হয়েছিল)। এর কারণ, বঙ্কিম ক্রমেই উপলব্ধি করেছিলেন তৎকালীন চিন্তা-রাজ্যে যে অন্তর্নিহিত পরাভবচেতনা বিদ্যমান তাতে সীমায়িত বিক্ষোভই সম্ভবপর। তাই জাতীয় মনোভাব কখনও সক্রিয় বিদ্রোহরূপে আত্মপ্রকাশ করেনি এবং বাঙালির অসন্তোষ স্বাভাবিকভাবেই আদর্শবাদে রূপান্তরিত হয়েছে। একদিকে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে নিয়মতান্ত্রিক বক্তৃতাদান অন্যদিকে

বৃটিশ পৃষ্ঠপোষকতায় জাতীয় সমৃদ্ধির আশাপোষণ—এই পরস্পরবিরোধী কাজের মধ্যেই ছিল দ্বিধা। কাজেই জাতীয় একতা উপন্যাসের ক্ষেত্রেও সম্ভবপর হয়নি, আদর্শও তাই সক্রিয় বিপ্লবের পথে অগ্রসর হয়নি। অতএব বঙ্কিম মহাপুরুষের জবানীতে সমন্বয়ী সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করলেন,—"সমাজ বিপ্লব অনেক সময় আত্মপীড়নমাত্র। বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী, ইংরেজেরা বাঙ্গালাদেশকে অরাজকতা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন।" এখানেও সেই 'সাম্য'-প্রবন্ধের সিদ্ধান্ত—'সম্পূর্ণ সংশোধন কালসাপেক্ষ।' জাতীয়চেতনার উন্মেষ হয়েছে বলেই বিদেশীশক্তির কাছে পরাজয় স্বীকার করে আদর্শলোকে আত্মসম্মান লাভের প্রয়াস লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তাই এই উপন্যাসে ভারতীয় হিন্দু-ঐতিহ্য অনুশীলনের জন্যই যেন প্রস্তাব করা হয়েছে, "সুতরাং ইংরাজকে রাজা করিব।" কারণ বহির্বিষয়ক জ্ঞানলাভ করে সনাতন ধর্মের পুনরুজ্জীবনের জন্য আরও কিছুকাল পরাধীনতার ক্লেশ বরণ করা প্রয়োজন। একদিকে পরাধীনতার গ্লানি ও ইংরেজ শোষণের বিরুদ্ধে অসন্তোষ অন্যদিকে নবাবী আমলের দুর্বিষহ স্মৃতি ও ইংরেজ শাসনের সুফল সম্পর্কে আশা—যুগের দ্বিধাদ্বন্দ্বকে সহজেই আদর্শ-লোকে উত্তীর্ণ করার প্রয়াস করছিল। বঙ্কিমের উপন্যাস 'ত্রয়ী'-তে ঐ দ্বিধার অবসান করার প্রেরণা লক্ষ্য করা যায় এজন্যেই। তাই 'আনন্দমঠের' সন্তানদল ইংরেজকে যুদ্ধে পরাজিত করেও রাজ্য স্থাপন করেনি। 'দেবী চৌধুরাণী'তে ভবানী পাঠক স্বেচ্ছায় ইংরেজের হাতে ধরা দিয়েছে। তৎকালীন আবেদন নিবেদন মূলক মডারেট পন্থা ইতিহাসের একটি তিক্ত সত্যের প্রকাশ; বঙ্কিমও জানতেন,—"স্বাতন্ত্র্যে অনাস্থা…হিন্দুজাতির চিরস্বভাব বলিয়া বোধ হয়।" তৎসত্ত্বেও বঙ্কিমের আশা অভিব্যক্ত হয়েছিল,—বাঙালি…"ইংরেজের চিত্তভাণ্ডার হইতে লাভ করিতেছে স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা ও জাতিপ্রতিষ্ঠা।" বঙ্কিমের বিশ্বাস তাই 'আনন্দমঠে'ও পুনর্ব্যক্ত হল,—"ইংরেজ শাসনে দৈবনির্দেশ আছে।"

স্বাতন্ত্র্য-প্রিয়তা ও জাতিপ্রতিষ্ঠায় প্রেরণা-স্বরূপ 'আনন্দমঠের' অবদান সম্পর্কে মোহিতলালের উক্তি যথার্থ—"দেশপ্রেমের এমন কবিত্বময় বিগ্রহটি বোধহয় জগৎ-সাহিত্যে বিরল, অতএব কাব্যের দিক দিয়াও এই উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলির অন্যতম, ইহাকে কেবল একটা বিশেষ cult বা ধর্মমন্ত্রের প্রচারমূলক উপন্যাস বলিয়া পৃথক করিলে চলিবে না।" ('বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস', পৃ ৫৮) ধর্মমন্ত্রের প্রচার-মূলক উপন্যাস বলে চিহ্নিত করার প্রয়াস কোন কোন সমালোচকের লেখায় দেখা গিয়েছিল, দৃষ্টান্ত-স্বরূপ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ত্রয়ী' (আনন্দমঠ-দেবী চৌধুরাণী-সীতারাম) উপন্যাস সম্পর্কে

মন্তব্যটি উল্লেখ্য—"বাঙ্গালীর প্রকৃতির আধারে…সমষ্টি ব্যষ্টি এবং সমন্বয়ের অনুশীলনের পদ্ধতি পরিস্ফুট।" এবং তদনুসারে আনন্দমঠে সমষ্টিগত সাধনার দিকটি বিশ্লেষিত। অবশ্য শিল্প-মূল্য-বিচার আমাদের উদ্দেশ্য নয়। ইতিহাসের আদর্শীকরণ প্রক্রিয়াটিই আমাদের বিচার্য। এসম্পর্কে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন,—"একটা অসাধারণ আদর্শের জ্যোতিতে আমাদের চক্ষু ঝলসিয়া যায়।" তাঁর মতে, বঙ্কিম মহাকাব্যের লক্ষণান্বিত বাহ্য আকৃতি ব্যবহার করেছেন, "উপন্যাসের ছাঁচে তাঁহার উচ্ছ্বসিত দেশভক্তি, তাঁহার বিরাট রাজনৈতিক কল্পনাকে ঢালিয়াছেন।…বঙ্কিম পৌত্তলিক বাঙ্গালীর মানস-স্বর্গে এক নূতন দেবী প্রতিমা সৃষ্টি করিয়া স্থাপিত করিয়াছেন।…'বন্দেমাতরম্' আধুনিক বাঙ্গালীর বেদমন্ত্র।" বাস্তবিকই সত্যানন্দ, ভবানন্দ, জীবানন্দ, শান্তি প্রভৃতি চরিত্রগুলি যেন আদর্শ-লোকের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক,—এরা যুক্তিহীন স্বজাতিপ্রীতির উচ্ছ্বাসে বাস্তবের সব বাধা অবলীলাক্রমে অতিক্রম করলেও কাল্পনিক নয়, পরাজিত ও নির্জিত জাতির মমত্বে জীবন্ত ও বাস্তব। এই মমত্ববোধেই দেশপ্রীতি জাগে, সত্যানন্দের মত আমাদের চোখেও জল ভরে আসে—"মা যা হইয়াছেন" সেই দৃশ্যে—

"কালী অন্ধকারসমাচ্ছন্না কালিমাময়ী। হৃতসর্বস্বা, এইজন্য নগ্নিকা। আজি দেশের সর্ব্বত্রই শ্মশান—তাই মা কঙ্কালমালিনী। আপনার শিব আপনার পদতলে দলিতেছেন—হায় মা।"

আনন্দমঠের ঘটনা যতই অবাস্তব হোক, সন্তান-সৈন্যদলের [লাঠি-সোটা বল্লমের সহায়তায়] শিক্ষিত-ইংরাজ-সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও বিজয়ে আমাদের অতৃপ্ত বাসনার প্রক্ষেপ ঘটে; তাই সত্যানন্দের সন্তানবাহিনী যেন সমগ্র বাঙ্গালী-মানসের বিজয়বাহিনী। গ্রন্থশেষে আমরাও যেন বলে উঠি,—"হায় মা, তোমার উদ্ধার করিতে পারিলাম না।" আমরা গ্রন্থকারের সঙ্গে একস্বরে প্রার্থনা করি,—বাংলামায়ের কোলে জীবানন্দের মত পুত্র ও শান্তির মত কন্যা আসুক। এই ত সার্থক আদর্শীকরণ, আমাদের জাতীয় কামনার উদ্ভাস, বঙ্কিম এই দিক দিয়ে সার্থক স্রষ্টা।

এবার প্রশ্ন আসে, জাতীয় কামনা বলতে কি বাংলার কামনা, অথবা সমগ্র ভারতের কামনা। 'আনন্দমঠে'র বঙ্গপ্রীতি কি বৃহত্তর ভারতপ্রীতিতে ছড়িয়ে পড়েছে? এ নিয়ে নানা যুক্তিজাল বিস্তার করা চলে। একদা ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের প্রশ্নের জবাবে অক্ষয়কুমার সরকার বলেছিলেন, "ভারতমাতার (fighting force) তরবারি ধরিবার উপযুক্ত ব্যক্তি সপ্তকোটি।" এ বিষয়ে তর্ক না তুলে বলা চলে বিপ্লবী অরবিন্দ 'আনন্দমঠের' নবভাষ্য রচনায়

'বন্দেমাতরম'কে মন্ত্রের সম্মান দিয়ে বৃহত্তর পরিধিতে এই দেশপ্রীতিকে বিস্তৃত করেছিলেন। উপন্যাস রচনাকালে বঙ্কিমের বঙ্গপ্রীতিই মুখ্য ছিল (প্রবন্ধাবলীতেও তা লক্ষ্য করে এসেছি), কিন্তু বঙ্কিমের সেই প্রীতি ভারতপ্রীতির প্রতিবন্ধক হয় নি। রাজনৈতিক ভাষ্যে সপ্তকোটি তেত্রিশকোটিতে পরিণত হয়েছে স্বভাবতঃই। সমালোচক প্রমথনাথ বিশী এসম্পর্কে বলেছেন, "সপ্তকোটি একটা Idealised সংখ্যা। ···আনন্দমঠ উপন্যাসের প্রতিষ্ঠা-ভূমি প্রত্যক্ষত বাংলাদেশ হলেও ওর যথার্থ ভূমিকা ভারতবর্ষব্যাপী।" এ পর্যন্ত অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তিনি "ধরণীং ভরণীং মাতরম্"-এর অর্থবিস্তার ঘটিয়ে যখন বলেন—"বিশ্বমানবের মুক্তির বিবরণ এই কাব্য"—তখন তা কিছুটা ভাবাতিশয্য বলে মনে হয়। বঙ্কিম দেশপ্রীতিকে জগৎপ্রীতির দিকে প্রসারিত করেছেন 'ধর্ম্মতত্ত্বে', তবু হিন্দু পুনরুজ্জীবনের পটভূমিকায় ঐ কথাটি ঠিক আন্তর্জাতিকতাবোধের অভিব্যক্তি বলে স্বীকার করা চলে না (অন্ততঃ আধুনিক অর্থে)। এ প্রসঙ্গে 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত আলোচনাকালে পুনরায় বিচার করা যাবে। তবে একথা ঠিক পরবর্তীকালের রাষ্ট্রীয়চেতনায় কোন গ্রন্থ বা ভাবের যথার্থ মূল্যায়নে কিছুটা আলোচকের ঈপ্সার রং লাগে। এব্যাপারটি সাম্প্রতিককালে 'আনন্দমঠের' বৈপ্লবিক উদ্দেশ্য-বিশ্লেষণ প্রসঙ্গেও লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

ব্যাপারটি 'আনন্দমঠের' উৎস সম্বন্ধে একটি নতুন তথ্য-যোগে বিবৃত হয়েছে ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার লিখিত 'Militant Nationalism in India' গ্রন্থে। আমরা দেখেছি, 'আমার দুর্গোৎসবে' 'আনন্দমঠে'-র ভাবটি বীজস্বরূপে ছিল। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ আনন্দমঠের পরিকল্পনা হয়ত আরও কিছু বাস্তব ঐতিহাসিক ঘটনাকে ভাবউৎস-রূপে পেয়ে পরিস্ফুট হতে পেরেছিল। আচার্য যদুনাথ সরকার অবশ্য সন্ন্যাসী-বিদ্রোহকে আনন্দমঠের পটভূমিকা বলে মেনে নেন নি, বঙ্কিমও তৃতীয় সংস্করণের প্রকাশের পূর্বে ভূমিকা-স্বরূপ সন্ন্যাসী-বিদ্রোহকে উল্লেখ করেন নি। 'দেবী চৌধুরাণী'র ভূমিকাতে ছিল,—"দেখিয়া শুনিয়া ইচ্ছা হইয়াছে আনন্দমঠের ভবিষ্যৎ সংস্করণে সন্ন্যাস বিদ্রোহের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব। ···পাঠক মহাশয়···'আনন্দমঠকে' বা 'দেবী চৌধুরাণী'কে ঐতিহাসিক উপন্যাস বিবেচনা না করিলে বাধিত হইব।" এদিকে ডঃ মজুমদার আনন্দমঠের উৎস হিসাবে একটি ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করেছেন,—তা হল মারাঠী ব্রাহ্মণ বাসুদেব বলবন্ত ফাদ্‌কের রাজদ্রোহ এবং তার চাঞ্চল্যকর মামলা। ঐ বৈপ্লবিক প্রয়াস বঙ্কিমের গোচরে আসার পরই[১৮] তাঁর আনন্দমঠের পরিকল্পনা হয়েছে। তাঁর মতে,—"There are some points of similarity between the

plan of Phadke and plot of Bankim Chandra's famous novel Anandamath" (Militant Nationalism in India, p. 12)

এ ব্যাখ্যাতে আমাদের আপত্তির কারণ নেই, আপত্তি আছে বঙ্কিমের উদ্দেশ্য বৈপ্লবিক ছিল—এই বিশ্লেষণে, "All the talk of the Sannyasis of Anandamath about the uprooting of Moslem power really meant the liberation of the country from the British power".

অর্থাৎ বঙ্কিম প্রচ্ছন্নভাবে সশস্ত্র বিপ্লবের প্রেরণাদান করেছিলেন। ডঃ মজুমদার তাঁর সিদ্ধান্ত সমর্থনের জন্য আনন্দমঠের প্রথম প্রকাশিত অংশগুলির সঙ্গে পরবর্তী সংস্করণগুলির (বিশেষতঃ ৫ম সং) পাঠ মিলিয়ে বঙ্কিমের আত্মগোপন-প্রয়াসের দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করেছেন।

সম্প্রতি শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এর সমর্থন করে লিখেছেন, "তাঁদের তুষ্ট করবার জন্যেই প্রতি সংস্করণেই কিছু অদলবদল করেছেন (বঙ্কিম)। এ না করলে আনন্দমঠ বাজেয়াপ্ত হত।" (শারদীয়া যুগান্তর, ১৩৭৪) আমাদের কাছে ঐ উক্তি সর্বাংশে যুক্তিগ্রাহ্য মনে হয় না। "He made the moslem rule a convenient scapegoat"—ডঃ মজুমদারের এই সিদ্ধান্তও তর্কাতীত নয়। কারণ, সিডিশনের ভীতি বঙ্কিম-মানসের পূর্বাপর প্রবণতার সঙ্গে সঙ্গতিরক্ষা করে না। সরকারের অপ্রীতিভাজন হয়েও অন্যায়ের প্রতিবাদ করার কয়েকটি ঘটনা তার প্রমাণ। (ডাফিনের বিরুদ্ধে মামলা, ও ওয়েষ্টমেকট সাহেবের সঙ্গে মনোমালিন্য উল্লেখযোগ্য) আসলে বঙ্কিমের কালে সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক তথ্য সাধারণের গোচরে ছিল না, বঙ্কিম জ্ঞাতসারে তথ্য গোপন করেন নি।

আর সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জনের লোভ বঙ্কিমের না থাকাই স্বাভাবিক। সর্বদা ও সর্বত্র সংযতবাক্ বঙ্কিম বিদ্রোহের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন নি।

স্পষ্টতঃ, বঙ্কিমের অন্ততঃ 'militant nationalism'-এর প্রতি আস্থা ছিল না। এসম্পর্কে পূর্বাপর কতকগুলি যুক্তি[১৯] তাঁরই প্রবন্ধ হতে উল্লেখ করা যায়—

(ক) 'সাম্য' এর সিদ্ধান্ত—"সম্পূর্ণ সংশোধন কালসাপেক্ষ।"

(খ) 'বাঙ্গালার কৃষক' প্রবন্ধে জমিদারদের সদ্‌বুদ্ধি উদ্রেকের উপর ভরসা রাখার সিদ্ধান্ত।

(গ) 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা' প্রবন্ধে—সাধারণ প্রজার সুখের

মাপকাঠিতে স্বাধীনতার মূল্য নিরূপণ।

(ঘ) 'দেবী চৌধুরাণী'তে—দেশ শান্ত হইলে ভবানী পাঠকের আত্মসমর্পণ।

উপরোক্ত সিদ্ধান্তগুলির পশ্চাতে যুক্তিগুলি কোথাও অস্পষ্ট নয়। বঙ্কিম আপাতত ইংরেজ শাসনের সুফলে বিশ্বাসী ছিলেন। এ শুধু তাঁরই বিশ্বাস নয় তৎকালীন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিশ্বাস। তাই 'আনন্দমঠের' শেষ পরিচ্ছেদে মহাপুরুষের উক্তি সহসা-আরোপিত কোন সিদ্ধান্ত নয়। "ইংরেজ রাজ্যে প্রজা সুখী হইবে নিষ্কণ্টকে ধর্মাচরণ করিবে।" ২য় সংস্করণে এই কথা সংযোজিত করে বঙ্কিম স্বীয় সমন্বয়-ধর্মিতার সঙ্গেই সুর বেঁধেছেন। আর চিকিৎসকের কথাগুলিও উদ্দেশ্য গোপন করার জন্য নয় এবং তাঁর আগমনও সহসা ঘটেনি, তৃতীয় খণ্ডের শেষ পরিচ্ছেদের সঙ্গে এর সম্পূর্ণ সঙ্গতি আছে। 'বিসর্জনের' ইঙ্গিত সেখানেই ছিল। অতঃপর শিল্পবিচারে মহাপুরুষের উক্তিগুলি সঙ্গতি রক্ষা করেছে কিনা এ তর্কে প্রবেশ না করে বলা যায় আদর্শ ও নীতিবিচারে বঙ্কিম পূর্বাপর সঙ্গতিরক্ষা করেছেন। 'ধর্ম্মতত্ত্বের' সিদ্ধান্তেও বহির্বিষয়ক জ্ঞান ও অন্তর্বিষয়ক জ্ঞানের সামঞ্জস্য রক্ষার কথা পুনর্বার বলা হয়েছে। অতএব 'মহাপুরুষের' কথা নিছক রাজস্তুতি নয়,—ঐগুলি আসলে সত্যদ্রষ্টা সাহিত্যিকের নিরপেক্ষ উক্তি।

মূলকথা এই যে, বঙ্কিমের মানস-সন্তানদল বিদ্রোহী হয়েছে সম্প্রদায়গতভাবে মুসলমান বা ইংরেজ কারও বিরুদ্ধেই নয়—অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে। এক্ষেত্রে ইতিহাসের ইঙ্গিতে মুসলমান এসেছে বিরোধীপক্ষ হয়ে, দেওয়ান ইংরেজ তার সহায়ক মাত্র। আর যুদ্ধ হয়েছে মুসলমান বা নেড়ে যবনের বিরুদ্ধেই নয়—ইংরেজের বিরুদ্ধেও। ইংরেজ সুশাসকের ভূমিকা গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই সন্তানব্রত সমাপ্ত হয়েছে। আপাতত পরবর্তী কথা বলার প্রয়োজন তখন ছিল না। কেবল একটু ইঙ্গিত ছিল—"সত্যানন্দ যে আগুন জ্বালিয়া গিয়াছিলেন তাহা সহজে নিবিল না। পারি ত সেকথা পরে বলিব।" (দ্রঃ—'আনন্দমঠ' ২।২০, বঙ্গদর্শন—জ্যৈষ্ঠ ১২৮৯, ৬৯ পৃ, ১ম সংস্করণ)। ঐ ইচ্ছা 'ঝাঁসির রাণী'-শীর্ষক উপন্যাস অথবা 'ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ ইতিহাস' রচনার ইচ্ছার মত অপূর্ণই থেকেছে। বঙ্কিমের আশাভঙ্গ তার কারণ হতে পারে, হয়ত তিনি পরে 'বন্দে উদরং'[২০] —এই তিক্ত সত্য উপলব্ধি করেছিলেন। অথবা পরবর্তী উপন্যাস 'দেবী চৌধুরাণী'-ই তাঁর পরবর্তী অগ্নিসঞ্চয়ের কাহিনী। কিন্তু 'আনন্দমঠে' বঙ্কিমের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট,—তা হল দেশবাসীকে স্বদেশ-প্রেমের ধর্মে দীক্ষিত করা, সশস্ত্র বিপ্লবের কথা প্রচার করা নয়। স্বদেশের সেবায়

উৎসর্গীকৃত নিষ্কাম সন্তানদলের ব্যর্থতা ও পরাজয়ের মধ্য দিয়েই ক্রমশ সার্থকতা আসবে, ঐ ক্লৈব্যবর্জিত মনোভাবসৃষ্টিই 'আনন্দমঠের' শিক্ষা।

ঐতিহাসিক রোমান্সের আশ্রয়ে ক্লৈব্যবর্জিত স্বাদেশিকতা-সৃষ্টির জন্ত বঙ্কিমের মত রবীন্দ্রনাথ কোন ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেন নি, একথা ঠিক, কিন্তু দুটি বিশেষ কাব্যে তিনি এই জাতীয় অনুপ্রেরণার সঞ্চার করেছিলেন বঙ্গভঙ্গ যুগের কয়েক বৎসর আগে। 'কথা' ও 'কাহিনী' সেই উল্লেখযোগ্য কাব্যদ্বয়। এ দুটি কাব্যের ঐতিহ্য-অবগাহনে বাঙালি-মানস অনুপ্রাণিত হয়েছে। এগুলিতে অঙ্কিত খণ্ড ইতিহাস-চিত্রগুলির বীরত্ব, মহত্ত্ব ও মানবতার গভীরতর আবেদন সহজেই উদ্দীপনার সঞ্চার করেছে। আমরা যখন শুনি—

"আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান, তারি লাগি তাড়াতাড়ি।"

অথবা, "রক্তে তাহার ধন্য হল নকল বুঁদিগড়।"

কিংবা, "হায় সে কি সুখ, এ গহন ত্যজি হাতে লয়ে জয়তুরী।

... ...

অত্যাচারের বক্ষে পড়িয়া হানিতে তীক্ষ্ণ ছুরি।"

তখন ঐজাতীয় ঐতিহাসিক আদর্শে সঞ্জীবিত হয়ে উঠি। কবি রাজপুত, শিখ, মারাঠাদের ঐতিহাসিক কাহিনীগুলি ভাবরসে রসিয়ে পরিবেশন করেছিলেন। ক্লৈববর্জিত মহত্ত্ব, স্বদেশ ও স্বজাতির জন্য আত্মদানের প্রেরণা তৎকালে বাংলাদেশে অসামান্য আবেদন সৃষ্টি করেছিল। এখানে রবীন্দ্রনাথ নবতর দৃষ্টিভঙ্গিতে ভারতীয় ঐতিহ্যের সন্ধান করেছিলেন,—সেই দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁর সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও ঐতিহাসিক নিবন্ধাবলীর (অধিকাংশই ১৩০০—১৩১৫ এর মধ্যে রচিত) আলোচনায় লক্ষ্য করেছি। সেখানে বিচারবুদ্ধিতে যেকথা বিশ্লেষিত, এখানে তাই শিল্পরূপে ও রসে উৎসারিত হয়ে উঠেছে। এই জাতীয় ঐতিহ্য-চর্চায় যথার্থ বস্তুরূপ না থাকলেও একটি আদর্শায়িত ইতিহাসচেতনা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করা যায়। এ সম্পর্কে ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের মন্তব্য যথার্থ—"রবীন্দ্রচিত্তে ভারতীয় ঐতিহ্য ও ইতিহাস যে দৃষ্টিতে যে রূপে ধরা দিয়াছিল সেই দৃষ্টি ও রূপই বহুদিন পর্যন্ত আমাদের পরবর্তী সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্মপ্রচেষ্টাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল, সেই দৃষ্টি ও রূপই আমাদের স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমি।" ('রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা', পৃ ৮২)' রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-চেতনার বৈশিষ্ট্য রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মচিন্তার ক্ষেত্রগুলিতে আমরা অনুধাবন করে এসেছি এবং উপলব্ধি করেছি ঐ বিশেষ চেতনা ক্রম-বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বিশ্বমানবতার দিকে প্রসারিত হয়ে চলেছে, ধর্ম-সংস্কৃতি-সমাজ-রাষ্ট্রকে

এক বৃহত্তর পটভূমিকায় প্রসারিত করে চলেছে। এই অভিনব ইতিহাসচেতনার সার্থকতম শিল্পসৃষ্টি 'গোরা' উপন্যাস (১৩১৬)।

'গোরা' ঐতিহাসিক অথবা ইতিহাসাশ্রিত রোমান্স নয়, আবার নিছক সামাজিক উপন্যাসের শ্রেণীভুক্ত নয়। অনেক সমালোচক[১১] এটিকে মূলত রাজনৈতিক উপন্যাস বলেছেন, আবার প্রখ্যাত সমালোচক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "ইহার মধ্যে অনেকটা মহাকাব্যের বিশালতা ও বিস্তৃতি আছে।" ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ও উক্ত মত সমর্থন করেছেন। বাস্তবিকই 'গোরা'-কে মহাকাব্যিক উপন্যাস বললেই যেন যথার্থ সংজ্ঞা প্রদান করা হয়। অবশ্য উপন্যাসের শ্রেণী অথবা আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য আমাদের বিবেচ্য নয়, আমাদের লক্ষ্য রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তার সামগ্রিক শিল্প-প্রকাশ-রূপে এর মূল্যায়ন। সেদিক দিয়ে 'আনন্দমঠের' সঙ্গে এটিকে তুলনা করা চলে।

দুটি উপন্যাসই স্ব স্ব স্রষ্টার ইতিহাস-দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিনিধিত্ব করেছে। আমরা লক্ষ্য করে এসেছি 'আনন্দমঠ'-এ বঙ্কিমের ইতিহাস-চেতনা আদর্শান্বিত। 'গোরা'-তেও রবীন্দ্র-ইতিহাস-দৃষ্টি আদর্শান্বিত হয়ে উঠেছে। বঙ্কিম অতীতের শৌর্য-বীর্য-আত্মত্যাগের গৌরবময় ঐতিহ্য ইতিহাসের আলোকে উদ্ভাসিত করে তুলতে চেয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় ধর্ম সংস্কৃতি অথবা প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যকে বর্তমান যুগের পরিপ্রেক্ষিতে আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। মূলে কিন্তু দুজনেরই প্রয়াসে আদর্শীকরণ-ঈপ্সাটি বিদ্যমান। বঙ্কিমের আদর্শীকরণ-প্রক্রিয়াটি ইতিহাসের নির্দেশে আপাতত 'বিসর্জনের' ইঙ্গিত দিয়ে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার আদর্শচিত্রটি তুলে ধরেছে, রবীন্দ্রনাথের হিন্দু-আদর্শের স্বপ্নটি বাস্তবের অভিঘাতে ভেঙে গেছে, কিন্তু উদারতর বিশ্বমানবতার পথেই সত্য-চেতনা জাগ্রত হয়েছে। আর এই ব্যাপারে দুই মনীষীর ব্যক্তিগত ধর্ম-উপলব্ধি বা মনোবিবর্তনের প্রভাব সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে (ধর্মচিন্তা প্রসঙ্গে পূর্বেই আলোচিত)। বঙ্কিমের স্বদেশচিন্তা 'আনন্দমঠে'-ই দেশপ্রীতিকে সনাতন ধর্মের অঙ্গীভূত করেছে (পরবর্তী পর্যায়ে তা আরও স্পষ্ট), আর রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মচিন্তা এই একই উপন্যাসের শিল্পরূপের মধ্যে বিবর্তিত হয়ে উদারতর স্বদেশভাবনায় লীন হয়ে গেছে।

'আনন্দমঠ' (১৮৮২ খ্রীঃ) ও 'গোরা'-র (১৯০৯ খ্রীঃ) প্রকাশকালের ব্যবধান সাতাশ বছর। আর দুটি উপন্যাসে অঙ্কিত ঘটনাকালের ব্যবধান প্রায় সওয়া শত বৎসর (ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ১৭৬৬ খ্রীঃ এবং সিপাহী বিদ্রোহের পঁচিশ বৎসর পরবর্তী কাল অর্থাৎ ১৮৮৪ খ্রীঃ)। 'আনন্দমঠ'-এ অতীত ইতিহাসের পটভূমিতে

উনিশ শতকীয় বাঙালি মানসের প্রক্ষেপ আছে অর্থাৎ শৌর্য-বীর্য-ঐতিহ্য-গৌরব এবং হিন্দুত্ব পুনরুজ্জীবনের বাসনায় শিল্পান্বিত অভিব্যক্তি আছে, আর 'গোরা'-তে ১৯শ শতকের শেষপাদের বাঙালি-জাগরণের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, জাতীয়তা-মূলক ও সংস্কারপ্রয়াসী আন্দোলনের আশ্চর্য বিশ্লেষণের মধ্যে অতীত হিন্দু-ভারতের ধর্ম-সংস্কৃতির প্রক্ষেপ ঘটেছে। পূর্বসূরী অতীতের চিত্রে বর্তমানের অভীপ্সা প্রক্ষিপ্ত করেছেন, আর উত্তরসূরী বর্তমানের (অব্যবহিত অতীত বলাও চলে) পটভূমিতে অতীতের উদ্ভাসন ঘটিয়েছেন। পূর্বসূরী ইতিহাসকে মান্য করে, সন্তানদের প্রচেষ্টা আপাতত স্থগিত রেখে বাহ্যবিষয়ক ও অন্তর্বিষয়ক জ্ঞানের সামঞ্জস্য সাধনের নির্দেশ দিয়েছেন, আর উত্তরসূরী বাস্তব প্রতিঘাতে অতীতের মোহ হতে মুক্ত হয়ে বর্তমানের বিশ্বলোকে কর্ম ও সেবাব্রতের মধ্যে জাগ্রত হয়ে উঠেছেন।

আমরা স্পষ্ট লক্ষ্য করেছি, বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠ' সৃষ্টির পরবর্তী পর্যায়ে 'অনুশীলন'-তত্ত্বের আশ্রয়ে সমন্বয়ের প্রয়াস করেছেন এবং আদর্শলোকে শান্তির সন্ধান করেছেন, আর এবার দেখতে পাব, রবীন্দ্রনাথ 'গোরা' সৃষ্টির মধ্য দিয়েই হিন্দুত্বের মোহ হতে মুক্তিলাভ করে বিশ্বমানবতার পথে অর্থাৎ আধ্যাত্মিক আন্তর্জাতিকতার পথে যাত্রা করেছেন।

মোটকথা, পূর্বসূরী ও উত্তরসূরীর স্বদেশচিন্তার শ্রেষ্ঠতম শিল্পরূপ এই দুটি উপন্যাসে তাঁদের স্ব স্ব ইতিহাসচেতনা এবং বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মুদ্রিত হয়েছে। বঙ্কিম ইতিহাসের শৌর্য-বীর্যময় যুগের স্বপ্ন দেখতেন (তাঁর প্রবন্ধাবলী হতে বহু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছি) এবং মহাভারতের কর্মময় ধর্মযুগের পরিকল্পনা করতেন। 'ত্রয়ী' উপন্যাস তারই শিল্পিত অভিব্যক্তি। রবীন্দ্রনাথ 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারায়' ও ঐ জাতীয় অন্যান্য প্রবন্ধে 'বহুত্বের মধ্যে ঐক্যের সাধনা'-ধারা অনুসন্ধানের যে মানসপ্রবণতার পরিচয় দিয়েছেন সেই জাতীয় অনুসন্ধিৎসায় আবিষ্কৃত ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের শিল্পিত প্রকাশ —'গোরা'।

রাজনৈতিক চেতনার ক্রমবিকাশ আলোচনায় লক্ষ্য করেছি, উনিশতম শতকের শেষ দশক হতে বাংলাদেশে দুটি চিন্তাধারা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, প্রথমটি—হিন্দুত্ব পুনর্জাগরণের ধারা—যা বঙ্কিমচন্দ্র, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ চিন্তানায়কদের নেতৃত্বলাভের পর বিবেকানন্দের আগ্রাসী হিন্দুধর্ম প্রচারের ফলে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল পরাধীন ও নির্জিত জাতিমানসে।

দ্বিতীয়টি সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্বের বিরুদ্ধে নরমপন্থী আন্দোলনের সমান্তরাল

উগ্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, যা অরবিন্দ তিলক প্রভৃতির নেতৃত্বে প্রসারিত হচ্ছিল। উক্ত দুটি ভাবধারার ফলশ্রুতি স্বাজাত্যবোধে আত্মানুসন্ধান এবং ঐক্যাদর্শ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস। এই সূত্রেই ভারতের বিচিত্র ও আপাতবিরোধী ধর্মসাধনা ও সংস্কৃতির মূলগত ঐক্য আবিষ্কারের প্রয়াস করছিলেন রবীন্দ্রনাথ। (বঙ্গদর্শন—নবপর্যায় যুগে)। প্রথম দিকে রবীন্দ্রনাথ উক্ত ঐক্যের সন্ধান পেয়েছিলেন তপোবনের আদর্শে। ('নৈবেদ্য' কাব্যে এবং 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার আদর্শ', 'হিন্দুত্ব' আদি প্রবন্ধে তার প্রকাশ)। ভারতীয় জাতি, ধর্ম ও সমাজ সবকিছু মিলিয়ে এক অখণ্ড ও সমগ্র জীবনাদর্শ গড়ে তোলার প্রয়াসই তাতে ছিল। তৎকালে 'ব্রাহ্মণ', 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' ইত্যাদি প্রবন্ধে বিস্তৃত-রূপে যে বক্তব্য উপস্থাপিত করেছিলেন তিনি, 'গোরা' উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীগণের চরিত্রে, ব্যবহারে, তর্কবিতর্কে তাই সজীব শিল্পরূপে বিকশিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু কেবলমাত্র একটি স্তরই নেই—দ্বিতীয় স্তর 'গোরা'-তে রবীন্দ্রমানসের বিবর্তনটি গোরা চরিত্রে ফুটে উঠেছে,—বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন-উত্তর রবীন্দ্রমানসের দিকপরিবর্তনটি প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর 'স্বদেশী সমাজ' প্রভৃতি পরিকল্পনা অবহেলিত হবার পর রবীন্দ্র-চিন্তার বিবর্তনে খণ্ডিত রাষ্ট্র-চিন্তার নিষ্ফলতাই ধরা পড়েছিল, এবং তাঁর মনের হিন্দুত্বের মোহ ক্রমেই অপসৃত হয়ে যাচ্ছিল। সেই সময় জাতীয় 'ব্যাধি ও প্রতিকার' নিরূপণ করে রবীন্দ্রনাথ যে পথ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হয়েছিলেন সেই পথ-পরিক্রমার সুস্পষ্ট চিহ্ন আছে 'গোরা'-তে। যেহেতু তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা সমাজচিন্তায় জড়িত এবং ঐ দুই এর ভিত্তি ধর্মচিন্তায় ('মানুষের ধর্মের লক্ষ্যাভিমুখীন যা) স্থাপিত, অতএব, তারই শিল্পিত রূপসৃষ্টি 'গোরা' তাঁর সামগ্রিক স্বদেশচিন্তার বাণী-মূর্তি। গোরা চরিত্রের ক্রমবিকাশ ও উপন্যাসে বিধৃত নানা উক্তির আশ্রয়ে এবার একথা পরীক্ষা করা যেতে পারে।

গোরার ধ্যানের ভারতবর্ষ ও বাস্তব ভারতবর্ষের মধ্যে সংযোগ ও সামঞ্জস্য সাধনের সংগ্রাম ও ব্যর্থতা, গোরার আধ্যাত্মিক শূন্যতাবোধ এবং সেই শূন্যতাবোধের মধ্য দিয়ে নবভারতীয়তার উত্তরণ-এর সবগুলি পর্যায় যেমন রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধাবলীতে প্রকাশিত হয়েছিল তেমনি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনেও অভিব্যক্ত হয়ে উঠছিল। গোরা স্বজাতীয় সকল সংস্কার সকল বিশেষ সত্যকে আশ্রয় করে নির্বিশেষ ধ্রুবসত্যটি লাভ করতে চেয়েছিল, কিন্তু অনেক দুঃখের মধ্য দিয়ে অনুভব করেছিল যে বর্তমান ভারতীয় সমাজ অতীত-সমাজ হতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। প্রথম পর্যায়ে সে ভারতীয় সাধনা ও আদর্শের

প্রতি নির্বিচার শ্রদ্ধায় বলেছিল, "যা কিছু স্বদেশের তারই প্রতি সংকোচহীন সংশয়হীন সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা প্রকাশ করা" প্রয়োজন। তাই দৃঢ়বিশ্বাসে সে বলেছে—

"একথা নিশ্চয়…ভারতের একটি বিশেষ প্রকৃতি, বিশেষ শক্তি, বিশেষ সত্য আছে, সেইটের পরিপূর্ণ বিকাশের দ্বারাই ভারত সার্থক হবে…।" উক্ত বিশ্বাস 'নৈবেদ্য'-কাব্যে এবং 'বঙ্গদর্শন'-পর্যায়ে রবীন্দ্রমানসেও লক্ষ্য করেছি; আর নিবেদিতা এবং ব্রহ্মবান্ধবের সাহচর্যে ঐ বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়েছিল। এদিকে গোরার সাধনা ঈশ্বরলাভের জন্য নয়, ধর্মতত্ত্ব প্রচারও নয়, তার সাধনা জাতীয় কলঙ্কমোচন করে জাতীয় গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠা এবং হিন্দুত্বের পুনরভ্যুত্থান। গোরা হিন্দু জাতীয়তাবাদের ধারক হতে চেয়েছে, 'ত্রিবেণী'-তে স্নান করতে গেছে পুণ্যসঞ্চয়ের লোভে নয়, "সেই জনসাধারণের সঙ্গে…নিজেকে এক করিয়া মিলাইয়া দেশের একটি বৃহৎ প্রবাহের মধ্যে আপনাকে সমর্পণ করিতে;" সে বলতে চেয়েছে—"আমি তোমাদের, তোমরা আমার।" হিন্দুত্ব ও জাতীয়তার এমনি সমন্বয় তৎকালে বিবেকানন্দের তেজোগর্ভ বাণীতে প্রচারিত হয়েছিল, এবং নিবেদিতার জলন্ত শ্রদ্ধার উদ্ভাসে তৎকালীন নানা মনীষীর ভারতচিন্তায় সঞ্চারিত হচ্ছিল; গোরাতে ঠিক সেই প্রতিভাস।[২২]

গোরা ভারতবর্ষের যে মূর্তি দর্শন করে বিক্ষুব্ধ, সেই মূর্তি 'আনন্দমঠের' 'মা হইয়াছেন' দৃশ্যটি স্মরণে আনে। যথা—

"আমার দেবীকে আমি যেখানে দেখতে পাচ্ছি সে ত সৌন্দর্যের মাঝখানে নয়—সেখানে দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র্য, সেখানে কষ্ট আর অপমান। সেখানে গান গেয়ে, ফুল দিয়ে পুজো নয়; সেখানে প্রাণ দিয়ে পুজো করতে হবে…একটা দুর্জয় দুঃসহ আবির্ভাব…রক্তবর্ণ আকাশক্ষেত্রে একটা বন্ধনমুক্ত ভবিষ্যৎকে দেখতে পাচ্ছি…।" উক্ত স্বপ্নদর্শন—'মা যা হইবেন' মূর্তির নবতর উপলব্ধি। এদিকে যুগের আদর্শে হিন্দু জাতীয়তাবোধ ব্যাপকতর—

"ভারতবর্ষের নানা প্রকার প্রকাশে এবং বিচিত্র চেষ্টার মধ্যে আমি একটা গভীর ও বৃহৎ ঐক্য দেখতে পেয়েছি, সেই ঐক্যের আনন্দে আমি পাগল।… আমি আমার ভারতবর্ষের সকলের সঙ্গে এক, তারা আমার সকলেই আপন…।"

এ যেন ঠিক ইতিপূর্বে ধ্বনিত বিবেকানন্দের বাণী, "ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই।"…

ভারতের সবকিছুকে নির্বিচারে নিবিড় মমতায় আপন করে নেবার প্রেরণাতেই গোরা ঘোষপুর চরে পুলিশী অত্যাচারের প্রতিবাদ করে কারাবরণ করেছে। পরে একদিন বিনয়কে সে বলেছে,—"আমার এই জাতিভেদের ভারতবর্ষ, আমার এই

কুসংস্কারের ভারতবর্ষ, আমার এই পৌত্তলিক ভারতবর্ষ"-এর অপমানের আসনে স্থান করে নিতে চাই। সুচরিতাকে তাই সে বলেছে,—"আমি আমার দেশের শক্তিকে ভক্তি করি।" ঈশ্বরের জন্য তার সাধনা নয়। তার একটিমাত্র ধ্যান-জ্ঞান-সাধনা ঐ ভারতবর্ষকে [২৩] ঘিরে। কিন্তু এ হল প্রথম পর্যায়।

দ্বিতীয় পর্যায়ে গোরার আদর্শ ভারতবর্ষের স্বপ্ন ধীরে ধীরে ভেঙে যাচ্ছিল। দেশের সঙ্গে প্রথমবার পরিচিত হতে গিয়ে গোরা দেখেছে, গ্রামের মাঝখানে বসে "এই নিভৃত প্রকাণ্ড গ্রাম্য ভারতবর্ষ যে কত বিচ্ছিন্ন, কত সংকীর্ণ, কত দুর্বল —সে নিজের শক্তি সম্বন্ধে যে কিরূপ নিতান্ত অচেতন এবং মঙ্গল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও উদাসীন···সংস্কার মাত্রেই যে তাহার কাছে কিরূপ নিশ্চলভাবে কঠিন···" গ্রামবাসীদের সঙ্গে বাস না করলে জানা যায় না। আর এই সব কিছুর "মূলে একটা দেশব্যাপী অজ্ঞানতা আছে।"

দ্বিতীয়বারে গোরার অভিজ্ঞতা আরও নিদারুণ—"প্রত্যেক লোকেরই লোকাচারের প্রতি অত্যন্ত একটি সহজ বিশ্বাস···কিন্তু সমাজের বন্ধনে, আচারে নিষ্ঠায় ইহাদিগকে কর্মক্ষেত্রে কিছুমাত্র বল দিতেছে না। ইহাদের মতো এমন ভীত, অসহায়, আত্মহিত বিচারে অক্ষম জীব জগতে আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। ··যে ধর্ম সেবারূপে, প্রেমরূপে, করুণরূপে, আত্মত্যাগরূপে এবং মানুষের প্রতি শ্রদ্ধারূপে শক্তি দেয়, প্রাণ দেয়,··কোথাও তাহাকে দেখা যায় না।"

এক কথায়, বর্তমান ভারতের বাস্তব অবস্থার সংঘাতে গোরার মনের বিশ্বাস টলতে সুরু করেছে। রবীন্দ্রনাথের মনেও ঠিক এমনি দ্বন্দ্বের প্রকাশ দেখা গিয়েছিল। পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

পরেশবাবুর কাছে গোরা যে কথা শুনেছে তা উল্লেখযোগ্য—"বর্তমানে যা সম্ভব তাই আমাদের সাধনার বিষয়।" অতএব অতীতের দিকে হাত বাড়িয়ে সময় নষ্ট করা নিষ্ফল। পরেশবাবুর বক্তব্য একটি অপ্রিয় সত্য উদ্ঘাটন করেছে, "সমদৃষ্টিতে দেখা জ্ঞানের কথা, হৃদয়ের কথা নয়।···আমাদের দেশে···সাম্যতত্ত্ব থাকা সত্ত্বেও নীচজাতকে দেবালয়ে পর্যন্ত প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না।" বাস্তবিকই বিবেকানন্দের বীর-বাণী সত্ত্বেও, অজস্র আবেগপূর্ণ বক্তৃতা সত্ত্বেও ভারতের বর্ণাশ্রমিক কাঠামোর চিরাচরিত অসাম্য বিন্দুমাত্র ঘোচেনি। হিন্দু সমাজ এখনও 'ক্ষয়রোগকেই প্রশ্রয় দিয়ে আসছে।' রবীন্দ্রনাথ 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা' বিশ্লেষণ করে যে ঐক্যতত্ত্বকে আবিষ্কার করেছিলেন প্রাচীন সমাজের ইতিহাসে তা মধ্যযুগেই 'আত্মসাৎ করবার শক্তি' হারিয়ে স্থবিরত্ব লাভ করেছিল, বর্তমানে বর্ণাশ্রমিক অচলায়তনের আশ্রয়ে ক্রমেই পচনশীল বিকারত্ব

প্রাপ্ত হচ্ছে। 'জীবনের পরিবর্তন বিকাশ, মৃত্যুর পরিবর্তন বিকার।' সমাজের এই অবক্ষয় রবীন্দ্রনাথের চোখেও ধরা পড়েছে। কিন্তু তা পরবর্তীকালে। প্রথমদিকে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল মধ্যযুগীয় সমাজ-ব্যবস্থার বিশুদ্ধরূপটি ফিরিয়ে আনলেই প্রাণধারা উৎসারিত হবে।[২৪] কিন্তু বর্ণাশ্রম-তত্ত্বের মধ্যেই যে ত্রুটি নিহিত একথা উপলব্ধি করে নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করতে তাঁকে দীর্ঘকাল চিন্তা ও পর্যালোচনা করতে হয়েছিল। ('কর্তার ইচ্ছায় কর্ম', 'শূদ্রধর্ম'—প্রভৃতি প্রবন্ধে তার দৃষ্টান্ত আছে।) আর গোরার মনোবিবর্তনের ক্ষেত্রেও একই স্তরপরম্পরা দেখা যাচ্ছে। অবশ্য গোরার জীবনের মর্মমূলশুদ্ধ নাড়া খেয়েছে তখনই যখন সে জেনেছে সে আইরিশম্যান, জন্মসূত্রে হিন্দু নয়। তার হিন্দুয়ানীর স্বপ্নসৌধ মুহূর্তে ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। ঐ কঠিনতম আঘাতে গোরা সর্বশ্রেষ্ঠ সত্যকে আবিষ্কার করেছে। তখনই ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার বাঁধ ভেঙে বিশ্বমানবতার প্লাবন এসেছে। গোরা ঘোষণা করেছে,—"আমি আজ ভারতবর্ষীয়। আমার মধ্যে হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান কোনো সমাজের কোনো বিরোধ নেই। আজ এই ভারতবর্ষের সকলের জাতই আমার জাত, সকলের অন্নই আমার অন্ন।"

উক্ত উপলব্ধি গ্রন্থকারের ব্যক্তিগত গণ্ডীসংকীর্ণতা নিষ্ক্রমণের উপলব্ধি। বঙ্গভঙ্গ যুগের রাজনৈতিক দলাদলি ও সংকীর্ণতা যে নিষ্ঠুর সত্য উদ্‌ঘাটন করেছিল, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের অবিশ্বাস যে উলঙ্গমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করছিল—তারই মন্থিত হলাহলে সমগ্রজাতি যেভাবে বিষক্রিয়ায় জর্জরিত হচ্ছিল,—তারই তিক্ততম অনুভূতিতে হিন্দুজাতীয়তার উন্নাসিকতা হতে রবীন্দ্রনাথ বাস্তব জগতে জাগ্রত হয়ে উঠেছিলেন। 'তপোবন' প্রবন্ধে এইকালের উপলব্ধি প্রকাশ পেয়েছে—"ভারতবর্ষের অন্তরের মধ্যে যে উদার তপস্যা গভীরভাবে সঞ্চিত হয়ে রয়েছে, সেই তপস্যা আজ হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ এবং ইংরেজকে আপনার মধ্যে এক করে নেবে বলে প্রতীক্ষা করছে।"

স্পষ্টতঃ 'ভারততীর্থের' সাধনার পথে রবীন্দ্রনাথ অগ্রসর হয়ে চলেছিলেন, যার ফলশ্রুতিতে বিশ্বমানবতাবোধ সহজ ও স্বাভাবিক। গোরার মুক্তদৃষ্টি তাই 'হিন্দুর দেবতা নয়, ভারতবর্ষের দেবতা'-কে গ্রহণ করেছে।

বাস্তবিকই "বঙ্গদেশের একটা বিশিষ্ট যুগসন্ধিক্ষণের সমস্ত বিক্ষোভ আলোড়ন, আমাদের দেশাত্মবোধের প্রথম স্ফুরণের সমস্ত চাঞ্চল্য, আমাদের ধর্মবিপ্লবের সমস্ত একাগ্রতা ও উদ্দীপনা এই উপন্যাসে স্থান লাভ করিয়াছে।…গোরাকে একটা জীবন্ত মানুষ অপেক্ষা ভারতবর্ষের আত্মবোধের প্রকাশ বলিয়াই বেশি মানায়।"[২৫]

গোরা চরিত্র হিসাবে যেমনই হোক, গোরার মাধ্যমে দেশাত্মবোধ ও ধর্ম-বিপ্লবের যে সুস্পষ্ট বিবর্তনটি আমরা লক্ষ্য করি, স্বদেশচিন্তার ক্রমবিকাশে তার অবদান অসামান্য। হিন্দুধর্ম ও জাতীয়তাকে একাত্ম করে দেখার তৎকালীন আবেগ, বর্ণাশ্রম বিধৃত হিন্দু সমাজ ও ধর্ম প্রতিষ্ঠার উন্মাদনা যে দারুণ অভিঘাতে নিঃশেষে লুপ্ত হয়ে নূতনতর সত্যালোকে জাগ্রত হয়েছে—তা ভবিষ্যৎ জাতীয়তার নির্দেশ এবং ভাবী আন্তর্জাতিকতার সূচনা। বাস্তবিকই ব্রাহ্মধর্ম ও হিন্দুধর্মের অন্তর্নিহিত দুর্বলতাগুলিকে নিরপেক্ষভাবে উদ্ঘাটন করে রবীন্দ্রনাথ যে আদর্শ স্বদেশচিন্তার ভাবমূর্তিটি রচনা করেছেন, তারও তুলনা হয় না। 'দেশানুরাগ ও ধর্মের বাহ্যানুষ্ঠানের মধ্যে অচ্ছেদ্য নিত্য সম্বন্ধের কল্পনা' ছিন্ন করে গোরা নবদৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ভারতবর্ষের সেবকরূপে মাথা তুলে বলেছে, "আজ আমি ভারতবর্ষের কোলের উপর ভূমিষ্ঠ হয়েছি—মাতৃক্রোড় যে কাকে বলে এতদিন পরে তা আমি পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছি।"

'আনন্দমঠ' ও 'গোরা'—উভয় উপন্যাসেই নায়কের যাত্রা সুরু হয়েছে ভক্তিকে[২৬] পাথেয় করে। সত্যানন্দ (নায়ক না হলেও সন্তানদলনেতা হিসাবে) 'মা যা হইয়াছেন'—এই দৃশ্য দেখে অশ্রুপাত করেছেন এবং তারপর 'মা যা হইবেন'—এই উজ্জ্বল সুপ্রভাতের আশায় সন্তানধর্ম প্রচার করেছেন; আর 'গোরা' তার 'দেবীকে দারিদ্র্যের মধ্যে অপমানের মধ্যে' প্রত্যক্ষ করে—'বন্ধনমুক্ত জ্যোতির্ময় ভবিষ্যতের' স্বপ্নে বিভোর হয়ে স্বদেশধর্মের সাধনায় আত্ম-নিয়োগ করেছে। এদিকে উভয় উপন্যাসের সমাপ্তি পর্বে মোহভঙ্গ ঘটান হয়েছে। সত্যানন্দকে বিরাট যুদ্ধ জয়ের পরই বিসর্জন দিতে হয়েছে সব আশাকে—তাঁকে আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলতে হয়েছে, "হায় মা, তোমায় উদ্ধার করিতে পারিলাম না।" আর সেখানে মহাপুরুষ পরবর্তী পন্থা নির্দেশ করেছেন, বহির্বিষয়ক জ্ঞান লাভ করে ভারতবর্ষে সনাতন ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে, ইংরেজ রাজত্ব তারই সহায়ক হবে। একথা পূর্বেই আলোচনা করেছি। এদিকে গোরার স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে, 'বাহ্যানুষ্ঠান ও দেশানুরাগের অচ্ছেদ্য নিত্য সম্বন্ধের কল্পনা' ভেঙে পড়েছে তার, তার আত্মোপলব্ধি এসেছে। তাই সে হিন্দুধর্ম ও হিন্দুজাতীয়তা নয়, ভারতবর্ষের দেবতাকে অর্থাৎ হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, ব্রাহ্ম সর্বজাতির সর্ব সম্প্রদায়ের সর্বকালের দেবতাকে বরণ করে 'সত্যকার কর্মক্ষেত্রে' 'সত্যকার সেবার' অধিকারী হয়েছে। মোটকথা 'আনন্দমঠের' তপস্যা পুনরায় সুরু হয়েছে সনাতন ধর্মের উন্নতি ও স্বদেশের মঙ্গল কামনায়, গোরার যাত্রা সুরু হয়েছে ভারতবর্ষের দেবতাকে বন্দনা করে কর্মক্ষেত্রে 'ভারততীর্থে'-র প্রতিষ্ঠাকল্পে। সমাপ্তির এ

বিভিন্নতা দুই মনীষীর দুই প্রকার দৃষ্টিভঙ্গির এবং দুই যুগের জাতিমানসের বিভিন্নতার পরিচায়ক। বঙ্কিম হিন্দু পুনরুজ্জীবনের ধারাকে বহন করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ ঐ ধারার মধ্য দিয়ে মানসবিবর্তনের মাধ্যমে বিশ্বমানবতার পথযাত্রী হয়েছিলেন। তাই দেখি 'আনন্দমঠে' মহাপুরুষ সত্যানন্দকে নিয়ে গেছেন হিমালয় শিখরের মাতৃমন্দিরের পথে। সেখানে পূর্ণ জ্ঞানলাভ করে মাতৃমূর্তি দর্শনের উদ্দেশ্যেই সত্যানন্দের তীর্থযাত্রা। এদিকে 'গোরা' সর্ববিধ সংস্কার ও তত্ত্বজ্ঞান বিসর্জন দিয়ে 'একেবারে…ভারতবর্ষের কোলের উপর ভূমিষ্ঠ' হয়ে 'মাতৃক্রোড় যে কাকে বলে তা…পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি' করেছে অর্থাৎ 'ভক্তিকে সম্পূর্ণ নিরাপদে রক্ষা করবার' লড়াই পরিত্যাগ করে 'পঞ্চবিংশতিকোটি লোকের যথার্থ কল্যাণ ভূমিতে—' এসে সে দাঁড়িয়েছে। বঙ্কিমের স্বদেশচিন্তা অতঃপর আদর্শলোকের উত্তুঙ্গ শিখরের পথে তীর্থযাত্রী হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তা অতঃপর ভাবলোকের শিখর ছেড়ে কোটিলোকের কল্যাণক্ষেত্রে নেমে এসেছে এবং ঐ কল্যাণক্ষেত্র বিস্তৃততর হয়ে জগৎক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। (শিল্পসাধনা ও মননের ক্ষেত্রে)। তাই কল্পনা করতে ইচ্ছা হয়, 'আনন্দমঠের' সত্যানন্দ হিমালয় শিখরের মাতৃমন্দির ছেড়ে 'গোরা'-রূপে একেবারে মাতৃক্রোড়ে ভূমিষ্ঠ হয়েছেন। এইভাবেই পূর্বসূরীর স্বদেশচিন্তার আদর্শ উত্তরসূরীর স্বদেশচিন্তায় পরিপূর্ণতা লাভ করেছে।

আমরা লক্ষ্য করেছি, জাতীয় আন্দোলনের পশ্চাতে 'আনন্দমঠ' সৃষ্টি করেছিল স্বদেশচিন্তার ভাবাবেগ এবং এর বৈপ্লবিক ভাষ্য (বঙ্কিমের কোন ইঙ্গিত না থাকলেও) অগ্নিযুগের মন্ত্ররূপেও ব্যবহৃত হয়েছিল; আর 'গোরা' হিন্দু-জাতীয়তাবোধের সংকীর্ণতাকে উদারতর ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস করেছিল; আবেগ সংযত করে কর্মক্ষেত্রে দেশকে আহ্বান জানিয়েছিল। (পুনরায় উল্লেখ্য, 'আনন্দমঠে' ইংরাজ রাজত্বকে বিধাতার মঙ্গল ইচ্ছা বলা হয়েছিল, আর 'গোরাতে' ইংরাজ রাজত্ব অবসানের কথা ওঠেনি, আত্মশক্তি-উদ্বোধনে সমাজ ও ধর্মের সত্যমুক্তিতে স্বতঃই তা গৌণ হয়ে যাবে, এ কথা স্পষ্টতর হয়ে উঠেছিল)। 'আনন্দমঠের' প্রভাব প্রত্যক্ষ ও তীব্রতর, 'গোরা'-র প্রভাব প্রত্যক্ষরূপে অনুভূত হয়নি তবে জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে এর প্রকাশ 'সূর্যের মতন', হয়ত অস্পৃশ্যতা-নিরোধ-আন্দোলন ও হরিজন-আন্দোলনের পশ্চাতে এর প্রভাব আছে। সবচেয়ে বড় কথা, গণসংগ্রামের ভূমিকা রচনায় কিছুটা এবং জাতীয়তাকে বিশ্বমানবতার দিকে প্রসারিত করার ইঙ্গিতদানে অনেকটা 'গোরা'র প্রভাব অনুভব করা গেছে—ভাবীকালের ইতিহাসে তার ফলশ্রুতি আরও

স্পষ্ট হবে সন্দেহ নেই। 'আনন্দমঠের' অবদান রাজনৈতিক চেতনা বিস্তারে, আর 'গোরা'-র অবদান বাস্তবনিষ্ঠ সমাজচেতনা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে।

অতঃপর পরবর্তী শিল্প সৃষ্টিগুলিতে দুই স্রষ্টার স্বদেশচিন্তার প্রকাশভঙ্গি লক্ষ্য করা যেতে পারে। বঙ্কিম এরপর 'অনুশীলন ধর্ম' অনুযায়ী আদর্শ হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন রচনা করেছেন (দেবী চৌধুরাণী, সীতারাম ও রাজসিংহ)। রবীন্দ্রনাথ অতঃপর তৎকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনের নীতিহীন পন্থা ও সংগঠনহীন আদর্শের স্বপ্নকে ভেঙে দেবার প্রয়াস করেছেন, 'ঘরে বাইরে' ও 'চার অধ্যায়' তার দৃষ্টান্ত।

স্বদেশচিন্তার ক্ষেত্রে "বঙ্কিমচন্দ্রের একটি প্রধান কীর্তি, ভারতীয় চিন্তাধারায় একটি নূতন সূত্রদান, গীতাকে রাজনৈতিক প্রয়োজনে ব্যবহার"।[২৭] মন্তব্যটি যথার্থ। আমরা জানি, আনন্দমঠের প্রস্তাবনায় মূলভাবটি বুঝাতে গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের চারটি শ্লোক উদ্ধৃত করা হয়েছিল। আর দেবী চৌধুরাণীর সমাপ্তিতেও গীতার শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে, 'ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।' উপন্যাসটির 'মটো' বা ভাবাদর্শরূপে ঘোষিত হয়েছিল, "The substance of Religion of culture"। বস্তুতঃ বঙ্কিমের 'অনুশীলন'-ধর্মের কাব্যিক প্রকাশ 'দেবী-চৌধুরাণী', যেখানে বিলাতী Patriotism-কে গীতোক্ত নিষ্কাম কর্মের উপর আরোপ করে 'দেবী চৌধুরাণীর' কর্মযোগ-সাধনা রূপ লাভ করেছে। আনন্দমঠে ছিল সমষ্টির সাধনা, এখানে তা ব্যষ্টির।

'আনন্দমঠের' ন্যায় এখানেও একদল উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত দস্যুর অবতারণা করা হয়েছে। উপাখ্যানে অসাধারণত্বের স্পর্শ ও অলৌকিকতা সত্ত্বেও দেশের বাস্তব অবস্থার যে মর্মস্পর্শী চিত্র অঙ্কিত হয়েছে এবং অরাজক অবস্থার যে বর্ণনা ভবানী পাঠকের মুখে শোনা গিয়েছে তা অতি জীবন্ত। কিন্তু কঠোর বৈরাগ্য ও দেশহিতব্রতের উপর গার্হস্থ্য ধর্মের জয় ঘোষণা করে বঙ্কিমচন্দ্র আর একবার যেন বলে উঠেছেন, 'সমাজ বিপ্লব অনেক সময় আত্মপীড়ন মাত্র, বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী।' এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য যথার্থ—"আনন্দমঠে দেশপ্রীতিই মুখ্য বস্তু, ধর্ম অপ্রধান। দেবী চৌধুরাণীতে ধর্ম প্রধান। দেশসেবা ও অত্যাচারের প্রতিরোধ একটা নামমাত্র উদ্দেশ্য"।[২৮]

আসলে 'ধর্মতত্ত্ব' প্রচারের আগ্রহ বঙ্কিম সাহিত্যজীবনের শান্তিপর্বের সূচনা করেছিল। তাই বাস্তব পটভূমিকায় কাহিনীর নায়িকাকে দিয়ে 'অনুশীলন' পরিকল্পনাটি রূপায়িত করেছেন তিনি। তাঁর উপন্যাসে ব্রিটিশ শাসনের অভ্যুদয়

কালের অরাজক দেশের প্রতিরোধ আন্দোলনে ভবানী পাঠক নেতৃত্ব দিয়েছে। বঙ্কিমের কল্পনায় দস্যু আদর্শ পুরুষের গৌরবলাভ করেছে, এইজন্যই তার মুখে প্রজাদের প্রতি অত্যাচারের বর্ণনা ("...ভূম্যধিকারীর দুর্বিসহ দৌরাত্ম্য বর্ণনা করিলেন।" সাহিত্য পরিষদ সং) আনন্দমঠের ভবানন্দের অনুরূপ উক্তিকে স্মরণ করিয়ে দেয় (৯ম পরিচ্ছেদ, ১ম খণ্ড)। ভবানন্দের কথায় বুকে হাঁটা "নীচজীব সাপের ঘাড়ে পা দিলে সেও ফণা ধরিয়া ওঠে", অতএব সেখানে ফণা তুলেছিল সন্তানদল, এখানে লাঠি ধরেছে ভবানী পাঠক এবং দেশ শান্ত হলে ভবানী পাঠক ধরা দিয়ে হাসি মুখে দ্বীপান্তরে গেছে। সুস্পষ্ট ভাবেই লক্ষ্য করা যায় যে 'ত্রয়ীর'-অন্তর্গত উপন্যাসগুলির আশ্রয়ে আত্মবিস্মৃত দেশবাসীকে স্বদেশ-প্রীত এবং শ্রেয়বোধে উদ্বুদ্ধ করাই বঙ্কিমের উদ্দেশ্য ছিল। অথচ 'আনন্দমঠ' সৃষ্টির পর পরই কালীপ্রসন্ন ঘোষকে একটি পত্রে বঙ্কিম জানিয়েছিলেন,—"আমি আনন্দমঠ লিখিয়া কি করিব, আর আপনি বা তাহার মূলমন্ত্র বুঝাইয়া কি করিবেন? এ ঈর্ষাপরায়ণ জাতির উন্নতি নাই। বল 'বন্দে উদরং।'" অর্থাৎ বঙ্কিম ইতিমধ্যেই স্বজাতির (স্পষ্টত বাঙালি জাতির) স্বার্থপরায়ণতা ও ঈর্ষা সম্পর্কে তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। তাই স্বদেশী ও স্বজাতীয় মন্বন্তর দলের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ বঙ্কিমের ঐ আক্ষেপ স্বাভাবিক। কিন্তু জাতিসংগঠক বঙ্কিমের লেখনী বন্ধ হয়নি এবং একথা সত্য তাঁর প্রয়াস ব্যর্থ হয়নি। তাই আত্মাদরে স্ফীত, অন্তঃসারশূন্য, ক্লীবত্বপ্রাপ্ত বাঙালির দেশে সহসা রোমান্সের পটভূমিতে যখন ভবানী পাঠকের দলের হাতে লাঠি ঘূর্ণ্যমান হয়ে, "বাঙালীর আব্রুপর্দা রাখিতে, মান রাখিতে, ধন রাখিতে, জন রাখিতে, সবার মন রাখিতে" উদ্যত হয়, তখন আমরাও ক্ষণকালের জন্য স্বার্থপরতার ছদ্মবেশ খসিয়ে বীরজাতিতে পরিণত হই।

জমিদার ইজারাদারদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামের এই উদ্দীপনায় আমরা যেন বাস্তব জীবনের হীনতা হতে মুহূর্তে আদর্শলোকে উন্নীত হই।

মনে রাখতে হবে, 'দেবী চৌধুরাণী'-তে ধর্মই মুখ্য, হিন্দুধর্ম রক্ষা এর মহৎ ব্রত, আর প্রফুল্ল 'অনুশীলন ধর্ম' (অর্থাৎ বঙ্কিমের দ্বারা প্রতিপাদিত সমন্বয়ধর্ম)—এর প্রতীক। প্রফুল্ল-এর উক্তিতে তাই পরম নিষ্ঠার প্রতিনিধি 'কর্ম শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিয়াছি।' অতএব সমাজের কল্যাণের জন্য, সর্বাঙ্গীন মঙ্গলের জন্য আত্মোৎসর্গ করার আদর্শ বঙ্কিম তুলে ধরেছেন 'প্রফুল্ল' চরিত্রের মাধ্যমে। এইভাবে বঙ্কিম গীতোক্ত ধর্মকে যে স্বদেশচিন্তার পরিধিতে এনে, দেশপ্রেমকে একটা পবিত্র 'creed'-রূপে ঘোষণা করলেন, তার সার্থকতা লক্ষ্য করা গেছে

মাত্র তিন দশক পরেই—বিবেকানন্দ ও অরবিন্দের স্বদেশভাবনায় ও বাস্তব সংগঠনে।

'দেবী চৌধুরাণী'-তে ইতিহাসের ক্ষীণ সূত্রটি মাত্র ছিল, 'সীতারামে' ঐতিহাসিক ঘটনা আরও বাস্তব, তবে উদ্দেশ্য পূর্বকথিত হিন্দুধর্ম পুনরুদ্ধার এবং ধর্ম-সাম্রাজ্য স্থাপনের আদর্শ প্রচার। 'ত্রয়ী-র শেষ খণ্ডটিও অনুশীলন ধর্মের বার্তাবাহী, গ্রন্থারম্ভেই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শ্লোক উদ্ধরণই তার প্রমাণ। আমরা জানি, 'প্রচার' পত্রিকার ১ম সংখ্যাতেই "বাঙ্গলার কলঙ্ক' এবং 'হিন্দুধর্ম' নামে দুটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। "এই দুটিতে সীতারাম উপন্যাসে প্রতিপাদ্য তত্ত্ব অতি স্পষ্টভাষায় লিখিত আছে। প্রথম প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীজাতির প্রতি আরোপিত মিথ্যা কলঙ্কের ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়াছেন।" আমরা ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি 'বাঙ্গালীর কলঙ্কক্ষালন' এবং 'সর্ববিধ উন্নতির জন্য ধর্ম' সম্পর্কে বঙ্কিমের আগ্রহ কত গভীর ছিল এইকালে। 'সীতারামে' তারই স্পষ্ট প্রভাব মুদ্রিত। 'বাঙ্গালীর বল' সঞ্চার এবং সংস্কৃত-হিন্দুধর্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই বঙ্কিমচন্দ্রের 'সীতারাম' রচিত হয়েছিল। এদিকে ঐতিহাসিকতা রক্ষার প্রতিশ্রুতি ১ম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে ছিল না, উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়েছিল এইভাবে—"সীতারাম ঐতিহাসিক ব্যক্তি। এই গ্রন্থে সীতারামের ঐতিহাসিকতা কিছুই রক্ষা করা হয় নাই। গ্রন্থের উদ্দেশ্য ঐতিহাসিকতা নহে।" অর্থাৎ বঙ্কিম ইতিহাসের পারম্পর্য মেনেছেন কিন্তু পূর্বঘোষিত উদ্দেশ্য অনুযায়ী ঘটনা-গুলিকে সৃষ্টি করেছেন, চরিত্র রচনা করেছেন। তবে গ্রন্থের উদ্দেশ্য কি? নিঃসন্দেহে 'অনুশীলন'-ধর্ম অনুযায়ী হিন্দু-ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন রচনা করা এবং ঐতিহাসিক তথ্যের সাহায্যে বাঙালির কলঙ্ক অপনোদন করা। আর সর্বোপরি স্বদেশবাসীদের উচ্চাঙ্গের আদর্শে দীক্ষাদানের উদ্দেশ্য ছিলই।

ইতিপূর্বে 'আনন্দমঠ' ও 'দেবী চৌধুরাণী'-র সংঘবদ্ধ প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে, দেশের ভার বিদেশী শাসকের হাতে তুলে দিতে হয়েছে, তার কারণ রাষ্ট্রশক্তির প্রতিকূলতা। 'state-power' ছাড়া সমাজের শিক্ষা, উৎপাদন সবই ব্যাহত হতে বাধ্য। বৃষের রাজনীতি তখন কুকুরের রাজনীতি হতে বাধ্য। বঙ্কিম এর প্রতিবিধানের কল্পনা করলেন 'সীতারামে', কিন্তু ঐতিহাসিক সত্যের খাতিরে তাও সম্পূর্ণ সফল হতে পারল না। সীতারামের ব্যক্তিগত সাধনা ও প্রয়াসে, চন্দ্রচূড়ের উদ্দীপনী শক্তির সহায়তায়, রাষ্ট্রশক্তিও করায়ত্ত হয়েছিল, কিন্তু সাধারণ সমাজ অর্থাৎ রামচাঁদ শ্যামচাঁদের দল উদাসীনই রয়ে গিয়েছিল। 'যে ইচ্ছা রাজা হউক আমাদের কি?' এই ঔদাসীন্যে রাজার রাজত্ব স্থায়িত্ব পেল না,

কারণ, 'এদেশে রাজা গেলেই রাজ্য যায়।' তত্ত্ববুদ্ধিহীন জনসমষ্টি সমাজ নামের অযোগ্য, তা রাষ্ট্রশক্তির পোষক ও ধারক হতে পারে না। 'আনন্দমঠ' 'দেবী-চৌধুরাণী' ও 'সীতারাম'—সর্বত্রই এই ব্যর্থতা। তথাপি একথা সত্য,—"In Anandamath, Rajsinha and Sitaram, Bankim Chandra's purpose was to preach the gospel of Patriotism."[২৯]

ঐ 'gospel of patriotism' শিক্ষা দিতে বঙ্কিম নব্য হিন্দুধর্মকে (অনুশীলন) ভূমিকারূপে গ্রহণ করেছেন। এখানে সীতারামের হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন সার্থক হয়েও অকালে ভঙ্গ হল কেবলমাত্র সমাজের ঔদাসীন্যেই নয়, সীতারামের চারিত্রিক-স্খলনও তার জন্য দায়ী। আর একটি বৈশিষ্ট্য এ গ্রন্থে খুব লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে, তা হল সমালোচকের কথাতে—"The most eloquent note in this novel is his love for Hinduism."[৩০]

'হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে?' তাই বোধহয় ঐতিহাসিক চরিত্র সীতারামের মাধ্যমে হিন্দুরক্ষা এবং হিন্দুধর্ম পুনরুদ্ধারের কামনা জেগেছে বঙ্কিমের, অর্থাৎ অতীত গৌরবে বর্তমানের হীনমন্যতাকে খর্ব করার ইচ্ছা দেখা গিয়েছে। 'পাথর এমন করিয়া পালিশ করিয়াছিল সে কি আমাদের মত হিন্দু?' এই জাতীয় মন্তব্যগুলিই সেই অতীত গৌরবের মধ্যে আত্মতৃপ্তিলাভের বাসনার প্রকাশ। আদর্শপুরুষ ছাড়া হিন্দুগৌরব পুনরুদ্ধার করা অসম্ভব, ('কৃষ্ণ চরিত্রে' বঙ্কিম ইতিপূর্বেই তা প্রতিপন্ন করেছিলেন) অতএব পরবর্তী সৃষ্টি 'রাজসিংহ'-এ সেই আদর্শ পুরুষের সন্ধান পাওয়া যাবে।

মোটকথা, 'ত্রয়ী' উপন্যাস পর্বে বঙ্কিম হিন্দুধর্ম পুনরুজ্জীবনের আদর্শ, হিন্দু-রাজত্ব প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন আবেগভরা ভাষাচিত্রে এবং বর্ণাঢ্য ঘটনার সমাবেশে পরিবেশন করেছেন। বঙ্কিমের স্বদেশচিন্তার এই শিল্পমূর্তিগুলিকে দেশপ্রেমের ইন্দ্রধনুর সপ্তবর্ণচ্ছটা অপরূপ রূপেই রঞ্জিন করে তুলেছে। কিন্তু ঐ ইন্দ্রধনুতে 'Neo-Hindu-Revival'-এর গৈরিক রংটিই যেন গাঢ় হয়ে উঠেছে, তাই সর্বত্রই 'বৈরাগীর উত্তরীয় পতাকা করিয়া নিও'—এই আদেশ যেন ধ্রুপদরাগিনী বাজিয়েছে, এবং এই জাতীয় আদর্শ পরিবেশ ছিল বলেই গুরু সত্যানন্দ, ভবানী পাঠক এবং চন্দ্রচূড়ের পরিকল্পনাগুলি নিষ্ঠাভরে প্রতিপালিত হয়েছে। ব্যর্থতা এসেছে ইতিহাসের ইঙ্গিতে, অসংগঠিত সমাজের ঔদাসীন্যে। বজ্র হেন ভারী এই তরবারি ধারণ করার উপযুক্ত 'স্বদেশী সমাজ' তখনও গড়ে ওঠেনি, অতএব স্বদেশপ্রেরণার অগ্নিশিখা আপনিই নির্বাপিত হয়েছে। ভবিষ্যতে যেমন করে 'চৌরিচাওয়া' বা 'বার্দ্দোলির' উন্মত্ততার পর দেশনায়ক তাঁর সত্যাগ্রহ

আন্দোলন স্থগিত করেছেন,—ঠিক তেমনি ইতিহাসের ইঙ্গিত বুঝি এখানেও ফুটে উঠেছে। ইতিহাসের ভাগ্যবিধাতা তাঁর পাশুপত অস্ত্র সংবরণ করেছেন, আর ঔপন্যাসিক বঙ্কিম বিভিন্ন যুক্তি দিয়েছেন সান্ত্বনা হিসাবে—(১) "তুমি বুদ্ধির ভ্রমক্রমে দস্যুবৃত্তির দ্বারা ধন সংগ্রহ করিয়া রণজয় করিয়াছ। পাপের কখন পবিত্র ফল হয় না।" (২) "ধর্মই স্ত্রীলোকের ধর্ম, রাজত্ব স্ত্রীজাতির ধর্ম নয়।" আর, রাজ্য সুশাসিত হইল। সুতরাং ভবানীঠাকুরের কাজ ফুরাইল। (৩) কামোন্মত্ত সীতারামের অধঃপতন ও জয়ন্তীকে সর্বসমক্ষে বিবস্ত্র করার আজ্ঞা-প্রচারই অগ্নি প্রজ্বলিত করেছে, এবং রাজ্য অতল জলে গেছে।

'কৃষ্ণচরিত্র' রচনা এবং বাংলাদেশের আগ্রাসী হিন্দুধর্মের প্রচারের যুগে 'ত্রয়ী'-তে' উপস্থাপিত হিন্দুরাজ্য-প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন, সামগ্রিক উদারতা এবং বিশ্বমৈত্রীর বাণী ('ধর্মতত্ত্বে'-ও ছিল) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মনে কিছু সন্দেহের সৃষ্টি করেছে পরবর্তীকালে। এ ব্যাপারটি অস্বাভাবিক নয়। আনন্দমঠে যে প্রেরণা ছিল লঘু, 'সীতারামে' তার স্বর গম্ভীর,—'হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে?' 'সীতারাম' উপন্যাসের ১ম সংস্করণের পর পরিত্যক্ত অংশে স্পষ্টই ছিল,—"যে দিকে সীতারাম মনশ্চক্ষু ফিরান, সেইদিকে দেখিতে পান মুসলমানের অত্যাচার। ভাবিলেন কোথায় ইহার প্রতিকার? সীতারাম অন্তরমধ্যে উত্তর পাইলেন। প্রতিকার 'ধর্মরাজ্য স্থাপন'।…তখন সীতারাম কায়মনোবাক্যে জগদীশ্বরে চিত্তসমর্পণ করিলেন। তিনি বুঝিলেন ধর্মই ধর্মসাম্রাজ্য স্থাপনের উপায়।"[৩১] এই কথাগুলি কিছুটা ভুল ধারণা সৃষ্টি করতে পারে বলেই বঙ্কিম পরবর্তী সংস্করণে এ অংশ পরিত্যাগ করেছিলেন।

অবশ্য ফকির সাহেবের কথোপকথন এই তথাকথিত অপবাদের খণ্ডন করে, আর 'মহম্মদপুর' নামকরণ, ও প্রজার প্রতি সমদৃষ্টিদানের প্রতিশ্রুতিও সেজন্য। ফকিরের উপদেশ ছিল, "দেশাচারের বশীভূত হইলে তিনি হিন্দুরাজ্য স্থাপন করিতে পারিবেন না।"

বঙ্কিম যে সাম্প্রদায়িকতার অনেক ঊর্ধ্বে ছিলেন তার প্রমাণরূপে ১ম সংস্করণে উল্লিখিত উক্ত কথোপকথন অতি গুরুত্বপূর্ণ।[৩২] তা সত্ত্বেও হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার কামনা, ভারতীয় ঐতিহ্যরূপে বৈদিক ও পৌরাণিক যুগের গৌরব প্রচার, 'ধর্মতত্ত্বে'-র গীতোক্ত অনুশীলন—এ সবই উচ্চরবে বঙ্কিমের সামগ্রিক শুভচিন্তার বাণীকে কিছুটা অস্ফুট করে তুলেছিল।

আরও একটি বৈশিষ্ট্য এই, 'ত্রয়ী'-র সবগুলি যুদ্ধের চিত্রই স্থানিক, নায়ক-নায়িকারাও প্রাদেশিক শ্রেয়বোধে উদ্বুদ্ধ। আনন্দমঠের সন্ন্যাসীদল, ভবানী-

পাঠকের দল কিংবা চন্দ্রচূড় সকলেই বাঙালি, সকলেরই ধ্যান বাংলার কল্যাণীয়া মূর্তিটি। সর্বত্রই পটভূমিটি 'সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং'—বঙ্গভূমি বলেই প্রতীয়মান হয়। অবশ্যই উপন্যাসের ক্ষেত্রে 'Local colour' স্বাভাবিক, কিন্তু প্রবন্ধাবলীতে বঙ্কিমের বঙ্গপ্রীতিমূলক রচনায় বাংলার সমস্যাই বেশি বিশ্লেষিত। বৃটিশ ভারতে অর্থনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ঐক্যবদ্ধ একটি স্বার্থকেন্দ্রে গ্রথিত দেশ বঙ্কিমের ধারণায় খুব বেশি স্থান পায়নি, এমনি অভিযোগ উঠেছে। তাঁর আদর্শের ও কর্মনীতির এই অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে অভিযোগ হয়ত সম্পূর্ণ অমূলক নয়, কিন্তু তার সবটুকু অংশ স্বীকার করা চলে না। ডঃ জয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত বঙ্কিমের হিন্দুপ্রীতি ও বঙ্গপ্রীতির সম্পর্কে অভিযোগের খণ্ডনে নিম্ন উদ্ধৃতিটুকু ব্যবহার করেছেন—

> An eminent critic Brander Mathew says, "Not only it is impossible for a man to get away from his country but it is equally impossible for him to get away from his own nationality." Has any author ever been able to create a character of a different stock from his own? Certainly all the greatest figures of fiction are compatriots of their authors."
>
> —The forum, vol. XXIV, 1897-98, p. 84.

বঙ্কিমের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত অভিযোগ খণ্ডনের জন্য প্রদত্ত উক্তিটি যথার্থ। অন্ততঃ উপন্যাসের ক্ষেত্রে বঙ্কিমের বঙ্গপ্রীতি বা হিন্দুপ্রীতির অভিযোগ করা চলে না, প্রবন্ধের ক্ষেত্রে কিছুটা হয়ত মেনে নিতে হয়। সেক্ষেত্রেও যুগ-প্রবণতাই যে তার কারণ তা আমরা ইতিপূর্বেই প্রতিপন্ন করেছি। উপন্যাসের ক্ষেত্রে এই দুটি অভিযোগের বিরুদ্ধে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ স্বরূপ 'রাজসিংহ'-কে উল্লেখ করা যেতে পারে। এতে রাজপুতানার পটভূমিকায় 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' সৃষ্ট হয়েছে, এবং তাতে হিন্দুরাজত্ব প্রতিষ্ঠার কথা থাকলেও শেষ পরিচ্ছেদের 'গ্রন্থকারের নিবেদনে' বঙ্কিমের সমদৃষ্টির পরিচয়ও লিপিবদ্ধ হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-সৃষ্টিতে এই প্রথম তাঁর আদর্শপুরুষ-চরিত্রটি ইতিহাসের বিচারে উত্তীর্ণ হয়েছে, তাঁর বহুদিন পোষিত কল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করেছে। শুধু 'রাজসিংহ' চরিত্রটিই নয়, কল্পনার রসে সঞ্জীবিত অন্যান্য চরিত্রগুলিও সত্যবুদ্ধি ও জাতিগত ঐতিহ্যে দীপ্ত এবং অপূর্ব প্রাণশক্তিসম্পন্ন। বঙ্কিম প্রচারিত 'ধর্মতত্ত্বে'-র আদর্শে গড়া সমাজমানুষ যেন এখানে পাওয়া যায়—এই রাজপুতানার মেবারে (টডের

রাজস্থানের সাক্ষ্য এদের স্বপক্ষে)। রণকৌশল, শক্তি, সাহস, হৃদয়বত্তায় এরা বঙ্কিমের কাম্যমূর্তি। এরা হিন্দু ঐতিহ্যকে রক্ষা করে, ক্ষুধার্তকে অন্ন জোগায়, শত্রুও অতিথি হলে তার সেবা করে, আবার কেবলমাত্র প্রজার দুঃখে দুঃখী হয়েই যুদ্ধজয়ের পরও রাজ্যস্থাপনা স্থগিত রাখে। সবচেয়ে বেশি লক্ষণীয় মহত্বের কথা এই যে রাজসিংহ যুদ্ধ জয়লাভের পর কেবলমাত্র 'দয়ার অনুরোধে হিন্দু-সাম্রাজ্য পুনঃস্থাপিত করিলেন না।' 'রাজসিংহ'-এর ৪র্থ সংস্করণের ভূমিকায় (১৮৯৩ খ্রীঃ) লিখিত বঙ্কিমের উদ্দেশ্যকথনটি গুরুত্বপূর্ণ। ইতিপূর্বে 'ভারতকলঙ্ক' প্রবন্ধে ভারতীয়দের অধঃপতনের কারণ বিশ্লেষণ করা হয়েছিল।[৩৩] উনবিংশ শতকেও হিন্দুদের ক্লীবত্ব বঙ্কিমকে ব্যথিত করেছিল, অতএব তিনি ইতিহাস অনুসন্ধান করে হিন্দুদের বাহুবল প্রতিপাদন করেছেন। তিনিই স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন, "হিন্দুদিগের বাহুবলই আমার প্রতিপাদ্য। উদাহরণ স্বরূপ আমি রাজসিংহকে লইয়াছি।" এই কারণেই বঙ্কিম উপন্যাসের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। রাজসিংহের সঙ্গে মোগলবাদশাহ ঔরঙ্গজেবের মহাযুদ্ধ, ইতিহাস অনুসারে অবিকৃত আছে। (আধুনিক ঐতিহাসিকের মতে ঔরঙ্গজেবকে কৌশলে বিপর্যস্ত করার কথা সবটা সত্য নয়)। লক্ষ্য করা যায়, কী আশ্চর্যরূপে গতিশীল এই ইতিহাসের কালচক্র, বঙ্কিম সেই চক্রনিনাদে প্রাচীন হিন্দু-ঐতিহ্যপোষিত মধ্যযুগের রাজসিংহের বলবীর্যময় শঙ্খনাদ শুনেছেন। ঐ শঙ্খনাদ শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্য না হতে পারে; কিন্তু তাকে বীরত্বের উদ্বোধন সঙ্গীত বললে অত্যুক্তি হয় না। এই বীরত্বের বাণীসঞ্চারই তাঁর লক্ষ্য ছিল। গ্রন্থের ভূমিকা ও উপসংহারে তাঁর প্রতিপাদ্য একই, তা হল 'হিন্দুর বাহুবল'। একই সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে দ্রষ্টা বঙ্কিমের সাবধানবাণী, "অন্যান্য গুণ থাকিতেও যাহার ধর্ম নাই, হিন্দু হৌক, মুসলমান হৌক, সেই নিকৃষ্ট।"

এদিকে বঙ্কিম নিজেই সচেতন ছিলেন পাছে তাঁর হিন্দুপ্রীতি সম্পর্কে কোন অভিযোগ ওঠে। তাই ভবিষ্যৎ সন্দেহের বিরুদ্ধে একটি রক্ষাকবচও তিনি বেঁধেছেন, "হিন্দু হইলেই ভাল হয় না, মুসলমান হইলেই মন্দ হয় না, অথবা হিন্দু হইলেই মন্দ হয় না, মুসলমান হইলেই ভাল হয় না। ভাল-মন্দ উভয়ের মধ্যে তুল্যরূপেই আছে।" ওদিকে আবার ঔরঙ্গজেবকে স্পেনের ফিলিপের সঙ্গে তুলনা করে মুসলমান বিজেতাদের রাজকীয়গুণের ভূয়সী প্রশংসা করে হিন্দুপ্রীতির বা পক্ষপাতিত্বের বিপরীত পাল্লায় কিছু ওজন চাপিয়ে সামঞ্জস্য রক্ষা করা হয়েছে।[৩৪] বঙ্কিমের উদ্দেশ্যের সততায় ও আন্তরিকতায় এতটুকু অবিশ্বাস করার কারণ নেই। সবকিছু মিলিয়ে যে সন্দেহের উৎপত্তি, তার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র

দায়ী নন। 'অনুশীলন' প্রচারনিষ্ঠা এবং হিন্দু-ঐতিহ্য-গৌরববোধ তাঁর পক্ষে খুব স্বাভাবিক ছিল, যুগের ইঙ্গিত ও দাবী তিনি মেনেছেন। কিন্তু অব্যবহিত পরবর্তী দশকে বিবেকানন্দের বেদান্ততত্ত্বের সিংহনাদে এবং অরবিন্দের 'ভবানী মন্দির'-এ প্রচারিত মন্ত্রসাধনায় আগ্রাসী হিন্দু-ধর্মের উন্মাদনায় যে আবহ সৃষ্ট হয়েছিল, তাতেই সংখ্যালঘুদের মনে উক্ত সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছিল। ইতিহাসের বিচিত্র গতিতে যা হয়েছে, তজ্জন্য বঙ্কিম প্রত্যক্ষত দায়ী নন।

আগেই উল্লেখ করেছি, 'রাজসিংহ' উপন্যাসে বঙ্কিম বঙ্গপ্রীতির বৃত্ত হতে বেরিয়ে এসেছিলেন। 'ধর্মতত্ত্বের' শেষে বঙ্কিম কামনা করেছিলেন,—'ভারতবর্ষ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠজাতির আসন গ্রহণ করিতে পারিবে।' 'রাজসিংহ'-এ ছিল সেই ভারতের ঐতিহ্যকথন। বঙ্কিমের আদর্শ-কল্পনার অনন্যসাধারণ সিদ্ধিরূপে 'রাজসিংহ' পুনরায় বাঙালি পাঠকের কাছে 'gospel of patriotism' বলে অভিনন্দিত হয়েছে। আনন্দমঠ-রচনার পর হতেই একজাতীয় শ্রেষ্ঠতাবোধের পরিচয় যে বঙ্কিমের শিল্পসৃষ্টিতে বিদ্যমান ছিল, তা আমরা লক্ষ্য করেছি। কিন্তু তাকে সুস্পষ্ট-রূপে নেতিধর্মী বলা চলে কিনা সন্দেহ। বরং একে বলা যায় যুগ প্রবণতাগুলিকে সমন্বয় করার প্রয়াস, 'ধর্মতত্ত্বে' তারই দৃষ্টান্ত আছে। পরাজিত জাতির মনোবৃত্তি বা ঐতিহ্য-উল্লাসিকতারূপে একে একেবারে 'নেতিধর্মী' বলে চিহ্নিত না করে, সমগ্র উনবিংশ শতকের মানস-বিবর্তনের ফলশ্রুতিরূপে মূল্যায়ন করাই ভালো। আর ঐ প্রবণতা রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসের মধ্যেও কিছু পরিমাণে প্রতিফলিত দেখা গেছে। তবে বিংশ শতাব্দীর মুক্ত-দৃষ্টি ও জাগ্রতবুদ্ধিতে রবীন্দ্রনাথ তাকে যুগস্বভাবেই অতিক্রম করতে পেরেছিলেন। তাই রবীন্দ্রনাথকে বঙ্কিমের সুযোগ্য উত্তরসূরী বলে আমরা নানাক্ষেত্রেই নিঃসন্দেহ হতে পেরেছি। উত্তরসূরী রবীন্দ্রনাথের ঐ উত্তরণ 'গোরা'-তেই ঘটেছে—আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি, পরবর্তী উপন্যাস দুটিতেও সেই উত্তরণের পরিচয় আছে। এবার এ সম্পর্কে পর্যালোচনা করা যেতে পারে। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের প্রসঙ্গে সাময়িক বাদ-বিবাদের উত্তরে লেখকের কৈফিয়ৎ অনুযায়ী, শিল্পের উপকরণে সাময়িক অভিজ্ঞতা ও ভালোমন্দ লাগাটা যা আছে, আমরা কেবল, তার থেকেই আমাদের আলোচ্য প্রসঙ্গটি বিচারের চেষ্টা করব, শিল্পবিচার আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

"ঘরে বাইরে'-র আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে দুইটি সুর আছে প্রথম রাজনৈতিক ও দ্বিতীয়টি সমাজনীতিমূলক"।[৩৫] আমরা আপাতত রাজনৈতিক বিষয়টিই পর্যালোচনা করব। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের রাজনৈতিক পটভূমিতে আছে

বাংলাদেশের স্বদেশী আন্দোলনের যুগ। আমরা জানি, দেশাত্মবোধের ভরা জোয়ারে একদিন 'বন্দমন্ত্রের উদ্গাতা' স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও দেশবাসীকে আহ্বান করেছিলেন, অথচ মাত্র তিনমাসের মধ্যেই এই অনুভূতিপ্রবণ মনীষী সমগ্র আন্দোলনের আবেগের তলদেশে যে একটা মস্ত ফাঁকি ছিল তা উপলব্ধি করে সরে এসেছিলেন। এ বিষয়ে আমরা রাজনৈতিক প্রবন্ধাবলীর প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি।

তৎকালে কয়েকমাসের মধ্যেই রাজনৈতিক উন্মত্ততায় ভাটা পড়েছিল, তাই রবীন্দ্রনাথ ঐ বিসদৃশ নেশাগ্রস্ততার বিরোধিতা করে নানা প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তারপর স্বদেশী আন্দোলন একসময় সন্ত্রাসবাদের সুড়ঙ্গ পথে যাত্রা করেছিল, আর স্বদেশীর নামে দস্যুতা প্রভৃতিও দেখা দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তারও প্রতিবাদ করেছিলেন। (দ্রষ্টব্য : 'পথ ও পাথেয়', 'দেশহিত', 'সদুপায়' ইত্যাদি)। তৎকালে তিনি বারম্বার সংগঠনমূলক স্বদেশ-সেবার দিকে আমাদের দৃষ্টি-আকর্ষণ করেও বিশেষ সাড়া পাননি। তার ইতিহাসও আমরা জানি। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের রাজনৈতিক পটভূমিতে আছে ঐ আবেগোন্মত্ত স্বদেশীযুগের সমাজ। দেশাত্মবোধ সম্বন্ধে নানা তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় আমূল পরিবর্তন এসেছিল। সমালোচকের কথায় বলা যায়, "দেশধর্ম ও মানবিকধর্মে যে বিরোধ একদিন দেখা দিল সে বিরোধে রবীন্দ্রচিত্তে মানবতার ধর্মই হইল জয়ী।"

আসলে, রবীন্দ্রনাথ 'স্বদেশীসমাজ' প্রবন্ধে গঠনমূলক দেশসেবার যে পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন এবং নিজের জমিদারীতে যার প্রয়োগ সুরু করে-ছিলেন, সেই আদর্শই অনেকটা 'নিখিলেশের' মাধ্যমে উপস্থাপিত। (অন্ততঃ রাজনৈতিক আদর্শে)।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কৈফিয়তে যে ভালোমন্দলাগা এবং 'সাময়িক অভিজ্ঞতা'-র কথা বলেছিলেন. তার চিত্রণ উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর ডাইরীতে অথবা পারস্পরিক তর্ক-বিতর্কে বা কথোপকথনে ফুটেছে। তার কিছু কিছু রবীন্দ্রনাথের এই যুগের নানা প্রবন্ধে প্রচারিত মন্তব্যগুলির সঙ্গে তুলনা করলেই উদ্দিষ্ট আদর্শটি স্পষ্ট উপলব্ধি করা যাবে—

(১) বিমলার আত্মকথায় নিখিলেশ প্রসঙ্গে মন্তব্য : "বন্দেমাতরম্ মন্ত্রটি তিনি চূড়ান্ত করে গ্রহণ করতে পারেন নি। তিনি বলতেন, দেশকে আমি সেবা করতে রাজি আছি, কিন্তু বন্দনা করব যাঁকে তিনি ওর চেয়ে অনেক উপরে। দেশকে যদি বন্দনা করি তবে দেশের সর্বনাশ করা হবে।"

আবার নিখিলেশের উক্তিটি : "আমি তোমাকে সত্য বলছি সন্দীপ, দেশকে দেবতা বলিয়ে যখন তোমরা অন্যায়কে কর্তব্য, অধর্মকে পুণ্য বলে চালাতে চাও, তখন আমার হৃদয়ে লাগে বলেই আমি স্থির থাকতে পারিনে।" রবীন্দ্রনাথ নিখিলেশের জবানীতে দেশ সম্বন্ধে ভাবাবেগ ও নেশাগ্রস্ততার কথা যা বলেছেন, 'কালান্তর' পর্বের বহু প্রবন্ধে নানাভাবে সে সম্বন্ধে তিনি দেশবাসীকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। 'সত্যের আহ্বান', 'স্বরাজসাধন', 'রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত', 'রায়তের কথা' প্রভৃতি অনেক প্রবন্ধই এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়। এর আগের যুগেও ('বঙ্গদর্শনে' ও 'ভারতী'তে প্রকাশিত) 'স্বদেশীসমাজ', 'দেশহিত', 'ব্যাধি ও প্রতিকার' ইত্যাদি প্রবন্ধেও এসম্পর্কে পুনঃ পুনঃ সজাগ হবার জন্যে দেশবাসীকে বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। তার মধ্যে একটি বক্তব্য তুলে দিচ্ছি :

(১) "আমরা দেশকে যে যতই ভালবাসি না কেন দেশকে ঠিকমত কেহ কোনোদিন জানি না।" (ব্যাধি ও প্রতিকার, ১৩১৪)

(২) নিখিলেশের আত্মকথা হতে আর একটি মন্তব্য : "আজ সমস্ত দেশের ভৈরবীচক্রে মদের পাত্র নিয়ে আমি যে বসে যাই নি এতে সকলেরই অপ্রিয় হয়েছি।" এবার কালান্তর পর্ব হতে ঐ 'ভৈরবীচক্রের' অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করা যাক : "সেদিন চারদিক থেকে বাংলাদেশের হৃদয়াবেগের উপরেই কেবল তাগিদ এসেছে। কিন্তু শুধু হৃদয়াবেগ আগুনের মতো জ্বালানি বস্তুকে খরচ করে ছাই করে ফেলে, সে তো সৃষ্টি করে না।" (সত্যের আহ্বান)

(৩) 'সন্দীপের আত্মকথায়' নিখিলেশের একটি উক্তি : "সত্যের সাধনা করবার শক্তি তোমরা খুইয়েছ বলেই তোমরা হঠাৎ আকাশ থেকে একটি মস্ত ফল পেতে চাও। তাই শত শত বৎসর ধরে দেশের যখন সকল কাজই বাকি, তখন তোমরা দেশকে দেবতা বানিয়ে বর পাবার জন্যে হাত পেতে বসে আছ।"

'আত্মশক্তি' ও 'সমূহ' গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধগুলিতে এবং 'কালান্তর' গ্রন্থে 'স্বরাজ-সাধন' ইত্যাদি প্রবন্ধে দেশকে সেবার মধ্য দিয়েই দেশকে পাবার কথা, সংগঠনের কথা অজস্র ধারায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন। এ-সম্পর্কে আমরা আগেই আলোচনা করেছি।

(৪) আর একটি বিষয়ে নিখিলেশের দৃষ্টিভঙ্গি অতি স্পষ্ট, তা হচ্ছে, সন্ত্রাস-বাদের গোপন সুরঙ্গপথ অনভিপ্রেত। দেশের সেবার নামে মানবতাবোধকেই হনন করার বিরুদ্ধে বিমলাকে সে স্পষ্ট বলেছে : "দেশের জন্যে অত্যাচার করা দেশের উপরেই অত্যাচার করা···।"

এবার 'পথ ও পাথেয়' প্রবন্ধের বক্তব্য স্মরণ করা যায়, "প্রয়োজন অত্যন্ত

গুরুতর হইলেও প্রশস্ত পথ দিয়াই তাহা মিটাইতে হয়—কোনো সংকীর্ণ রাস্তা ধরিয়া কাজ সংক্ষেপ করিতে গেলে একদিন দিক হারাইয়া শেষে পথও পাইব না, কাজও নষ্ট হইবে।"

(৫) বয়কট সম্পর্কে নিখিলেশের বক্তব্য রবীন্দ্রনাথের উক্তিরই প্রতিধ্বনি। সন্দীপের অন্ধ স্তাবক ও পিকেটিং-এ উদ্যোগী ছাত্রদের সঙ্গে নিখিলেশের তর্ক-বিতর্কে তার কথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

হিন্দু-মুসলমান-সম্প্রীতি সম্পর্কেও নিখিলেশের যুক্তি অনুধাবন যোগ্য। 'ব্যাধি ও প্রতিকার' কিংবা 'হিন্দু-মুসলমান' (কালান্তর) প্রবন্ধের বক্তব্য নিখিলেশের কথায় প্রতিধ্বনিত।

উপরোক্ত তুলনাতে আমরা দেখেছি, 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের বাস্তব বিশ্লেষণে তৎকালীন রাজনৈতিক মোহ ও স্বপ্নের জাল প্রচণ্ড হাওয়ায় উড়ে যেতে বসেছে। রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই উদ্দেশ্যমূলক শিল্পসৃষ্টি করেন নি। তবে শিল্পের উপকরণ রূপে নিজস্ব অভিজ্ঞতা এমনকি নিজস্ব অভিব্যক্তিগুলি পর্যন্ত চরিত্রের মাধ্যমে তিনি তুলে ধরেছেন। তথাকথিত স্বদেশপ্রেম, স্বাদেশিকতা, জাতীয়তা ইত্যাদির রঙীন আবেশ, ক্রোধ ও লোভের মাতালো আবহে চড়া সুরে 'এজিটেশন', 'পিকেটিং', 'বয়কট' অথবা সন্ত্রাসবাদের ঝাঁঝালো আস্বাদে তরুণরক্তে নেশা জাগানো—এসব স্বপ্নকে ঔপন্যাসিক যেন চুরমার করে দিয়েছেন। প্রসঙ্গতই উপস্থাপিত হোক অথবা শিল্পসৃষ্টির মাধ্যমেই পরিবেশিত হোক, যুগ-সাহিত্যিকের মনোভঙ্গি সমগ্র দেশকে নাড়া দিয়ে যায়। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসও তৎকালীন রাজনীতির মাতালো আবহাওয়াতে তীক্ষ্ণসুরেই সতর্ক-বাণী উচ্চারণ করেছে। এর কয়েক বৎসর পরে রবীন্দ্রনাথ এণ্ড্রুজকে ১৮।৯।১৯২০ তারিখের একটি পত্রে লিখেছিলেন,—"It is not that I do not feel any anger in my heart for injustice and insult heaped upon my motherland. But this anger of mine should be turned into the fire of love for lighting the lamp of worship to be dedicated through my country to my God. It would be an insult to humanity if I use the secred energy of my moral indignation for the purpose of spreading a blind passion all over my country."

'ঘরে-বাইরে'-তে নিখিলেশের কথায় ও কাজে এবং তার মাস্টারমশাই-এর সহযোগিতায় ও সেবায় ঐ বিশ্বাসই জীবন্ত সত্য হয়ে উঠেছে। উপন্যাসটির

চরিত্রগুলিতে মতবাদ প্রাধান্য আছে ('গোরা'-তে যেমন ছিল), এমন কি 'অবিমিশ্র আদর্শবাদে নিখিলেশের ব্যক্তিত্ব শীর্ণ ও ক্ষুণ্ণ হয়েছে সেকথাও ঠিক, তথাপি সমাজনীতিমূলক সমস্যার ('বিমলা'-র স্খলন ও অনুতাপকে কেন্দ্র করে) সমান্তরাল যে জলন্ত ও জীবন্ত রাজনৈতিক সমস্যার উদ্ঘাটন আছে—তার জন্যই উপন্যাসখানি আমাদের আলোচনার ক্ষেত্রে মূল্যবান। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ-ভাবনার একটি অপূর্ব শিল্পিত অভিব্যক্তি 'ঘরে বাইরে'। সন্দেহ নেই, নিখিলেশ রবীন্দ্রনাথের মানসপুত্র। কিন্তু সন্দীপকে যেভাবে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের নেতৃস্থানীয়রূপে অঙ্কন করা হয়েছে, হীন জঘন্য কাপুরুষ বলে দেখান হয়েছে তাতে সেকালের পত্র-পত্রিকায় সন্ত্রাসবাদী নেতাদের প্রতি অবিচার করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছিল। তৎকালীন আবেগের মধ্যে ঐ জাতীয় অভিযোগ স্বাভাবিক (ক্ষুদিরাম, সত্যেন, অরবিন্দ প্রমুখ নেতাদের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে), কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কৈফিয়ৎ দিয়েছেন যে 'ঘরে-বাইরে'-র উপন্যাস-ধর্মের প্রয়োজনেই সন্দীপকে প্রয়োজন হয়েছিল।

সামগ্রিক জীবনবোধের মাপকাঠিতেই রবীন্দ্রনাথ আত্মোপলব্ধির বিচার করেছেন, স্বদেশচিন্তার সবগুলি ক্ষেত্রেই, এখানেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। অর্থাৎ যথার্থ 'মানবসত্য' রাজনৈতিক আন্দোলনের অনেক উর্ধ্বে একথা রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে-বাইরে'তে প্রকাশিত। ঠিক একই কথা 'চার অধ্যায়' উপন্যাসেও বলা হয়েছে। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের বিদ্বেষবুদ্ধির প্রতিবাদ-স্বরূপ 'চার অধ্যায়' (১৯৩৪ খ্রীঃ)। আমরা আগেই বলেছি, 'গোরা' উপন্যাস সৃষ্টিকাল হতেই রবীন্দ্রনাথ তৎকালীন স্ববিরোধিতা, দ্বৈধীবৃত্তি, হিন্দুত্ব-গৌরবস্ফীতি, হিন্দুজাতীয়তাবাদের অন্তঃসারশূন্যতা ইত্যাদি উত্তরণ করে দেশের যথার্থ কল্যাণক্ষেত্রে উপস্থিত হতে পেরেছেন। 'ঘরে বাইরে'-তে তিনি আরও সুস্পষ্টভাবে বিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক ভ্রান্তি, স্বদেশপ্রেমের মোহনীয় আবেশ, অন্ধতা ও আবেগ-বিহ্বলতা হতে উত্তীর্ণ হয়ে দেশের জড়ত্ব ও তামসিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের ক্ষেত্রে, মানুষের সেবার ক্ষেত্রে নেমে এসেছেন। দেশ সেখানে দেবীমূর্তি নয়, জীবন্ত মানুষের সমষ্টি। তার মঙ্গলের পথও তাই সংকীর্ণ পথ নয়, সহজ ও সত্য পথ। 'চার অধ্যায়'-এ রবীন্দ্রনাথ পুনরায় শিল্পসৃষ্টির মাধ্যমে প্রতিবাদ করলেন সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে। কারণ যথার্থ মানব-সত্য হিংসাদ্বেষের উর্ধ্বে। তার জন্য মানবহৃদয়ের অবাধ প্রকাশের পথ চাই, এবং ধ্রুব সত্য এই, জীবনস্রোতের সহজ স্বাভাবিক ধারা রুদ্ধ করে কোন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা চলে না।

'ঘরে বাইরে'-তে স্বদেশী আন্দোলনের সবগুলি সমস্যাকে (বয়কট, পিকেটিং, সন্ত্রাসবাদ, হিন্দু-মুসলিম বিরোধ, সংগঠন প্রভৃতি সবগুলি) পটভূমি করে উপন্যাসে চরিত্রগুলি বিকশিত। এখানে, স্বদেশী আন্দোলনের অঙ্গীভূত একটি বিশেষ প্রচেষ্টা হিসাবে বিপ্লববাদ আলোচিত হয়েছে। এ উপন্যাসে বিপ্লববাদের বিরুদ্ধে অতীনের অভিযোগ ত্রিবিধ। তা হল এই, সনাতন নীতিজ্ঞান, আত্ম-স্বাতন্ত্র্য ও প্রেম—এই তিনের স্বাভাবিক বিকাশ বিপ্লব পন্থায় রুদ্ধ, নিষ্পেষিত এবং অবশেষে তার দ্বারা মানব-সত্যই উন্মূলিত। ঐগুলি অতীনেরই অভিযোগ শুধু নয়, অতীনের স্রষ্টারও অভিযোগ। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তার বিবর্তনের পূর্বাপর পটভূমি আলোচনা করে ইতিপূর্বেই তা আমরা উপলব্ধি করেছি।

এ প্রসঙ্গে 'চার অধ্যায়' রচনাকালের পটভূমিটুকু স্মরণীয়। বাংলাদেশের বৈপ্লবিক বিভীষিকা-পন্থার সেটি তৃতীয় যুগ, এদিকে তখন সরকারী দমননীতিও চরমেও উঠেছিল। গুলির আঘাতে অথবা ফাঁসীর মঞ্চে দেশের বীরদের নির্ভয় আত্মদান জনসাধারণের মধ্যে একটা ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা এবং অকথিত বেদনার সঞ্চার করে চলেছিল। ঠিক সেই সময়েই 'চার অধ্যায়'-এর আবির্ভাব। বলা-বাহুল্য এবারও ('ঘরে বাইরে' প্রকাশকালের মত) বাদ-প্রতিবাদের ঝড় বয়ে গেল, পত্র-পত্রিকাগুলি মুখর হয়ে উঠল তীব্র সমালোচনায়। বিশেষ করে উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশকালে রবীন্দ্রনাথ যে 'আভাস' শীর্ষক অংশটুকু ভূমিকায় সংযোজন করেছিলেন তার জন্যই। তাতে ছিল অগ্নিযুগের প্রথম পর্বের নেতা এবং রবীন্দ্রনাথের অতি শ্রদ্ধার্হ ব্যক্তি ব্রহ্মবান্ধবের একটি স্বীকৃতি। "বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর এত বড়ো প্রচণ্ড পরিবর্তন আমার কল্পনায় অতীত ছিল। …সেই অন্ধ উন্মত্ততার দিনে একদিন হঠাৎ এলেন উপাধ্যায়।…বললেন, 'রবিবাবু, আমার খুব পতন হয়েছে।' তখন কর্মজাল (তাঁকে) জড়িয়ে ধরেছে। নিষ্কৃতির উপায় ছিল না।…"

উপন্যাসের আরম্ভে এই ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য।

উপরোক্ত 'আভাস' প্রসঙ্গটি উপন্যাসের প্রসঙ্গে সংযোজিত হবার ফলেই তুমুল প্রতিবাদ উঠল। ব্রহ্মবান্ধবের নামের সঙ্গে তাঁর উক্তিতে পতনের উল্লেখ এবং 'অতীন' চরিত্রের ব্যঞ্জনার মধ্যে বিভীষিকাপন্থী দলের কর্মীদের পতন ও স্বভাবধর্ম হতে স্খলনের ইঙ্গিত যথার্থ বিপ্লবপন্থীদের প্রতি অবিচার বলে মনে করলেন অনেকে। রবীন্দ্রনাথ ঐসব প্রতিবাদের উত্তরে যে মন্তব্য করলেন, তাঁর মূল বক্তব্য এই যে, উপাধ্যায় প্রসঙ্গের সঙ্গে উপন্যাসের অনিবার্য যোগ নেই, কেবল গ্রন্থের অনুলেখ হিসাবে তা উল্লিখিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ উক্ত কৈফিয়ৎ

দিলেন, আবার ২য় সংস্করণে 'আভাস'-টিও বাদ দিলেন।

ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের মতে, ঐ 'আভাস' যোজনার ফলে, "লেখক অতীন চরিত্রের যুক্তির মধ্যে আপন মনের যুক্তি ও সমর্থন অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়া ফেলিয়াছেন এবং মনে হয়, পাছে পাঠক-চিত্তে এই যুক্তি ও সমর্থন স্বীকৃত না হয় এই আশঙ্কায় অতি নিকটবর্তী ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে উপাধ্যায় মহাশয়ের নজির উদ্ধার করিয়াছেন।" ('রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা', পৃ ৪৬৫)

'চার অধ্যায়' উপন্যাসের শিল্প-কৌশল, চরিত্র-রূপায়ণ, ভাষার ইন্দ্রজাল বা নাটকীয় কাহিনীর অসামান্য গতি এবং এলা অতীনের দুরন্ত দুর্বার রোমান্টিক প্রেমের লিরিক সুর ও ব্যঞ্জনা প্রভৃতি আমাদের আলোচনার প্রয়োজন নেই। 'স্বদেশচিন্তার' শৈল্পিক প্রকাশ হিসাবে 'চার অধ্যায়' রবীন্দ্রমানসের যে দিকটি পুনরুদ্ঘাটিত করেছে, তাই আমাদের দেখা প্রয়োজন।

অতীনের যুক্তির মধ্যে লেখকের যুক্তি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে—এই কথাটিই পরীক্ষা করা যেতে পারে। একেবারে তৃতীয় অধ্যায়ে অতীন ও এলার কথোপকথনে অতীনের স্বীকৃতিগুলি লক্ষ্য করার মত—

১। "তোমরা যাকে পেট্রিয়ট বলো আমি সেই পেট্রিয়ট নই। পেট্রিয়টিজমের চেয়ে যা বড়ো তাকে যারা সর্বোচ্চ না মানে তাদের পেট্রিয়টিজম কুমিরের পিঠে চড়ে পার হবার খেয়া নৌকা। মিথ্যাচরণ, নীচতা, পরস্পরকে অবিশ্বাস, ক্ষমতালাভের চক্রান্ত, গুপ্তচরবৃত্তি একদিন তাদের টেনে নিয়ে যাবে পাঁকের তলায়।"

২। "দেশের আত্মাকে মেরে দেশের প্রাণ বাঁচিয়ে তোলা যায়, এই ভয়ংকর মিথ্যে কথা পৃথিবীসুদ্ধ ন্যাশনলিষ্ট আজকাল পাশবগর্জনে ঘোষণা করতে বসেছে, তার প্রতিবাদে আমার বুকের মধ্যে অসহ্য আবেগে গুমরে গুমরে উঠছে—এই সত্য ভাষায় হয়ত বলতে পারতুম, সুরঙ্গের মধ্যে লুকোচুরি করে দেশ উদ্ধারচেষ্টার চেয়ে সেটা হত চিরকালের বড়ো কথা।"

এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথ প্রাদেশিক সম্মিলনীর অভিভাষণে চরমপন্থীদের হৃদয়াবেগ সংযত করার উপদেশ দিয়েছেন : ···"বিদ্বেষের কারণটি যখন চলিয়া যাইবে···রক্তপিপাসু বিদ্বেষবুদ্ধি দ্বারা আমরা পরস্পরকে ক্ষতবিক্ষত করিতে থাকিব।"

১৯১৮ সালে পিয়ার্সনকে একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "Pride of Patriotism is not for me. I earnestly hope that I shall find my home anywhere in the world before I leave it."

অন্যত্র তিনি লিখেছেন, "In small minds patriotism dissociates itself from higher ideal of humanity. It becomes magnification of self, on a stupendous scale—magnifying our vulgarity, cruelty, greed, dethroning God..."

এই 'higher ideal of humanity'-এর জন্যই ভাঙনের পথ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের তীব্র আপত্তি। তাঁর আজীবন আস্থা ছিল, মানবসত্য হিংসাদ্বেষের উর্ধ্বে। 'দেশের জন্য অত্যাচার করা, দেশের উপরেই অত্যাচার করা'—এ সত্যটি বারম্বার সর্বপ্রকার বিরুদ্ধতার মধ্যেও সাহসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা করেছেন। অতীনের স্বীকৃতিতে তার স্পষ্ট প্রতিধ্বনি। অবশ্য একথা অস্বীকার করা চলে না, "অতীনের দেওয়া পরিচয় কিংবা এলার ভিতর দিয়া পাওয়া পরিচয় অঘোরপন্থীদের যথার্থ পরিচয় নয়।" রবীন্দ্রনাথ অগ্নিযুগের বৈপ্লবিকপন্থার সঠিক রূপটি হয়ত চিনতে পারেন নি। অন্তত বিভীষিকাপন্থার যে পরিবেশ 'বাংলাদেশের বিপ্লব প্রচেষ্টার ভূমিকা' যা তিনি রোমান্টিক দৃষ্টিতে দেখেছেন,—তা ঠিক নয়। (লেখক নিজেই তা স্বীকার করেছেন, "এখানে সেই বিপ্লবের বর্ণনা গৌণ মাত্র।")

বিপ্লববাদী মনোবৃত্তির প্রকৃত স্বরূপ নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথের মত, আন্তর্জাতিক মানবতাবোধের প্রচারকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বাইরে, ('কিছু কিছু আভাস আমার নিজের অভিজ্ঞতাকে স্পর্শ করেছে'—এ স্বীকৃতি সত্ত্বেও) এ জন্যই হয়ত বৈপ্লবিক পরিবেশটি ঐতিহাসিক তথ্যনির্ভর হয়নি। তথাপি তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল, বিশেষ করে 'ইন্দ্রনাথের' চরিত্রে ব্রহ্মবান্ধবের ছায়া আছে, এই বিশ্বাসে। এই সম্পর্কে স্বয়ং লেখকের একটি কৈফিয়ৎ ভুল ধারণার সৃষ্টি করেছিল,—"একজন মহিলা আমাকে চিঠিতে জানিয়েছেন যে তাঁর মতে ইন্দ্রনাথের চরিত্রে উপাধ্যায়ের জীবনের বহিরংশ প্রকাশ পেয়েছে আর অতীন্দ্রের চরিত্রে ব্যক্ত হয়েছে তাঁর অন্তরতর প্রকৃতি, এ কথাটি প্রণিধানযোগ্য সন্দেহ নেই।" (রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৩শ খণ্ড, পৃ ৫৪৫)

'কথাটি প্রণিধানযোগ্য' বলেই যত ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করেছেন লেখক। উপন্যাসে অঙ্কিত 'ইমপার্শোন্যাল' স্বভাবের 'ইন্দ্রনাথে'র মনে স্বদেশপ্রেম, মানবিকতা, মহান আদর্শবাদ প্রভৃতি নিতান্তই 'সেন্টিমেন্টালিজম্'। তাঁর সংকল্প—"দেশকে দেবী বলে মা বলে অশ্রুপাত করব না কাজ করব।" এ সংকল্পটি ঠিক আমাদের দেশে পরিচিত ও শ্রদ্ধেয় বিপ্লবীদের মনের কথা নয়, এবং তাঁদের কর্মপদ্ধতির সঙ্গেও মেলে না। আর মেলে না বলেই অভিযোগ করার

কথাই উঠে না, ব্রহ্মবান্ধবের সঙ্গে তুলনারও প্রশ্ন ওঠে না।

বিপ্লববাদের বিরুদ্ধে নীতিজ্ঞানের দিক দিয়ে যে অভিযোগ আছে, তা সার্বভৌমিক। মনুষ্যত্ব ও বিবেকবুদ্ধির বলিদানে এর নৈতিক আশ্রয় ধূলিসাৎ হয়ে যায়, সে কথা অতি স্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথ তাই এ পথকে চিরদিনই ভ্রান্তপথ বলে বিশ্বাস করেছেন। তাই বলে বাংলার মুক্তি-পাগল বিপ্লবী তরুণদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে তাঁর এতটুকু দ্বিধা ছিল না,—কতবার কতভাবে তার অভিব্যক্তি আমরা লক্ষ্য করেছি তাঁর কবিতায়, প্রবন্ধে।

"ইচ্ছার অগ্নিগর্ভ রূপ দেখেছি বাংলার তরুণদের চিত্তে। দেশে তারা দীপ জ্বালাবার জন্যে আলো নিয়েই জন্মেছিল—ভুল করে আগুন লাগালো, দগ্ধ করল নিজেদের, পথকে করে দিল বিপথ। কিন্তু সেই দারুণ ভুলের সাংঘাতিক ব্যর্থতার মধ্যে বীরহৃদয়ের যে মহিমা ব্যক্ত হয়েছিল, সেদিন ভারতবর্ষের আর কোথাও তো তা দেখিনি।" (দেশনায়ক)

এর পরে রবীন্দ্রনাথের মনের শ্রদ্ধা সম্বন্ধে কোন ভ্রান্ত ধারণার অবকাশ থাকে না। তাঁর আক্ষেপ কেবল 'পথকে বিপথ করা'-র 'দারুণ ভুলের সাংঘাতিক ব্যর্থতার' জন্যই। 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে 'অতীনের' প্রচণ্ড ট্র্যাজিডিতে সে কথাটাই শিল্পিত রূপে অভিব্যক্ত হয়েছে। আর এই প্রসঙ্গে তাঁর পূর্বসূরী বঙ্কিমের উপন্যাসে গ্রথিত দুটি কথা সহজেই মনে আসে, "পাপের কখনো পবিত্র ফল হয় না," এবং "সমাজবিপ্লব অনেকসময় আত্মপীড়নমাত্র, বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী।"

আমরা লক্ষ্য করেছি, দেশপ্রেমিক ও বিপ্লবীদের বীরত্ব ও আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি-স্বরূপ বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের অজস্র অভিব্যক্তি আছে, অথচ দুজনের কেউই অনর্থক আত্মঘাতের সপক্ষে ছিলেন না। শুধুমাত্র নীতিবোধেই নয়, মনে হয় রাজনৈতিক বিচক্ষণতাও এঁদের চিন্তার পশ্চাতে ছিল। বঙ্কিমের মতই রবীন্দ্রনাথ নেতিবাচক আন্দোলনকে স্বীকার করেন নি, ইতিবাচক সংগঠনমূলক আন্দোলনের ত্যাগ, তিতিক্ষা, বীরত্ব ও দুর্জয় মৃত্যুপণকে নানাভাবে শিল্পিত রূপেই তুলে ধরেছেন কবিতায়, গানে, নাটকে। কবিতা, নাটক আমাদের আলোচ্য পরিধিভুক্ত নয়। তবু এই সূত্রে 'প্রায়শ্চিত্ত' (১৩১৬) নাটকের ধনঞ্জয় বৈরাগীর চরিত্ররূপটি স্মরণ না করলে প্রাসঙ্গিক চিত্রটি সম্পূর্ণ হবে না। সেখানে সেই নির্ভীক, সত্যসন্ধ, অত্যাচার অবিচারের চিরশত্রু মানুষটিও রাজার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়েছিল। ন্যায়ধর্ম ও আধ্যাত্মিক শক্তির সঙ্গে গণশক্তির সম্মিলন এবং তার ফলশ্রুতিতে অহিংস গণবিদ্রোহের ইঙ্গিত খুব স্পষ্ট হয়ে

উঠেছিল ঐ নাটকটিতে। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ঐ জাতীয় আদর্শবাদী ত্যাগী পুরুষই ভাবীকালের বরেণ্য দেশনায়ক। পরবর্তীকালের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের ঐ শিল্পমূর্তিটি যেন রূপধারণ করেছিল, গান্ধীজীকে মহাত্মা বলে এই জন্তেই তিনি বরমাল্য দিয়েছিলেন।

এ পর্যন্ত, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক ও রাজনীতিমূলক উপন্যাসের মূলধারাটি অতিক্রম করেছি আমরা। অতঃপর সমাজসমস্যামূলক উপন্যাসের প্রসঙ্গটি অতি সংক্ষেপে পর্যালোচনা করছি, সমাজচিন্তার শিল্পিতরূপ হিসাবে। এঁদের এই জাতীয় উপন্যাসে প্রচলিত সমাজকাঠামোতে প্রেমের মূল্যায়ন এবং নারীর স্থান নির্ণয়ই মুখ্য দুটি উদ্দেশ্য। আধুনিক সামাজিক উপন্যাসের মত শ্রেণীসংগ্রাম, সম্মিলিত পরিবারের ভাঙন, মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজের অবক্ষয়, সমাজের বা পরিবারের সর্বাত্মক নৈতিকতাবোধলুপ্তি অথবা আধুনিক নিষ্ঠুর যান্ত্রিক জগতে ব্যক্তিসত্তার শূন্যতাবোধ ইত্যাদি সমস্যামূলক পটভূমিকা বা তজ্জাত চরিত্র-দ্বন্দ্ব প্রধানত নেই। সমালোচকের কথায়—"নরনারীর আদিম আকর্ষণ বঙ্কিম-উপন্যাসের মূল প্রেরণা···কামের রূপান্তর প্রেম, প্রেমের রূপান্তর ভক্তি, প্রেম ও ভক্তিতে মনুষ্যত্বের পরাকাষ্ঠা।···বঙ্কিম উপন্যাসে মনুষ্যত্বচর্চার পক্ষে দাম্পত্য-জীবনের গুরুত্ব।"৩৬ বস্তুত বঙ্কিম দাম্পত্য প্রেমকেই বরণীয় করে তুলেছেন—ত্যাগে, তিতিক্ষায়, সাধনায় আর সেই দাম্পত্য প্রেম সামাজিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শ অথ অ মনুষ্যত্বচর্চার পথ। সমাজসাধনা ও ধর্মসাধনা এক্ষেত্রে এক। এদিকে ··· ·কিত পাপের চিত্র বঙ্কিম খুব স্বাভাবিক সংকোচে অঙ্কন করেছেন, তার দৃষ্টান্ত 'হীরার' পদস্খলন কিংবা 'রোহিনীর' ট্র্যাজিডিটি। অন্যান্য সমস্যা এই একই কেন্দ্রে কেন্দ্রিত : এবং বিধবা-বিবাহ অথবা বহু-বিবাহ অথবা অসামাজিক প্রণয়—সবই ঐ দৃষ্টিভঙ্গির মানদণ্ডে মূল্যায়িত। সর্বত্রই বঙ্কিম তাঁর মূল প্রত্যয়কেন্দ্রে স্থির ; সে প্রত্যয় হল, 'সৌন্দর্য সৃষ্টিই কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য।' এবং 'সত্য ও ধর্মই সাহিত্যের উদ্দেশ্য'। (এমনকি 'কপালকুণ্ডলার' মত খাঁটি রোমান্সও ঐ সুরে বাঁধা)।

নরনারীর প্রেম সম্পর্কে বঙ্কিম রক্ষণশীল কিংবা শেষ পর্যায়ে সমাজ-সংস্কারক ও ধর্ম-প্রবক্তার ভূমিকায় তাঁর শিল্পসৃষ্টিতে স্বাভাবিক প্রেম অস্বীকৃত—এই জাতীয় অভিযোগগুলি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারের অবকাশ নেই ; কেবল এইটুকু বলা যায় ঐ অভিযোগ সর্বাংশে সত্য নয়। বঙ্কিম 'প্রেম'কে জীবনের অঙ্গ বলে স্বীকার করেছেন, দাম্পত্যজীবন ও সার্থক প্রেমকে তাই তিনি মহনীয় করেই

এঁকেছেন।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে প্রেমের উদ্ভব ও বিকাশ পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের দ্বারা (আঁতের কথা টেনে বার করে) যা প্রকাশিত, তা একটি কথায় বলতে হয়, "প্রেম নামক এক অনির্বচনীয় আনন্দময় বেদনাময় ইচ্ছাশক্তি পঙ্কের মধ্য হইতে পঙ্কজবন জাগ্রত করিয়া তুলিতেছেন।" প্রেম সম্পর্কে দুজনের মূল দৃষ্টিভঙ্গিতে সূক্ষ্ম পার্থক্য যদি থাকে, তা এসেছে রবীন্দ্রনাথের কবিদৃষ্টির রোমান্টিকতার ফলে, কিন্তু উপন্যাসের পরিবেশনের ক্ষেত্রে দুই শিল্পীর পার্থক্য দুস্তর। 'বিষবৃক্ষে'র রোহিনী আর 'চোখের বালি'র বিনোদিনীর তুলনা করলেই তা স্পষ্ট বোঝা যায়। মোটকথা সমাজ সমস্যাকে বঙ্কিম আত্মসংযমের পথে সমাধানের নির্দেশ দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ সমাজ সমস্যাকে সর্বত্র প্রাধান্য দিতে চান নি, তবে নরনারীর প্রেমের সহজ পথকে স্বীকৃতি দিয়েছেন ইঙ্গিতে। 'বিনোদিনী'-র ক্ষেত্রে যা পারেন নি, 'দামিনীর' ক্ষেত্রে তাই সম্ভব করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

আসলে দু'জনের সমাজ-দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ঘটেছে সমাজের নবতর জটিলতায়। বিংশ শতকের প্রারম্ভ হতেই বাঙালির সর্ববৃহৎ পরিবার ও গোষ্ঠী-জীবনের অবক্ষয় দেখা দিতে থাকে, আর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ ক্রমস্ফুট হতে থাকে। এইকালে ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক পরীক্ষিত হচ্ছিল (মধ্যবিত্ত সমাজে বিশেষত) এবং তার সুস্পষ্ট বিবর্তন রবীন্দ্রনাথের সচেতন মনে ধরা পড়ছিল। তাই 'চোখের বালি'-তে স্বামী-স্ত্রীর ব্যক্তিগত সম্পর্কের স্বাধীন [illegible] স্ফুটতর, এবং নারীকে নারী হিসাবে দেখার সূচনা তাতে বর্তমান। ত্যাগের [illegible] ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধ এবং নারীর যৌনস্বাধীনতাবোধের ক্রমবিকাশ [illegible] বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে নারীর স্থান নির্ণয়ে সূক্ষ্ম পার্থক্যের সৃষ্টি করেছে। এক্ষেত্রে বঙ্কিমও সচেতন ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তো যুগের প্রয়োজনে আরও বেশি। তাই দেখি, নর ও নারীর সাম্যের অধিকার বঙ্কিম 'সাম্য' প্রবন্ধে স্বীকার করেছেন, কিন্তু প্রচলিত সামাজিক কাঠামো ধূলিসাৎ করে তৎক্ষণাৎ ঐ সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে তিনি চান নি। তাঁর মতে, নারী শিক্ষার প্রসারের ফলে আর দাম্পত্য প্রেমের স্পর্শে ঐ সমস্যার সমাধান আপনিই হবে। তাই 'কুন্দ'-কে কিংবা 'শৈবলিনী'-কে 'নারীসত্তা'-রূপে বিচারের প্রশ্ন তিনি তোলেন নি। তাঁর মতে নারী, পুরুষের স্ত্রী ও সহধর্মিনীরূপেই সার্থক, তাই 'অনুশীলন'-ধর্মের কঠোর সাধনার পরে 'প্রফুল্ল' গৃহিণী হয়ে ফিরে এসেছে, আর তার বিপরীতাচরণ করে 'শ্রী' সীতারামের সর্বনাশ ডেকে এনেছে। সম্পূর্ণ স্বাধীন মনোবৃত্তিসম্পন্না

(স্বেচ্ছাচারিণী হয়) নারীর চরিত্রচিত্র তাঁর উপন্যাসে দেখা যায় না।

এদিক নিয়ে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি ক্রমবিবর্তিত হয়ে সম্পূর্ণরূপে বিংশ শতাব্দীর আধুনিক মনোবৃত্তিকেই স্বীকার করেছে। রবীন্দ্রনাথ বহুস্থলেই নারীর দুটি রূপকে বন্দনা করেছেন—"নারীর দুইটি রূপ, একটি মাতৃরূপ, অন্যটি প্রেয়সী-রূপ। মাতৃরূপে নারীর একটি সাধনা আছে···মানব সংসারে তা পাপকে, অভাবকে—অপূর্ণতাকে জয় করে। প্রেয়সীরূপে তার সাধনায় পুরুষের সর্বপ্রকার উৎকর্ষ চেষ্টাকে প্রাণবান করে তোলে।" ('ভারতবর্ষীয় বিবাহ')

'সুচরিতা', 'কুমুদিনী' এবং সর্বাধিক স্পষ্ট রূপে 'শর্মিলা' প্রথম শ্রেণীর; 'বিনোদিনী', 'দামিনী', 'বিমলা', 'উর্মিমালা'—দ্বিতীয় শ্রেণীর। ঐ দুটি ধর্মের সম্মিলনও আছে প্রায় প্রত্যেক নারী-হৃদয়েই।

এ-পর্যন্ত বঙ্কিমের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির যথেষ্ট মিল। কল্যাণীয়া নারীকে কাব্যে বন্দনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ,—'সর্বশেষের গানটি আমার আছে তোমার তরে।' কিন্তু আর-এক শ্রেণীর নারী রবীন্দ্র-সাহিত্যে ক্রমবিবর্তিত হয়ে উঠেছে। এই ধারায় ক্রমআবির্ভাব---'দামিনী' ও তার পরবর্তী রূপ 'মৃণাল' ('স্ত্রীর পত্রে' যে কেবল মেজোবৌ নয়, একটি ব্যক্তিসত্তা) এবং তারও পরে বুঝি একেবারে শেষ গল্পের 'সোহিনী'—যে মাতা নয়, প্রেয়সী নয়, নারী। এই নারীর বিবর্তনে রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম স্বীকৃতি দিয়েছিলেন 'বলাকা'-'পলাতকা'র যুগে। পৃথিবীর নবীনতম যুগে নারীসত্তার নবতম বিকাশকে রবীন্দ্রনাথ অভিনন্দন জানিয়েছিলেন, সমাজ-চিন্তার ক্ষেত্রে আমরা তা আলোচনা করেছি।

কোন প্রকার শিল্পগত বিশ্লেষণ অথবা মনোবিশ্লেষণের মধ্যে প্রবেশ না করে একটি মূল কথা আমরা স্বীকার করে নিতে পারি। বঙ্কিম তাঁর উপন্যাসে সমাজ-সমস্যাকে বিচার করেছেন এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর হিন্দুসমাজের প্রচলিত কাঠামোকে স্বীকৃতি দিয়েছেন, আর রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাসে ঐ সামাজিক কাঠামোটির প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধতা করেন নি, তবে নবযুগের দৃষ্টিভঙ্গিতে সেটি বিচার করেছেন, এবং ব্যক্তিত্ববোধের উদ্বোধন ও নারীর উদ্বোধনের দিকে সাগ্রহ দৃষ্টিপাত করেছেন। রাজনীতির ক্ষেত্রে যেমন রাষ্ট্র তাঁর কাছে প্রধান হয়ে ওঠে নি 'ব্যক্তি'-ই (সমাজের সমষ্টির মধ্যে) মুখ্য, এবং তার সর্বাঙ্গীন বিকাশই লক্ষ্য হয়েছে, তেমনি সমাজসমস্যার ক্ষেত্রেও সামাজিক কাঠামো তাঁর কাছে মুখ্য নয়—প্রেমে, সৌন্দর্যে, কর্মে, জ্ঞানে, সর্বাঙ্গীন ব্যক্তিত্বের জাগরণই (নর অথবা নারীর) তাঁর কাম্য। এক্ষেত্রে দু'জনেরই নিজস্ব নীতিবোধ—সৌন্দর্যে ও মঙ্গলে

সদাজাগ্রত।

আর একটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে, দুজনেই হিন্দু সমাজের কাঠামোতেই সামাজিক উপন্যাসের রূপদান করেছেন, মুসলমান সমাজের কাঠামোটি (হয়ত অনভিজ্ঞতার জন্যই) কেউই গ্রহণ করেন নি। (বঙ্কিমের ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসে মুসলিম সমাজের রোমাণ্টিক চিত্র অবশ্য আছে। কিন্তু সেগুলি আমাদের যুগের বর্ণ প্রতিফলিত করে না)।

দুই.

অতঃপর শিল্পায়িত স্বদেশচিন্তার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশরূপে আমাদের সর্বজনবন্দিত জাতীয় সংগীতগুলি পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। প্রধানত বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টি 'বন্দেমাতরম্' এবং রবীন্দ্রসৃষ্টি 'জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে'—সঙ্গীত দুটিই আমাদের বিবেচ্য। অবশ্য বঙ্কিমের 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের সুবিস্তৃত ভাষ্যরূপে রবীন্দ্রনাথের 'ভাণ্ডার' যুগের অজস্র স্বদেশীগীতির কথাও প্রসঙ্গরূপে স্মরণ করতে হবে।

স্বদেশচিন্তামূলক সংগীতের আনুপূর্বিক ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়—এর দুটি প্রধান উৎস হল, ঠাকুরবাড়ীর 'হিন্দুমেলা' এবং 'বঙ্গভঙ্গ' আন্দোলন। 'হিন্দুমেলার' সম্পাদক গগনেন্দ্রনাথের 'লজ্জায় ভারত যশ গাহিব কি করে', প্রথম স্বদেশী সঙ্গীত। দ্বিজেন্দ্রনাথ রচিত 'মলিনমুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি' এবং দ্বিতীয় অধিবেশনের জন্য রচিত সত্যেন্দ্রনাথের, 'মিলে সবে ভারত সন্তান' খুব জনপ্রিয় ছিল। এই দ্বিতীয় সংগীতটির প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন বঙ্কিম, তিনি লিখেছিলেন, 'এই মহাগীত ভারতের সর্বত্র গীত হউক।' (বঙ্গদর্শন, চৈত্র, ১২৭৯) যাত্রায়, নাটকে, আখ্যান কাব্যেও এই যুগে স্বদেশপ্রীতি উদ্দীপক গানের প্রচার হতে থাকে। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচেতনার প্রথম অভিব্যক্তি একটি জাতীয় সংগীত—'একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন।' তাঁর একটি গান—'জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ'—ঠিক দেশমাতৃকাবোধ হতে রচিত নয়, তথাপি, চতুর্দশ বৎসর বয়সের রচনারূপে উল্লেখযোগ্য।

প্রায় এই সময়েই বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত বিখ্যাত সংগীত 'বন্দেমাতরম্' প্রকাশিত হয় 'বঙ্গদর্শন'-এর একটি পৃষ্ঠাপূরণের জন্য। পরে এটি অন্তর্ভুক্ত হয় 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে।

দ্বিতীয় উৎস স্বদেশী আন্দোলন বা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন—যে যুগে 'ভাণ্ডার'

পত্রিকায় (এবং 'বঙ্গদর্শন'-এ) রবীন্দ্রনাথের স্বদেশীসংগীতের বান ডেকেছিল।

সেদিনের প্রাণ-জাগানো সংগীতগুলির আবেদন কেবল সাময়িক নয়, চিরন্তন। আজও সেগুলি অতীব-জনপ্রিয়। এই যুগ সম্পর্কে আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেনের মন্তব্য যথার্থ,—"বঙ্কিমচন্দ্রের কণ্ঠে বাঙালী শুনেছে তার জীবনযজ্ঞের ঋক্‌মন্ত্র, রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে শুনেছে তার সামগান। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন বঙ্গমন্ত্রের ঋষি, সে মন্ত্রের সংহতরূপ 'বন্দেমাতরম্‌' আর রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বঙ্গমন্ত্রের উদ্‌গাতা, সে মন্ত্রের পূর্ণরূপ হচ্ছে রাখিসংগীত,—'বাংলার মাটি বাংলার জল।' এই রাখিমন্ত্র হচ্ছে, 'বন্দেমাতরম্‌' মন্ত্রেরই কবি-ভাষ্য।"

(—ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ, পৃঃ ১১১)

ভাণ্ডারযুগের অজস্র গানের তালিকা প্রস্তুত করার সুযোগ নেই। গানগুলি বঙ্গমাতার সৌন্দর্য বর্ণনা (যথা—'সোনার বাংলা'), দেশ বন্দনা (যথা—'ও আমার দেশের মাটি') এবং তেজোদৃপ্ত সংগীত (যথা—'এবার তোর মরাগাঙে') এই তিন শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা যায়। গানগুলির অধিকাংশ সম্পূর্ণ লোকসংগীত-ধর্মী, বাংলার নিজস্ব বাউল সুরে বাঁধা।

ইতিপূর্বের 'হিন্দুমেলা' যুগের গানে প্রায়ই ছিল, ভারতের বর্তমান দীনতা ও ও দুর্দশার জন্য ক্ষোভ এবং অতীত গৌরবের জন্য অশ্রুবিসর্জন। বঙ্গভঙ্গ-যুগের গানে দেশবন্দনা (প্রায়ই 'বাংলা জননী') এবং কঠোর আত্মসমালোচনার সঙ্গেই ছিল জাতীয় সংগ্রামে আত্মদান করার আহ্বান। এই দ্বিতীয় যুগের সম্পূর্ণ ভাব উৎস 'বন্দেমাতরম্‌' যাতে দেশবন্দনা ও আত্মোৎসর্গের ভাবদুটি একত্রে ছিল। আর প্রথমাবধিই মাতৃস্বরূপিণী বলে ('ভারতমাতা', 'ভারত-লক্ষ্মী', 'বঙ্গজননী', 'বাংলা মা' ইত্যাদি) বন্দনা করার রীতি প্রচলিত যা—'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপী গরীয়সী' ঐতিহ্যের স্বীকৃতি।

বঙ্গভঙ্গ যুগের পরবর্তীকালে সমগ্র 'ভারতবর্ষ'-কে এক অখণ্ড আধ্যাত্মিক অনুভূতি জড়িত জনগণসত্তার প্রতীকরূপে বন্দনা করার সূচনা হল রবীন্দ্রনাথের 'ভারততীর্থ', 'জনগণমন-অধিনায়ক' ইত্যাদি সংগীতগুলি হতে। এই বিবর্তনটি পূর্ব-ঐতিহ্য হতে বিচ্ছিন্ন নয়, তবে সার্বজনীনতার দিকে প্রসারিত হবার জাতীয়বাসনা।

ঋষি বঙ্কিমসৃষ্ট জাতীয় 'ঋক্‌মন্ত্র' স্বরূপ 'বন্দেমাতরম্‌'-এর সার্থকতার ভাষ্য আছে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশীযুগের সঙ্গীতে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভাষ্য আলোচনার পূর্বে, ঐ সঙ্গীতকে কেন্দ্র করে যে বিপুল পরিমাণে তর্ক-বিতর্ক হয়ে গেছে, সেগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করা প্রয়োজন। নানা জনে নানা ভঙ্গিতে 'বন্দেমাতরম্‌'

সংগীতের বিচার বিশ্লেষণ করে পক্ষে বা বিপক্ষে মতামত দান করেছিলেন, কেউ বা বলেছেন এটি ফরাসী সঙ্গীত—'Marseillaise'-এর তুল্য, কেউ বা বলেছেন এই সঙ্গীতটি পৌত্তলিকতা অথবা সাম্প্রদায়িকতার ভাবদুষ্ট। স্বদেশী-আন্দোলন-পর্বে যে সঙ্গীত সমগ্র বাংলাদেশের জাতীয়মন্ত্র রূপে উচ্চারিত, মুসলিম লীগের মন্ত্রিত্বকালে এবং আরও পরে জাতীয় সঙ্গীতরূপে নির্বাচনকালে তার বিরুদ্ধেও বিরূপ সমালোচনা প্রকাশিত হতে থাকে। প্রশ্ন উঠেছিল সংখ্যালঘু মুসলমান-সম্প্রদায়ের এক বৃহৎ অংশ হতেই (মুসলিম লীগের প্ররোচনায়)। বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে হিন্দুপ্রীতির অভিযোগ আরোপ করে 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতকে পৌত্তলিকতার ভাববাহী বলে চিহ্নিত করার প্রয়াস হয়েছিল। এ সম্পর্কে বিদেশী সমালোচকদের মন্তব্যগুলিও কৌতূহলজনক। ঐগুলি এ ব্যাপারের বহুদিন পূর্বেই লিখিত হয়েছিল। Lord Ronaldsay আনন্দমঠকে 'perverted Patriotism of Indians' বলে বসেছেন। 'বন্দেমাতরম্' সম্পর্কে সর্বপ্রথম J. D. Anderson এই 'Marseillaise' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। (Modern Review 1919, p. 21)। আশ্চর্যের কথা, ১৯৩৭ খ্রীঃ লীগ-শাসনকালে 'বন্দেমাতরম্'-কে উপলক্ষ করে কলকাতায় 'আনন্দমঠের' বহ্ন্যুৎসব করা হয়েছিল। সেদিন বাংলার বহু মনীষী ক্ষুব্ধ কণ্ঠে ঐ নিন্দনীয় ব্যাপারের প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। শ্রদ্ধেয় হীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়েছিল 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকায়। ঐ প্রতিবাদমূলক পত্রে তিনি বলেছিলেন, 'আনন্দমঠ' রচনায় অন্তত ছয়-সাত বৎসর পূর্বে যে সঙ্গীতটি রচিত তাকে 'আনন্দমঠে'-র সঙ্গে জড়িয়ে মুসলিম-বিদ্বেষী এবং পৌত্তলিকতার গন্ধযুক্ত বলে প্রচার করা অন্যায়।

এ সম্পর্কে জাতীয়তাবাদী চিন্তাশীল লেখক রেজাউল করিম সাহেব বিশ্লেষণ করে বলেছিলেন, সুজলা সুফলা দেশের বর্ণনা একেশ্বরবাদে 'গুনাহ' নয়। 'বন্দনা' শব্দেও আপত্তির কারণ নেই আর দেশকে 'মা' বলাও ইসলাম-বিরোধিতা নয়। যদি 'মা' বলা অপরাধ হয় তবে কবি ইকবাল, হাফিজ, রুমী, ওমরখৈয়ামও একই 'গুনাহ' করেছেন। আর 'উম্মলকোরা' (গ্রাম্যজননী) 'উম্মল মোমেনীন' (বিশ্বাসীগণের জননী) ও 'উম্মল কিতাব' (গ্রন্থ-জননী) প্রভৃতি শব্দেও ঐ জাতীয় ভাবই প্রকাশিত হয়। বিশেষ অভিযোগ ছিল সঙ্গীতটির যে অংশটি সম্পর্কে সেই শেষের কয়েকটি কলিতে পৌত্তলিকতা তো নেই-ই বরং তার বিপরীত কথাই আছে, কারণ—

"দেবদেবী অপেক্ষা আমার কাছে বড় দেশ—দেশই আমার দুর্গা, দেশই

আমার লক্ষ্মী, দেশই আমার সরস্বতী···উহারা আমার নিকট কিছু নয়—দেশই আমার নিকট সব—সব সাধনার শ্রেষ্ঠ ধন।" (দ্র. রেজাউল করিম : 'বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ', পৃ ১১৬)

বাস্তবিকই শিল্পসমালোচনা অথবা নিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে[৩৭] বিচার করা হলে এ সম্পর্কে কোন প্রকার অভিযোগ ওঠার কথা নয়। আসলে হিন্দু-পুনরুজ্জীবন যুগের প্রতিক্রিয়ায় এবং মুসলিম-লীগ প্রচারিত সাম্প্রদায়িকতার আবহে পারস্পরিক তর্ক-বিতর্কে 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতের ঐতিহাসিক মূল্য তাতে বিন্দুমাত্রও হ্রাস পায়নি। বিপ্লবী অরবিন্দের কথায়—"The Mantra had been given and in a single day a whole people had been converted to the religion of patriotism. The Mother had revealed herself....A great nation which has had that vision can never again bend its neck in subjection to the yoke of a conqueror." (—p. 13, Bankim-Tilak-Dayananda)

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথও এর ঐতিহাসিক মূল্য এবং প্রায় অর্ধশতাব্দীব্যাপী জাতীয় আন্দোলনের ঐতিহ্য স্বীকার করেছেন।[৩৮] আর আধুনিক যুগের সমালোচকের বিচারে, দেশরূপ ভাবের শিল্পমূর্তিটি ঐ মাতৃমূর্তি, 'ত্বং হি দুর্গা', "এর মধ্যে পৌত্তলিকতার স্থান নেই। তা যদি থাকতো তবে রবীন্দ্রনাথের মতো অপৌত্তলিক ব্যক্তি লিখতেন না, 'ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে, বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ; দুই নয়নে স্নেহের হাসি, ললাটে নেত্র আগুনবরণ।"

(—পৃ ২৪০, বঙ্কিম সরণী)

আরও একটি অভিযোগ উঠেছিল, তা হল 'বন্দেমাতরম'-এর উদ্দিষ্ট জননী তো বঙ্গজননী। এটি খণ্ডনার্থে মন্তব্য করেছেন উক্ত সমালোচক, "সপ্তকোটি একটা 'Idealised' সংখ্যা।···আর আনন্দমঠ উপন্যাসের প্রতিষ্ঠাভূমি প্রত্যক্ষত বাংলাদেশ হলেও ওর যথার্থ ভূমিকা ভারতবর্ষব্যাপী।·· বিশ্বমানবের মুক্তির বিবরণ এই কাব্য। বঙ্গ নয়, ভারত নয়, ধরণীং ভরণীং মাতরম্'.কবির বন্দনীয়।" (—বঙ্কিম সরণী, পৃ ২৬২) আমরা আগেই বলেছি পৌত্তলিকতার অভিযোগ[৩৯] নিরপেক্ষ বিচারে, অন্ততপক্ষে শিল্পের বিচারে অস্বীকার করা যায়, কিন্তু 'বঙ্গজননী' বলে মাতৃমূর্তিকে অস্বীকার করার পিছনে কোন যুক্তি নেই। বর্তমানে এ অর্থ গ্রহণ করতে আমাদের সংকোচ হতে পারে ভারতীয় গণতন্ত্রের পটভূমিকায়, তৎকালে ঐ জাতীয় চিন্তা বঙ্কিমের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। স্বদেশী যুগেও তো 'বাংলার মাটি, বাংলার জল'—সঙ্গীতকে সংকীর্ণ দৃষ্টিতে দেখা হয়নি।

যুগ-অনুসারে সপ্তকোটিকে তেত্রিশকোটি অথবা চল্লিশ কোটিতে পরিবর্তিত করে নিলে সংগীতের চিরন্তন মূল আবেদনটি ঠিকই থাকে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য এই যে, 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতকে উপলক্ষ করে আলোড়ন কালে (১৯৩৭ খ্রীঃ কলকাতা কংগ্রেসে) রবীন্দ্রনাথ পরামর্শ দিয়েছিলেন, সংগীতটির দুর্গা-কমলা-বাণী ইত্যাদি অংশ বাদ দিয়ে জাতীয় সঙ্গীতরূপে স্বীকার করতে।

তৎকালীন উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিবেশে ঐ পরামর্শ খুব যুক্তযুক্ত ছিল সন্দেহ নেই। ইতিপূর্বেই সমালোচকের মন্তব্য উদ্ধৃত করেছি, "রাখীসঙ্গীতটি, 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের কবিভাষ্য।" অর্থাৎ 'সুজলাং সুফলাং' ইত্যাদির ভাষ্য হল, 'বাংলার মাটি বাংলার জল' ইত্যাদি। এই সূত্রেই মনে হয় রবীন্দ্রনাথের আর একটি জনপ্রিয় স্বদেশী সঙ্গীত 'ও আমার দেশের মাটি', 'বন্দেমাতরম্'-এর যুগোপযোগী রূপায়ণ। এই সঙ্গীতে 'সপ্তকোটি' নিয়ে কোন প্রকার অভিযোগের অবকাশ নেই। আর পৌত্তলিকতার প্রশ্নই ওঠে না। 'দেশের মাটি'-ই প্রণম্য কারণ তিনি 'সকল-সহা সকল-বহা মাতার মাতা', অর্থাৎ 'জনক-জননী-জননী'। বঙ্কিমও মাতৃরূপিণী স্বদেশমূর্তির বন্দনা করেছিলেন। আর 'মা' বলে দেশকে সম্বোধন রীতি এদেশে ওদেশে প্রায় সর্বত্রই প্রচলিত। ওদিকে বঙ্কিমের 'ধরণীং ভরণীং মাতরম্', আর এদিকে 'বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা' আসলে—একই ব্যঞ্জনা। অর্থাৎ উক্ত সংগীত দুটির বাক্‌প্রতিমা প্রায় মিলে যায়, তবে রবীন্দ্র-সৃষ্টিতে কিছু অর্থবিস্তার ঘটেছে। দ্বিসপ্তকোটি ভুজে খরকরবাল গ্রহণ করার পরিবর্তে কবিভাষ্যে আছে আত্মবিশ্লেষণ, 'বৃথা আমায় শক্তি দিলে শক্তিদাতা'। উক্ত শক্তি মাতৃঋণ কথঞ্চিৎ পরিশোধের জন্য দেশ সেবায় নিয়োজিত হোক এমনি কামনা আছে। মোটকথা 'বন্দেমাতরম্'-মন্ত্রে ছিল দেশমাতৃকার রূপবর্ণনা এবং শক্তিপূজার উদ্দীপনী সংকল্প গ্রহণ, এখানে আছে দেশজননীর সৌন্দর্য-বর্ণনা ও আত্মবিশ্লেষণজাত অনুতাপের পর মাতৃঋণ কথঞ্চিৎ দেশসেবায় পরিশোধ করার সংকল্প। এইটুকুই নবযুগের রূপায়ণ, দেবতার শক্তি নয় আত্মশক্তির উদ্বোধন হোক—এই আবেগই স্বদেশীযুগের বহু সঙ্গীতে অভিব্যঞ্জিত, যথা: 'আমি ভয় করব না', 'নিশিদিন ভরসা রাখিস', 'সঙ্কোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান' ইত্যাদি। বঙ্কিম বঙ্গমন্ত্রের ঋষি, স্বদেশপ্রীতির ঋক্‌মন্ত্র তাঁর সৃষ্টি, রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্গমন্ত্রের উদ্‌গাতা', স্বদেশপ্রীতির সামগান তাঁর কণ্ঠে।

স্বদেশীযুগের পরেই রবীন্দ্র সঙ্গীতে 'ভারততীর্থ' প্রতিষ্ঠার আহ্বান শোনা

গেল (২.৭.১৯১০, ১৮ই আষাঢ় ১৩১৭), এর আগেই 'গোরা' উপন্যাসে 'যিনি কেবল হিন্দুর দেবতা নন, যিনি ভারতবর্ষেরই দেবতা' তাঁকে বন্দনা করা হয়েছিল (প্রকাশ ১৯১০ খ্রীঃ)। অতঃপর ১৯১১ সালের ২৭শে ডিসেম্বর কলকাতা কংগ্রেসের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে 'জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারতভাগ্য বিধাতা' এই জাতীয়সঙ্গীতটি সর্বপ্রথম গীত হয়। তারপর থেকেই জাতীয়চিত্তে এটি 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতটির পাশেই প্রতিষ্ঠালাভ করে এসেছে এবং স্বাধীন-ভারতে এটি রাষ্ট্রীয় সঙ্গীতের মর্যাদা লাভ করেছে। আশ্চর্যের কথা এই যে, 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতের মতো 'জনগণমন'-সঙ্গীত নিয়েও নানা বিরূপ সমালোচনা হয়ে গেছে, নানা অভিযোগ ধ্বনিত হয়েছে ; এমনকি স্বয়ং কবিকেও নানা জনের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হয়েছে। এই সঙ্গীতটির বিস্তৃত ইতিহাস আলোচনা করেছেন আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেন তাঁর 'ভারতবর্ষের জাতীয় সঙ্গীত' : প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায় ('পূর্বাশা', ফাল্গুন ১৩৫৪ এবং ফাল্গুন ১৩৫৫) প্রবন্ধে। ঐ প্রবন্ধেই অভিযোগগুলি খণ্ডন ও ভ্রান্তধারণার নিরসন করা হয়েছে।

যাই হোক এ ভ্রান্তি[৪০] আজ আর কারো নেই, তথ্য-বিকৃতির প্রশ্নও আর ওঠে না। আর-একটি উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, ঐ গানটি একমাস পরেই কলকাতায় 'মাঘোৎসবে' (২৫.১.১৯১২) ধর্মসঙ্গীতরূপে গীত হয়। উক্ত সভাতেই 'ধর্মের নবযুগ' বিষয়ক ভাষণে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—

> "আমাদের যাহা কিছু আছে সমস্তই পণ করিয়া ভূমার পথে নিখিল মানবের বিজয় যাত্রায় যেন সম্পূর্ণ নির্ভয়ে যোগদান করিতে পারি। জয় জয় জয় হে জয় বিশ্বেশ্বর, মানবভাগ্যবিধাতা।" (—ফাল্গুন ১৩১৮)

অতএব আচার্য সেনের বক্তব্য যথার্থ,—"বৃহৎ ভূমিকায় যিনি বিশ্বেশ্বর বা মানব-ভাগ্য-বিধাতা, দেশপ্রীতির পটভূমিকায় তিনি ভারত-ভাগ্য-বিধাতা বলে অভিহিত হয়েছেন।" লক্ষ্য করা যায়, ১৯১৭ খ্রীঃ রচিত 'দেশ দেশ নন্দিত করি' গানটির ভাবও একই। 'জনগণমনের অধিনায়ক' 'ভারতভাগ্য বিধাতা' এখানে 'জাগ্রত ভগবান' রূপে বন্দিত। এই বৎসরই কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশনে 'বন্দেমাতরম্' গানের দ্বারা উদ্বোধনের পর কয়েকটি স্বদেশপ্রীতিমূলক সঙ্গীত-এর সঙ্গে 'দেশ দেশ নন্দিত করি' গানটি পরিবেশিত হয়েছিল ! আর অধিবেশনের প্রথমদিনের কার্যারম্ভের পর রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচিত 'India's Prayer' (যাকে রিপোর্টে 'offer of benediction' বলা হয়েছে) পাঠ করেন। এদিকে অধিবেশনের তৃতীয় দিনে গীত জনপ্রিয় 'জনগণমন' সঙ্গীতটি। একই অধিবেশনের তিন দিনে পরিবেশিত প্রার্থনা ও সঙ্গীতত্রয় যেন একই ভাবের গ্রন্থিতে বদ্ধ

জাতীয়তার সামগান। লক্ষণীয় এই, 'India's Prayer'-এর অন্তর্নিহিত ভাবটি 'জনগণমন' সঙ্গীতে নিবদ্ধ ভাবের পরিপূরক, সর্বপ্রকার আত্ম-অবমাননার বিরুদ্ধে আত্মশক্তির উদ্বোধন হোক,—এই প্রার্থনা ধ্বনিত হয়েছিল তাতে—

"For Thy glory rests upon the glory that we are,
Therefore in Thy name we oppose the power
That would plant its banner upon our soul,..."

অর্থাৎ মানব-ভাগ্য-বিধাতার কাছে আত্মশক্তি-উদ্বোধনের প্রার্থনা। ইতিপূর্বে আলোচনা-প্রসঙ্গে আমরা বলেছি, রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রীতি বঙ্কিমের মতই কখনও ধর্মনিরপেক্ষ নয়, 'জনগণমন' সঙ্গীতে ভক্তি-মিশ্র-দেশাত্মবোধের প্রেরণা অত্যন্ত স্পষ্ট। তাঁর 'দেশ দেশ নন্দিত করি' অথবা 'India's Prayer'-এ উক্ত ভাবনাই ব্যঞ্জিত। এখানে আবার মনে পড়ে কবির উক্তি—'মিলে গেছ ওগো বিশ্বদেবতা মোর সনাতন স্বদেশে'। যেন ভারতের জাতীয়তাবোধ বিশ্বমানবতার পথযাত্রী হয়ে উঠেছে এবং ভারতবর্ষ হয়ে উঠেছে 'ভারততীর্থ', কারণ দেশের মাটিতে 'বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা' আছে।

বঙ্কিমের স্বদেশপ্রীতিও 'ভক্তিমিশ্র দেশাত্মবোধে' উদ্দীপ্ত। 'ত্বং হি দুর্গা'—এই মন্ত্রে আরাধ্যা দেবী ও দেশমাতৃকা অভিন্ন। তবে পূর্বসূরী ও উত্তরসূরীর প্রকাশভঙ্গিতে পার্থক্য এই, বঙ্কিম হিন্দুর পৌরাণিক দেবীর মূর্তিতে রূপায়িত করলেন তাঁর ধ্যান ও ধারণাকে, রবীন্দ্রনাথ সর্বজনস্বীকৃত নিরাকার ঈশ্বরকে মানব-ভাগ্য-বিধাতা বলে বন্দনা করলেন। রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসচেতনায় ইতিহাসের ভাগ্যবিধাতাকে 'জনগণ-পথ-পরিচায়ক'-রূপে স্বীকার করেছেন, কিন্তু বঙ্কিম এক্ষেত্রে ইতিহাসচেতনাকে স্বীকার করেন নি, পৌরাণিক ভক্তি-বৃত্তিকেই উদ্দীপনীচেতনারূপে গ্রহণ করেছেন। এইজন্যই 'জনগণমন' সঙ্গীত বিংশ-শতাব্দীতে ভারতের জাতীয়ভাব পরিপোষক, গণতন্ত্রের জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সব মানুষের ঐক্য-বিধায়ক।

শুধু তাই নয়, ইতিহাসের পথে যিনি স্রষ্টা, তিনি বিশ্বের সকল জাতি সকল মানুষের জয়যাত্রার পথেই আমাদের আহ্বান করেছেন—তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

বস্তুত 'বন্দেমাতরম্ ও 'জনগণমন' এই জাতীয়-সঙ্গীত দুটিই বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তার শ্রেষ্ঠতম শিল্পিত অভিব্যক্তিরূপে বিবেচনা করা যায়। আর এই দুটির মাধ্যমেই পূর্বসূরী ও উত্তরসূরীর সামগ্রিক স্বদেশচিন্তার মিল ও অমিলগুলি উপলব্ধি করা যায়।

অতঃপর সামগ্রিক দৃষ্টিতে দুজনের স্বদেশচিন্তার শিল্পিত অভিব্যক্তিগুলির তুলনা করা যায়। বঙ্কিমের শিল্পসৃষ্টির 'মটো', 'দেশের ও মনুষ্যজাতির মঙ্গল' এবং তদনুসারে 'কবি ধর্মের প্রধান সহায়'। রবীন্দ্রনাথের 'মটো', 'চিত্তমুক্তি' অর্থাৎ অন্তরের উৎস-উদ্বারণ। বঙ্কিম-কথিত 'চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির সম্যক অনুশীলনে' হয় 'চিত্তশুদ্ধি', আর রবীন্দ্র-মতে সৌন্দর্যসৃষ্টি ও রস-উপলব্ধির দ্বারা মানুষ ভূমাপ্রয়াসী হয়ে ওঠে। দুজনের উদ্দেশ্য প্রায় এক (অন্তত ব্যঞ্জনায়), বিভিন্নতা এসেছে পন্থায় ও যুগগত পরিবেশে (যার প্রভাব পূর্বালোচিত তিনটি ক্ষেত্রে লক্ষ্য করে এসেছি)।

(ক) বঙ্কিম মুখ্যত ইতিহাসচেতনার আশ্রয়ে স্বদেশচিন্তার শিল্পমূর্তি গড়েছেন, সে সৃষ্টিতে কলঙ্কক্ষালন ও আদর্শীকরণ এই উভয় প্রক্রিয়াই যুগপৎ বিদ্যমান। রবীন্দ্রনাথও ইতিহাসচেতনার আশ্রয়ে মূলত আদর্শীকরণ প্রক্রিয়ায় শিল্পসৃষ্টি করেছেন ('গোরা' তার দৃষ্টান্ত), আবার কোথাও বা একেবারে বাস্তব-ভূমিতে তিনি নেমে এসেছেন এবং তার ফলে সমকালীন সমাজরীতি ও রাজনীতির পরিশ্রুত রসে তাঁর সৃষ্টির ভাব-তরুটি অভিসিঞ্চিত হয়েছে।

(খ) উক্ত ইতিহাসচেতনার রং-এ বঙ্কিমের শিল্পসৃষ্টিতে শৌর্য-বীর্যময় চিত্রই অঙ্কিত (দৃষ্টান্ত : জীবানন্দ, ভবানন্দ, ভবানী পাঠক, সীতারাম, রাজসিংহ), রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিতে ইতিহাসচেতনার রসে মানবতাবোধ, ত্যাগ, সেবা, প্রেম, দয়া প্রভৃতি ভাবগুলি সিঞ্চিত। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক বীরচরিত্র অবলম্বন না করে ইতিহাস-রসে পুষ্ট মানুষের সৃষ্টি করেছেন। (গোরা, নিখিলেশ তার দৃষ্টান্ত। ঠিক অব্যবহিত পূর্ববর্তীকালের ইতিহাসের প্রতিনিধি গোরা, সমসাময়িক কালের নিখিলেশ)।

(গ) সমকালীন যুগের অধ্যায় বঙ্কিমের শিল্পসৃষ্টিতে আছে, কিন্তু তাতে বিশেষরূপে তৎকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনের কোন প্রকার শিল্পিত অভিব্যক্তি নেই। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনকেও শিল্পের উপকরণরূপে গ্রহণ করেছেন এবং তার মাধ্যমে স্বীয় স্বদেশচিন্তা ব্যক্ত করেছেন। স্পষ্টত বঙ্কিমের কালে বাঙালি মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজ ধর্মসংস্কার আন্দোলনেই মেতে উঠেছিল বেশি, তাই 'ত্রয়ী' উপন্যাসগুলিতে গীতোক্ত অনুশীলন-ধর্ম প্রতিফলিত। এদিকে রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'-পরবর্তী বিখ্যাত উপন্যাসদুটিতে সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনের পটভূমিটি উজ্জ্বল, ধর্মসংক্রান্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব তৎকালে পশ্চাতপটে অপসৃত।

(ঘ) রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মবিষয়ক চিন্তার ক্ষেত্রে পূর্বসূরী ও

উভয়সৃষ্টির মিল ও পার্থক্য উভয়ই (যেগুলি আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে তুলনামূলকভাবে পর্যালোচনা করেছি) এই শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রেও সুস্পষ্টরূপে প্রভাবশীল থেকেছে। উপন্যাসের ক্ষেত্রে 'আনন্দমঠ' ও 'গোরা' কিংবা 'বিষবৃক্ষ' ও 'চোখের বালি', আর সঙ্গীতে 'বন্দেমাতরম্' ও 'জনগণমন' তার দৃষ্টান্ত।

(ঙ) স্বদেশচিন্তামূলক শিল্পসৃষ্টিতে দুজনেরই মানসভূমিতে অন্তর্লীন ধর্মচেতনাটি বিশেষভাবে উপলব্ধি করা যায়। তবে বঙ্কিমের এই জাতীয় শিল্প যেন স্থাপত্য-ধর্মী এবং এর অন্যতম প্রধান উপকরণরূপে—আরও স্পষ্ট করে হয়ত বলা যায় গাঁথুনির মশলারূপে, উক্ত ধর্মচেতনাটি বিদ্যমান ('ত্রয়ী' ও 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত তার দৃষ্টান্ত)। আর রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় সৃষ্টি যেন পুষ্পিত বা ফলবান তরুর মতো, যার পরিপুষ্টিতে ধর্মচেতনা সূর্যালোকের মতো সঞ্চরণশীল, কিন্তু কোন স্থূল উপাদানরূপে বোধগম্য হয় না। ('গোরা' ও 'জনগণমন' তার দৃষ্টান্ত)। তাই বঙ্কিমের আদর্শ গীতোক্ত অনুশীলন 'ধর্মতত্ত্ব'টি স্বদেশচিন্তামূলক শিল্পসৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আদর্শ 'মানুষের ধর্ম' অপ্রত্যক্ষ অথচ অনুভূত।

(চ) ফলশ্রুতিতে বঙ্কিমের শিল্পান্বিত স্বদেশচিন্তা হিন্দু-জাতীয়তাবাদের ভরাজোয়ারে সর্বত্র সঞ্চারিত হতে পেরেছিল। আর রবীন্দ্রনাথের শিল্পান্বিত স্বদেশচিন্তা স্বদেশীসঙ্গীতে সারা বাংলাকে একটি বিশেষ যুগে উদ্বেল করলেও পরবর্তী পর্বে বুদ্ধিবাদী ও সাহিত্যরসিক মহলেই সীমাবদ্ধ থেকে গেল। বিশেষত 'নেশন' ও 'ন্যাশনালিজম'-এর ঢক্কানিনাদের মধ্যে তাঁর আধ্যাত্মিক আন্তর্জাতিকতার সুর চাপা পড়েছে, গণচেতনায় সংক্রামিত হতে পারে নি (অবশ্য অংশত প্রভাব বিস্তার করেছে)। আমরা আগেই বলেছি, 'আনন্দমঠে'-র অবদান রাজনৈতিক চেতনা-বিস্তারে, 'গোরা'-র অবদান বাস্তবনিষ্ঠ সমাজ-চেতনা-প্রতিষ্ঠায়। প্রথমটি হিন্দু-জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বাহনে দ্রুত সঞ্চারিত, আর দ্বিতীয়টি পরোক্ষভাবে গণসংগ্রামের ভূমিকা রচনা করলেও খুব ধীরসঞ্চারী।